ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত ১৯৬৫

সুকুমার সেন

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত রঙ্গীনচন্দ্র হালদার

সহৃদয়-সুহৃদয়েষু

সূচীপত্র

এই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস বইটির নামকরণের কৈফিয়ৎ না দিলে পাঠক ঠকানো হইবে বলিয়া মনে করি। প্রথমত, এখনকার দিনের ব্যবহারে ভারতীয় মানে Indian আর ভারতীয় সাহিত্য মানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত সাহিত্য। এই অর্থ সাহিত্য অকাদেমি সমর্থিত বটে। আমি কিন্তু সে অর্থে ভারতীয় সাহিত্য বলি নাই। যে সাহিত্য কোন বিশিষ্ট প্রাদেশিক ভাষায় লেখা নয়, যে সাহিত্য এমন ভাষায় লেখা যা কখনো কোন প্রদেশ বিশেষের সম্পত্তি ছিল না, যে ভাষা অনেক প্রদেশেরই ব্যবহার্য ছিল এবং যে ভাষার সাহিত্যে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সমান অধিকার,—অর্থাৎ বৈদিক, সংস্কৃত, বৌদ্ধসংস্কৃত, পালি, বিভিন্ন প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ—এই সব প্রাচীন ও মধ্যকালীন ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত সাহিত্যবস্তুর কথাই বলিয়াছি। 'প্রাচীন ও মধ্যকালীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যের ইতিহাস' নাম দিলে হয়ত অধিকতর সঙ্গত হইত কিন্তু সে পাঠকখেদানো নামে প্রকাশক মহাশয়ের অসুবিধা হইত আশঙ্কা করিয়া তাহা করি নাই।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের ইতিহাস বলিতে বিবিধ ভাষায় যে ধরনের গ্রন্থের সহিত পাঠকেরা পরিচিত এ বইটি ঠিক সে ধরনের নয়। এ বই ইতিহাস, তবে আবর্জনা বর্জিত। (আবর্জনা বলিলে কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হইবেন। তাঁহাদের সান্ত্বনার্থে বলি, আমি যাহা আবর্জনা বিবেচনা করিয়াছি।) আমার নিজের রুচিমত এই ইতিহাস রচনা। শুনিয়াছি কেউ কেউ মনে করেন সাহিত্য-আলোচনায় আমার কোন অধিকার নাই কেননা, তাঁহাদের মতে, বিধাতা আমাকে রসবোধহীন করিয়াছেন। এমন ব্যক্তিবিদ্বেষ নূতন নয়, চিরকালই আছে এবং তাহার জবাব কালিদাস ও ভবভূতি দিয়াছেন। তাহাই যথেষ্ট। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-পরীক্ষার্থীদের জন্য বইটি আমি লিখি নাই, লিখিয়াছি সেই দুর্লভ পাঠকদের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া যাঁহারা প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে ভালোলাগার পাথেয় খোঁজেন, প্রাচীনত্বের বড়াই খোঁজেন না। তিন হাজার বছরের একটানা সাহিত্যের ইতিহাস আর কোন দেশের ভাষায় আছে কিনা জানি না। থাকিলেও, আমার বিশ্বাস, আমি যে দৃষ্টি ও জ্ঞানবুদ্ধি বলে পড়িয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বইটি লিখিলাম তাহা অ-দ্বিতীয়। জানি ইহার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য দায়ী খানিকটা আমার যথোচিত-অবকাশহীনতা আর অনেকটা আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনার অক্ষমতা।

ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রবাহ যেমন সাহিত্যের প্রবাহও তেমনি অবিচ্ছিন্ন। তবে সাহিত্যপ্রবাহের অখণ্ড ধারা বহুশ অন্তর্বহমান বলিয়া সহজে অথবা সহসা প্রতীয়মান নয়। এই বইয়ে আমি যথাসাধ্য সেই অখণ্ড-প্রবাহের অনুসরণ করিবার প্রযত্ন করিয়াছি। বৈদিক সাহিত্য-সংস্কৃতির যে আত্যন্তিক বিচ্ছেদ ছিল না তাহা প্রতিপন্ন করিতে নূতন-পুরাতন উপাদান উপস্থাপিত করিয়াছি। বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্ যে কেবলি কঠিন তত্ত্বকথা নয়, তাহার মধ্যেও যে স্থানে স্থানে নির্মল সাহিত্যরস সঞ্চিত আছে, বোধ করি তাহাও দেখাইতে পারিয়াছি। পালি বৌদ্ধসংস্কৃত এবং জৈন সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের উত্তুঙ্গতার নূতন পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের দেশের প্রাচীন সমালোচকেরা যে সব ভালো রচনাকে সাহিত্যমূল্য দিতে পারেন নাই, সে সব আমি উপেক্ষা করি নাই। আর যে সব রচনা পাণ্ডিত্যের উৎসমুখে উৎসারিত এবং যেগুলি লইয়া পণ্ডিতেরা মাতামাতি করিয়াছেন সেগুলিকে আমার আলোচনায় অপ্রয়োজনীয় বোধে যথাসম্ভব প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। স্বভাবতই

সবচেয়ে বেশি স্থান লইয়াছেন কালিদাস। কালিদাসের রচনায় পূর্ববর্তী সাহিত্যের ফলপরিণতি আছে, সমসাময়িক লোকসাহিত্যের স্বীকৃতি (—বাংলা অর্থে নয়, সংস্কৃত অর্থে—) আছে এবং পরবর্তী সাহিত্যের বীজ নিহিত আছে। কালিদাসের ভাষা প্রাচীন আর্য (সংস্কৃত), তবে সে ভাষার মোড়কে যাহা আছে তাহাতে কালের বাতিল ছাপ পড়ে নাই।

এই বই পড়িয়া যদি দু-চার জন কেহ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আগ্রহবান্ হন, তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থক।—এই ভরসা করি মনে।

৪ অক্টোবর ১৯৬৬ শ্রীসুকুমার সেন

'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' বইটি 'ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস' নামে প্রকাশিত হইল। বইটি ১৯৬৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পাইয়াছিল। আগের সংস্করণগুলিতে বইটির নামে অসম্পূর্ণতা ছিল। ভারতীয় সাহিত্য বলিলে দ্রাবিড়ীয় ও অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্যও বুঝায়। সেইজন্য নামটি বর্তমান সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিলাম। গ্রন্থ মধ্যে কিছু কিছু রদবদল করা হইল।

বর্তমান সংস্করণে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান বন্দিরাম চক্রবর্তী সবরকম সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

৪ জানুয়ারি ১৯৯২ শ্রীসুকুমার সেন

প্রকাশকের নিবেদন

সুকুমার সেনের ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের এই দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণে মুদ্রণ প্রমাণ যতদূর সম্ভব দূর করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে অধ্যাপক শ্রীসমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীসুনন্দনকুমার সেনের সাহায্য সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি।

সুধাংশুশেখর দে

ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

১. ঋগ্‌বেদ-কথা

ভারতীয় সাহিত্যের প্রবাহ কালে কালে বাঁক ফিরিয়া ফিরিয়া দৃশ্যাদৃশ্য স্রোতে বিসর্পণ করিতে করিতে বহিয়া আসিয়াছে। সাহিত্যের প্রকাশ ভাষায়। সেই ভাষার কালোচিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অবিচ্ছিন্নধার ভারতীয় সাহিত্যকে কয়েকটি সমতলের ঘাটে ধরিতে ছুঁইতে পারি। প্রথম হইল বৈদিক সাহিত্য, দ্বিতীয় সাধু সংস্কৃত সাহিত্য, তৃতীয় কথ্য সংস্কৃত সাহিত্য, চতুর্থ পালি (বৌদ্ধ) সাহিত্য এবং প্রাচীন রাজানুশাসন ও প্রত্নলিপি, পঞ্চম জৈন সাহিত্য, ষষ্ঠ প্রাকৃত ভাষায় পদ্য ও গদ্য রচনা, সপ্তম অপভ্রংশ পদ্য ও গদ্য রচনা, অষ্টম অবহট্‌ঠ পদ্য ও গান, নবম প্রথম নব্য ভারতীয় রচনা। অতঃপর, আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, ভারতীয় সাহিত্যধারা বিশীর্ণ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছুকাল সমান্তরাল বহিয়া গিয়া অবশেষে নিজ নিজ পথে দূরান্তরিত হইয়াছে।

এ বড় আশ্চর্যের কথা যে দীর্ঘ-অনুশীলনসিদ্ধ প্রৌঢ়িমা লইয়াই ভারতীয় সাহিত্যের উদয় হইয়াছিল। সে হইল ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ-সংহিতা (ঋক্-বেদ)। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে এবং এক অথবা বহু দেবভাবনার বিমিশ্র অনুভূতির উত্তেজনায় ও আবেগে ঋগ্‌বেদের "সূক্ত" (= সু-উক্ত) অর্থাৎ সুভাষিত দেবস্তোত্র ও তদন্তর্গত "ঋক্" অর্থাৎ অর্চনাশ্লোকগুলি উদ্দীপ্ত। ইহার মধ্যে অবশ্য এমন অল্প কয়েকটি কবিতাও আছে যাহা দেবোপাসনার, যজ্ঞকার্যের অথবা অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কবিরহিত। ভারতীয় সাহিত্যের পরবর্তী ইতিহাসে পৌঁছিলে তবেই ঋগ্‌বেদের মধ্যে অসমঞ্জস "লৌকিক" কবিতাগুলির বিশেষ মূল্য নজরে পড়ে।

"সংহিতা" অর্থাৎ গ্রন্থ আকারে ঋগ্‌বেদের কবিতাগুলি সংকলিত হইতে বেশ বিলম্ব হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদ সংহিতার অধিকাংশ সূক্তের রচনাকাল ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ তবে সংকলনকাল খুব কম হইলেও চারিপাঁচ শত বৎসর পরে। কিছু কিছু কবিতার রচনাকাল তাহার আগে। কিন্তু কত আগে তাহা বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় যে কবিতাগুলি সব একই সময়ে অথবা খুব অল্পকালের ব্যবধানে রচিত হয় নাই। ভাব ভাষা ও বস্তু (দেবভাবনা) বিশ্লেষণ করিয়া ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলিকে প্রাচীন ও অর্বাচীন, দুই ভাগে সহজে পৃথক করা যায়। প্রাচীন ভাগের কবিতাগুলির উর্ধ্বসীমা ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে বিশেষ বাধা নাই। তখনও পূর্ব-অভিজন ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগত আর্যদের সম্পর্কসূত্র সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। অর্বাচীন ভাগের কবিতাগুলির রচনাকালের অধঃসীমা গ্রন্থের শেষ সংকলনের কিছু আগে।

ঋগ্‌বেদের রচনা ও সংকলনকালে এবং তাহার বেশ কিছুকাল পরেও, আর্য-ভারতীয়দের মধ্যে দুইচারিজন ব্যতীত কেহই হয়ত লিখিতে জানিতেন না। ঋগ্‌বেদের সূক্ত মুখে মুখে রচিত এবং মুখে মুখেই গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে আগত ও গ্রন্থবদ্ধ। ইহাই হইল অভিজ্ঞদের অভিমত। এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর কোন দেশে ঘটে নাই। হাতে লেখার কথা দূরে থাক যত্ন করিয়া ছাপায় তুলিলেও ভুল এড়ানো যায় না। অথচ একটানা প্রায় দেড়-দুই হাজাব বৎসর ধরিয়া ঋগ্‌বেদের মতো গ্রন্থ (এবং সেই সঙ্গে বিশাল বৈদিক সাহিত্যের অপর ভারি ভারি গ্রন্থ) মুখে মুখেই পুরুষানুক্রমে কালবাহিত হইয়া পরিশুদ্ধভাবে আসিয়াছে। মৌখিক পরিবহনে

যাহাতে ভ্রমপ্রমাদের প্রবেশ না ঘটে সেজন্য সেকালের বেদজ্ঞেরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। ঋগ্‌বেদের সূক্ত অভ্রান্তভাবে মনে রাখিবার ও বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে অনেক উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। সেসব এখন অদ্ভুত উৎকট মনে হয়। মুখে মুখে ঋগ্‌বেদ রেকর্ড করার বিভিন্ন উপায়গুলিকে "পাঠ" বলা হয়। সাধারণত পরিচিত হইতেছে "পদ-পাঠ"। পদপাঠ প্রণালীতে প্রত্যেক পদ সন্ধি ভাঙ্গিয়া এবং সমাস-পদ হইলে সমাস ভাঙ্গিয়া একটি একটি করিয়া পড়া হইত। পদপাঠে অনেক সময় পদের বিভক্তি-অংশও বিশ্লিষ্ট করা আছে এবং প্রত্যেক পদের নিজস্ব স্বর (accent) দেখানো হইয়াছে। এইভাবে আমাদের দেশে ভাষা-বিশ্লেষণের (অর্থাৎ ব্যাকরণের) সূত্রপাত হইয়াছে এই পদ-পাঠ প্রণালীতে।

এখানে একটা কথা জানা আবশ্যক। ঋগ্‌বেদের সূক্ত যেভাবে পড়া হইত (অর্থাৎ "মন্ত্র-পাঠ") তাহা কোন কোন স্থলে পদপাঠেরই মতো ছিল।

পদ-পাঠ ছাড়া, বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করিবার জন্য আরও কয়েক রকম পাঠ-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল। "ক্রম"-পাঠে প্রথমটি ছাড়া প্রত্যেক পদ পুনরুক্ত হইত। "জটা"-পাঠে দুইটি করিয়া পদ প্রথমে যথাক্রমে পড়িয়া তাহার পর উল্টাইয়া পড়িয়া আবার ঠিকমত পড়িতে হইত। "সংহিতা", 'পদ' ও "ক্রম" এই তিন পাঠ-প্রণালীর উদাহরণ দিতেছি :

সংহিতা-পাঠ

তৎ সবিতুর্ বরেণিঅং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

পদ-পাঠ

তৎ। সবিতুঃ। বরেণ্যম্। ভর্গঃ। দেবস্য। ধীমহি।
ধিয়ঃ। যঃ। নঃ। প্রচোদয়াৎ।।

ক্রম-পাঠ

তৎ সবিতুঃ। সবিতুর্বরেণ্যং। বরেণ্যং ভর্গঃ। ভর্গো দেবস্য।
দেবস্য ধীমহি। ধীমহীতি ধীমহি।
ধিয়ো যঃ। যো নঃ। নঃ প্রচোদয়াদিতি প্রচোদয়াৎ।।

ঋগ্‌বেদ নামের মধ্যে 'ঋক্' শব্দের অর্থ "অর্চনা শ্লোক" আর 'বেদ' শব্দের অর্থ "প্রাচীন পরম্পরাগত জ্ঞানভাণ্ডার"। 'বিদ্যা' ও 'বেদ' দুইই বিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন কিন্তু শব্দ দুইটির অর্থ ঠিক এক নয়। 'বিদ্যা' মানে যে জ্ঞান ব্যক্তিচেষ্টার দ্বারা অধিগত, 'বেদ' মানে পূর্বাগত জ্ঞানরাশি। বেদ-মন্ত্র বিশেষ কোন ব্যক্তির রচনা নয়, ইহা "অপৌরুষেয়" অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক। প্রাচীনকালের এই ধারণার উৎপত্তির হেতু বেদ শব্দের ব্যঞ্জনায় নিহিত ছিল।

ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি সংহিতা-আকারে সঙ্কলিত হইবার অনেককাল পূর্ব হইতেই বিভিন্ন অর্চক (ঋষি) গোষ্ঠীর সম্পত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছিল। অর্চক-গোষ্ঠীর ব্যক্তিবিশেষ তাঁহাদের নিজস্ব সূক্তগুলি—সব না হইলেও কিছু কিছু—লিখিয়া থাকিবেন এবং/অথবা নিজ বংশ ও গুরুবংশ ক্রমে সেগুলি ব্যবহারের অধিকার পাইয়া থাকিবেন। ঋগ্‌বেদ-সংহিতা সঙ্কলনের সমকালে সূক্তগুলির প্রত্যেকটির "ঋষি" (অর্থাৎ দ্রষ্টা বা রেকর্ডার) নির্বাচিত হইয়াছিল।[১] ঋক্ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে নারীও ("ঋষিকা") আছেন। যেমন অপালা আত্রেয়ী, ঘোষা কাক্ষীবতী, "বাক্ অম্ভৃণী", "শচী পৌলোমী"। শেষ তিনটি নাম কল্পিত মনে হয়।

১। সেকালের মতে ঋষিরা ঋক্‌মন্ত্র দৈববাণীর ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নামগুলি অনেক সময় যদৃচ্ছাগৃহীত বলিয়া বোধ হয়। কেননা ইহার মধ্যে প্রাচীন দেবতার নামও আছে। যেমন ত্রিত আপ্ত্য, ত্রিশিরাঃ ত্বাষ্ট্র, সূর্যা সাবিত্রী।

ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় সূক্তগুলি দুই রকমে সাজানো আছে। এক "অষ্টক" বিভাগ, আর "মণ্ডল" বিভাগ। ঋগ্‌বেদের "সূক্ত" (অর্থাৎ কবিতা) সংখ্যায় ১০১৭ (এগারোটি "বালখিল্য" সূক্ত ধরিলে ১০২৮)। "অষ্টক" বিভাগে এই সূক্তগুলি মোটামুটি আট সমান অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের নাম "অষ্টক"। প্রত্যেক অষ্টক আবার আটটি করিয়া "অধ্যায়"-এ বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় আবার পাঁচ অথবা ছয় শ্লোক ("ঋক্") লইয়া কয়েকটি "বর্গ"-এ বিভক্ত। এই বিভাগ যান্ত্রিক ও অর্বাচীন। মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্যই এই বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

"মণ্ডল" বিভাগে সূক্তগুলিকে কোনরকম ভাঙচুর করা হয় নাই। এখানে সূক্তগুলি দশটি "মণ্ডল"-এ বিভক্ত। প্রথম মণ্ডলে সূক্ত-সংখ্যা ১৯১, দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩, তৃতীয় মণ্ডলে ৬২, চতুর্থ মণ্ডলে ৫৮, পঞ্চম মণ্ডলে ৮৭, ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫, সপ্তম মণ্ডলে ১০৪, অষ্টম মণ্ডলে ৯২ (বালখিল্য সূক্তগুলি ধরিলে ১০৩), নবম মণ্ডলে ১১৪, দশম মণ্ডলে ১৯১। এই "মণ্ডল" বিভাগই প্রাচীন এবং এই বিভাগ স্বীকার করিয়াই ঋগ্‌বেদ-সংহিতার বর্তমান সঙ্কলন গঠিত।

দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত মণ্ডলগুলিতে সূক্ত এক রীতিতে সঙ্কলিত। এখানে মণ্ডলে একটি করিয়া ঋষির (আসলে ঋষি-বংশের) রচনা স্থান পাইয়াছে। ঋষিগোষ্ঠী দ্বিতীয় মণ্ডলে গৃৎসমদ, তৃতীয় মণ্ডলে বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলে অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলে ভরদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলে বশিষ্ঠ। অষ্টম মণ্ডলে অধিকাংশই কাণ্বদের রচনা। প্রত্যেক মণ্ডলে আবার প্রকৃতি (অর্থাৎ বিষয়) ও আকৃতি (অর্থাৎ ঋক্‌সংখ্যা) অনুসারে সূক্তগুলি সাজানো আছে। দ্বিতীয় হইতে সপ্তম, এই ছয়টি মণ্ডল লইয়া ঋগ্‌বেদের প্রথম সঙ্কলন অর্থাৎ ঋক্‌সংহিতার প্রথম সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার পর সংযোজিত হইয়াছিল প্রথম মণ্ডলের প্রথম পঞ্চাশটি সূক্ত এবং সমগ্র অষ্টম মণ্ডল। অষ্টম মণ্ডলে যদিও সব সূক্তই কাণ্ববংশীয় ঋষির রচনা তবুও ইহাতে সূক্তগুলির যোজনা ভিন্ন পদ্ধতির। প্রথম মণ্ডলের প্রথম পঞ্চাশ সূক্তও অধিকাংশ কাণ্বদের রচনা। দ্বিতীয় সংযোজন হইল নবম মণ্ডল। ইহাতে যে সূক্ত আছে সে সবগুলিরই উদ্দিষ্ট দেবতা সোম। এখানে ঋষিদের মধ্যে নূতন কোন নাম নাই। অনুমান করা হয় যে দ্বিতীয় হইতে অষ্টম মণ্ডল পর্যন্ত ঋষি-কবিদের সোমদৈবত সূক্তগুলি সরাইয়া নবম মণ্ডলরূপে সংযুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর প্রথম মণ্ডলের বাকি সূক্তগুলি (১৪১) এবং সর্বশেষে দশম মণ্ডল সংযুক্ত হইয়াছিল। প্রথম ও শেষ মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা একই (১৯১),—ইহা অনুধাবনযোগ্য। দশম মণ্ডল যে সর্বশেষ যোজনা তাহা সূক্তগুলির কোন কোনটির ভাষায় যে অল্পস্বল্প অর্বাচীনত্ব এবং অধিকাংশের বিষয়ে যে বৈচিত্র্য আছে তাহা হইতে বোঝা যায়।

ঋগ্‌বেদের সূক্তে ঋক্-সংখ্যার পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। গড়পড়তায় সূক্তের ঋক্-সংখ্যা দশ। সর্বাপেক্ষা বড় সূক্তে আটান্নটি ঋক্ আছে (১.১৬৪), সবচেয়ে ছোট সূক্তে একটি মাত্র (১.৯৯)।

ঋগ্‌বেদের কবিতায় মূল ছন্দ চারটি—ত্রিষ্টুভ্, জগতী, গায়ত্রী ও অনুষ্টুভ্। ত্রিষ্টুভে চার চরণ, প্রত্যেক চরণে অক্ষরসংখ্যা এগারো। জগতীতেও চার চরণ, চরণে অক্ষরসংখ্যা বারো। গায়ত্রীতে তিন চরণ, প্রত্যেক চরণে আট অক্ষর। অনুষ্টুভে চার চরণ, চরণে অক্ষরসংখ্যা গায়ত্রীর সমান। এ ছাড়া মিশ্র ছন্দও আছে। তাহাতে একাধিক মূল ছন্দের মিশ্রণ, চরণে অক্ষরসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি এবং ঋকে চরণসংখ্যার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। একটি ছন্দের তিনটি ঋক্ লইয়া গুচ্ছ হইলে বলে "ত্র্যচ" অর্থাৎ তিনটি ঋকের সমষ্টি। (যেমন সংস্কৃত কাব্যে বহু শ্লোকে বাক্য সমাপ্ত হইতে বলে "কুলক"।) দুই বিভিন্ন মিশ্র ছন্দের শ্লোকসমষ্টির নাম "প্রগাথ"। (সংস্কৃত কাব্যে দুইটি শ্লোকে বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে বলে "যুগ্মক"।)

সংস্কৃত মহাকাব্যে দেখা যায় যে প্রত্যেক সর্গে প্রধানত একটিমাত্র ছন্দ ব্যবহৃত, কিন্তু সর্গের শেষ শ্লোকের ছন্দ তাহা হইতে পৃথক্। এই বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত ঋগ্‌বেদের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত দেখা যায় যে ত্রিষ্টুভে রচিত সূক্তের শেষ ঋকের ছন্দ জগতী, অথবা গায়ত্রীতে রচিত সূক্তের শেষ ঋকের ছন্দ অনুষ্টুভ্।

চিরদিন ধরিয়া যাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়া সংস্কৃতকে শাস্ত্রের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের কাছে ঋগ্‌বেদ প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ। এ শাস্ত্র এত প্রাচীন ও এত পবিত্র যে, তাঁহাদের মতে, ইহার উদ্ভব ব্রহ্মার বাক্‌বিসর্গে, এবং যে যে ঋষির নাম বিশেষ বিশেষ কবিতার সহিত সংযুক্ত আছে তাঁহারা মন্ত্রস্রষ্টা[১] (= সূক্ত-রচয়িতা) নন, তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রের ধারক ও বাহক মাত্র। এখনকার বেতার-বার্তার ভাষায় ঋগ্‌বেদের ঋষিকবিরা ছিলেন যেন রিসিভার এবং ট্রান্‌স্‌মিটার যন্ত্রের মতো। তাঁহাদের বংশানুক্রমে অথবা শিষ্য-পরম্পরায় কবিতাগুলি যেন কালে কালে রীলে হইয়া আসিয়া অবশেষে—সাত-আট শত বৎসর অথবা তাহার আগে—পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব ঋগ্‌বেদ-সংহিতা ধর্মকাব্যগ্রন্থ, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া নিখুঁত অভ্যাসের মধ্য দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে।

ঋগ্‌বেদ-সংহিতা পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থরূপে সংকলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তবে ঋগ্‌বেদের সব কবিতাই ধর্মঘটিত নহে। ইহাতে এমনও কতকগুলি সূক্ত আছে যেগুলিকে বহু কষ্টকল্পনাতেও পারমার্থিক ভাবময় বলা যায় না। দুই একটিকে তুকতাক তন্ত্রমন্ত্রের পর্যায়ে ফেলিতে হয়। কিন্তু বাকি লৌকিক কবিতাগুলির সম্বন্ধে শুধু এই অনুমান করা চলে যে কেবল প্রাচীনত্বের দাবিতেই ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় এইগুলির স্থান হইয়াছিল। তখনকার কালে এই কবিতাগুলির মূল্য কেমন ছিল জানি না। এখনকার দিনে এইগুলির মূল্য ঋগ্‌বেদের অপর কবিতাগুলির তুলনায় বেশি। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরবর্তী সাহিত্যের বীজ ঋগ্‌বেদের এই লৌকিক কবিতাগুলির কোনো কোনোটির মধ্যে উপ্ত আছে।

লৌকিক কবিতাগুলির কথা বাদ দিলে ঋগ্‌বেদের সমস্ত কবিতাই দেববন্দনা ও প্রার্থনা। ঋগ্‌বেদে মুখ্য দেবতা বলিতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, বিষ্ণু, রুদ্র, সবিতা, অর্যমা, সূর্য, ভগ, পর্জন্য, যম, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্‌গণ, বৃহস্পতি, ত্বষ্টা, বসুগণ, অগ্নি ও সোম। আভাসে প্রতিভাসে দেবতাদের রূপকল্পনা ছিল কিন্তু কোন স্পষ্ট প্রতিমা-ভাবনা ছিল বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। যজ্ঞে—অর্থাৎ অগ্নিপূজায়—যাঁহাদের আহ্বান করা হইত তাঁহারা অলক্ষ্যে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের দূত এবং প্রতিনিধি ছিলেন একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নি। দেবতাদের উদ্দেশে খাদ্য ও পেয় নৈবেদ্য ("হবিঃ") অগ্নিতে সমর্পণ ("হোম") করা হইত। অগ্নি তাহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতেন। এইভাবে দেখিলে অগ্নিই ঋগ্‌বেদের মুখ্য দেবতা। সুতরাং ঋগ্‌বেদের ধর্মাচারকে অগ্নি-যাগ (fire worship) বলা যায়। ঋগ্‌বেদ-সংহিতার প্রায় চারি-আনা ঋক্ ইন্দ্রের স্তব। তাহার পরেই অগ্নির স্তব সংখ্যায় সমধিক। ঋগ্‌বেদ-সংহিতার আরম্ভ অগ্নির স্তবে, সমাপ্তিও অগ্নির স্তবে।

ঋগ্‌বেদের প্রথম সূক্ত গায়ত্রী ছন্দে রচিত। প্রথম ঋক্‌টি এই

অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।

১। বেদের প্রাচীনতম অংশ, ছন্দে রচিত ঋগ্‌বেদ, "মন্ত্র" বলিয়া পরিচিত ছিল।

হোতারং রত্নধাতমম্।।

'অগ্নিকে বন্দনা করি, (যিনি) পুরোহিত, [১]

(যিনি) যজ্ঞের দেবতা ঋত্বিক্,[১]

(যিনি) হোতা,[১] (যিনি) রত্নদাতা শ্রেষ্ঠ।।'

সোম-সূক্তগুলি সংখ্যায় অগ্নি-সূক্তের পরেই। সোম ঠিক দেবতা ছিলেন না। সোম-উদ্ভিদের রস দুগ্ধ মধু প্রভৃতি অনুপানযোগে মাদক পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত, যজ্ঞেও হবিঃরূপে দেবতাদেব উদ্দেশে প্রদত্ত হইত। সোম পান করিবার পরে দেহে যে উত্তেজনা এবং মনে যে উদ্দীপনা জাগিত তাহা বৈদিক কবি-ভাবুকদের মনে এক বিশেষ দৈবী শক্তির ক্রিয়া বলিয়া অনুভূত হইত। সেই অনুভবের বশে যে দেবরূপকল্পনা তাহাই সোম-দৈবত। আর্যেরা যখন ইরানে থাকিতেন তখনই সোমের দৈবীকরণ শুরু হইয়াছিল। কিন্তু কি আবেস্তায় কি বেদে সোম পুরাপুরি দেবতায় পরিণত হইতে পারে নাই। ইরানে থাকিতেই সোম-যাগ ও অগ্নি-যাগ পরস্পর বিরুদ্ধ হইতেছিল। ঋগ্‌বেদের মধ্যে এই বিরোধিতার পরিচয় নাই।

যখন বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড প্রচলিত ছিল তখন শিষ্ট ব্যক্তিরা যে অন্নপানে অভ্যস্ত ছিল তাহাই দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত। অর্থাৎ হোমের দ্রব্য ছিল—দুগ্ধ ঘৃত মধু সোম পুরোডাশ (যবের রুটি) মাংস। আচরণে দেবতারা মানুষের মতোই,—এই ছিল তখনকার কল্পনা। যদিও তখনও দেবতাদের মূর্তি ভক্তের হৃদয়ে সুস্পষ্ট রূপ নেয় নাই তবুও যেটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে অধিকাংশ দেবতায় মানবরূপই প্রতিফলিত। তবে কোন কোন অপ্রধান দেবতায়—যেমন রুদ্রপত্নীতে ও রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণে—পরিচিততম পশু গোরুর প্রতিফলন আছে। ঋগ্‌বেদের কবি দেবতাদের সৌম্যমূর্তিই আঁকিয়াছিলেন। সে কল্পনায় অতিরঞ্জন আছে বটে কিন্তু অতিরঞ্জনের মূলে বস্তুভিত্তি ছিল। যেমন অনূদিত প্রাতঃসূর্যের অধিদেবতা সবিতাকে বলা হইয়াছে "হিরণ্যাক্ষ" "হিরণ্যপাণি" "হিরণ্যহস্ত"।। সূর্যপ্রভারূপে কল্পনা করিয়া উষাকে একবার ইঙ্গিত করা হইয়াছে দশভুজারূপে (৮.১০১.১৩)।

ইয়ং যা নীচী অর্কিণী রূপা রোহিণ্যা কৃতা।

চিত্রেব প্রত্যদর্শ্যায়ত্যা অন্তর্দশসু বাহুষু।।

'এই যে নিম্নগামিনী কিরণময়ী, রোহিণীর দ্বারা রূপকৃত হইয়াছেন (তিনি) আসিতে আসিতে দশ বাহু প্রসারিয়া প্রতিমার মতো দেখা দিলেন।।'

(একবার পৃথিবীকেও "দশভুজি" বলা হইয়াছে ঃ দশভুজি ১১.৫২.১১)

এই রূপকল্পনা যে দশভূজা দুর্গা ভগবতী প্রতিমার ভাবনার মূলে তা এই সূক্তেরই পরের একটি ঋক্ হইতে আরও স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় (৮.১০১.১৫)।

মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং

স্বসাদিত্যানাম্ অমৃতস্য নাভিঃ।

প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায়

মা গাম্ অনাগাম্ অদিতিং বধিষ্ট।

'রুদ্রগণের (= মরুদ্‌গণের) মাতা, বসুদের কন্যা, আদিত্যদের ভগিনী, অমৃতের উৎস। যাহার বোধ আছে এমন লোককে বলিতেছি ঃ অপাপ গাভী অদিতিকে বধ করিও না।।'

১। 'পুরোহিত' হইল গৃহযাজী যাজ্ঞিক, 'ঋত্বিক্' যিনি নিয়মিত অগ্নিতে আহুতি দিতে থাকেন, 'হোতা' যিনি আহুতি দেবার সময়ে উপযুক্ত ঋক্‌মন্ত্র পড়িয়া যান।

যখন বৈদিক সমাজে গোমাংস ভক্ষণ উঠিয়া যাইতেছিল অথবা অন্য কারণে গোহত্যা নিষিদ্ধ হইতেছিল তখনি এই সূক্তটি রচিত হইয়াছিল। আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ গাথায় এই ভাবের উক্তি আছে।

এই প্রসঙ্গে কিছু অবান্তর কথা বলি। আমরা এখন দেবী দুর্গাকে ভগবতী রূপে এবং গো-দেবতারূপেও পূজা ও ভক্তি করি। শিবপত্নীর সহিত এ দেবতার সম্পর্ক নিতান্ত আধুনিক কালের নহে। আর্যেরা যখন ভারতবর্ষে আসে নাই তখনই গোরূপধরা উর্বীর কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে রুদ্রের সম্পর্কে গোরূপা পৃথিবী নূতন সাজ লইয়াছিল। "পৃশ্নি" (অর্থাৎ বাঘাফটকা রঙের) গোরু হইল রুদ্রের পত্নী। তাই রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণ ঋগ্‌বেদে "গোমাতরঃ" বলিয়া উল্লিখিত। অ-বৈদিক সংস্কৃত সাহিত্যে রুদ্রের গোপত্নীর ইঙ্গিতমাত্র নাই। সেখানে গাভী নয়, বৃষ শিবের বাহন। অথচ বৈদিক কল্পনা সংস্কৃত শাস্ত্র এড়াইয়া ভিতরে ভিতরে চলিয়া আসিয়া নিতান্ত আধুনিককালে গোদেবতা ভগবতীতে পরিণত হইয়াছে। "ভগবতী" রূপে রুদ্রপত্নী একালে ষষ্ঠীর দলভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার অধিষ্ঠান পাকুড় গাছে, বেলগাছে ও ভাগাড়ে।

যে দেবভাবনা বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে শুরু হইয়াছিল তাহাতে অদ্ভুত ও উৎকট কল্পনার রঙ যে অল্পস্বল্প লাগে নাই তাহা নহে। বৃহস্পতি (বা "ব্রহ্মণস্‌পতি") দেবতার রূপ কল্পনায় তাহার উদাহরণ পাই। অগ্নির দেবতা ও পুরোহিত—এই দুই ভাবনা মিলাইয়া বৃহস্পতির রূপকল্পনা। ঋগ্‌বেদে বৃহস্পতির বর্ণনা পৌরাণিক সাহিত্যের দেবগুরুর সঙ্গে একেবারে সাদৃশ্যবিহীন। ঋগ্‌বেদে বৃহস্পতি অর্ধেক মানব অর্ধেক পশু। মানবরূপে তিনি ধনুর্বাণ ও পরশুধারী, অরুণ অশ্ববাহিত রথারোহী। পশুরূপে তিনি তিগ্মশৃঙ্গ নীলপৃষ্ঠ সপ্তাস্য। প্রথম দুইটি কল্পনা অগ্নিশিখা হইতে, শেষ কল্পনা সূর্যরশ্মি হইতে। ষাঁড়ের মতো বৃহস্পতির নিনাদ। এ কল্পনাও অগ্নি হইতে আসিতে পারে। (এই বৈদিক মানব-পশু কল্পনা পৌরাণিক কল্পনায় পশুত্ব বর্জন করিয়াছিল এবং লৌকিক কল্পনায় মানবত্ব বর্জন করিয়াছিল। পুরাণে তিনি দেবগুরু। মনসামঙ্গলে বৃহস্পতি ব্রহ্মার যমজ সন্তান হইয়াছেন, তাঁহাদের "দেবকায় সপ্তমুখ পুচ্ছ পদভাগে"।)

ঋগ্‌বেদের কয়েকটি সূক্তে স্ত্রীদেবতার বন্দনা আছে। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উষা এবং যমজ ভগিনী "নক্ত" অর্থাৎ নিশা। উষা খুব প্রাচীন দেবতা হইলেও শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি কবিভাবনাতেই রহিয়া গিয়াছিলেন। যাগযজ্ঞে উষার কোন প্রাপ্য অংশ ছিল না। অপর দেবীদের তো নাই-ই। ঋগ্‌বেদের অপর, অর্বাচীন, দেবীরা সকলেই ভালো-মন্দ গুণ অথবা শক্তির ভাবনা হইতে মূর্তি লাভ করিয়াছে।

ভালো শক্তি যাহা মানুষকে পোষণ করে, ধারণ করে, মহৎ করে তাহা যে যে দেবীভাবনায় রূপ খুঁজিয়াছিল সেগুলি নদী অথবা জলাধারার সহিত ("আপঃ") বিজড়িত। যেমন, বিশেষ করিয়া সরস্বতী ও ইড়া। (পৌরাণিক সাহিত্যে এই দুই দেবতা এক হইয়া গিয়াছেন।) এই দুই দেবীর উদ্দেশে লেখা দুইটি করিয়া সূক্ত আছে। প্রথমটির প্রারম্ভে যে একটি গল্পের ইশারা আছে তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে বৈদিক সাহিত্যের যে অযজ্ঞীয় অংশ ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় বাদ গিয়াছে তাহার কোন কোনটির বস্তুতে সরস্বতী নদী-দেবীর কাহিনী উল্লিখিত ছিল। সরস্বতীকে বৈদিক কবির ধাত্রী বলিতে পারি, যেমন সংস্কৃত কবির ধাত্রী গঙ্গা। সরস্বতী-তীর হইতে দূরে থাকা বৈদিক কবি নির্বাসনতুল্য ভাবিয়াছেন। সরস্বতীর কাছে বৈদিক কবির প্রার্থনা ছিল এই (৬.১১.১৪ ঘ)

মা ত্বৎ ক্ষেত্রাণি অরণ্যানি গন্ম।।

'আমরা যেন তোমা হইতে দূরে মরুস্থানে না যাই।।'

বাক্‌-শিল্পের মাহাত্ম্য-শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করি (১০.৭১.২, ৪)।

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো
যত্র ধীরা মনসা বাচম্‌ অক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে
ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি।।২।।

'ছাঁকনিতে ছাতু ছাঁকার মতো জ্ঞানী যেখানে মনের দ্বারা বাক্য বলিয়াছে, সেখানে সখারা সখার ব্যবহার বুঝিতে পারে। তাহাদের বচনে ভদ্র লক্ষ্মী নিহিত।

বাণীর রূপ বাণীর রস সকলের গোচরে সকলের নাগালে আসে না। যাহাকে বাণীর অনুগ্রহ হয় সে-ই বাণীকে পায়।

উত ত্বঃ পশ্যন্‌ ন দদর্শ বাচম্‌
উত ত্বঃ শৃণ্বন্‌ ন শৃণোতি এনাম্‌।
উতো তু অস্মৈ তনুবং বি সস্রে
জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ।।৪।।

"বাক্‌কে কেহ হয়ত দেখিয়াও দেখিল না, কেহ হয়ত শুনিয়াও শুনে না। আবার কাহাকে হয়ত (সে) নিজেকে অনাবৃত করিয়া দিল, যেমন সুবেশ প্রেমার্দ্র পত্নী পতির কাছে (করে)।

দ্বিতীয় সূক্তটি যে বাক্‌-দেবতার উদ্দেশে লেখা তা মূলের মধ্যে কোথাও উল্লিখিত নয়। সূক্তটি কোন এক নারীর উক্তি। তিনি যে বাক্‌ তাহা অনুমান করিয়া লইতে হয়। অনুমানের হেতু, 'বৃহদ্দেবতা' নামক ঋগ্‌বেদসংহিতা-সূচি গ্রন্থে সূক্তটি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাকের রচনা বলিয়া নির্দিষ্ট। ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তের (৩.৫৫) ঋক্‌গুলির যে ধুয়া, "মহদ্‌ দেবানাম্‌ অসুরত্বম্‌ একম্‌" ('দেবতাদের মধ্যে একটি মহৎ ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান)', সেই ভাবনাতেই বাকের দ্বিতীয় সূক্তটি বিরচিত। এই সূক্ত হইতে কয়েকটি ঋকের অনুবাদ দিতেছি।

'আমি রুদ্রপুত্রদের সহিত বসুদের সহিত বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সহিত এবং সব দেবতার সহিত (বিচরণ করি)। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কেই ভরণ করি, আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে, আমি উভয় অশ্বীকে (ভরণ করি)।। ১।।

'আমি সবনযোগ্য সোমকে ভরণ করি, আমি ত্বষ্টাকে এবং পূষাকে ও ভগকে (ভরণ করি)। আমি নিষ্ঠাবান্‌ হবিষ্মান্‌ সোমযাজী যজমানকে ধন দান করি।। ২।।

'আমি বসুদের সমিতি। যাঁহারা যজনীয় তাঁহাদের মধ্যে (আমি) প্রথম জ্ঞানবতী। এমন আমাকে দেবতারা বহুধা বিধান করিয়াছেন,—(আমি) বহু স্থানবাসিনী, বহু স্থানচারিণী।। ৩।।

'যে চিন্তা করে, যে প্রাণ ধারণ করে, যে কানে শুনিতে পায়, সে আমার দ্বারা পুষ্টি গ্রহণ করে। আমাকে না জানিয়াই তাহারা বাঁচিয়া আছে। শোন, বিশ্বাস করিবার মতো কথা তোমাকে বলিতেছি।। ৪।।

'আমিই নিজে এ (কথা) বলিতেছি যাহা দেবতাদের এবং মানুষদের প্রিয়। যাহাকে (যাহাকে) ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকেই বড় করিয়া দিই,—তাহাকে দক্ষ পুরোহিত ('ব্রহ্মা''), তাহাকে মন্ত্রকার ("ঋষি"), তাহাকে সুবুদ্ধি (করিয়া দিই)।। ৫।।

'রুদ্রের হইয়া আমিই তাঁহার ধনু টানিয়া দিই—ব্রহ্মদ্বেষী শক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে।

আমিই লোকের মধ্যে বিবাদ বাধাই। আমিই দ্যুলোকে ও ভূলোকে প্রবেশ করিয়াছি।। ৬।।

'ইহার শিখরে আমি পিতাকে প্রসব করিয়াছি। আমার গর্ভস্থান সমুদ্রের ভিতরে। সেখান হইতে আমি বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া দাঁড়াইয়া আছি। সেই দ্যুলোক আমি দীর্ঘতায় স্পর্শ করি গিয়া।। ৭।।

'আমি বায়ুর মতো ধাই, বিশ্বভুবন ধরিয়া রাখিতে রাখিতে। দ্যুলোকের ওপারে এই পৃথিবীরও পারে, এমন মহিমায় আমি সম্ভূত হইয়াছি'।। ৮।।

এই সূক্তটি হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে শক্তিপূজার আরম্ভ ধরা হয়। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে যে "সপ্তশতী" অধ্যায়গুলিতে চণ্ডীমাহাত্ম্য বর্ণিত তাহাতে খানিকটা এই সূক্তের ভাবই আছে এবং পরবর্তীকালের কবিকল্পনা ও দেবভাবনা আশ্রয় করিয়া বিস্তারিত হইয়াছে। "চণ্ডী" আইডিয়াটির বীজও ঋগ্‌বেদে পাওয়া যায়।

আসলে কিন্তু এই সূক্তে ব্রহ্মভাবনা রহিয়াছে। তলবকার-'কেন' উপনিষদের গোড়ায় ব্রহ্ম যে ভাবে উপস্থাপিত এই সূক্তে নাম-না করা বাক্ ঠিক তেমনি ভাবেই বিবৃত। প্রথম হইতেই রুদ্র দেবতার দুই মেজাজ ছিল, প্রসন্ন ও ক্রুদ্ধ। প্রসন্ন মেজাজে দক্ষিণ মুখে তিনি আরোগ্যের দেবতা, পশু-মানুষের "ভিষক্‌তম"। ক্রুদ্ধ মেজাজে রুদ্র মুখে তিনি ধ্বংসের দেবতা, বিশেষ করিয়া অপরাধীর ও গার্হস্থ্য পশুর। ঋগ্‌বেদের সময়েই রুদ্রের ক্রোধ ("মনা") কবিদের দৃষ্টিতে শুধু ভাবময় না থাকিয়া বস্তুময় ও রৌদ্রময় হইয়া স্বতন্ত্র দেবভাবনা জাগাইতেছিল। যেমন (২.৩৩.৫)

> হবীমভি র্হবতে যো হবির্ভির্
> অব স্তোমেভী রুদ্রং দিষীয়।
> ঋদূদরঃ সুহবো মা নো অস্যৈ
> বভ্রু সুশিপ্রো রীরধন্ মনায়ৈ।।

"আহ্বানমন্ত্র স্তব ও হব্য দিয়া যাঁহাকে আহ্বান করা হয়, (সেই) রুদ্রকে আমি স্তোত্রের দ্বারা যেন প্রসন্ন করিতে পারি। কৃপাময়, সহজে আহূত, লালকালো, সুন্দর-ওষ্ঠাধর—(তিনি) যেন আমাদের তাঁহার মনার বশে না ফেলেন।।"

এই মনারই সমার্থক শব্দ "চণ্ডী"।

দেবতাদের মধ্যে শুধু রুদ্রেরই ঘর-সংসারের বেশি উল্লেখ ঋগ্‌বেদে আছে। তাঁহার পত্নী পৃশ্নি গাভী, পুত্রেরা মরুৎ। রুদ্র ও মরুৎ—সকলেই ভালো, নাটকীয়, সাজ পরেন এবং রথে চড়েন। রুদ্র ভৈষজ্য বিতরণ করেন, পুত্রেরা ("গোমাতরঃ" "রুদ্রাসঃ") বৃষ্টিধারা দেন। কিন্তু পিতার যেমন পুত্রদেরও তেমনি দুই মেজাজ, সৌম্য ও ভীষণ (শিব ও রুদ্র)।

ঋগ্‌বেদে দেবপত্নীদের নাম পতিনামে স্ত্রীপ্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। যেমন, ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ী। ইন্দ্রপত্নী ছাড়া ইহাদের শুধু নামটুকুই উল্লিখিত। একটি প্রহেলিকাময় এবং কিছু অশ্লীল সূক্তে (১০.৮৬) ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর ও বৃষাকপির সংলাপ আছে। বৃষাকপি ইন্দ্রের পুত্র এবং মনে হয় যেন ইন্দ্রাণীর সপত্নীপুত্র। ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর পুত্রবধূরও উল্লেখ আছে। এই সূক্তটি আসলে মেয়েলিতন্ত্রের বস্তু ছিল বলিয়া বোধ হয়।

পুরাণে ও পরবর্তী সাহিত্যে শক্তিদেবতার দুইটি বিশিষ্ট রূপ—সুবেশা সুন্দরী হৈমবতী দুর্গা আর কোপনক্রোধনা রুদ্রাণী চণ্ডী। দেবীর এই দুই রূপে বৈদিক দুইটি স্বতন্ত্র দেবীভাবনা মিশিয়া আছে। রুদ্রের মনার উল্লেখ আগে করিয়াছি, তিনিই রুদ্রাণী চণ্ডী। প্রথম দেবীর সন্ধান ঋগ্‌বেদে অভিন্নসহচরী দুই ভগিনী-দেবীতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের একজন দিবা—শুভ্র দিন, আর একজন নিশা—কৃষ্ণ দিন ("অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জুনং চ")। গৌরী ও কালী এই দুই দেবী

ঋগ্‌বেদে দৌ-এর কন্যা ("দিবো দুহিতা")। একজনের নাম উষা, আর একজনের নাম নক্ত, নক্ত (অথবা রাত্রী)। ঋগ্‌বেদের স্ত্রীমূর্তি-দেবভাবনায় উষাই অগ্রগণ্য, এমন কি প্রাচীনত্বের হিসাবে একমাত্র বলা চলে। উষা ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের দেবতা। কিন্তু উষার কল্পনায় আবেগের ও কবিত্বের ভাগ বেশি থাকায় ঋগ্‌বেদের যজ্ঞভোজী দেবসভায় তাঁহার আসন পড়ে নাই (যজ্ঞে উষার স্থান না থাকিলেও, উষার আরাধনা অজ্ঞাত ছিল না। ঋগ্‌বেদের উল্লেখ হইতেই জানা যায় যে কবিরা ইঁহার বোধন করিতেন। যেমন দুর্গার বোধন হয়)। উষাস্তোত্রের সংখ্যা বিচার করিলে ঋগ্‌দেবের অনেক প্রধান দেবতার উপরে উষার মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে হয়। উষা-সূক্তগুলি ঋগ্‌বেদের প্রাচীনতম অংশের মধ্যে পড়ে।

ঋগ্‌বেদে উষা-কল্পনায় দুইটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত উষা একটিমাত্র বিশেষ দেবী (বা দেব-কল্পনা)। কিন্তু কোন কোন উষা-সূক্তে উষা একটিমাত্র নন, বহু—অর্থাৎ তাঁহারা উষাগণ ("উষসঃ")। মনে হয় এ বহুত্বকল্পনার মূলে ছিল সুপ্রভাত-ভাবনা। অতীতে যেন বিশেষ বিশেষ উষার আবির্ভাব বিশেষ বিশেষ শুভ দিন সূচিত করিয়াছিল। ঋষি কবি বামদেব বলিয়াছেন (৪.৫১.৬)

ক্ব স্বিদ্ আসাং কতমা পুরাণী
যয়া বিধানা বিদধুর্ ঋভূণাম।
শুভং যচ্ছুভ্রা উষসশ্চরন্তি।
ন বি জ্ঞায়ন্তে সদৃশীরজুর্যাঃ।।

'কোথায় ছিলেন কে তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন যাঁহার আদিভাবে ঋভুদের কাজের ভার দেওয়া হইয়াছিল?[১] শুভ্র উষারা যখন শোভা করিয়া চলিয়া যান (বৈদিক পরবর্তীকালের উষাগণ অপ্সরসদের সঙ্গে মিলিয়া) তখন একই রকম, অপ্রৌঢ়া তাঁহাদের ভিন্নত্ব জানা যায় না।'

বৈদিক কবি উষাকে দাত্রীদেবী বলিয়া ভাবিতেন এবং তাঁহার কাছে ধন মান সন্তান চাহিতেন। এমন কি উষাকে মাতৃভাবনাও করিতেন। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন (৭.৮১.৪)

উচ্ছন্তী যা কৃণোষি মংহনা মহি প্রখ্যৈ দেবি স্বর্দৃশে।
তস্যাস্তে রত্নভাজ ঈমহে বয়ং স্যাম মাতুর্ন সূনবঃ।।

"হে মহতী দেবী, প্রভাত হইতে হইতে যে (তুমি আমাদের) অবলোকন কর এবং সূর্যালোক দেখাও সেই তোমার ধনের অংশ প্রার্থনা করি (আমরা), যেমন পুত্রেরা মাতার ধনের অংশ বাঞ্ছা করে)।।'

পরবর্তী কালে বৈদিক উষা ও ঔপনিষদিক হৈমবতী মিশিয়া গিয়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের দুর্গাদেবীতে পরিণত হইয়াছেন। একটি বৈদিক সূক্তে উষাকে দশভুজা বলা হইয়াছে। এ ব্যাপার এখানে স্মরণীয়।

রাত্রি যিনি জগৎকে সুপ্তি ও শান্তি দেন ("জগতো নিবেশনীম্") তাঁহার উদ্দেশে পুরা সূক্ত একটিমাত্র ঋগ্‌বেদে আছে (১০.১২০)। এ রাত্রিদেবতা নক্ষত্রশালিনী জ্যোতির্ময়ী যামিনী, যা উষারই যেন সাজবদল। এই সূক্তে উষা—রাত্রির সঙ্গে অভিন্ন কল্পনায়—সম্বোধিত হইয়াছেন। সূক্তটির রচনায় কবিত্বের পরিচয় আছে। গায়ত্রী ছন্দে লেখা। অনুবাদ দিতেছি।

'দেবী রাত্রি আসিতে আসিতে তাঁহার চক্ষুসমূহের দ্বারা বহু স্থানে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি সব শোভা ধারণ করিয়াছেন।।। ১।।

১। একটি সোমপানপাত্র ভাঙ্গিয়া সেই আকারের চারিটি পাত্র গড়ার দূরূহ ভার দেবতারা ঋভুদের দিয়াছিলেন। ইঁহারা তিনজন।

"অমর্ত্য তিনি চারিদিকে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, অধোলোকে এবং ঊর্ধ্বলোকে। জ্যোতির দ্বারা (তিনি) তম নিবারণ করেন।। ২।।

'আসিতে আসিতে দেবী ভগিনী উষাকে ছুটি দিয়াছেন। তম দূর হইবে।। ৩।।

'যাঁহার আগমনে আমরা ফিরিয়া আসিতেছি, যেমন পক্ষী বৃক্ষে নীড়ে ফিরিয়া আসে, সেই তুমি আজ আমাদের কাছে (আবির্ভূত হইয়াছ)।। ৪।।

'ফিরিয়া আসিয়াছে গ্রামের লোক, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীরা, পক্ষীরা, এমন কি লুব্ধ গৃধ্রেরাও।। ৫।।

'হে রাত্রি, তুমি বৃককে বৃকীকে তাড়াইয়া দাও, চোরকে তাড়াইয়া দাও। এখন আমাদের ত্রাণকারিণী হও।। ৬।।

'কালো ব্যক্ত অন্ধকার ঘন কাজল লেপিতে লেপিতে আমার কাছে উপস্থিত। হে উষা, ঋণের মতো তাহা ঘুচাইয়া দাও।। ৭।।

'হে রাত্রি, (এই স্তব) আমি তোমার কাছে উপস্থিত করিলাম,' যেমন (রাখাল সন্ধ্যাকালে) গোরুকে করে,[২] যেমন বিজয়ীকে স্তব (করে)। হে স্বর্গের দুহিতা, তুমি (ইহা) স্বীকাব কর।।' ৮।।

দেবীব দুর্গা নামের সূত্রও ঋগ্‌বেদে লভ্য। দুর্গম পথে, অর্থাৎ রণে-বনে-সঙ্কটে যিনি রক্ষা করেন তিনি দুর্গা। আবার তিনি জগৎ-ধাত্রী অন্নপূর্ণাও। একটি অর্বাচীন সূক্তে (১০.১৪৬) অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী ও জগদ্ধাত্রী দেবীকে অরণ্যানী নাম দিয়া বন্দনা করা হইয়াছে। কবিতাটির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। অনুবাদ দেওয়া হইল।

'অরণ্যানী, অরণ্যানী, ওই যে তুমি যেন হারাইয়া যাইতেছ। কেন গ্রামের খোঁজ কর না? তোমাকে ভয় লাগে না কি? ।। ১।।

'যখন বৃযারবের ডাকে ঝিঁঝি দোহারকি দেয় তখন যেন অরণ্যানী ঝাঁঝর বাজাইয়া সংবর্ধিত হন।। ২।।

'এই গোরু চরিতেছে, যেন ঘরবাড়ির মতো দেখাইতেছে। যেন অরণ্যানী শকট হাঁকাইতেছে সন্ধ্যায়।। ৩।।

'এই যেন কেহ গোরুকে ডাকিতেছে, এই যেন কেহ কাঠ কাটিল। মনে হয় যেন অরণ্যানীর অধিকারে বাস করিতে করিতে সন্ধ্যায় কেহ হাঁক পাড়িল।। ৪।।

'অরণ্যানী কাহাকেও হিংসা করে না, কেউ যদি না অভিগমন করে। স্বাদু ফল পাড়িয়া খাইয়া যথা-ইচ্ছা বিশ্রাম করা যায়।। ৫।।

'অঞ্জনগন্ধি, সুগন্ধ, কৃষিকর্ম ব্যতিরেকেও বহু-অন্নময়ী, মৃগদের মাতা অরণ্যানীকে আমি (এই) স্তব করিলাম'।। ৬।।

বৈদিক কালের পরে যে দুইটি দেবতা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ও সাহিত্যে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছেন, সেই অর্বাচীন রুদ্র আর প্রাচীন বিষ্ণু বেদের প্রধান দেবতাদের অন্যতম। রুদ্র "অসুর" শ্রেণীর দেবতা, বিষ্ণু "দেব" শ্রেণীর। রুদ্রের প্রসঙ্গ আগে করিয়াছি। বিষ্ণুর কথা এখন বলিতেছি।

বৈদিক বিষ্ণুর পরিণাম হইল বিষ্ণু-কৃষ্ণ, তাহার পরে বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে কৃষ্ণ-কাহিনীর পুরানো রূপটি পাওয়া যায়। এই পৌরাণিক গল্পগুলি মনে হয় প্রাক্-বৈদিক গন্ধর্ব-ঐতিহ্য হইতে আগত। ভাগবতে মোটামুটি সেই কাহিনীই আছে। এই কাহিনীর

১। এখানে কবি নিজের কথাই বলিয়াছেন। ঋণমুক্তির স্বস্তি রাত্রিপ্রভাতের সঙ্গে তুলিত হইয়াছে।
২। অর্থাৎ গোরুকে গোহালে আনে।

কোন কোন ঘটনার ইঙ্গিত ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুর প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। পুরাণে কৃষ্ণ শিশু ও কিশোর, ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু "যুবা কুমার"। পুরাণে কৃষ্ণ গোপবেশী বিষ্ণু, ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু গোপ নন, তবে গোপা—অর্থাৎ রক্ষাকর্তা ("বিষ্ণুর্গোপাঃ")। এবং তখনই গোধন লইয়া তাঁহার কারবার ছিল। পুরাণকাহিনীর কৃষ্ণ ব্রজে গোরু চরাইতেন, ঋগ্‌বেদের বিষ্ণু "পরম পদে"—অর্থাৎ দ্যুলোকের ঊর্ধ্বস্থানে, পরবর্তী কালের বৈকুণ্ঠে, আরও পরবর্তী কালের গোলোকে—বহুশৃঙ্গ লঘুচারী গোরু পুষিতেছে ("যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ")। পুরাণে বিষ্ণু-কৃষ্ণের এক নাম মাধব। এ নামের বুৎপত্তি-কল্পনার সমর্থনে গল্প তৈয়ারি করিবার অসার্থক চেষ্টা হইয়াছিল।—বিষ্ণু নাকি কোনো এক মধু দৈত্যকে নিধন করিয়াছিলেন। সে নিধনের কোন কাহিনী নাই, এবং হত্যাকারী অর্থে তদ্ধিত "-অ" প্রত্যয় হয় এমন কোন ব্যাকরণসূত্রও নাই, অথবা দ্বিতীয় উদাহরণ নাই। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুর প্রসঙ্গে প্রায় সর্বদাই তাহার পরম পদে মধুর প্রস্রবণের এবং সে মধুভোগে দেবতাদের পরম উৎসাহের উল্লেখ আছে ("বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বঃ উৎসঃ")। সুতরাং মধু-উৎসের অধিকারী ও ভাণ্ডারী বলিয়াই বিষ্ণুর নাম মাধব। "মাধব"-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট "মধুসূদন" নামটিতে বৈদিক বর্ণনার ইঙ্গিত আছে। "সূদন" মানে পাচক, পরিবেষণকারী। মাধব নামের কল্পিত বুৎপত্তির প্রভাবে মধুসূদন নামেরও বিকৃত বুৎপত্তিচলিত হইয়াছে। সূদ্ ধাতুর অর্থ পাক করা, পরিবেষণ করা, গুছাইয়া রাখা, ঠিকভাবে পরিচালনা করা। সুতরাং মধুসূদন নামের অর্থ মধু-পরিবেষণকারী বা মধু-ভাণ্ডারী।

ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সহযোগী, তবে ইন্দ্রের মর্যাদা বিষ্ণুর উপরে। ঋগ্‌বেদে অধিকাংশ সূক্তে নূতন দেবতা ইন্দ্রকে পুরাতন দেবতাদের অপেক্ষা মহান্ বলিয়া দেখানো হইয়াছে। বিষ্ণু ছিলেন প্রাচীন এবং মহান্ দেবতা। তাই বৈদিক কবি তাহাকে ইন্দ্রের সহকারী করিয়াছেন। পুরাণে[১] ইন্দ্রের প্রাধান্যের স্বীকৃতি আছে—শুধু বিষ্ণুর "উপেন্দ্র" নামে। তবে যেহেতু পুরাণে ইন্দ্রের স্থান বিষ্ণুর অনেক নীচে, তাই সেখানে নামটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—ইন্দ্রের ছোট ভাই।[২]

আসল কথা এই যে বৈদিক মিথলজি অনেকভাবে বিপর্যস্ত হইয়াও নূতন নূতন সূত্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পৌরাণিক মিথলজির বিচিত্র ছক বুনিয়া গিয়াছে। তাহাতে যে কেমন উলট-পালট তাহা দেখাইতেছি।

ঋগ্‌বেদের অধিকাংশ সূক্ত যাঁহাদের রচনা তাঁহাদের মান্য মুখ্য দেবতা হইয়াছিলেন নবাগত ইন্দ্র। ইন্দ্রের প্রাধান্য যে সকলে স্বীকার করিত না তাহার স্পষ্ট উল্লেখ ঋগ্‌বেদেই আছে। "স জনাস ইন্দ্রঃ" এই ধুয়া-যুক্ত সুবিদিত ইন্দ্র-সূক্তে (২.১২) কবি যেন ইন্দ্র-অবিশ্বাসীদের দৈন্যের ইঙ্গিত করিয়া (৫) তাহাদের হাঁক দিয়া ইন্দ্রে বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন।

> যৎ স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরম্
> উতেমাহুর্নৈষো অস্তীতি এনম্।
> সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবামিনাতি
> শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ।।

১। বৈদিক-পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সংহিতা ও রামায়ণ-মহাভারত সমেত সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বুঝাইতে "পুরাণ" কথাটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া ব্যবহার করিতেছি।

২। শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৭১) এই লেখকের 'শব্দবিদ্যা ও পুরাণকথা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

'যাঁহার সম্বন্ধে সংশয় করিয়া বলে, কোথায় ভীষণ তিনি? তাহার পর ইঁহার সম্বন্ধে (নিশ্চিত হইয়া) বলে, ও (দেবতা) নাই। তিনি অবিশ্বাসীর সম্পদ্ জুয়াড়ির অর্থের মতো হরণ করিয়া লন। উঁহার সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখ। জনগণ, তিনি ইন্দ্র।।"

ইন্দ্রের বিরুদ্ধবাদীদের কথার আভাস ঋগ্‌বেদের শেষের দিকে, দশম মণ্ডলে, একটি সূক্তে (২৩) আছে। ঐ সূক্তটি একটি নাট্য-কবিতা, কিঞ্চিৎ অশ্লীলতাদুষ্ট। প্রত্যেক শ্লোকে ধুয়াছত্র আছে, "বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ" ('সবার হইতে ইন্দ্র বড়')। এই সূক্তে স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া পালিতপুত্র বৃষাকপির পত্নীর সহিত ইন্দ্রাণী ইতর ভাষায় কলহ করিয়াছেন। বৃষাকপি নিজেকে ইন্দ্রের চেয়ে বড় মনে করেন, কিন্তু ইন্দ্রাণী তাহা মানে না। তাই তিনি ইন্দ্রের ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চান। ইন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া ঘরে রাখিতে উৎসুক। (কোন কোন পণ্ডিত বৃষাকপি দেবতাকে হনুমান্-দেবতার পূর্বতন রূপ বলিয়া মনে করেন। নামটির অর্থ মদ্দা হনুমান্।)

বৈদিক আর্যদের যে দল বিশেষভাবে ইন্দ্র-পূজক ছিলেন, যে কোন কারণে হোক, তাঁহাদের ক্রমশ দলহানি ও বিষ্ণুপূজকদের (ও রুদ্র-শিবপূজকদের) দলবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। তাহার ফলে ইন্দ্র দেবসিংহাসনচ্যুত হন এবং বিষ্ণু সে সিংহাসন লাভ করেন। (শেষ পরিণামে ইন্দ্র 'ইঁদ" রূপে গ্রাম্য ব্রতের ইষ্টদেব হইয়া এখন বিলুপ্ত)। বৈদিক ইন্দ্র-পূজকদেব ঐতিহ্যে ইন্দ্র-বিষ্ণুর সহযোগিতার কথা আছে। হয়ত বৈদিক বিষ্ণু-পূজকদের ঐতিহ্যে ইন্দ্র-বিষ্ণুর দ্বন্দ্বের কথা ছিল। হয়ত ইন্দ্র-বিরোধীদের ঐতিহ্য বিষ্ণুর ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়াইয়া ছিল। সেই দ্বন্দ্বের কাহিনী পুরাণে ইন্দ্র-বিষ্ণুব বিরোধে বিস্তারিত হইয়াছিল। ইন্দ্র ও কৃষ্ণ-বিষ্ণুব বিরোধের দুইটি বিশিষ্ট গল্প পুরাণে আছে। এক পারিজাত-হরণ, আর গোবর্ধন-ধারণ। পারিজাত-হরণ উপাখ্যান স্পষ্টতই অর্বাচীন, ইহার কোন আভাস-ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে নাই। গোবর্ধন-ধারণের আভাস ক্ষীণভাবে আছে।

ইন্দ্রের ধারাবর্ষণ হইতে গোকুল রক্ষার জন্য কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ছাতার মতো তুলিয়া ধরিয়া ব্রজবাসী ও গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন। বেদের ঋষিকবিদের কল্পনায় বিষ্ণু পৃথিবীর ঊর্ধ্ব আকাশকে থামের মতো ধারণ করিয়া আছেন ("যো অস্কভায়দ্ উত্তরং সধস্থম্"), তাহারই তলায় মর্ত্য-অমর্ত্যের বাস। কৃষ্ণ-লীলার মধ্যে যে কয়েকটি শিশুকাহিনী পৌরাণিক কালে সর্বাধিক সুপরিচিত ছিল তাহার মধ্যে গোবর্ধন-ধারণ প্রধান। কৃষ্ণের ব্রজলীলা বাক্-শিল্পে গ্রথিত হইবার আগে মূর্তিশিল্পে সুপ্রচলিত হইয়াছিল। গুপ্তযুগে নির্মিত উৎকৃষ্ট গোবর্ধনলীলার মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

গোবর্ধনের সঙ্গে আর একটি পৌরাণিক উপাখ্যান বিজড়িত আছে। কৃষ্ণের অবতারত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা ব্রজের সব গোবৎস হরণ করিয়া গোবর্ধনকন্দরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ গোবৎসদের অনুরূপ সৃষ্টি করিয়া গোমাতাদের ও ব্রজবাসীদের ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া গোবৎস ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত প্রধান ইন্দ্রশত্রুদের মধ্যে একজনের নাম বল। সে ছিল গোবপু, অর্থাৎ গোরূপী অসুর। সে তাহার গোষ্ঠে অনেক গোরু আটক করিয়াছিল। ইন্দ্র বলেব খোঁয়াড় হইতে সে গোরু উদ্ধার করিয়াছিলেন ('যো গা উদাজদ্ অপধা বলস্য")। বেদের অর্বাচীন অংশে বলের ব্রজ হইতে গোরু উদ্ধার বৃহস্পতির কীর্তি বলা হইয়াছে।

'পাখির ডিম ভাঙ্গিয়া যেমন শাবক (বাহির হয় তেমনি) বৃহস্পতি স্বয়ং পর্বতের (গুহা হইতে) গোরু বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। ("আণ্ডেব ভিত্ত্বা শকুনস্য গর্ভম্ উদ্ উস্রিয়া পর্বতস্যা ত্মনাজৎ।" (১০.৬৮.৭ গঘ)।

পৌরাণিক কাহিনীতে ইন্দ্র-বৃহস্পতির স্থানে কৃষ্ণ আসিয়াছেন এবং বলের স্থানে ব্রহ্মা (বৃহস্পতি) গিয়াছেন।

বেদে অনেক ইন্দ্রশত্রুর উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে তিনজন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট—বৃত্র, বল ও রৌহিণ। বৃত্র অহি অর্থাৎ সর্প, যে সপ্ত সিন্ধুর জল গিরিব্রজে বাঁধের মতো আটক করিয়াছিল। তাহাকে হনন করিয়া সপ্ত সিন্ধুর জলধারা মুক্ত করা ইন্দ্রের সবচেয়ে বড় কাজ। একটি শ্লোকে (১.৩২.৩) বৃত্রবধে ইন্দ্রের উদ্যোগের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাহার বাস্তবতা নিখুঁত। মুকুন্দ কবিকঙ্কণে যদি কালকেতুর শিকার-উদ্যোগের এই রকম বর্ণনা দিতেন তবে কিছুমাত্র অসঙ্গত ঠেকিত না, শুধু সোম-কদ্রুকের বদলে আমানি-হাঁড়ি বলিলেই হইত।

> বৃষায়মাণো অবৃণীত সোমং
> ত্রিকদ্রুকেষু অপিবৎ সুতস্য।
> আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রম্‌
> অহন্নহিং প্রথমজামহীনাম্‌।।

'ষাঁড়ের (মতো উঠিয়া) তিনি সোম খুঁজিলেন। তিন ডাবা-ভরতি সোম তিনি পান করিলেন। মঘবান্‌ (অর্থাৎ ইন্দ্র) তাঁহার অমোঘ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অহিগণের মধ্যে প্রথমে যে জন্মিয়াছে সেই অহিকে বধ করিলেন।'

অহি-বৃত্র কল্পনা হইতে সহজেই জলাধিকারী জলশায়ী নাগ-কল্পনা আসিয়াছিল। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলরাম নাগরাজ অনন্তের অবতার। তিনি কোন নদীর জলধারা আটক করেন নাই বটে কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গলের ফলা টানিয়া যমুনার জল বিপথে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদের পরবর্তী গ্রন্থসমূহে যজ্ঞকাণ্ডের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে আখ্যান-আখ্যায়িকা অর্থাৎ গল্পকাহিনী ধীরে ধীরে প্রাধান্য লইতেছে এবং সাহিত্যের পরবর্তী স্তরে আসিয়া তাহা দুইটি শাখায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। প্রাচীন শাখায় পাই মহাকাব্য-পুরাণ, নবীন শাখায় পাই নাটক। এই দুই শাখারই উদ্ভেদমূল ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে সঙ্কলিত তিন-চারটি সূক্তে (যম-যমী সংবাদ, ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী-বৃষাকপি সংবাদ, পুরূরবাঃ-উর্বশী সংবাদ ও সরমা-পণি সংবাদ) পাওয়া যায়। এই চারটি আখ্যান-সূক্তের মধ্যে তিনটির সূত্র পরবর্তী সাহিত্যে হারাইয়া গিয়াছে। কেবল পুরূরবাঃ-উর্বশীর গল্প ধারাবাহিত হইয়া এ কালের বন্দরে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে কথা পরে বলিব। এখন সরমা-পণি সংবাদের (১০.১০৮) পরিচয় দিই। যে সুবৃহৎ বল-বিরোধ উপাখ্যান ঋগ্‌বেদের মধ্যে আকীর্ণ আছে এই আখ্যানটি তাহারই ক্ষুদ্র অংশ।

অঙ্গিরস্‌দের গোধন চুরি গিয়াছে। দেবতাদের নেতা ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবশুনী (কক্কুরী) সরমাকে চর করিয়া হারা গোরুর সন্ধান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। দেবলোকের সুদূর সীমানায় দুস্তর রসা নদী পার হইয়া সরমা অসুরলোকে গিয়া পণিদের দ্বারা সুরক্ষিত পর্বত-গুহাদুর্গে বেষ্টিত কোষ্ঠাগারের দ্বারে উপনীত হইল। তাহার পর পণি-প্রহরীদের নেতাদের সঙ্গে সরমার সওয়াল-জবাব। পণি-সর্দারের প্রশ্ন দিয়াই সূক্তটি শুরু।

পণি-সর্দার

> কিসের খোঁজে সরমা এতদূর আসিলে। এ পথ দূরের, বহু দূরের, বিপদসঙ্কুল। আমাদের কাছে আসিবার উদ্দেশ্য কি ? কী পীড়ার পীড়ন হইয়াছে? কি উপায়ে রসার জল পার হইলে? ।।১।।

সরমা

> ইন্দ্রের দূতী আমি পেরিত হইয়া, হে পণিরা, তোমাদের ধনরত্নের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। লাফ দিয়া পার হইবার আশঙ্কায় এদিকে (আসিবার ভয়) নাই আমাদের। সেই উপায়েই রসার জল পার হইয়াছি।। ২।।

পণি-সর্দার

হে সরমা, তুমি যাহার দূতী হইয়া বহুদূর অতিক্রম করিয়াছ সেই ইন্দ্র কেমন? কেমন (তাহার) রূপ? ইন্দ্র এখানে আসুক। তাহার সঙ্গে আমরা মৈত্রী করিব। তখন সে আমাদের গো-পতি (অর্থাৎ গোঁসাই) হইতে পারিবে।। ৩।।

সরমা

যাহার দূতী হইয়া আমি দূরদূরান্তর হইতে আসিয়াছি তাঁহাকে ঠেকানো যায় বলিয়া আমি অবগত নই, নদীস্রোতও ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। ওগো পণিরা, তোমরা ইন্দ্রের দ্বারা হত হইয়া মাটিতে পড়িবে।। ৪।।

পণি-সর্দার

হে কল্যাণী সরমা, এই যে সব গোরুর খোঁজে তুমি স্বর্গলোকের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়াছ। কে বিনাযুদ্ধে এগুলিকে ছাড়িয়া দিবে? আমাদের অনেক শাণিত অস্ত্র আছে।। ৫।।

সরমা

ওগো পণিরা, তোমাদের কথাবার্তা রণোদ্ধত নয়। তোমাদের দেহ অস্ত্রবিক্ষত না হোক, তোমাদের যাওয়া-আসার পথ নিরাপদ হোক। বৃহস্পতি কোন দিকেই তোমাদের ক্ষমা করিবেন না।। ৬।।

পণি-সর্দার

হে সরমা, আমাদের এই কোষাগার পর্বতের গুহায় নিহিত, গোরু ঘোড়া ও রত্নে ভরা। সে সব রক্ষা করিতেছে রক্ষাকার্যে নিপুণ পণিরা। বৃথাই তুমি ভূয়া ঠিকানায় আসিয়াছ।। ৭।।

উত্তরে সরমা যাহা বলিল তাহার ভাবার্থ এই যে, যাহাদের এই সব গোরু সেই ঋষিরা আসিয়া গোরু লইবেই। পণিরা যেন ভালোয় ভালোয় দিয়া দেয়।

পণি-সর্দার

হে সরমা, দেবতারা জোর করিয়া বুঝাইয়াছে তাই তুমি এখানে আসিয়াছ। তোমাকে (আমরা) ভগিনী করিতে চাই। তুমি আর ফিরিয়া যাইও না। হে কল্যাণী, তোমাকে গোরুর ভাগ দিব।। ৯।।

সরমা

আমি ভ্রাতৃত্বও জানি না, ভগিনীত্বও জানি না। (সে) জানেন ইন্দ্র আর ঘোর আঙ্গিরসেরা। তাঁহারা গোরু পাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন তাই আসিয়াছি। ও পণিরা, ভালোয় ভালোয় এখান হইতে সরিয়া পড়।। ১০।।

ইহার পরে একটি ঋক্ আছে। তাহা পরবর্তীকালে ঋগ্‌বেদ-সম্পাদকের সংযোজন বলিয়া মনে হয়।

ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় নারী-কবির—পরবর্তীকালে বেদ-ব্যাখ্যাতাদের ভাষায় "ঋষিকা"র—রচনা দুই একটি আছে। ইন্দ্র, ইন্দ্রপুত্র বসুক্র ও বসুক্রপত্নী—এই তিনজনের সংলাপময় নাট্যরসাশ্রিত সূক্তটির (১০-২৮) প্রথম ঋক্ বসুক্রপত্নীর উক্তি। রচনার ভঙ্গি হইতে মনে হয় শ্লোকটি নারীর রচনা।

ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শীর্ষস্থানীয় ইন্দ্রও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সকলে সমবেত হইয়াছে, কিন্তু ইন্দ্র অনুপস্থিত। তাই দেখিয়া বসুক্রপত্নী বলিতেছেন,

বিশ্বো হি অন্যো অরিরাজগাম
মমেদহ শ্বশুরো না জগাম।
জক্ষীয়াদ্ ধানা উত সোমং পপীয়াৎ
সু-আশিতঃ পুনরস্তং জগায়াৎ।। ১।।

'বড় বড় লোক সবাই আসিয়াছেন, আমার শ্বশুর তো আসিলেন না। তিনি আসিলে ভাজাভুজি খাইতেন, আর সোম পান করিতেন। উত্তম ভোজন করিয়া আবার স্বস্থানে গমন করিতেন।।'

বলিতে বলিতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। পুত্রবধূর নিরামিষ ভোজনের আয়োজন দেখিয়া তিনি খুশি হইলেন না। নিজের খাদ্যরুচি ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন।

স রোরুবদ্ বৃষভ স্তিগ্মশৃঙ্গো
বর্ষ্মন্ তস্থৌ বরিমন্না পৃথিব্যাঃ।
বিশেষু এনং বৃজনেষু পামি
যো মে কুক্ষী সুতসোমঃ পৃণাতি।।২।।

'তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সে বৃষভ নাদ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া আছে পৃথিবীর উচ্চস্থানে আর সমতলে। "সকল সঙ্কটে তাহাকে রক্ষা করিব যে সোমসবনকারী আমার দুই পেট ভরায়।।"'

ইন্দ্রের মন বুঝিয়া গৃহপতি (বসুক্র) ইন্দ্রকে তাঁহার রুচিমাফিক ভোজনের আয়োজন করিয়া বলিল,

অদ্রিণা তে মন্দিন ইন্দ্র তূয়ান্
সুন্বন্তি সোমান্ পিবসি ত্বমেষাম্।
পচন্তি তো বৃষভা অৎসি তেষাং
পৃক্ষেণ যন্মঘবন্ হূয়মাঃ।। ৩।।

'ইন্দ্র, শিলায় তোমার জন্য সত্বর সুপেয় সোম প্রস্তুত করা হইতেছে, তুমি তাহা হইতে (যথেচ্ছ) পান কর। তোমার জন্য একাধিক বৃষভ পাক করা হইতেছে, তুমি তাহা হইতে (যথেচ্ছ) খাও. যেহেতু হে মঘবন্, তুমি আহূত হইয়াছ।।'

বোধ হয় তখন ভোজসভায় গানের ব্যবস্থা থাকিত এবং সমস্যাপূরণ খেলাও চলিত। গায়ক বসুক্রকে ইন্দ্র প্রহেলিকা দিয়া চ্যালেঞ্জ করিলেন।

ইদং সু মে জরিতরা চিকিদ্ধি
প্রতীপং শাপং নদ্যো বহন্তি।
লোপাশঃ সিংহং প্রত্যঞ্চমৎসাঃ
ক্রোষ্টা বরাহং নিরতক্ত কক্ষাৎ।। ৪।।

'হে গায়ক, আমাকে এই ব্যাপার বুঝাইয়া দাও।—নদীর জল উজানে বহিতেছে, খেঁকশিয়াল সিংহকে পিছু হইতে তাড়া করিয়াছে, ভুঁড়োশিয়াল বরাহকে ঝোপ হইতে দূর করিয়াছে।"

বসুক্র সমস্যাপূরণের অক্ষমতা জানাইয়া উত্তর জানিতে চাহিলেন।

কথা ত এতদহমা চিকেতং
গৃহসস্য পাকস্তবসো মনীষাম্।
ত্বং নো বিদ্ব ঋতুথা বি বোচো
যমর্ধং যে মঘবন্ ক্ষেম্যা ধূঃ।। ৫।।

'কেমন করিয়া এ ব্যাপার আমি বলিতে পারি, শক্তিশালী জ্ঞানীর (বাণীর) মর্ম, মুর্খ (আমি)। হে বিদ্বান, তুমি সময়োচিত (এই বাণীর মর্ম) আমাদের বলিয়া দাও।—হে মঘবন্, কোন্ দিকে তোমার ক্ষেমঙ্কর (রথের) ধূরা?'

ইন্দ্র নিজের মহিমা বলিলেন।

এবা হি মাং তবসং বর্ধয়ন্তি
দিবাশ্চিন্ মে বৃহত উত্তরা ধূঃ।
পুরূ সহস্রা নি শিশামি সাকম্।
অশত্রুং হি মা জনিতা জজান।। ৬।।

'এমনিভাবেই শক্তিমান্ আমাকে অভিনন্দিত করে। বৃহৎ দ্যুলোকেরও ঊর্ধ্বে আমার (রথের) ধূরা। হাজার হাজারকে আমি এক সঙ্গে সাবাড় করি। শত্রুহীন করিয়া জন্মদাতা আমাকে জন্ম দিয়াছে।'

এই সঙ্গে বসুক্রও বৃত্রবধে নিজের কৃতিত্বটুকু ইন্দ্রকে মনে পড়াইয়া দিল।

এবা হি মাং তবসং জজ্ঞুরুগ্রং
কর্মন্‌কর্মন্ বৃষণমিন্দ্র দেবাঃ।
বধীং বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানো
অপ ব্রজং মহিনা দাশুষে বম্।। ৭।।

'এমনি ভাবে, হে ইন্দ্র, আমাকেও শক্তিমান্ ভীষণ প্রত্যেক (বীর)-কর্মে ওজস্বী (বলিয়া) জানেন দেবতারা। উল্লসিত (আমি) বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছি। (নিজ) শক্তিতে আমি যজমানের জন্য গোষ্ঠ উন্মুক্ত করিয়াছি।।'

ইন্দ্র দেবতাদের কৃতিত্বকে লঘু করিয়া, বন কাটিয়া বসত করার সঙ্গে তুলনা দিলেন।

দেবাস আয়ন্ পরশূঁরবিভ্রন্
বনা বৃশ্চন্তো অভি বিড্‌ভিরায়ন্।
নি সুদ্রুঅং দধতো বক্ষণাসু
যত্রা কৃপীটমনু তদ্ দহন্তি।। ৮ ।।

'দেবতারা আসিলেন, পরশু ধরিলেন, বন কাটিতে কাটিতে লোকজন লইয়া আসিলেন। বহনপাত্রগুলিতে ভালো কাঠ রাখিয়া (তাঁহারা) যেখানে ঝোপঝাড় (সে সব পর পর) পোড়াইলেন।।'

বসুক্র ইন্দ্রের মতোই সমস্যা উপস্থাপিত করিল।

শশঃ ক্ষুরং প্রত্যঞ্চং জগার
অদ্রিং লোগেন বি অভেদমারাৎ।
বৃহন্তং চিদ্ ঋহতে রন্ধয়ানি
বয়দ্বৎসো বৃষভং শূশুবানঃ।। ৯।।

'শশক পিছনে ছোঁড়া তীরের ফলা গিলিয়া লইয়াছে। ঢেলা দিয়া পর্বতকে দূর হইতে ভাঙ্গিয়াছি। বৃহৎকেও ক্ষুদ্রের অধীন করিয়া দিই। বাছুর বাড়িয়া উঠিয়া ষাঁড়কে ভক্ষণ করিবে।।''

উত্তরে ইন্দ্র জঙ্গলে একটি শিকারকাহিনীর আভাষ দিলেন।

সুপর্ণ ইত্থা নখমা সিষায়
অবরুদ্ধঃ পরিপদং ন সিংহঃ।
নিরুদ্ধশ্চিন্ মহিষস্তর্য্যবান্

গোধা তস্মা অযথং কর্ষদেতৎ।। ১০।।

'শ্যেন পক্ষী এই রকমে নখ জড়াইয়াছিল, যেমন পদপাশে অবরুদ্ধ সিংহ (বদ্ধ হয়)। আটক পড়া মহিষ তৃষ্ণাতুর, গোধা (বা কুম্ভীর) তাহাকে পা টানিয়া দিয়াছিল।''

জানি না কি এই গল্প যেখানে ঈগল জালে ও সিংহ ফাঁদে পড়িয়াছিল, যেখানে বন্য মহিষ খেদায় পড়িয়া তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছিল এবং গোসাপ (বা কুমীর) তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল। আরও দুইটি ঋক্ থাকিলেও সংলাপময় কবিতাটির এইখানেই সমাপ্তি।

কক্ষীবানের কন্যা ঘোষার রচিত তিনটি সূক্ত অশ্বিদ্বয়ের স্তব (১.৩৯-৪১)। অশ্বিদ্বয় (''নাসত্যৌ'') মৈত্রীর দেবতা বিশেষ করিয়া বিবাহ মিত্রতার দেবতা, সেই সঙ্গে শারীরিক সুস্থতার ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক। এখন যেমন বাংলা দেশের মেয়েরা ব্রতপূজা করে ঋগ্‌বেদের কালে মেয়েরা তেমনি অশ্বিদ্বয়ের পূজা করিত। ঘোষার রচনায় তাহার পতিকামনার ও সংসারসুখবাসনার অভিব্যক্তি আছে।

কিন্তু নারী-কবির রচনা হিসাবে ঋগ্‌বেদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অত্রিকন্যা অপালার গাথাটি (৮.৯১)। এইটিকে আধুনিক কালের মেয়েলি ইন্দ্রপূজা ব্রতের (অর্থাৎ ইতু পূজার) সর্বাপেক্ষা পুরাতন নিদর্শন বলিয়া লওয়া যায়। অপালা নিজের জন্য রূপ ও সন্তান কামনা করিয়াছে, পিতাব টাক-মাথায় চুল চাহিয়াছে, সংসারের সমৃদ্ধি মাগিয়াছে।

জল আনিতে গিয়া ফিরিবার পথে অপালা সোমলতা পাইয়াছে। সেইটি ঘরে আনিয়া, তাহার রস ইন্দ্রপূজায় দিয়াছিল। প্রথম ও শেষ ঋক্ দুইটি ছাড়া সবই ইন্দ্রের উদ্দেশে অপালার উক্তি।

> এক কন্যা জল আনিতে নীচে গিয়া পথে সোম পাইল। গৃহে আনিতে আনিতে বলিল, তোমাকে আমি ইন্দ্রের জন্য সবন[১] করিব, তোমাকে আমি শক্তিমান (ইন্দ্রের) জন্য সবন করিব।। ১।।
>
> এই যে ছোট মানুষটি (তুমি) ঘরঘর দেখিতে দেখিতে আসিতেছ,[২] এই সোম দাঁতে-চিবাইয়া রস পান কর। যবান্ন, অন্নপানীয়, পিঠা ও স্তব (গ্রহণ কর)।। ২।।
>
> নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন, নিশ্চয়ই করিবেন, নিশ্চয়ই তিনি ভালো করিবেন। নিশ্চয়ই পতিবিদ্বিষ্ট নিয়ন্ত্রিত (আমরা) ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গত হইব।। ৩।।
>
> ওই যে আমাদের শস্যক্ষেত্র, এই যে আমার দেহ আর আমার পিতার যে মস্তক সে সব রোমশ করিয়া দাও।। ৪।।

সূক্তের শেষ ঋক্‌টি পরে যোগ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইটিতে ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, তুমি অপলাকে তিনবার শোধন করিয়া, একবার রথের ফাঁকে, একবার শকটের ফাঁকে আর একবার লাঙ্গলের ফাঁকে, সূর্যকান্তিময়ী করিয়া দিয়াছ।

শেষ ঋক্‌টি[৩] যদি অপালার রচনা হয় তবে এইটিই ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম কবিতা যাহাতে কবির স্বাক্ষর (অর্থাৎ ভণিতা) আছে।

১। অর্থাৎ রসনিষ্কাশন।

২। 'অসৌ য এষি বীরকো গৃহংগৃহং বিচাকশৎ।''—এখানে ''বীরকঃ'' আমি ইন্দ্র-পুত্তলিকা বলিয়া মনে করি। তিরিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বেও বর্ধমান অঞ্চলে ইন্দ্রের প্রতিমূর্তি ''ভাদু'' দেবতারূপে ভাদ্র মাসে ঘরে ঘরে পূজা আদায়ের জন্য ফিরিতে দেখিয়াছি। সে কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে।

৩। ''খে রথস্য অনসঃ খে যুগস্য শতক্রতো।
অপালামন্দ্র ত্রিষ্‌পূত্বী অকৃণোঃ সূর্য্যত্বচম্।।''

ঋগ্‌বেদের একটি নাট্যরসময় গাথা পরবর্তীকালের ভারতীয় কাব্যে-নাটকে একটি বিশিষ্ট বিষয় যোগাইয়া আসিয়াছে—আধুনিক কাল পর্যন্ত। পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনী প্রথম পাওয়া গেল ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তে (১০.৯৫)। তাহার পর ব্রাহ্মণে, মহাভারতে ও কালিদাসের নাটকে এই কাহিনীর কালানুসারী ও ভাবানুযায়ী রূপান্তর ও বিকাশ দেখিয়াছি। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উর্বশী মানবের চিরন্তন সৌন্দর্যপিপাসার প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে পুরূরবা-উর্বশীর গাথা একমাত্র দৃগ্‌গোচর ধারাবাহী সূত্র বলিয়া অত্যন্ত মূল্যবান। রচয়িতা বলিয়া কোন ঋষির নাম নাই। সুতরাং কবিতাটি বেশ প্রাচীন। যথাযথ অনুবাদে ঋক্‌-সূক্তটি উদ্ধৃত হইল।

উর্বশী সৈরিণী। পুরূরবার গৃহে সে চাব বৎসর পত্নীরূপে বাস করিয়াছিল। এখন সে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। পুরূরবার প্রেমে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়ে নাই। উর্বশীকে ধরিয়া রাখিবার জন্য সে ব্যাকুল। উর্বশী দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে, পুরূরবা তাহাকে ফিরিবার জন্য অনুনয় করিয়া পিছু পিছু যাইতেছে।—এই দৃশ্য গাথাটির ভূমিকা।

পুরূরবাঃ

ওগো কোপবতী জায়া, মানিনী (তুমি), থাম। কিছু কথাবার্তা কই। আমাদের না-বলা মনের কথা সুখ দিবে না আগামী দিনে।। ১।।

উর্বশী

তোমার এ কথা লইয়া আমি করিব কী? প্রথম দিনের ঊষার মতোই আমি চলিয়া আসিয়াছি। হে পুরূরবা, তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও। বায়ুর মতো অধরা হইয়াছি আমি।। ২।।

পুরূরবাঃ

যেমন তূণ হইতে বাণ (ছোঁড়ে) পুরস্কার প্রতিযোগিতায়, যেমন দৌড় (হয়) যাহাতে গোরু লাভ,—হাজার (গোরু) লাভ। কোন বীর (অর্থাৎ পুরুষ বংশধর) থাকিবে না—এমন উদ্দেশ্য ঝলক দেয় নাই। মেষী যেমন (মেষের) ডাক (বোঝে) ক্রীড়াসঙ্গীরাও (তেমনি এ কথা) বোঝে।। ৩।।

উর্বশী

দিনে তিনবার তুমি আমাকে বেত মার আর আমি অকাম থাকিলেও তুমি (তোমার বাসনা) পূরণ কর। পুরূরবা, আমি তোমার ইচ্ছার অনুবর্তন করিয়াছি। হে পুরুষ, তুমি তখন আমার দেহের রাজা ছিলে।। ৫।।

পুরূরবাঃ

(আমার) যে যে (সখী)—যেমন সুজুণি, শ্রেণি, সুম্নআপি, হ্রদেচক্ষু. গ্রন্থিনী, চরণ্যু—ইহারা অরুণ রাগের মতো বাহির হইয়াছে, দুধালো গাইয়ের মতো ডাক দিয়াছে—ভালোর জন্য।। ৬।।

উর্বশী

যখন ইনি জন্মান তখন মহিলারা একত্র বসিয়াছিল আর আত্মতৃপ্ত নদীরা ইঁহাকে পোষণ করিয়াছিল। যেহেতু. হে পুরূরবা, বিরাট যুদ্ধের উদ্দেশ্যে দস্যুনিপাতের জন্য

১। 'পুরূরবস্‌' মানে বহুযুদ্ধকারী বীর।

তোমাকে দেবতারা বাড়াইয়াছিল।। ৭।।[১]

পুরূরবাঃ

অমানুষী ইহারা বিবসন হইলে যখনি মানুষ (আমি) ইহাদের সম্ভোগ করিয়াছি তখন ইহারা সঙ্গমযোগ্য হরিণীর মতো আমার কাছ হইতে ভয়ে পিছাইত, যেমন রথের জোয়াল স্পর্শে কাতর ঘোড়ারা।। ৮।।

উর্বশী

যখন অমর্ত্য নারীদের প্রতি মর্ত্য পুরুষ প্রেমাসক্ত হয় তখন সে, যেমন বুদ্ধি, সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিলিত হয়। (তখন) তাহারা রাজহংসীর মতো দেহের প্রসাধন করে, ক্রীড়াশীল ঘোড়ার মতো (লাগাম) কামড়ায়।। ৯।।

পুরূরবাঃ

বিদ্যুতের মতো ছুটিয়া যে দীপ্তি দিয়াছিল আমার আর্দ্র প্রেমকামনা পুরণ করিয়া, সেই জলধারা হইতে সৌভাগ্যবান্ বীর (পুত্র) জন্মগ্রহণ করুক। উর্বশী আয়ু দীর্ঘ করুক।। ১০।।

উর্বশী

তুমি এইভাবে রক্ষণার্থে জন্মিয়াছ, তাই তুমি আমাতে তেজ অর্পণ করিয়াছ। জানিয়া শুনিয়া আমি সেইদিনই তোমাকে বলিয়াছিলাম। তুমি আমার কথায় কান দাও নাই। কেন বৃথা কথা বাড়াইতেছ।।১১।।

পুরূরবাঃ

পুত্র জন্মিয়া কবে পিতাকে দেখিতে পাইবে? কাঁদুনে (ছেলের) মতো সে চোখের জল ফেলিবে, যখন জানিবে। মনের মিল আছে যাহাদের সে দম্পতীকে কে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়, যতক্ষণ শ্বশুরকুলে অগ্নি জাজ্বল্যমান? ১২।।

উর্বশী

সান্ত্বনা দিব যখন (শিশু) চোখের জল ফেলিবে। কাঁদুনে (ছেলের) মতো সে কাঁদিবে (মায়ের) মঙ্গল চিন্তার অপেক্ষায়।[১] তোমার কাছে তাহা পাঠাইয়া দিব তোমার যাহা আমাতে আছে। গৃহে চলিয়া যাও। মূর্খ, তুমি আমাকে পাও নাই।।১৩।।

পুরূরবাঃ

দেবতার বরপুত্র (অর্থাৎ পুরূরবাঃ নিজে) আজ হয়ত বিবাগী হইয়া ঝাঁপ দিবে দূরতর দূরদেশের দিকে। হয়ত শুইবে সে মরণের কোলে। হয়ত তাহাকে হিংস্র নেকড়েরা খাইয়া ফেলিবে।।১৪।।

উর্বশী

‘ওগো পুরূরবস, মরিও না তুমি, ভৃগুপাতও[২] করিও না। হিংস্র নেকড়েরা তোমাকে ভক্ষণ না করুক। স্ত্রীজাতির সখ্য বলিয়া কিছু নাই। গোবাঘার মতোই হৃদয় ইহাদের।। ১৫।।

ভিন্ন মূর্তিতে[৩] আমি ছিলাম মানুষের মধ্যে। চার বছর ধরিয়া রাত্রিতে সহবাস করিয়াছি। দিনের মধ্যে একবার করিয়া শুধু ঘৃতবিন্দু ভোজন করিয়াছি। তাহাতেই

১। অর্থাৎ তাহার কান্না মায়ের স্নেহ ও যত্ন টানিবে।
২। পাহাড় অথবা উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা ।
৩। উর্বশী আসলে অপদেবতা, তাই সে মানবরূপে নিজেকে “কিরূপা” বলিতেছে।

তৃপ্ত হইয়া চরিয়া বেড়াই।। ১৬।।

পুরূরবাঃ

অন্তরিক্ষ পূর্ণ করিয়া আকাশ ব্যাপিয়া (চলিয়াছে) উর্বশী, প্রেমিক আমি তাহাকে অনুনয় করিতেছি। (আমার) পূণ্যভাগ তোমার হোক। ফিরিয়া এস। আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে।। ১৭।।

ভরতবাক্য[১]

হে ইলাপুত্র (পুরূরবস্), দেবতারা তোমাকে এইরকম বলিয়াছিলেন যে তুমি এখন মৃত্যুকে সাথী করিয়াছ। তোমার সন্তান হবিঃ দ্বারা দেবতাদের যজ্ঞ করিবে, আর তুমি স্বর্গে আনন্দ করিবে।। ১৮।।

ঋগ্‌বেদের এই উর্বশী-পুরূরবা সূক্তটি কবিতা হিসাবে বেশ জোরালো,—বাস্তব হৃদয়োষ্ণ উজ্জ্বল প্রেমের কবিতা,—বৈদিক ভাষাব কঠিন শুক্তিপুটে আবৃত একটি চিরন্তন কবিতা। আরম্ভ ও শেষ দুইই নাটকীয়। চতুর্থ ঋক্‌টি কাহারও উক্তি নয়, সেটি কবিতার ও কাহিনীর কোনটির পক্ষেই অপরিহার্য নয়। শেষের ঋক্‌টি পরবর্তীকালের নাটকে ভরতবাক্যের মতো এবং আরও পরবর্তীকালে নীতিকাহিনীর ফলশ্রুতির মতো।

উর্বশী-পুরূরবার কাহিনীর মূল কথাবস্তু যথাসম্ভব পরিবর্তনসহ ভিন্ন ভিন্ন আকারে আধুনিক কালে চলিয়া আসিয়া ছেলেভুলানো রূপকথায় এক পরিণাম পাইয়াছে। সে কাহিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে ঋগ্‌বেদের কবিতাটির নূতন মূল্য ও অভিনব সৌন্দর্য উপলব্ধ হইবে। এখন সেইভাবেই সংলাপের মধ্য দিয়া গাঁথা ঋগ্‌বেদীয় কবিতা-কাহিনীর বিশ্লেষণ করিতেছি।

অপ্সরা উর্বশী গন্ধর্বদের নারী। অমরী সে, পুরূরবার প্রেমে পড়িয়া স্বেচ্ছায় সেই মর্ত্য পুরুষের অবরোধের বন্ধন স্বীকার করিয়াছিল। যখন সে পুরূরবার বংশবীজ গর্ভে ধারণ করিল তখন তাহার মর্ত্যবাসের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাই সে পুরূরবাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। সম্ভবত কোন জলাশয়ের ধারে আসিয়া পুরূরবা পলাতকা উর্বশীর লাগ পাইয়াছে।

প্রথম ঋকে পুরূরবা উর্বশীকে অনুনয় করিতেছে দুদণ্ড থামিয়া তাহার কথা শুনিতে। পুরূরবার প্রেম এখনও পূর্ণভাবে জাগ্রত। সে ভাবিতেছে, উর্বশী মান করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাই সে বলিতে চায় যে তাহার কথা উপেক্ষা করিলে পরে যখন অভিমান কাটিয়া যাইবে তখন উর্বশীরই মন কাঁদিবে।

উত্তরে উর্বশী বলিতেছে যে কথাবার্তায় কোন ফল হইবে না। সে পুরূরবাকে একেবারে ছাড়িয়া আসিয়াছে। চেষ্টা করিলেও পুরূরবা উর্বশীকে আর ছুঁইতে পারিবে না। তাই সে পুরূরবাকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে বারবার অনুরোধ করিল।

তৃতীয় ঋক্ পুরূরবার উক্তি। অর্থ খুব পরিষ্কার নয়। তবে এইটুকু বোঝা যায় যে পুরূরবা বীরকর্ম করিয়া উর্বশীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিল। এখনও তাহার বংশধর ভূমিষ্ঠ হয় নাই। সুতরাং উর্বশীর মর্ত্যবাসের মেয়াদ এখনি ফুরাইয়া যাইবার কথা নয়।

এই ঋকে মেষীর ও মেষের ডাকের উল্লেখ হইতে অনুমান করিতে ইচ্ছা হয় যে গর্ন্ধবেরা ভেড়ার ডাক ডাকিয়া উর্বশীকে চলিয়া আসিতে আদেশ দিয়াছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণের বর্ণনায় পাই যে উর্বশীর ঘরের কাছে তাহার পোষা মেষী ও তাহার দুই শাবক বাঁধা থাকিত। ডাকিনীরা প্রেমাস্পদকে দিনের বেলায় ভেড়া বানাইয়া রাখে, এই আধুনিক লোকবিশ্বাসও এই প্রসঙ্গে মনে আসে।

১। উর্বশীর উক্তি অথবা কোন দেবতার উক্তি বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

পঞ্চম ঋকে উর্বশী বলিতেছে যে পুরূরবার গৃহবাসকালে সে পুরূরবার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশে ছিল। পুরূরবা তাহাকে দিনে তিন বার করিয়া বেত মারিত[১] (এই প্রসঙ্গে, আরব্য-উপন্যাসের সিদি নোমানির গল্প মনে পড়ে। তাহার পত্নী যাদুকরী ছিল। দিনের বেলা সে দু একটি দানা মাত্র মুখে দিত, রাত্রিতে পিশাচের সঙ্গে মিলিয়া শবমাংস খাইত। এক গুনিন্ সিদি নোমানির প্রতি অনুকম্পা করিয়া আমিনাকে ঘোড়া করিয়া দেয়। নোমানি সেই ঘোড়াকে ভালোবাসিত কিন্তু তাহাকে প্রত্যহ নির্দয়ভাবে চাবুক মারিতে হইত।) অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণ-কাহিনীতে[২] উর্বশীরও দিনে ঘোড়া ও রাত্রিতে প্রেয়সী নারী হওয়ার কথা আছে। সিদি নোমানির মায়াবিনী পত্নী আমিনা যেমন মনুষ্যখাদ্য দুএকটি দানা মাত্র মুখে কাটিত ঋগ্‌বেদীয় সূক্তের উর্বশীও তেমনি দিনে এক বিন্দু মাত্র ঘি খাইয়া থাকিত! (ষোড়শ ঋকে একথা আছে।)

ষষ্ঠ ঋক্ পুরূরবার উক্তি। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি যে কোন জলাশয়ের ধারে পুরূরবা, উর্বশীর কথাবার্তা হইতেছিল এবং ইতিমধ্যে সেখানে (জল হইতে?) উর্বশীর সখী অপ্সরারা আবির্ভূত হইয়াছিল। পুরূরবা তাহাদের দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ভাবিয়াছিল যে সখীরা তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিবে। শতপথ-ব্রাহ্মণের বর্ণনায় আছে যে পুরূরবা যখন পলাতকা উর্বশীর খোঁজ পায় তখন সে ও তাহার সহচরীরা হ্রদে রাজহংসী হইয়া বিচরণ করিতেছিল। নবম ঋকে বাজহংসীর উল্লেখ আছে।

পুরূরবার মনে বৃথা আশা জাগাইয়া উর্বশী তাহাকে কষ্ট দিতে চায় না। সে বলিল (সপ্তম ঋক্) যে, পুরূরবার জন্মকালে দেবীরা আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিল আর নদীদেবতারা নবজাতককে পুষ্টি দিয়াছিল। দেবতাবা এইভাবে পুরূববাকে জন্মকাল হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছে, কেননা তাহার দ্বারা দেবশত্রুদের নিপাত সাধিত হইবে।[৩] সুতরাং প্রেমের চর্চা ছাড়িয়া দিয়া নিজের গৌরবের দিকে পুরূরবার মন দেওয়া আবশ্যক।

নিজের জন্মকথা কানে না তুলিয়া পুরূরবা বলিল (অষ্টম ঋক্) যে অমর অপ্সরা একদা স্বেচ্ছায় তাহাকে প্রেম বিলাইয়াছিল, এখন তাহার পিছাইবার কোন অর্থ হয় না। উর্বশীর এখন যে অননুরাগ তাহা প্রেমলাজুকতার আতঙ্ক মাত্র।

উর্বশী উত্তর দিল (নবম ঋক্), যখন মানব অমানবীর সঙ্গে প্রেম করে তখন বিধিব্যবস্থা অন্যরকম হয়। অমানবীরা তাহাকে লোভ দেখায়, তাহার সামনে লাস্যলীলা করে মাত্র। উর্বশী বলিতে চায় যে সে পুরূরবার সঙ্গে প্রেমলীলাই করিয়াছে তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করে নাই। কেন না পরী-অপ্সরীর হৃদয়ের বালাই নাই।

দশম ঋকে পুরূরবা বলিল, তুমি বিদ্যুতের মতো নামিয়া আসিয়া চকিতে আমার হৃদয় হরণ করিয়াছ। তোমার গর্ভে আমার সন্তান রহিয়াছে। সৌভাগ্যবানের মতো সে নদী-দেবতাদের পুষ্টিলাভ করিতে জন্মলাভ করুক। উর্বশী (তাহার) আয়ু বাড়াইয়া দিক। (অর্থাৎ উর্বশী যেন গর্ভপাত না করে।)

উর্বশী উত্তর দিল (একাদশ ঋক্) তোমার-আমার ছেলের কথা আমি জানিয়া শুনিয়া আগেই তোমাকে বলিয়া রাখিয়াছি। সে কথা তুমি কানে তোল নাই, এখন শুধুশুধুই কথা বাড়াইতেছ। তোমার জন্ম হইয়াছে বীরকর্মের জন্য। সেই তোমার তেজোবীজ আমার গর্ভে রহিয়াছে। পুত্র সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কার কারণ নাই।

১। সকল টীকাকারই বেত মারা কার্যের অর্থ করিয়াছেন—উপগত হওয়া। এ অর্থ দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে খাপ খায় না।

২। জৈমিনীয়-সংহিতায় দণ্ডীরাজার উপাখ্যান।

৩। 'পুরূরবস্' নামের নিরুক্তি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

পুরূরবা তখন অন্যদিক দিয়া উর্বশীর মন ভিজাইতে চেষ্টা করিল (দ্বাদশ ঋক্)। পুরূরবা বলিল, নবজাত যখন পিতাকে খুঁজিবে এবং পিতাকে না দেখিয়া কাঁদিতে থাকিবে তখন তুমি কি বলিবে? আর, তোমার শ্বশুরকুলের এমন বাড়বাড়ন্তের সময়ে পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ হওয়া কি ভালো?

উর্বশী জবাব দিল (ত্রয়োদশ ঋক্), ছেলে যখন কাঁদিবে তখন তাহাকে যথোচিত সান্ত্বনা দিব। ছেলেদের মাঝে মাঝে কাঁদা ভালো। তোমার বীজ যাহা আমার দেহে ন্যস্ত তাহা যথাসময়ে তুমি পুত্ররূপে ফেরৎ পাইবে। ঘরে চলিয়া যাও। বোকা তুমি, বুঝিতেছ না যে আর আমাদের মিলন হইবার নয়।

পুরূরবা তখন হতাশ হইয়া উর্বশীকে বলিল (চতুর্দশ ঋক্), দেবতাদের আমি বরপুত্র। কিন্তু দেখিতেছি বিবাগী হইয়া যাওয়া অথবা আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার গতি নাই। উর্বশীর মন ভিজাইবার জন্য পুরূরবা তাহার অচিরাগামী মৃত্যুর বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করিল।

পুরূরবার উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইল। উর্বশীর মন একটু ভিজিল। সে উত্তর দিল (পঞ্চদশ ও ষোড়শ ঋক্), মরিবে কেন তুমি? আত্মহত্যার কোন রকম চেষ্টা করিও না। তুমি জানিয়া রাখ, নারীর ভালোবাসা বলিয়া কিছু নাই। তাহাদের হৃদয় হিংস্র শ্বাপদের মতো (কখনো পোষ মানে না)। মানুষের মেয়ে সাজিয়া আমি চার বছর ছিলাম। সে চার বছরের প্রত্যেক রাত্রি তোমার সঙ্গে এক শয্যায় কাটাইয়াছি। (সে কথা আমি কখনো ভুলিব না) তোমার ঘরে যতদিন ছিলাম প্রত্যহ এক ফোঁটা ঘি ছাড়া আর কিছুই খাই নাই। সেইটুকুতেই আমি তৃপ্ত। (এই বলিয়া উর্বশী আকাশপথে চলিয়া গেল।)

উর্বশীর হৃদয়ে যে প্রেমের স্মৃতি জাগরূক আছে তাহা বুঝিয়া পুরূরবার ব্যাকুলতা বাড়িয়া গেল। সে কাতর হইয়া দ্রুত অপস্রিয়মাণ উর্বশীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল (সপ্তদশ ঋক্), তোমার প্রেমিক আমি। আমার কথা রাখ, ফিরিয়া এস। না হয় আমার অর্জিত পুণ্য সব তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি ফিরিয়া এস।

এইখানেই ঋগ্বেদের কবিতাটির অত্যন্ত চমৎকার নাটকীয় পরিসমাপ্তি।

দেবকাহিনী ও মিথলজি বাদ দিলে বিশুদ্ধ লৌকিক কবিতা বলিতে ঋগ্বেদে বোধকরি দুইটিমাত্র আছে। সূক্ত (১০.৩৪) একটি জুয়াড়ির খেদ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এমন সর্বকালের আধুনিক কবিতা আর দ্বিতীয় নাই।

ধনী যুবক সে। ভালো ঘরে বিবাহ হইয়াছে। জুয়ার আড্ডায় গিয়া জুয়া খেলিয়া খেলিয়া এখন সে সর্বস্বান্ত। পাওনাদারেরা আদায়ের জন্য তাহার শ্বশুরবাড়িতে গেলে কুটুম্বেরা বলে, কে ও? আমরা চিনি না। তাহার স্ত্রী তাহার আশা ছাড়িয়া অন্যকে অবলম্বন করিতেছে। নিজের কথা খোলাখুলি বলিয়া জুয়াড়ি শেষে পাঠক-শ্রোতাকে জুয়া খেলার বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছে এবং চাষবাসে মন দিয়া সংসারে উন্নতি করিতে বলিতেছে (এ অংশ, শেষ দুই ঋক্, জুয়াড়ির উক্তি বলিয়া গ্রহণ না করিলেও চলে।) সূক্তটির যথাযথ অনুবাদ দিতেছি।

> বড় (গাছ) হইতে ঝুলিয়া থাকে যে (ফল), ঝড়ো জায়গায়, সে (ফল) জুয়ার পাটায় যখন গড়াইয়া পড়ে তখন আমার মন মাতে। মূজবৎ পর্বতজাত সোমের রসের মতো তেজী বিভীদক[১] আমাকে খুশি করে।। ১।।

১। বিভীদক (সংস্কৃত বিভীতক), আধুনিক বয়ড়া। বয়ড়া বড় গাছের ফল। এ গাছ ফাঁকা জায়গায় জন্মায়। সেকালে বয়ড়ার বীজ জুয়াখেলায় ঘুঁটি রূপে ব্যবহৃত হইত।

সে (আমার পত্নী) আমাকে ভর্ৎসনা করে নাই, রাগ করে নাই। বন্ধুদের প্রতি আমার প্রতি সে সর্বদা প্রসন্ন ছিল। জুয়াতে শুধু একটি সংখ্যার বেশি দান পড়ার কারণেই আমি পতিব্রতা পত্নীকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছি।। ২।।

শাশুড়ী (আমাকে) ঘৃণা করে, স্ত্রী তাড়াইয়া দেয়। যে ব্যক্তি কষ্টে পড়িয়াছে সে এমন কাহাকেও পায় না যে করুণা করে। 'বিক্রেতব্য বুড়ো ঘোড়ার মতো জুয়াড়ির কোন প্রয়োজন আমি দেখি না', (—এই কথা সবাই বলে)।।৩।।

তাহার স্ত্রীর অঙ্গ অন্য লোকে স্পর্শ করে, যাহাকে দখল করিতে প্রবল জুয়া বাসনা করিয়াছে (তাহার) বাপ মা ভাই তাহার সম্বন্ধে বলে, 'আমরা কিছু জানি না। উহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাও'।।৪।।

অনেক সময় ভাবি, আমি ইহাদের সঙ্গে যাইব না।[১] বন্ধুদের সঙ্গে (যাইতে যাইতে তখন) আমি পিছাইয়া পড়ি। কটা রঙের (ঘুঁটিগুলি) পাটায় (শব্দ করিয়া) পড়িয়া যেন আমাকে ডাক দেয়, তখন আমি অভিসারিকার মতোই তাহাদের সংকেতস্থানে হাজির হই।। ৫।।

জুয়াড়ি সভায়[২] যায়—'আজ জিতিব কি'—এই কথা মনে ভাবিতে ভাবিতে, দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে। জুয়ার ঘুঁটিগুলি তাহার কামনা ব্যর্থ করিয়া দেয়, তাহার প্রতিপক্ষ খেলাড়িকে পুরা দান ফেলিয়া।। ৬।।

জুয়ার ঘুঁটি—তাহারা পেঁচালো, ছুঁচালো, প্রবঞ্চনাকারী, উত্তপ্ত এবং দাহকারী। শিশুর দানের মতো, তাহারা যাহাকে জয় দেয় তাহার হইতে আবার কাড়িয়া লয়। জুয়াড়িকে ভুলাইবার শক্তিতে তাহারা যেন মধু-মোড়া।।৭।।

তিন পঞ্চাশ[৩] ইহারা সংখ্যায়, খেলা করে, যেন সবিতা যাহার নিয়ম ধ্রুব। (ইহারা) শক্তিমানের রুদ্রতার কাছেও নত হয় না। এমন কি রাজাও ইহাদের নমস্কার করে।।৮।।

ইহারা নীচে গড়ায়, উপরে চড়ে। হাত নাই (ইহাদের, তবুও) যাহার হাত আছে তাহাকে পরাভূত করে। (ইহারা যেন) জুয়ার পাটায় নিক্ষিপ্ত দৈব অগ্নিপিণ্ড, (স্পর্শে) শীতল হইয়াও হৃদয়কে দগ্ধ করে।।৯।।

জুয়াড়ির পরিত্যক্ত পত্নী দুঃখ পায়, মাতাও পায়—'পুত্র না জানি কোথায় (কেমন) রহিয়াছে', (ভাবিয়া)। দেনদার সে, (পাওনাদারের) ভয়ে টাকাকড়ির সন্ধানে রাত্রিতে হানা দেয়।।১০।।

অপরের পত্নী কোন নারী ও (তাহার) সুচারু গৃহস্থালি দেখিলে জুয়াড়ির অনুতাপ হয়। (নিজে সে) সকালে বাদামী রঙের ঘোড়া জুতিয়াছিল (তাহার রথে)। এখন, দিনের শেষে, সে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে।। ১১।।

তোমাদের মহান্‌গণের যিনি নেতা, রাজা যিনি তোমাদের দলের মুখ্য হইয়াছেন তাঁহাকে আমি হাত জোড় করিয়া[৪] (বলিতেছি), 'আমি টাকাকড়ি লুকাই নাই—এ কথা সত্য বলিতেছি'।।১২।।[৫]

১। জুয়াড়ি বন্ধুরা জুয়ার আড্ডায় যাইবার জন্য দল বাঁধিয়া ডাকিতে আসিত।
২। জুয়ার আড্ডায় যেখানে সকলে সমবেত।
৩। তখন দেড়শটি লইয়া জুয়াখেলা হইত।
৪। মূলে আছে "তস্মৈ কৃণোমি...দশাহং প্রাচীঃ।" জুয়ার আড্ডার প্রসঙ্গে ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন চতুর্দশ শতাব্দে জ্যোতিরীশ্বর বর্ণনরত্নাকরে "দশ অঙ্গুলি দেখইত অছ।"
৫। এই ঋক্‌টির ভাব মৃচ্ছকটিক নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিস্তারিতভাবে মিলিবে।

'জুয়া খেলিও না, চাষবাস কর। নিজের যেটুকু সম্পত্তি আছে যথেষ্ট মনে করিয়া (তাহাতে) খুশি থাক। ওহে জুয়াড়ি, সেইখানে[১] ধনধান্য, সেইখানেই পত্নী।'—এই কথা এই মহান্ সবিতা আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন।।৩।।[২]

"বন্ধু কর (আমাদের), আমাদের প্রতি দয়া কর। জোর করিয়া আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করিও না।

তোমাদের ক্রোধ, (তোমাদের) বিদ্বেষ এখন উপশান্ত হোক। অন্য কেহ কটা-রঙ (ঘুঁটিদের) কবলে পড়ুক।।১৪।।[৩]

ঋগ্বেদের কোন কোন সূক্তে গাথার উল্লেখ আছে। সেকালে গাথার যে নরম ও গরম প্রকারভেদ তাহার উল্লেখ আছে বিবাহ-সূক্তে (১০.৮৫)। নরম বা ধীর গাথার নাম ছিল "রৈভ্যী"[৪] গরম বা বীর গাথার নাম ছিল "নারাশংসী"।[৫] বিবাহের পূর্বে কন্যা সাজাইবার কালে দু রকম গাথাই গাওয়া হইত। সম্ভবত অন্তঃপুরে মেয়েরা গাহিত রৈভ্যী গাথা, সদরে পুরুষেয়া গাহিত নাচিত নারাশংসী।

রৈভ্যাসীদ্ অনুদেয়ী নারাশংসী ন্যোচনী।
সূর্যায়া ভদ্রমিদ্ বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতম্।।

'রৈভী হইল অনুদেয়ী[৬] নারাশংসী হইল ন্যোচনী[৭]। সূর্যার শোভন সজ্জা, গাথা গাহিয়া উপস্থাপিত হইল'।।৬।।

এই সূক্তের মধ্যে কয়েকটি গাথাও অল্পবিস্তর সম্পাদিত হইয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে করি। বিবাহের সময়ে কন্যাগৃহে ও বিবাহের পরে বরগৃহে অনুষ্ঠানের কয়েকটি শ্লোক মূলত গাথা (এবং মেয়েলি গাথা) ছিল বলিয়া বোধ হয়। যেমন কন্যাবরের হাতে রাখীবন্ধন শ্লোক,

নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তির্বি অজ্যতে।
এধন্তে অস্যা জ্ঞাতয়ঃ পতির্বন্ধেষু বধ্যতে।।

'এই যে লালনীল সূতা পরানো হইল, ইহাতে ইহারা জ্ঞাতিরা বাড়িবে, পতি বন্ধনে বাঁধা থাকিবে।।'২৮।।

গৃহাগত নববধূকে স্বাগত করিয়া গৃহিণী (অথবা পুরোহিত) বলিতেছে,

সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায় অথাস্তং বি পরেতন।।

'সুমঙ্গলময়ী এই বধূ, (তোমরা সকলে) এস, দেখ। ইহাকে সৌভাগ্য দিয়া যাহাব যাহার বাড়ি চলিয়া যাও।।'৪৫।।

তাহাব পর ইন্দ্রের কাছে নববধূর জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা।

ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি।।

'হে দয়ালু ইন্দ্র, তুমি ইহাকে সুপুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহাকে দশ পুত্র দাও, পতিকে একাদশ করিয়া দাও।।'৪৫।।

বৈদিক বিবাহকাণ্ডের এই গাথা-শ্লোকগুলির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখনকার বিবাহকাণ্ডের স্ত্রী-আচারে একেবারে অশ্রুত নয়।

১। অর্থাৎ এইভাবে চলিলে। ২। এই ঋক্ বিচারপতির উক্তি।
৩। এই ঋকের উদ্দিষ্ট জুয়া-ঘুঁটি। ৪। রৈভ্যী-আনুষ্ঠানিক স্তব বা গান।
৫। নারাশংসী—বীরত্বাখ্যাপক স্তব বা গান। ৬। অনুদেয়ী—বিবাহে সম্মতি দেবার সময় গেয় (?)
৭। ন্যোচনী—(?)

২. অপর বেদ-কথা

বৈদিক-সাহিত্যে অথর্ব-সংহিতা (আসল নাম "অথর্বাঙ্গিরসঃ"[১] অর্থাৎ অথর্বাঙ্গিরঃ সংহিতা) ঋক্‌সংহিতার পরিশিষ্টের মতো, তবে সংকলন বেশ কিছুকাল পরে হইয়াছিল। সত্য বটে অথর্বসংহিতার দুই চারিটি সূক্ত ঋক্‌সংহিতায়ও আছে। কিন্তু সে সূক্তগুলির ভাষায় পরবর্তীকালের ছাপ কিছু পড়িয়াছে এবং ভাবেও সেগুলি অথর্বসংহিতার অন্য কোন রচনার কাছাকাছি। সম্ভবত সেগুলির প্রচলন বেশি ছিল বলিয়াই ঋক্‌সংহিতার সংকলনের সময়ে সে সূক্তগুলিও গৃহীত হইয়াছিল। ইহা হইতে আরও বোঝা যায় যে ঋক্‌সংহিতার সঙ্কলনের সময়ে অথর্বসংহিতার সঙ্কলন হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও ঋক্‌সংহিতা যিনি বা যাঁহারা সঙ্কলন করিয়াছিলেন আমরা যে অথর্বসংহিতা জানি ঠিক সে গ্রন্থ তাঁহাদের জানা ছিল না।

অথর্বসংহিতাকে অনেকটা খাতির করিয়া "বেদ" বলা হয়। অন্তত অথর্বসংহিতা কুলীন বেদ নয়। কুলীন বেদকে বলে "ত্রয়ী"—ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ। প্রকাশ্য যজ্ঞকাণ্ডে ত্রয়ীরই ব্যবহার। অথর্ববেদের স্থান অ-ভদ্র যজ্ঞকাণ্ডে, অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্রের ক্রিয়ায়। সামবেদ (অর্থাৎ সামসংহিতা) বস্তুত ঋক্‌সংহিতা হইতে ভিন্ন নয়। যজ্ঞকাণ্ডে ঋক্ (অর্থাৎ শ্লোক) ও সূক্ত (অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্তোত্র) প্রয়োজন মতো বাচন এবং/অথবা গান করা হইত। গেয় ঋক্ অথবা সূক্তকে বলিত "সামন্"। সামসংহিতা, আর কিছুই নয়, কেবল "সামন্" এর সাজে ঢালা ঋক্‌সংহিতা। নূতন শ্লোক অল্প কিছু আছে, সেগুলি সংখ্যায় একশতও নয়।

যজ্ঞে যাঁহারা সামগান করিতেন তাঁহারা বংশানুক্রমে "সামবেদীয়" সম্প্রদায়ে পরিণত হন এবং বেদবিদ্যার চর্চা নিজেদের সম্প্রদায় অনুসারে করিতে থাকেন। ইঁহাদের সম্প্রদায় কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়।

ঋগ্‌বেদের সঙ্গে যজুর্বেদের (অর্থাৎ যজুর্বেদীয় সংহিতার) সম্পর্ক বেশ দূরগত। ইহাতে যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আঁখর-মন্ত্র সংগৃহীত আছে। এই আঁখর-মন্ত্রগুলির নাম "নিবিদ্"। নিবিদ্‌যুক্ত ঋক্‌মন্ত্রের নাম "যজুষ্" সেই হইতে "যজুর্বেদ" নাম।

যজুর্বেদও 'যজুর্বেদীয়' সম্প্রদায়ের ধারাবাহিত অনুশীলনে সঞ্জাত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ও অনেকগলি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল।

অথর্ববেদের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক। অথর্ববেদের সূক্তগুলির অধিকাংশই ঝাড়ফুঁক তুকতাক-জড়িবড়ির সঙ্গে ব্যবহারের, আধিব্যাধি ভূতে-পাওয়া সাপবিছায় কাটা উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি প্রতিকার-অভিচারের জন্য রচিত। এখনকার দিনের পুরোহিতদর্পণের সঙ্গে কুচুমারতন্ত্রের যে পার্থক্য তখনকার দিনের ঋগ্‌বেদের (ও সামবেদ-যজুর্বেদের) সঙ্গে অথর্ববেদের সেই পার্থক্য।

তবুও উল্লেখযোগ্য রচনা অথর্ববেদে যে একেবারে নাই তাহা নয়। তবে কবিতা হিসাবে সেগুলি ঋগ্‌বেদের তুলনায় খুব উজ্জ্বল নয়। অথর্ববেদের দুই একটি সূক্ত পদ্যভাঙা গদ্য-ছাঁদে অথবা পুরাপুরি গদ্যছাঁদে লেখা। এমন রচনার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য "ব্রাত্য"-কাণ্ড (১৫)। ইহাতে রাজবৎ ব্রাত্যের যে বিবরণ আছে তাহাতে সেকালের সন্ন্যাসী-বাউলদের আচরণের এবং গৃহস্থবাড়িতে তাঁহাদের অভ্যর্থনার এবং সেই সঙ্গে কপট ব্রাত্যদের প্রতি অশ্রদ্ধার ইঙ্গিত পাই।

১। মানে অথর্বন্ ও অঙ্গিরসদের রচনা। অথর্বন্ মানে অগ্নিযাজক, অঙ্গিরস মানেও তাই। অঙ্গিরস শব্দটি প্রাচীনতর।

৩. ব্রাহ্মণ-কথা

ঋক্‌সংহিতা ও অথর্বসংহিতা বৈদিক সাহিত্যের প্রথম স্তরের গ্রন্থ, পদ্যরচনা। ''ব্রাহ্মণ''-নামযুক্ত গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় স্তরের গ্রন্থ, গদ্যরচনা। ব্রাহ্মণগুলি রচিত হইবার পূর্বেই যজ্ঞচর্যায় নিরত বেদজ্ঞেরা বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী শাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক শাখায় বৈদিক পদ্ধতিতে ও যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কম বেশি বিশিষ্টতা দেখা দিয়াছিল। সেই কারণেই বিভিন্ন শাখার ব্রাহ্মণগুলির নামে পার্থক্য ও বিষয়নির্বাচনে ও বস্তুর উপস্থাপনে এত বিভিন্নতা। ঋগ্‌বেদ-শাখার ব্রাহ্মণের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম হইল 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ'। সামবেদ শাখার বিশিষ্টতম ব্রাহ্মণের নাম 'তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণ,' নামান্তরে 'পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ'। যজুর্বেদাধ্যায়ীদের মধ্যে দুইটি প্রধান উপশাখাভেদ হইয়াছিল। এক উপশাখাগুচ্ছে মন্ত্র (অর্থাৎ ঋক্ ও নিবিদ্) পৃথক করা আছে বলিয়া এই উপশাখা ''শুক্ল'' (অর্থাৎ পরিষ্কৃত) নাম পাইয়াছিল। শুক্ল-যজুর্বেদের ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে প্রধান বাজসনেয় শাখার 'শতপথ-ব্রাহ্মণ'। যজুর্বেদের দ্বিতীয় উপশাখাগুচ্ছে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ জড়াজড়ি আছে, তাই নাম ''কৃষ্ণ'' (অর্থাৎ মিশ্রিত)। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা', 'মৈত্রায়নী-সংহিতা' এবং 'কাঠক-সংহিতা' সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ''সংহিতা'' নাম থাকিলেও এগুলি ব্রাহ্মণই।

ভারতীয় সাহিত্যচিন্তার ধারাবহনে ঋগ্‌বেদের এবং পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যশৃঙ্খল এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি। ঋগ্‌বেদের কোন কোন গল্পবীজ যাহা বহু কাল পরে মহাভারতে, বিবিধ পুরাণে আর সংস্কৃত কবিদের লেখনীতে কাব্য ও নাটকে পল্লবিত হইয়াছিল তাহার অঙ্কুরস্ফোট ব্রাহ্মণের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণে কিছু কিছু গাথা আছে এবং সেই সব গাথাকে আশ্রয় করিয়া যে সব কাহিনী প্রচলিত ছিল অথবা গঠিত হইয়াছিল তাহাও দুই একটি আছে। ঋগ্‌বেদে গদ্য নাই। সংস্কৃত মহাকাব্যে-পুরাণেও গদ্য নাই বলিলে অন্যায় হয় না। (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দের আগে সংস্কৃত ভাষায় পুরাপুরি গদ্যে কোন সাহিত্যগ্রন্থ লেখা হয় নাই।) ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি গদ্যে লেখা। এ গদ্যের মূল্য শুধু ভারতীয় সাহিত্যে সবচেয়ে পুরানো বলিয়াই আদরণীয় নয়; সহজ, সরল কথ্যভাষার নিকটবর্তী এবং রসবাহী গদ্য বলিয়াই এগুলির অসাধারণ মর্যাদা। অন্য কোন দেশে এত পুরানো সাহিত্যে এমন সুন্দর সাধু গদ্য রচনা আছে বলিয়া আমার জানা নাই। এ গদ্য যাঁহারা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের অনুবর্তীরা—পরবর্তী লেখকেরা—এ পথে চলেন নাই। যাহাকে এখন বলে ডাইজেস্ট (অর্থাৎ সারসংগ্রহ) তাঁহারা সেইরকম বই লিখিতে লাগিলেন। তাহার ফলে ব্রাহ্মণের সম্ভাবনাময় সরস গদ্যরীতি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত সূত্র-রীতিতে শুকাইয়া গেল। সে কথা পরে বিবেচ্য।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, এ কথা আগে বলিয়াছি। বিশেষজ্ঞদের মতে এ গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ইহাতে যজ্ঞকাণ্ডের এবং কোন কোন ঋক্-সূক্তের উৎপত্তি অথবা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কয়েকটি ছোট-বড় আখ্যান আছে। সেগুলি খুব মূল্যবান্। ছোট মাঝারি ও বড় আখ্যানের একটি করিয়া উদাহরণ মূলনিষ্ঠ অনুবাদে দিতেছি।

কবষ ঐলুষের কাহিনীটি ছোট আখ্যানের নিদর্শন।

> ঋষিরা একদা সরস্বতীর ধারে সত্রে[১] বসিয়াছিলেন। তাঁহারা কবষ ঐলুষকে সোমসবন কার্য হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। 'দাসীর পুত্র, জুয়াড়ি, অব্রাহ্মণ[২]—কি করিয়া

১। বহুদিনব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান।
২। অর্থাৎ যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত হইবার পক্ষে অযোগ্য।

আমাদের মধ্যে দীক্ষিত হইল।' —এই ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বাহিরে মরুস্থলে বহন করিয়া লইয়া গেলেন, 'এখানে ইহাকে পিপাসা হত্যা করুক, সরস্বতী জল যেন যেন পান না করে।'

তিনি বাহিরে মরুস্থলে নিক্ষিপ্ত, পিপাসার দ্বারা গৃহীত (হইয়া) এই অপোনপ্ত্রীয়[১] সূক্তটি আবিষ্কার করিলেন,—"প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু"[২] ইত্যাদি। ইহাতে (তিনি) অপ্‌দের প্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অপ্‌রা তাঁহার দিকে উঠিয়া আসিল। তাঁহাকে সরস্বতী চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

সেইজন্যই এখনকারদিনেও (এই স্থানকে) "পরিসারক" বলা হয় যেহেতু ইহাকে সরস্বতী চারিদিক দিয়া পরিসরণ করিয়াছিলেন।

যে ঋষিরা বলাবলি করিলেন, 'দেবতারা ইহাকে স্বীকাব করিয়াছেন, ইহাকে ডাকিয়া লই।' (অপর সকলে বলিলেন), 'তাই হোক।' তাহাকে ডাকিয়া লইলেন।

কবষ ঐলুষের আখ্যানে কৌলীন্যের ও পাণ্ডিত্যের উপরে কবির ও দেবানুগৃহীতের মর্যাদা স্থাপিত হইয়াছে।

নাভানেদিষ্ঠ মানবের কাহিনী মাঝারি গল্পের নিদর্শন এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সবচেয়ে পুরানো নীতিকথার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এমন কি, কাহিনীর শেষে মরাল্‌ও দেওয়া আছে।

নাভানেদিষ্ঠ মানব (অর্থাৎ মনুর পুত্র) যখন ব্রহ্মচর্য বাস করিতেছিল[৩] (তাহার) ভ্রাতারা (তাহাকে বাদ দিয়া) সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করিয়া লইল। সে আসিয়া বলিল, 'আমাকে কি ভাগ দিলে?' 'এই কর্তা মধ্যস্থকে',—বলিল তাহারা।[৪] তাই এখনকার দিনেও পুত্রেরা পিতাকে কর্তা অথবা মধ্যস্থ বলে।

সে পিতার কাছে আসিয়া বলিল, 'বাবা, তোমাকেই আমার বলিয়া দিয়াছে।' তাহাকে পিতা বলিলেন, 'বাছা ও গ্রাহ্য করিও না। অমুক অঙ্গিরসেরা স্বর্গলোকের জন্য সত্রে (অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী উৎসব-যজ্ঞ) বসিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকবারেই ষষ্ঠ দিবসে আসিয়া ভুলে পড়িতেছেন। তাঁহাদের তুমি ষষ্ঠ দিবসে এই দুই সূক্ত বল গিয়া। তাঁহাদের যে সহস্র সত্রনৈবেদ্য তাহা তাঁহারা স্বর্গে যাইবার মুখে দিবেন।' 'বেশ।'

তাঁহাদের কাছে আসিল, (বলিল), 'হে সুবুদ্ধি, মনুপুত্রকে প্রতিগ্রহ কর।' (অঙ্গিরসেরা) বলিলেন, 'কি বাসনায় বলিতেছ?' 'শুধু এই, তোমাদের আমি ষষ্ঠ দিবস অর্থাৎ ষষ্ঠ দিবসের কৃত্য জানাইয়া দিব,' (সে) আরো বলিল, 'তাহা হইলে এই যে তোমাদের সহস্র সত্রনৈবেদ্য তাহা স্বর্গে যাইবার বেলায় আমাকে দিয়ো।' তাঁহাদের সেই দুইটি সূক্ত ষষ্ঠ দিবসে বলিয়া দিল। তাহার পর তাঁহারা যজ্ঞ ভালো করিয়া জানিলেন, স্বর্গলোকও ভালো করিয়া জানিলেন অর্থাৎ যজ্ঞে ফললাভ, স্বর্গে গমনযোগ্যতা লাভ হইল। স্বর্গে যাইবার সময় তাঁহারা বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, এই (রহিল) তোমার সহস্র।'

যখন সে তাহা সংগ্রহ করিতেছিল তখন মলিনবসন এক পুরুষ উত্তর (অর্থাৎ

১। ঋগ্‌বেদের একটি বারিপ্রশংসা সূক্ত (১০.৩০)।
২। এইটুকু সূক্তের প্রথম ঋকের প্রথম চরণ।
৩। অর্থাৎ গুরুগৃহে অধ্যয়নার্থ বাস করিতেছিল।
৪। মিতাক্ষরা অনুসারে পিতা বর্তমানেও সম্পত্তি ভাগ করা চলে।

যজ্ঞকুণ্ডের শীর্ষ) হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'ইহা তো আমার, আমারই বাস্তু-অবশেষ।' সে বলিল, 'আমাকেই তো ইহা দিয়াছেন।' তাহাকে বলিলেন, 'এই বিষয়ে আমাদের দুইজনের প্রশ্ন অর্থাৎ এই বিবাদের মীমাংসা 'তোমারই পিতার উপর (থাক)।'

সে পিতার কাছে আসিল। তাহাকে পিতা বলিলেন, 'তোমাকে তো বাছা, দিয়াছেন?' 'দিয়াছেন তো আমাকে,' (সে) বলিল, 'কিন্তু আমার তাহা এক মলিনবসন পুরুষ (যজ্ঞকুণ্ডের) উত্তর (দিক) হইতে উঠিল (আর) "আমারই এইসব, আমারই বাস্তু-অবশেষ", এই (বলিয়া) গ্রহণ করিল।' তাহাকে পিতা বলিলেন, 'তাঁহারই বাছা সেই সব। তাহা তিনি তোমাকে দিবেন।'

সে ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'তোমারই তো, মহাশয়, এই সব—ইহা আমাকে পিতা বলিলেন।' তিনি বলিলেন, 'তাহা আমি তোমাকেই দিই যে (হেতু) তুমি সত্যই বলিলে।'

অতএব জ্ঞানীকে তাই সত্যই বলিতে হয়।

হরিশ্চন্দ্র-রোহিত-শুনঃশেপের আখ্যান ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রাপ্ত আখ্যায়িকাগুলির মধে বৃহত্তম এবং পরবর্তী কালের সাহিত্য-ও-সংস্কৃতির ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ আখ্যানের বীজ ঋগ্‌বেদের মধ্যে থাকিলেও সেখানে তাহা স্পষ্ট নহে। তবে শুনঃশেপ ঋগ্‌বেদের কবিদের অন্যতম ছিলেন এবং তাঁহার কবিতা হইতে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের আখ্যানের সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের গল্প যে ঋগ্‌বেদকে সর্বত্র অনুসরণ করে নাই তাহারও স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের গল্পে শুনঃশেপের পিতা তাহাকে বলি রূপে কাটিবার জন্য অগ্রসর, কিন্তু ঋগ্‌বেদের গল্প-বীজে শুনঃশেপ পিতাকে (ও মাতাকে) দেখিতে চায় ("কো নু মহ্যা অদিতয়ে পুন র্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ")। ব্রাহ্মণ-কাহিনীতে যে নরমেধের ব্যাপার আছে তাহা ঋগ্‌বেদে অতিশয় প্রচ্ছন্ন। পৌরাণিক কাহিনীতে এই বৈদিক হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অন্যরকম রূপ লইয়াছে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী পুরাণেরই অনুসরণ করিয়াছে। মধ্যকালের বাংলা সাহিত্যে, ধর্মমঙ্গল ও ধর্মঠাকুরের ছড়ায়-গানে, ব্রাহ্মণ-কাহিনীর ধারাবাহিকতা দেশ-কাল-অবস্থার যথাযোগ্য পরিবর্তনসহ প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে।

হরিশ্চন্দ্র বেধস্-পুত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অপুত্র ছিলেন। তাঁহার শত জায়া ছিল। তাহাদের গর্ভে পুত্র লাভ করেন নাই। তাঁহার গৃহে পর্বত ও নারদ[১] বাস করিতেন। তিনি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

এই যে পুত্র চায়, যাহারা জানে অথবা যাহারা না (জানে)
(সকলে) পুত্রের দ্বারা, (কী) লাভ হয় তাহা আমাকে বল, নারদ।।
তিনি (নারদ) একটিতে[২] জিজ্ঞাসিত হইয়া দশটিতে[৩] উত্তর দিলেন।
ইহার উপর ঋণ[৪] ন্যস্ত করে আর অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়,
যদি পিতা জাত ও জীবিত পুত্রের মুখ দেখিতে পায়।।
যত কিছু পৃথিবীতে ভোগ, যত কিছু অগ্নিতে,
যত কিছু জলে প্রাণীদের হইতে পারে, তাহার বাড়া পুত্রে পিতার।।

১। দুইজন ঋষি।
২। একটি গাথায়।
৩। দশটি গাথায়।
৪। অর্থাৎ উত্তরাধিকারের দায়িত্ব।

চিরদিন পুত্রের দ্বারা পিতারা বহুল তমঃ পার হইয়াছে।
নিজেই নিজ হইতে জন্মিয়াছে, তাহাই[১] অতিতারিণী[২] অন্নধারা।।
ছাইভস্মেই কি চর্মপরিধানে বা কি দাড়িতেই বা কি, তপস্যায়
বা কি? হে ব্রাহ্মণেরা, পুত্র বাসনা কর। তাহাতেই দোষহীন সংসারযাত্রা।
অন্নই প্রাণ, বস্ত্রই আশ্রয়, রূপ বলিতে সোনা,[৩] বিবাহ বলিতে পশু,[৪] বন্ধু বলিতে
জায়া, দুঃখহেতু বলিতে কন্যা,[৫] পুত্রই জ্যোতি পরম ব্যোমে।।[৬]

এই সব তাঁহাকে (= হরিশ্চন্দ্রকে) শুনাইয়া তাহার পর তাঁহাকে (নারদ) বলিলেন, "বরুণ রাজাকে ধর, 'পুত্র আমার জন্মাক, তাহাকে দিয়া তোমার উদ্দেশে যাগ করিব', এই বলিয়া।" "বেশ", বলিয়া তিনি (= হরিশ্চন্দ্র) বরুণ রাজার কাছে গেলেন (ও বলিলেন), "আমার পুত্র জন্মাক, তাহাকে দিয়া আপনার উদ্দেশ্যে যাগ করিব।"

তাঁহার পুত্র জন্মিল, রোহিত নাম। "বেশ", (বরুণ) তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার তো পুত্র জন্মিল, উহাকে দিয়া আমার উদ্দেশে যাগ কর।" তিনি বলিলেন, "যখন পশু দশদিন পার ("নির্দশ") হয় তখন সে যাগযোগ্য হয়।[৭] নির্দশ হোক তখন আপনাকে যাগ করিব।" "বেশ।"

সে নির্দশ হইল। তাঁহাকে (বরুণ) বলিলেন, "নির্দশ তো হইল, ইহাকে দিয়া আমাকে যাগ কর।" তিনি বলিলেন, "যখন পশুর দাঁত উঠে তখনই সে শুদ্ধ (অর্থাৎ যাগযোগ্য) হয়। ইহার দাঁত উঠুক তখন আপনাকে যাগ করিব।" "বেশ।"

তাহার দাঁত উঠিল। তাঁহাকে (বরুণ) বলিলেন, "ইহার দাঁত উঠিল তো। ইহাকে দিয়া আমাকে যাগ কর।" তিনি বলিলেন "যখন পশুর দাঁত পড়িয়া যায় তখনই সে শুদ্ধ হয়। দাঁত ইহার পড়ুক তখন আপনাকে যাগ করিব।" "বেশ।"

তাহার দাঁত[৮] পড়িল। তাঁহাকে (বরুণ) বলিলেন, "ইহার তো দাঁত পড়িল, ইহাকে দিয়া আমাকে যাগ কর।" তিনি বলিলেন, "যখন, পশুর আবার দাঁত উঠে তখন সে শুদ্ধ হয়। দাঁত ইহার আবার উঠুক তখন আপনাকে যাগ করিব।" "বেশ।"

তাহার দাঁত আবার উঠিল। তাঁহাকে (বরুণ) বলিলেন. "ইহার দাঁত তো আবার উঠিল। যাগ কর আমাকে ইহার দ্বারা।" তিনি বলিলেন, "যখন ক্ষত্রিয় সংনাহ-ধারণযোগ্য[৯] হয় তখনই শুদ্ধ হয়। সংনাহ প্রাপ্ত হোক তখন আপনাকে যাগ করিব।" "বেশ।"

সে সংনাহ পাইল। তাঁহাকে (বরুণ) বলিলেন, "সংনাহ তো পাইল, ইহার দ্বারা

১। অর্থাৎ পুত্ররূপে আত্মজন্ম।
২। অর্থাৎ দুর্গাতিতারিণী।
৩। অর্থাৎ রূপ বাড়াইতে সোনার অলঙ্কার। অথবা সবিতার হিরণ্যবর্ণই শ্রেষ্ঠ রূপ অর্থাৎ রঙ।
৪। সেকালের ধন ছিল পশু। বিবাহে ধন চাই।
৫। মূলে "কৃপণং দুহিতা"।
৬। বাকি পাঁচটি গাথার অনুবাদ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া দিলাম না।
৭। দশ দিনের কম বয়সের পশু যজ্ঞে কাটা হইত না।
৮। যাহাকে "দুধে দাঁত" বলে।
৯। অর্থাৎ যখন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ও বর্মপরিধানের উপযুক্ত বয়স পায়।

আমাকে যাগ কর।" "বেশ", বলিয়া তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাকে ইনিই আমাকে দিয়াছেন। এখন তোমার দ্বারা ইঁহাকে যাগ করিব।" সে তো "না" বলিয়া ধনু লইয়া অরণ্যের দিকে চলিয়া গেল। সে সংবৎসর কাল অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল।

তাহার পর ইক্ষ্বাকুবংশধরকে[১] বরুণ ধরিলেন। তাঁহার[২] পেট বাড়িল।[৩] তাহা রোহিত শুনিল। সে অরণ্য হইতে গ্রামে আসিল। পুরুষরূপে ইন্দ্র লাগ পাইয়া তাহাকে বলিলেন,[৪]

> "নানাভাবে যে শ্রম করিয়াছে তাহাব শ্রী থাকে। হে রোহিত, শুনিয়াছি যেজন দলের মধ্যে বসিয়া থাকে সে পাপী। যে বিচরণ করে ইন্দ্র তাহারই সখা।।
> কেবলই চল।"

"কেবলই চল—এই নির্দেশ ব্রাহ্মণ আমাকে দিলেন", ভাবিয়া রোহিত দ্বিতীয় সংবৎসর অরণ্যে পর্যটন করিল। সে অরণ্য হইতে গ্রামে আসিল। পুরুষরূপে ইন্দ্র লাগ পাইয়া তাহাকে বলিলেন,

> "যে চলে তাহার জঙ্ঘা পুষ্পিত, আত্মা বিস্ফারিত ও ফলবান (হয়)। সমস্ত পাপ শুইয়া পড়ে প্রপথে[৫] শ্রমের দ্বার হত হইয়া।।
> কেবলই চল।"

"কেবলই চল—ব্রাহ্মণ আমাকে এই নির্দেশ দিলেন", ভাবিয়া (রোহিত) তৃতীয় সংবৎসর অরণ্যে পর্যটন করিল। সে অরণ্য হইতে গ্রামে আসিল। পুরুষরূপে ইন্দ্র লাগ পাইয়া তাহাকে বলিলেন,

> "ভাগ্য বসিয়া থাকে যে বসিয়া থাকে, খাড়া দাঁড়ায় যে দণ্ডায়মান, শুইয়া থাকে যে পড়িয়া থাকে। যে চলে (তাহার) ভাগ্য অগ্রসর হইবেই।।
> কেবলই চল।"

"কেবলই চল—আমাকে ব্রাহ্মণ এই নির্দেশ দিলেন," ভাবিয়া (রোহিত) চতুর্থ সংবৎসর অরণ্যে পর্যটন করিল। সে অরণ্য হইতে গ্রামে আসিল। পুরুষরূপে ইন্দ্র লাগ পাইয়া তাহাকে বলিলেন,

> "যে শুইয়া আছে সে হয় কলি[৬] (অর্থাৎ পরাজিত) যে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে সে দ্বাপর[৬] (অর্থাৎ কিছু ভালো), উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে যে সে ত্রেতা[৬] (অর্থাৎ আরো ভালো), যে চলে সে কৃত[৬] (অর্থাৎ জয়ী) সম্পন্ন হয়।।

১। অর্থাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্রকে।

২। অর্থাৎ রাজার।

৩। অর্থাৎ উদরী হইল। বরুণ জলাধিপতি তাই তাঁহার কোপে উদরী।

৪। ইন্দ্রের উক্তিগুলি গাথায়। ইন্দ্রের এই আবির্ভাব ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের কাছে ধর্মের আবির্ভাব স্মরণ করায়। হয়ত এই যোগাযোগ আকস্মিক নয়।

৫। অর্থাৎ চলন-পথে।

৬। এই শব্দগুলি দ্যূতক্রীড়ার। ইহা হইতেই চার যুগের নাম। কলি=এক দান পড়া। দ্বাপর=দুই দান পড়া। ত্রেতা=তিন দান পড়া। কৃত=পুরা অর্থাৎ চার দান পড়া।

কেবলই চল।"

"কেবলই চল—আমাকে ব্রাহ্মণ এই নির্দেশ দিলেন", ভাবিয়া (রোহিত) পঞ্চম সংবৎসর অরণ্যে পর্যটন করিল। সে অরণ্য হইতে গ্রামে আসিল। পুরুষরূপে ইন্দ্র লাগ পাইয়া তাহাকে বলিলেন,

"চলিতে চলিতে মধু লাভ করে, চলিতে চলিতেই স্বাদু ফল[১]। দেখ সূর্যের ঐশ্বর্য, যিনি চলিতে চলিতে তন্দ্রা যান না।।
কেবলই চল।"

"কেবলই চল—আমাকে ব্রাহ্মণ এই নির্দেশ দিলেন", ভাবিয়া (রোহিত) ষষ্ঠ সংবৎসর অরণ্যে পর্যটন করিল। অরণ্যে সে অজীগর্ত সৌয়বসি ঋষিকে ক্ষুধায় অবসন্ন দেখিতে পাইল। তাঁহার তিন পুত্র ছিল—শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ ও শুনোলাঙ্গুল নামে। তাঁহাকে (রোহিত) বলিল, "হে ঋষি, আমি তোমাকে এক শত[২] দিতেছি, ইহাদের একজন দ্বারা নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে চাই।" তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'ইহাকে নয় কিন্তু।" "ইহাকেও নয়",—বলিলেন মাতা কনিষ্ঠ সম্বন্ধে। তাঁহারা একমত হইলেন মধ্যমে—শুনঃশেপে। তাঁহাকে শত দিয়া সে তাহাকে লইয়া অরণ্য হইতে গ্রামে আসিল।

সে পিতার কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি তো ইহাকে দিয়া নিজেকে ছাড়াইতে পারি।" তিনি বরুণ রাজার কাছে গেলেন, 'ইহাকে দিয়া আপনাকে যাগ করিব।" "বেশ", বরুণ বলিলেন, "ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ আরও ভালো"। (বরুণ) তাঁহাকে রাজসূয় যজ্ঞক্রিয়া বলিয়া দিলেন। (রাজা) অভিষেচনীয় কর্মে[৩] এই পুরুষকে পশুরূপে বলি ঠিক করিলেন।

তাঁহার হোতা[৪] বিশ্বামিত্র ছিলেন, জমদগ্নি অধ্বর্যু[৫], বশিষ্ঠ ব্রহ্মা[৬] অয়াস্য উদ্‌গাতা[৭]। উৎসর্গ করার পর তাহাকে (যূপকাষ্ঠে) বাঁধিবার লোক (তাঁহারা) পাইলেন না। তখন অজীগর্ত সৌয়বসি বলিলেন, "আমাকে আর এক শত দাও, আমি ইহাকে বাঁধিয়া দিব।" তাঁহাকে (রাজা) আর এক শত দিলেন। তিনি তাহাকে (=পুত্র শুনঃশেপকে) বাঁধিয়া দিলেন।

উৎসর্গ (-যূপে) বাঁধা, আপ্রী-অনুষ্ঠান[৮] এবং অগ্নিপ্রদক্ষিণ করানো হইলে পর কাটিবার লোক (তাঁহারা) পাইলেন না। তখন অজীগর্ত সৌয়বসি বলিলেন, "আমাকে আরও এক শত দাও, আমি ইহাকে কাটিয়া দিব।" তাঁহাকে আরও একশত দিলেন। তিনি অসি শাণাইয়া আগাইলেন।

১। মূলে "উদুম্বর'। এখানে অর্থ ডুমুর নয়, সুখাদ্য ফল।
২। একশত পশু (=গোরু)
৩। সোমযাগে।
৪। যে ঋত্বিক্ অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করেন।
৫। যে ঋত্বিক্ বেদি-নির্মাণ প্রভৃতি কাজ করেন, যজ্ঞপাত্র গুছাইয়া দেন এবং যজুর্মন্ত্র পাঠ করেন।
৬। পূজায় তন্ত্রধারকের মতো প্রধান ঋত্বিক্।
৭। যে ঋত্বিক্ সামগান করেন।
৮। আহুতি দিবার পূর্বে বিশেষ স্তোত্র পাঠ।

এখন শুনঃশেপ লক্ষ্য করিল, "অ-মানুষের মতোই আমাকে (ইহারা) কাটিবে। তাই আমি দেবতাদের ধরি।" সে দেবতাদের মধ্যে প্রথম প্রজাপতিকেই ভেটিল এই ঋকের দ্বারা, "কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাম্" ইত্যাদি।[১]

তাহাকে প্রজাপতি বলিলেন, "দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই নিকটতম। তাঁহাকেই ধর।" সে অগ্নিকে ভেটিল এই ঋকের দ্বারা, "অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাম্" ইত্যাদি।[২]

তাহাকে অগ্নি বলিলেন, "সবিতাই সব চালনার কর্তা। তাঁহাকেই ধর।" সে সবিতাকে ভেটিল এই তিন ঋকের দ্বারা, "অভি ত্বা দেব সবিতঃ" ইত্যাদি।[৩]

তাহাকে সবিতা বলিলেন, "বরুণ রাজার জন্য নিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাকেই ধর।" সে বরুণ রাজাকে ভেটিল পরবর্তী একতিরিশ[৪] (ঋক্) দ্বারা।

তাহাকে বরুণ বলিলেন, "অগ্নিই দেবতাদের মুখ এবং সুহৃত্তম।[৫] তাঁহাকেই স্তব কর। তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" সে অগ্নিকে স্তব করিল পরবর্তী বাইশ[৬] ঋক্ দ্বারা।

তাহাকে অগ্নি বলিলেন, বিশ্বদেবদের[৭] স্তব কর। তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" সে বিশ্বদেবদের স্তব করিল এই ঋক্ দ্বারা "নমো মহদভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ" ইত্যাদি।[৮]

তাহাকে বিশ্বদেবরা বলিলেন, 'ইন্দ্রই দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে ওজস্বী. সবচেয়ে বলবান্ সহনশীল,[৯] সবচেয়ে সৎ, সাহায্যক্ষম। তাঁহাকে তুমি স্তব কর। তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" সে ইন্দ্রকে স্তব করিল "যশ্চিদ্ধি সত্য সোমপা"—এই সূক্ত[১০] এবং পরবর্তী পনেরো (ঋক্)[১১] দ্বারা।

স্তুত হইয়া ইন্দ্র তাহার প্রতি অন্তরে প্রীত হইয়া হিরণ্যরথ দিলেন। সে "শশ্বদ্ ইন্দ্র" ইত্যাদি[১২] (ঋক্) দ্বারা ইন্দ্রকে প্রত্যয় দিল।

১। ১.২৪.১।
২। ১.২৪.২।
৩। ১.২৪. ৩-৫। } এই তিন ঋকের ছন্দ গায়ত্রী।

৪। ১.২৪. ৬-১৫; ১.২৫. ১-২১।

৫। দেবতাদের উদ্দেশে হবিঃ অগ্নিতেই দিতে হইত। অগ্নি দূত হইয়া দেবতাদের অন্নপান বহিয়া দিতেন বলিয়া তিনি দেবতাদের সুহৃত্তম।

৬। ১.২৬ ১-১০; ১.২৭. ১-১২।

৭। বিশ্বদেব ("বিশ্বে দেবাঃ") মানে দেবসমূহ, একত্র সম্মিলিত দেবতারা, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দেবতা"।

৮। ১.২৭.১৩।

৯। এখানে সহ্ ধাতু প্রাচীন অর্থে ("বলপ্রয়োগ করা") ব্যবহৃত।

১০। ১.২৯।

১১। ১.৩০. ১-১৫।

১২। ১.৩০.১৬।

তাহাকে ইন্দ্র বলিলেন, "অশ্বী দুইজনকে এখন স্তব কর। তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" সে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করিল ইহার পরবর্তী তিন ঋকের[১] দ্বারা।

তাহাকে অশ্বিদ্বয় বলিলেন, "উষাকে এখন স্তব কর। তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" সে উষাকে স্তব করিল ইহার পরবর্তী তিন ঋকের[২] দ্বারা।

যেমন যেমন ঋক্ উচ্চারিত হয় তেমনি তেমনি তাহার বন্ধন খসিয়া যায়, ইক্ষ্বাকুসন্তানের উদর কমিয়া আসে। শেষ তিন ঋক্ উচ্চারিত হইবামাত্র বন্ধন একেবারে খুলিয়া গেল, ইক্ষ্বাকুসন্তান নীরোগ হইলেন। তাহাকে (=শুনঃশেপকে) ঋত্বিক্‌রা[৩] বলিলেন, "আজিকার দিনের যজ্ঞ ব্যবস্থা তুমিই কর।"

তাহার পর শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের কোলে চাপিল। তখন অজীগর্ত সৌয়বসি বলিলেন, "ঋষি, আমার পুত্রকে ফিরাইয়া দাও।" "না," বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'ইহাকে তো দেবতারা আমাকে পুরস্কার দিয়াছেন।"

সে হইল দেবরাত বৈশ্বামিত্র[৪]। তাহারই (শাখা) এই কাপিলেয় ও বাভ্রবেরা।[৫]

তখন অজীগর্ত সৌয়বসি বলিলেন (পুত্রকে), "তুমিই এস, (আমরা দুইজনে[৬]) তোমাকে বিশেষভাবে ডাকিতেছি।" তখন অজীগর্ত বলিলেন[৭],

> "সৌয়বসি অঙ্গিরস্-গোষ্ঠীর, তাহার জন্মকাল হইতে (সে) বিখ্যাত, জ্ঞানী। হে ঋষি, পিতামহ হইতে আগত সূত্র[৮] হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না, আবার আমার কাছে এস।।"

শুনঃশেপ বলিল,

> "দেখিয়াছেন (সকলে) তোমাকে কাটারি হাতে, যাহা শূদ্রদের মধ্যেও পাওয়া যাইবে না। হে অঙ্গিরস, তিন শত গোরু তুমি সাদরে পাইয়াছিলে আমার বদলে।।"

অজীগর্ত সৌয়বসি বলিলেন,

> "বাবা, সে পাপ কর্ম যাহা আমি করিয়াছি আমাকে সন্তাপ দিতেছে। সে পাপ আমি নষ্ট করিতে চাই। (তিন) শত গোরু ফেরত যাক।।"

শুনঃশেপ বলিল,

> "যে একবার একটু পাপ করিতে পারে সে তাহার পরেও তাহা করিতে পারে। শূদ্রোচিত কার্যক্রম[৯] হইতে তুমি সরিয়া যাও নাই। তুমি যাহা করিয়াছ তাহার প্রতিবিধান নাই।।"

১। ১.৩০.১৭-১৯।

২। ১.৩০.২০-২২।

৩। বিশ্বামিত্রপ্রমুখ প্রধান যজ্ঞপুরোহিত।

৪। অর্থাৎ অতঃপর শুনঃশেপ আজীগর্তি (=অজীগর্ত-পুত্র) স্থানে তাহার নাম হইল দেবরাত (=পুরস্কাররূপে দেবতার দেওয়া) বৈশ্বামিত্র (=বিশ্বামিত্র-পুত্র)।

৫। "কপিল" ও "বভ্রু" হইতে উৎপন্ন।

৬। অর্থাৎ আমি ও তোমার মাতা।

৭। পিতাপুত্রের এই সংলাপ গাথায়।

৮। অর্থাৎ রীতি ও গোষ্ঠী-আচার।

৯। পুত্রবিক্রয় ও অর্থলোভে নৃশংসতা।

"প্রতিবিধান নাই", বিশ্বামিত্রও সমর্থন করিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,

"অত্যন্ত ক্রূর সৌয়বসি, কাটারি দিয়া কাটিতে ইচ্ছুক (হইয়া) দাঁড়াইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র হইও না। আমারই পুত্রত্ব স্বীকার কর।।"

শুনঃশেপ বলিল,

"হে রাজপুত্র,[১] আমাদের বিষয়ে (সকলকে) জানাও। যেভাবে (এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়) সেভাবে বলিয়া দাও। যাহাতে আঙ্গিরস[২] হইয়াও তোমার পুত্রত্ব পাইতে পারি।।"

বিশ্বমিত্র বলিলেন,

"তুমি আমার পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হইবে। তোমার সন্তান জ্যেষ্ঠ হইবে, দেবতাদের সম্পত্তি[৩] হইয়া আমার কাছে আসিবে। সেইভাবে আমি তোমাকে উপমন্ত্রণ[৪] করিতেছি।।"

শুনঃশেপ বলিল,

"(সকলে[৫]) একমত হইলে সৌহার্দ্য ও সমৃদ্ধির জন্য আমার পক্ষে বলিবে। যাহাতে আমি, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তোমার পুত্রত্ব পাইতে পারি।।"

তাহার পর বিশ্বামিত্র পুত্রদের ডাকাইলেন,

"মধুচ্ছন্দস্, ঋষভ, রেণু, অষ্টক—শোন, আর যে যে ভাই (তোমরাও শোন),—ইহাকে[৬] জ্যেষ্ঠ বলিয়া অধিকার দাও।।"

সে বিশ্বামিত্রের এক শত এক পুত্র ছিল, (তাহার মধ্যে) পঞ্চাশ জন মধুচ্ছন্দসের বড়, পঞ্চাশ জন ছোট। যাহারা বড় তাহারা ভালো মনে করিল না। (বিশ্বামিত্র) তাহাদের শেষে বলিলেন, "তোমাদের সন্তান প্রত্যন্তদেশের ভাগ পাইবে।" তাহারা এইসব—অন্ধ্রেরা, পুণ্ড্রেরা, শবরেরা, পুলিন্দেরা, মূতিবেরা ইত্যাদি, প্রান্তবাসী বহু বিশ্বামিত্রসন্তান দস্যুপ্রধান।

মধুচ্ছন্দস্ বলিল পঞ্চাশজনের[৭] সঙ্গে,[৮]

"যাহা আমাদের পিতা বলিবেন তাহাতে আমরা লাগিয়া থাকিব। তোমাকে আমরা নেতা করিতেছি। তোমার অধীন আমরা হইলাম।।"

বিশ্বমিত্র নিশ্চিন্ত হইয়া পুত্রদের প্রশংসা করিলেন,[৯]

"হে পুত্রগণ, (তোমরা) পশুসম্পন্ন ও বীর (= পুত্র) সম্পন্ন হইও, যাহারা আমার মান রাখিয়া আমাকে বীর (পুত্র-) বান্ করিয়াছ।।"[১০]

১। উৎপন্ন বলিয়া এই সম্বোধন।
২। অর্থাৎ অঙ্গিরস্-গোত্রীয়।
৩। মূলে "দায়"।
৪। অর্থাৎ বিধিমতে ও প্রকাশ্যে আহ্বান।
৫। অথবা তোমায় পুত্রেরা।
৬। শুনঃশেপকে।
৭। পঞ্চাশ জন ছোট ভাইয়ের।
৮। উক্তি গাথায়।
৯। তিনটি গাথায়।
১০। অর্থাৎ পুত্রগৌরবিত।

"বীর (পুত্র-) বান্ গাথিন (তোমরা) দেবরাতকে নেতা করিয়া সকলে কৃতার্থ হও। হে পুত্রগণ ইনিই[১] তোমাদের মঙ্গল নির্দেশক[২]।।

"হে কুশিকগণ,[৩] ইনি বীর দেবরাত। ইঁহার আনুগত্য কর। আমার সম্পত্তি[৪] তোমাদেরও বর্তাইবে, আর যে বিদ্যা (আমরা) জানি তাহাও।"

সেই সুবুদ্ধি ও সমৃদ্ধ, গাথিন, বিশ্বামিত্রপুত্র সকলে একত্র দেবরাতের মতে রহিল, লাভ (হইল) পোষণ ও শ্রেষ্ঠত্ব।।

অধ্যয়ন করিলেন দেবরাত, দুই (বিদ্যা-) ধনের (অধিকারী)[৫] ঋষি,—জহ্নুদের আধিপত্যে এবং গাথিন্‌দের দৈব বেদে[৬]।।

এই সেই শতাধিক ঋক্ ও গাথা যুক্ত শৌনঃশেপ আখ্যান।

রাজা অভিষিক্ত হইলে হোতা রাজাকে ইহা বলিবেন। সোনার মাদুরে বসিয়া বলে, সোনার মাদুরে বসিয়া শোনে। যশই হিরণ্য, তাই যশের দ্বারাই সংবর্ধিত করে।..

অতএব যে রাজা বিজয়যুক্ত হন (রাজসূয়) যজ্ঞ না করিয়াও শৌনঃশেপ আখ্যান গাওয়াইতে পাবেন। (ইহা শুনিলে) তাঁহাতে অল্পমাত্রও পাপ অবশিষ্ট থাকিবে না।

যিনি আখ্যান গাহিবেন তাঁহাকে হাজার গোরু দিতে হইবে, শত (গোরু) দোহারকে। সেই আসন দুইটি আর শাদা অশ্বতরী-যুক্ত বথ হোতার (প্রাপ্য)।

পুত্রকামীরাও গাওয়াইতে পারেন। (তাহা করিলে তাঁহারা) পুত্রলাভ করেন, নিশ্চয়ই পুত্রলাভ করেন।।

সেকালে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান-অঙ্গ হিসাবে রাজারা আখ্যান শুনিতেন। পরে এই রকম একটি আখ্যান রামায়ণ মহাকাব্যে এবং কতকগুলি আখ্যানগুচ্ছ মহাভারত মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছে। এই ধরনের আখ্যায়িকার মধ্যে শৌনঃশেপ আখ্যান প্রাচীনতম। ঋগ্‌বেদের কবিতার প্রসঙ্গ যোগাইবার চেষ্টার জন্য কাহিনীটির বিশেষ মূল্য আছে। শৌনঃশেপ আখ্যানকে বৈদিক সাহিত্যের মহাকাব্যিকা (মাইকেলের ভাষায় epicling) বলিতে পারি। এটির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা আছে, প্রাচীন সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। আরও মূল্য হইল দেবযাগের উপর প্রব্রজ্যার, শ্রামণ্যের নির্দেশ। পরবর্তী কালের অধ্যাত্ম কর্মে ও চিন্তায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ভেদের সূচনা এখানেই পাই।

শুনঃশেপকে গায়ক ধরিলে শৌনঃশেপ আখ্যানকে তিনটি কাণ্ডে ভাগ করা চলে। প্রথম বন্ধন-কাণ্ড, দ্বিতীয় উদ্ধার-কাণ্ড, তৃতীয় প্রতিষ্ঠা-কাণ্ড। অন্যথা দুই পর্বে ভাগ করিতে পারি। প্রথম রোহিত-পর্ব, দ্বিতীয় শুনঃশেপ-পর্ব।

আখ্যানের বিবরণে ও চরিত্রচিত্রণে স্বভাবসঙ্গতি স্পষ্ট। হরিশ্চন্দ্রের ওজরের পর ওজর উঠানো, রোহিতের জীবিতাশা ও পিতার অসুস্থতার খবর পাইয়া প্রত্যাবর্তনের ব্যগ্রতা, হিতৈষী মহামন্ত্রীর মতো ইন্দ্রের সস্নেহে সদুপদেশ, গরীব পিতামাতার মধ্যম পুত্রের প্রতি উদাসীনতা, অজীগর্তের অমানুষিক লোভ ও নিষ্ঠুরতা, দেবতাদের পরস্পরপ্রীতি এবং বিশ্বামিত্রের উদারতা—আখ্যানের মধ্যে অত্যন্ত সরল সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়াছে।

১। বিশ্বামিত্রের পিতার নাম ছিল গাথিন্। ইহা আজীববাচক হইতে পারে। বিশ্বামিত্রকে "ভরত" বলা হইয়াছে। ভরত, গাথিন্, গাথিন—তিনটি শব্দই সমার্থক—"আখ্যায়িকা-গায়ক, বীণা-গায়ক" ইত্যাদি।

২। দেবরাত।

৩। কুশিক বংশকর্তার নাম।

৪। মূলে "দায়"।

৫। অজীগর্তের পুত্র বলিয়া জহ্নুদের সম্পত্তির এবং বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া গাথা-জ্ঞানের।

৬। দেবানুগ্রহে প্রাপ্ত জ্ঞানে অর্থাৎ কাব্যশক্তিতে, সূক্ত-রচনায়।

আর একটি প্রসঙ্গ তুলিয়া ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের আলোচনা শেষ করিতেছি। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুর প্রসঙ্গে সর্বদা তাঁহার ত্রিবিক্রমের উল্লেখ পাই।

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্‌।

'এই (বিশ্ব) বিষ্ণু পরিক্রমা করিয়াছেন, তিনি তিন বার পদক্ষেপ করিয়াছেন।' এখানে তিন পদক্ষেপ বলিতে সূর্যের তিন নির্দিষ্ট অবস্থান—পূর্ব দিগন্তে উদয়, মধ্য গগনে পূর্ণতেজ বিস্তার, পশ্চিম দিগন্তে অস্তগমন—বুঝাইতেছে। এই ত্রিপাদ বেষ্টনের মধ্যে বিশ্বভুবন অবস্থিত।—এই বৈদিক কল্পনা আশ্রয় করিয়া পৌরাণিক সাহিত্যে বামন-অবতারের উপাখ্যান গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঋগ্‌বেদের কবিকল্পনা আর পুরাণের কাহিনীবিস্তারের মধ্যবর্তী একটি গল্প ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে রহিয়াছে। অনুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি।

> ইন্দ্র আর বিষ্ণু একদা অসুরদের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন।
> তাহাদের জয় করিয়া বলিলেন, "বাঁটোয়ারা করি।[১]
> অসুরেরা বলিল, "বেশ।"
> ইন্দ্র বলিলেন, "এই বিষ্ণু যতদূর পদচারণ করিবেন ততদূর পর্যন্ত আমাদের আর বাদ বাকি তোমাদের।"
> তিনি (বিষ্ণু) এই লোকসমূহ পদপরিক্রমা করিলেন, তাহার পর বেদগুলিকে, তাহার পর বাক্‌কে।

এই কাহিনীর রূপান্তর কাণ্বশাখার শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। সেখানেও বিষ্ণু বামন, তবে ত্রিবিক্রম নহেন, শয়ান।

> দেবেরা ও অসুরেরা, 'উভয়েই প্রজাপতির সন্তান, আড়াআড়ি পরীক্ষা দিল। তখন, দেবতারা যেন অনুদ্ধত এই রকম ছিলেন। সে অসুরেরা, মনে করিল "আমাদেরই এই ভুবন।" তাহারা বলিল, "এখন এই পৃথিবীকে বাঁটোয়ারা করিয়া লই। তাহাকে (=পৃথিবীকে) ভাগ করিয়া ভোগ করিব।" ষাঁড়ের চামড়া[২] দিয়া তাহাকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ভাগ করিতে করিতে চলিল।
>
> তাহা দেবতারা শুনিল,—অসুরেরা এই পৃথিবীকে ভাগ করিয়া লইতেছে। তাহারা বলিল, "চল সেখানে যাই যেখানে এই পৃথিবীকে অসুরেরা ভাগ করিতেছে। যদি ইহার ভাগ না পাই তবে আমাদের হইবে কি।"[৩] তাহারা বিষ্ণুরূপ যজ্ঞকে আগে করিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, "আমাদেরও এই পৃথিবীতে ভাগ দাও, আমাদেরও (অংশ) এই পৃথিবীতে হোক।"
>
> সে অসুরেরা যেন অবজ্ঞা করিয়া বলিল, "এই বিষ্ণু শুইতে যতটুকু স্থান লাগিবে ততটুকুই তোমাদের দিব।" বিষ্ণু ছিলেন বামন। তাহাতে দেবতারা ক্রুদ্ধ হইল না, তাহারা ভাবিল, "আমাদের খুব দিয়াছে, যেহেতু আমাদের যজ্ঞ-পরিমিত (ভূমি) দিয়াছে।" সেই যজ্ঞ-বিষ্ণুকে পূর্বশিরে শোয়াইয়া চারিদিক ছন্দের দ্বারা বেড়িয়া দিল।...তাহার পর অর্চনা ও শ্রম (অর্থাৎ তপস্যা) করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তাহারা (দেবতারা) সেই উপায়ে এই সমগ্র পৃথিবীকে লাভ করিল।[৪]

১। অর্থাৎ যে বস্তুর অংশ লইয়া বিবাদ তাহা ভাগ করিয়া লই। ইন্দ্র ও বিষ্ণু যেন টসে জিতিয়াছেন তাই তাঁহাদেরই অগ্রাধিকার।

২। অর্থাৎ চামড়ার দড়ি।

৩। "কে স্যাম যদস্যা ন ভজেমহি।"

৪। কাণ্বীয় শতপথ ব্রাহ্মণ, W. Caland সম্পাদিত, ২.২.৩.১-৭।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির মধ্যে ঐতরেয়ের পরে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শুক্ল যজুর্বেদীয় 'শতপথ-ব্রাহ্মণ'।[১] ভাষা ও গদ্যরীতির দিক দিয়া শতপথ-ব্রাহ্মণ অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। ইহাতে কতকগুলি নিজস্ব আখ্যান ও আখ্যায়িকা আছে। তাহার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য পুরূরবস্-উর্বশীর আখ্যান। ঋগ্‌বেদের কাহিনীর সঙ্গে কিছু কিছু অমিল থাকিলেও[২] মোটামুটি শতপথ-ব্রাহ্মণের গল্পে ঋগ্‌বেদের অনুসরণ ও তদুপরি দেশকালপাত্রোচিত পরিবর্তন আছে। মূলনিষ্ঠ অনুবাদে শতপথ-ব্রাহ্মণের গল্পটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি। ভারতীয় সাহিত্যের অদ্বিতীয় আবহমান কথাবস্তুটির দ্বিতীয় উপস্থাপন ইহাতে পাইতেছি।

> উর্বশী সে অপ্‌সরা। পুরুরবা[৩] ঐড়কে ভালোবাসিল। তাহাকে পাইয়া বলিল, "দিনের মধ্যে তিনবার আমাকে বেতের ছড়ি দিয়া মারিবে, অনিচ্ছুক আমাকে কখনো জোর করিবে না, কখনো যেন তোমাকে নগ্ন না দেখি—এই আমাদের মেয়েদের ব্যবস্থা।"[৪]
>
> সে[৫] ইহার[৬] সঙ্গে অনেককাল ছিল। ইহা হইতে গর্ভিণীও হইল, —এতকাল ইহার সঙ্গে ছিল। তাহার পর গন্ধর্বেরা পরামর্শ করিল, "অনেককাল এই উর্বশী মানুষের ঘরে বাস করিতেছে। জানো যেমন করিয়া ফিরিয়া আসে।" তাহার শয্যার নিকটে দুই শাবক সহিত এক মেষী বাঁধা ছিল। তাহার মধ্য হইতে এক শাবককে গন্ধর্বেরা প্রহার করিল।
>
> সে[৭] বলিল, "পুরুষ নাই[৮] যেন জনমানব নাই যেন (এখানে)—আমার বাছাকে হরণ করিতেছে।" আবার একটিকে প্রহার করিল। সেও সেই কথা বলিল।
>
> তখন এ[৯] ভাবিয়া দেখিল, "কিসে পুরুষশূন্য, কিসে জনশূন্য এখান হইতে পারে যেখানে আমি রহিয়াছি।" সে নগ্ন থাকিয়াই উঠিয়া ছুটিল। ভাবিল বস্ত্র পরিতে গেলে দেরি হইবে। তখনই গন্ধর্বেরা বিদ্যুৎ বিকাশ করাইল। তাহাকে (উর্বশী) যেমন দিনের বেলা তেমনি (স্পষ্টভাবে) নগ্ন দেখিল। তখনই সে[১০] তিরোহিত হইল। "আবার আসিব", (বলিতে বলিতেই) অগোচর। সে মনের দুঃখে প্রলাপ বকিতে বকিতে কুরুক্ষেত্রের কাছাকাছি ঘুরিয়া বেড়াইল, (সে স্থানের[১১] নাম) অন্যতঃপ্লক্ষা বিসবতী[১২]। তাহার ধারে ধাবে ঘুরিতে লাগিল। তখন সে অপ্‌সরারা রাজহংসী হইয়া ভাসিয়া বেডাইতেছিল।

১। সর্বসমেত একশত অধ্যায় ("পথ") আছে বলিয়া এই নাম।
২। ব্রাহ্মণের আখ্যানের মধ্যেই এই অমিলের উল্লেখ আছে। সম্ভবত প্রথম হইতেই গল্পটির একাধিক পাঠ ছিল।
৩। নামটি ঋগ্‌বেদের পুরূরবস, এখানে পুরুরবস্।
৪। অর্থাৎ অপ্‌সরাদের নিয়ম।
৫। উর্বশী।
৬। পুরুরবস্।
৭। উর্বশী।
৮। "অবীরে", অর্থাৎ সমর্থপুরুষহীন স্থানে।
৯। পুরুরবস্।
১০। উর্বশী।
১১। সম্ভবত হ্রদ।
১২। অর্থ, যাহার দুই তীরে যজ্ঞডুমুর এবং জলে পদ্মবন আছে।

তাহাকে চিনিয়া এ[১] (সখীদের) বলিল, "এই সেই মানুষ যাহার সঙ্গে আমি ছিলাম।" তাহারা বলিল, "উহার কাছে (আমরা) দেখা দিই গিয়া।" "বেশ।" তাহার কাছে (তাহারা) আবির্ভূত হইল।

তাহাকে[১] চিনিয়া এ[২] কাতর নিবেদন করিল। "ওগো জায়া...একটু ক্ষান্ত হও, দুজনে কথাবার্তা কই।[৩]...." এই কথা তাহাকে[৪] বলিল।

তাহাকে[৫] অপর (নারী[৪]) উত্তর দিল, "তোমার এ কথা লইয়া আমি করিব কী? প্রথম দিনের উষার মতোই আমি চলিয়া আসিয়াছি।[৬] তুমি তো তাহা কর নাই যাহা আমি বলিয়াছিলাম। এখন আমি তোমার অপ্রাপ্য হইয়াছি। ঘরে ফিরিয়া যাও।" এই কথা তাহাকে[৫] তখন (উর্বশী) বলিল।

তাহার পর এ খিন্ন হইয়া বলিল, "দেবতার বরপুত্র আজ বিবাগী হইয়া হয়ত দূরদেশে বিপদে পতিত হইবে। হয়ত সে মারা পড়িবে। হয়ত তাহাকে হিংস্র নেকড়েরা খাইয়া ফেলিবে।"[৭] দেবপ্রিয় আজ উদ্বন্ধন অথবা ভৃগুপাত করিবে কিংবা নেকড়ে অথবা কুকুর (তাহাকে) ভক্ষণ করিবে—এই কথাই বলিল।

অপর (নারী[৪]) উত্তরে বলিল, "ওগো পুরুরবস্ তুমি মরিও না তুমি ভৃগুপাতও করিও না। হিংস্র নেকড়েরা তোমাকে ভক্ষণ না করুক। মেয়েদের ভালোবাসা বলিয়া কিছু নাই, গোবাঘার মতোই হৃদয় ইহাদের।"[৮] সে কথা[৯] মনে রাখিও না। নারীর কখনও সখ্য নাই। ঘরে ফিরিয়া যাও। —এই কথাই তাহাকে (উর্বশী) বলিল।

এই পর্যন্ত গল্প বলিয়া শতপথ-ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকার রচয়িতা মন্তব্য করিতেছেন যে ঋগ্‌বেদের পাঠে আরও উক্তি প্রত্যুক্তি আছে।[১০] তাহার পর,

(পুরুরবার কথা) তাহার[৪] হৃদয়ে ব্যথা দিল।

সে[৪] তখন বলিল, "বৎসর পূর্ণ হইলে সেই রাত্রিতে আসিও, তখন এক রাত্রি আমার সঙ্গে শুইও, তখন তোমার এই[১১] পুত্র জাত হইবে।"

বৎসর পুরিলে রাত্রিতে আসিল, (দেখিল)—আহা, সোনার ঘরবাড়ি! তাহার পর ইহাকে[৫] (গন্ধর্বেরা) এই কথা বলিল, "এ সব গ্রহণ কর।" তাহার পর তাহার কাছে তাহাকে[৪] পাঠাইল।

সে[৪] বলিল, "গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই তোমাকে প্রভাতে বর দিবে। (বর) চাহিতে পার।" তবে কিন্তু আমাকে চাহিতে হইলে তুমি 'বর চাও' বলিলে, 'তোমাদেরই একজন হইব'—এই কথা বলিও।" তাহাকে প্রভাতে বর দিতে চাহিল। সে[৫] বলিল, 'তোমাদেরই যেন একজন হই।" তাহারা বলিল, 'মনুষ্যদের মধ্যে অগ্নির সেই যজ্ঞ-উপযুক্ত তনু নাই যাহার দ্বারা যাগ করিয়া করিয়া আমাদের একজন হওয়া যায়।" পাত্রে অগ্নি রাখিয়া তাহাকে দান করিল। (আর বলিল,) "ইহার দ্বারা যাগ করিয়া আমাদের একজন হইবে।"

১। উর্বশী। ২। পুরুরবস্। ৩। ঋগ্‌বেদ ১০.৯৫.১।
৪। উর্বশী ৫। পুরুরবস্। ৬। ঋগ্‌বেদ ১০.৯৫.২।
৭। ঐ ১০.৯৫.১৪। ৮। ঐ ১০.৯৫.১৫। ৯। অর্থাৎ আমাদের প্রেমের স্মৃতি।
১০। "বহ্ব চাঃ প্রাহুঃ।" ১১। অর্থাৎ গর্ভস্থ।

(সে) শিশুপুত্রকে লইয়া চলিয়া আসিল। সে অরণ্যে অগ্নি রাখিয়া শুধু শিশুপুত্রকে লইয়া গ্রামে[১] আসিল, "আবার আসিল,"[২] এই (ভাবিয়া), (কিন্তু দেখিল,) তাহা অন্তর্হিত। যে অগ্নি (তাহা) অশ্বত্থে, যে পাত্র তাহা শমীবৃক্ষে। আবার সে গন্ধর্বদের কাছে আসিল।

অতঃপর কাহিনীসূত্র যজ্ঞকাণ্ডের জঞ্জালে খেই হারাইয়াছে।

মৎস্য-অবতারের একমাত্র পুরানো কাহিনী শতপথ-ব্রাহ্মণেই আছে। এই কাহিনীর সঙ্গে বাইবেলের নোয়ার কাহিনীর (যাহার মূল বাবিলনের উৎকীর্ণ লিপিতে আক্কাদীয় ভাষায় পাওয়া গিয়াছে) বেশ মিল আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ-কাহিনীর বীজ বিদেশাগত অথবা বিদেশে প্রাপ্ত অনুমান করিতেই হয়। মাধ্যন্দিন ১. ৮. ১ ও কাণ্ব (২ . ৩) দুই শাখার পাঠ মিলাইয়া শতপথ-ব্রাহ্মণের কাহিনীর যথাযথ অনুবাদ দিতেছি।

মনুকে প্রভাতে আচমনের জল আনিয়া দিল, যেমন হাত ধুইবার জল আনা হয়। তিনি যখন আচমন করিতেছিলেন তখন তাঁহার হাতে একটি মাছ ঠেকিল। সে[৩] উঁহাকে[৪] বাক্য বলিল, "আমাকে ভরণ কর, তোমাকে পার করাইব।" উনি বলিলেন, "কি হইতে আমাকে পার করাইবে?" সে বলিল, "বান এই সব প্রজা (অর্থাৎ জীব) সমূলে লইয়া যাইবে,[৫] তাহা হইতে তোমাকে পার করাইব।" সে বলিল, "কি উপায়ে তোমার ভরণ হইবে?"[৬] সে বলিল, "যতদিন (আমরা) ছোট থাকি আমাদের নাশকারী অনেক থাকে।" (সে) বলিল, "আবার মাছেও মাছ খায়। অতএব আমাকে আগে কুম্ভে রাখ।[৭] যখন বাড়িয়া তাহাতে কুলাইবে না[৮] তখন ডোবা খুঁড়িয়া তাহাতে আমাকে রাখিও। যখন বাড়িয়া তাহাতে কুলাইবে না তখন আমাকে সমুদ্রে রাখিয়া আসিও। তখন আমি নাশকারীর অতীত[৯] হইব।"

মৎস্য অনেককাল রহিয়া গেল।[১০] সে তাড়াতাড়ি বাড়িতে লাগিল। সে বলিল, "অমুক সময়ে বান আসিবে। অতএবং নৌকা গড়িয়া প্রস্তুত থাকিও। সে বান উঠিলে নৌকায় আশ্রয় লইও, তখন তোমাকে পার করাইব।" উনি সেই ভাবে ভরণ করিয়া (তাহাকে) সমুদ্রে ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। সে[১১] সে সময় বলিয়া দিয়াছিল সেই সময়ে উনি নৌকা গড়িয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। সে বান উঠিলে উনি নৌকায় চড়িলেন। মৎস্য তাহার কাছে ভাসিয়া আসিল। তাহার শৃঙ্গে নৌকার কাছি লাগাইয়া দিলেন, আর তাহা লইয়া (মৎস্য) উত্তরগিরির দিকে ধাবিত হইল।

১। অর্থাৎ লোকালয়ে।
২। অগ্নি লইয়া যাইতে।
৩। অর্থাৎ মৎস্য।
৪। অর্থাৎ মনু।
৫। "ঔঘ ইমাঃ সর্বা প্রজা নির্বোঢ়া।"
৬। "কথং ভার্যোসি" (কাণ্ব), "কথং তে ভৃতিঃ" (মাধ্যন্দিন)।
৭। "বিভৃহি" (কা), "বিভারাসি" (মা)।
৮। "যদা তামতিবর্ধৈ।"
৯। "অতিনাষ্ট্রো ভবিতাস্মি।"
১০। "শশ্বদ্ ধ ঝষ আস।"
১১। অর্থাৎ মৎস্য।

সে বলিল, "তোমাকে পার করাইলাম। আমাকে খুলিয়া দাও। এই গাছে নৌকা ভালো করিয়া বাঁধো, তুমি যেন গিরিতে থাকিতে থাকিতে আমাকে জল হইতে বিচ্যুত করিও না।[১] যেমন যেমন জল কমিবে তেমন তেমন নামিতে থাকিও।" মনু সেইভাবে নামিয়া চলিলেন। এই হইল এখন সেই উত্তরগিরি হইতে মনুর অবসর্পণ। সেই বান সব জীব জন্তু ভাসাইয়া লইয়া গেল, কেবল একলা মনু অবশিষ্ট রহিলেন।

প্রজার[২] কামনায় (মনু) অর্চনা করিয়া তপস্যা করিয়া বেড়াইলেন।[৩] সেখানে তিনি পাকযজ্ঞের দ্বারাও যাগ করিলেন—ঘি, দই, মাঠা, ছানা[৪]। এক বছর ধরিয়া এইভাবে জলে হবন করিলেন। তাহা হইতে, বৎসর ঘুরিলে, এক নারী উৎপন্ন হইল। সে পূর্ণগঠিত হইয়াই উঠিয়া আসিল।[৫] তাহার পায়ে ঘি লাগিয়া আছে। মিত্রাবরুণ (দুই জন) তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন, "কে বট?" সে বলিল "মনুর দুহিতা।" (তাঁহার) বলিলেন, "বল আমাদের (দুহিতা)।" (সে) বলিল, "না। যিনি আমাকে জন্ম দিয়াছেন আমি তাঁহারই।" তাহাতে ভাগ লইতে (তাঁহারা) আঘাত করিলেন। সে জানিল ও জানিল না করিয়া এড়াইয়া আসিল।[৬] সে মনুর আছে আসিল। মনু তাহাকে বলিল, "কে বট? সে বলিল, "তোমার দুহিতা।" তিনি বলিলেন, "মহাশয়া,[৭] কিসে আমার দুহিতা?" সে বলিল, "এই যা বছর ধরিয়া জলে আহুতি হবন করিয়াছিলেন—ঘি, দই, মাঠা, ছানা—তাহা হইতে আমাকে (আপনি) জন্ম দিয়াছেন।" (সে) বলিল, "আমি আশীঃ (অর্থাৎ বর) স্বরূপিণী।[৮] সেই আমাকে যজ্ঞে প্রয়োগ করুন। যজ্ঞে যদি আমাকে প্রয়োগ করেন প্রজা ও পশু আপনার বহু হইবে।[৯] যে কোন আশীঃ আমাকে দিয়া কামনা করিবেন তাহা আপনার ফলিবে।"

সেই মতো করিয়া মনু "ইমাং প্রজাতিং প্রাজায়শত যেয়ং মনোঃ প্রজাতিঃ।"

দেবতা ও অসুরের প্রথমে বাক্ ও সোম ছিল না। এই দুইটির অধিকার লইয়া যে কাহিনীগুলি আছে তাহা যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির বিশেষ সম্পত্তি। এই কাহিনীগুলি অবলম্বনে পরে একাধিক পুরাণকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণের একটি কাহিনী—"সৌপর্ণী-কাদ্রব-আখ্যান" প্রায় মহাকাব্যের পর্যায়ে পড়ে। প্রথমে বাক্-অধিকারের গল্প বলি।

বাক্শক্তি লইয়া মনুষ্য জন্মিয়াছিল, বাক্শক্তি ছাড়া দেবতারা ও অসুরেরা। সে মনুষ্যেরা যাহা বলিত তাহাই ফলিত। সে দেবতারা ও অসুরেরা প্রজাপতিকে বলিল, "ইহারা তো এই রকম হইল।" তিনি[১০] বাক্ হইতে সত্য নিষ্কলন করিলেন—

১। এইখানে কাণ্ব শাখায় অতিরিক্ত পাঠ, "মা ত্বা বিহাসীৎ" (তোমাকে যেন না ছাড়ে, অর্থাৎ তোমার নৌকা যেন চড়ায় না পড়ে)।

২। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির।

৩। "সোর্চয়ঞ্ছ্রাম্যান্ প্রজাকামশ্চচার।"

৪। "আমিক্ষা।"

৫। "সা হ পিব্দমানোবোদেয়ায়।"

৬। "তদ্ধ জজ্ঞৌ তদ্ধ ন জজ্ঞাবতিত্বেয়ায়" (মা)।

৭। 'ভগবতি।"

৮। "সাশীরস্মি।"

৯। "বহু প্রজয়া পশুভির্ভবিষ্যসি।"

১০। প্রজাপতি।

"ভূর্ভুবঃ স্বর্"—এই। (বাকের অবশিষ্ট) যে চতুর্থ ভাগ, অসত্য, তাহা মনুষ্যদের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। এই তো বাকের অসত্য (ভাগ) যাহা মনুষ্যেরা বলে।[১]

বাকের পরের ইতিহাস সুপর্ণী-কদ্রূর কাহিনীতে পাই।

কদ্রূ আর সুপর্ণী নিজে রূপ লইয়া রেষারেষি করিয়াছিল। কদ্রূ সুপর্ণীকে নিজ রূপগৌরবে হারাইয়া দিল। ...সে কদ্রূ সুপর্ণীকে বলিল, "এখানে হইতে [২] স্বর্গের তিন তলায় সোম (আছে), তাহা আনো, তাহাতে নিজেকে মুক্ত কর।" সে সুপর্ণী ছন্দস্‌দের[৩] বলিল,[৪] "এই জন্যই পিতামাতা পুত্রদের ভরণ করে। এমন (অবস্থা) হইতে আমাকে উদ্ধার কর, ইহা হইতে আমাকে কিনিয়া লও।"

প্রথমে গেল জগতী। তাহার চৌদ্দ অক্ষরের দুই অক্ষর কাটা গেল সে বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার পরে গেল ত্রিষ্টুভ। তাহারও সেই দুই অক্ষর কাটা পড়িল। শেষে গেল গায়ত্রী বাজপাখি হইয়া, তাহার চারি অক্ষর। সে সোম লইয়া এবং সহোদরাদের কাটা চারি অক্ষর আত্মসাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, পথে গন্ধর্বেরা সোম কাড়িয়া লইল। (পুরাণে এই কাহিনী গরুড়ের অমৃত আহরণ আখ্যানে পরিণত হইয়াছে)।

সোম পাইবার উপায়ানান্তর না দেখিয়া দেবতারা গন্ধর্বদের কাছে সোম কিনিয়া লইতে চাহিল, গোরুর বদলে। গন্ধর্বেরা কিন্তু যজ্ঞ ছাড়া অন্য কিছুর বদলে সোম দিতে একেবারেই রাজি নয়। যজ্ঞ (অর্থাৎ যজ্ঞভাগ) দিলে দেবতাদের থাকে কী। দেবতারা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, যেহেতু গন্ধর্বেরা স্ত্রীলোলুপ অতএব তাহাদের কাছে মেয়েমানুষ পাঠানো যাক। তাহারা বাক্‌কে নারী বানাইয়া মায়া সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়া দিল।[৫] কিন্তু দেবতারা সোমও পাইল না। এবং বাক্‌কে ফিরিয়া পাইবার জন্য যে ফিকির করিয়াছিল তাহাও খাটিল না। বাক্ গন্ধর্বদের কাছে থাকাই পছন্দ করিল।

বাকের অধিকার লইয়া দেবতারা অবশেষে গন্ধর্বদের চ্যালেঞ্জ করিলেন। ঠিক হইল বাক্ যেন স্বয়ম্বরা হইবেন। দুই পক্ষ নিজের কেরামতি দেখাইবে, তখন যে দলকে ইচ্ছা বাক্ বরণ করিবে। স্বয়ংবরসভায়।

দেবতারা গাথা গাহিতে লাগিল, গন্ধর্বেরা তত্ত্বকথা বলিতে লাগিল।[৬]

সে[৭] দেবতাদের কাছে হাজির হইল। সেকারণ বিবাহে গাথা গান করা হয়,[৮] সেকারণে গান যে করে সে স্ত্রীলোকের প্রিয়...[৯]

এই কাহিনীই পুরাণে বিষ্ণুর মোহিনীরূপ ধরিয়া অসুরদের বঞ্চনা করিয়া দেবতাদের অমৃত পরিবেষণ উপাখ্যানে নূতনতর রূপ লইয়াছে।

১। কপিষ্ঠলকঠ-সংহিতা ৪.৬।
২। অর্থাৎ বহুদূরে।
৩। সুপর্ণী হারিয়া গিয়া কদ্রুর অধীন হইয়াছিল।
৪। "ছন্দাংসি সৌপর্ণানি।"
৫। "তে বাচং স্ত্রিয়ং কৃত্বা মায়ামুপাবসৃজৎ"।
৬। "গাথাং দেবা অগায়ন্। ব্রহ্ম গন্ধর্বা অবদন্"।
৭। বাক্।
৮। "তস্মাদ্ বিবাহে গাথা গীয়তে"।
৯। মৈত্রায়ণী সংহিতা ৫. ৭. ৬।

৪. উপনিষৎ-কথা

বৈদিক সাহিত্যের (—বৈদিক বিদ্যার নয়—) শেষ পর্যায়ে উপনিষদ্। এই রচনাগুলি প্রায় সবই ব্রাহ্মণগ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে[১] নিবদ্ধ। কোন কোন উপনিষদ্ ব্রাহ্মণের সমকালে অথবা অল্পকাল পরে লেখা হইয়া থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশ উপনিষৎ সম্পর্কিত ব্রাহ্মণগুলির রচনা অনেক পরের রচনার পরে।

বৈদিক কর্মকাণ্ড আর বিশেষ কোন পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন লাভ করে নাই। তবে সাধারণ লোকের জীবনধারায় বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাব ক্রমেই কমিয়া যাইতেছিল। ধর্মভাবনা ও দৈবচিন্তা নূতন নূতন পথে ধাবিত হইয়াছিল। উপনিষদ্‌গুলিতে যে অধ্যাত্মচিন্তার প্রকাশ তাহার ঈষৎ পূর্বাভাস ঋগ্‌বেদের কোন কোন সূক্তে ও ঋকে থাকিলেও আসলে তাহা অন্য ঐতিহ্য হইতে আগত। ভারতবর্ষের যে বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি ও অধ্যাত্মভাবনা—সর্বত্র ব্রহ্মবোধ এবং অহিংসা—তাহার মূল এই চিন্তাতেই নিহিত। ভারতবর্ষের দর্শনজ্ঞানের উৎস উপনিষদ্। ভারতীয় অধ্যাত্মরসিকদের সর্বকালের পানীয় যোগাইয়াছে উপনিষদের অমৃতনির্ঝর। ভারতীয় জীবনচিন্তার ও অধ্যাত্মভাবনায় যতটা, ঠিক ততটা না হইলেও, ভারতীয় সাহিত্যসাধনায় উপনিষদের প্রয়োগ কম কার্যকর হয় নাই। উপনিষদ্ তো সাহিত্যই। ভারতবাসী কখনো জীবনকে মরণাবচ্ছিন্ন ভাবে নাই বরং মরণকেই জীবনাবচ্ছিন্ন ভাবিয়াছে। এই জীবনমরণকে অখণ্ড স্রোতোরূপে ভাবনা ভারতীয় চিন্তার এক প্রধান বিশিষ্টতা। এ বোধের আলো উচ্চতর সাহিত্য উদ্ভাসিত করিবেই এবং উচ্চতর সাহিত্যে এ আলো বিচিত্রবর্ণে প্রতিফলিত হইবেই। সুতরাং উপনিষদের গল্পগুলি আপাতত ঋষিদের লড়াই মনে হইলেও ভারতীয় সাহিত্যের মৌলিক সৃষ্টির মূল, যেমন যোগদর্শনের সম্পূটে উপস্থাপিত হইলেও ভগবদ্‌গীতা ভারতীয় সাহিত্যের একটি মূল রচনা। রূপক গল্প (allegory ও parable) উপনিষদে উচ্চ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

অধ্যাত্মভাবকেরা ও দর্শনচিন্তকেরা উপনিষদকে মূল সূত্র ধরিয়াছিলেন বলিয়া উপনিষদ্-রচনা অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছিল, এমন কি ইহার কৃত্রিম নব পর্যায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্তও জের টানিয়া আসিয়াছে। আমাদের আলোচনায় প্রাচীন ও আসল উপনিষদ্‌গুলিই আবশ্যক। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির রচনাকাল আনুমানিক সপ্তম হইতে চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর মধ্যে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের ভাষার তুলনায় উপনিষদ্-ভাষা আমাদের পরিচিত সংস্কৃত ভাষার অনেকটা কাছাকাছি। ভাষার যুক্তিতে উপনিষদ্‌গুলিকে ঐ সময়ের আগে নেওয়া যায় না।

প্রাচীন ও প্রধান উপনিষদ্‌গুলির পরিচয় দিতেছি। তাহার আগে ব্রহ্ম ও উপনিষদ্ শব্দ দুইটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

এখন আমরা ব্রহ্ম বলিতে নির্গুণ ঈশ্বর বা পরমাত্মা বুঝি, যাঁহার রূপ নাই যিনি সর্বব্যাপী সর্বময়। এই অর্থ সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন হইতেই আমরা পাইতেছি। বৈদিক সাহিত্যে উপনিষদের পূর্বে এ অর্থ ছিল না। ঋগবেদে দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্) শব্দ ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয় স্বরধ্বনি উদাত্ত হইলে শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং মানে হইত—যিনি যজ্ঞে স্তব পাঠ করেন, যজ্ঞকার্যে পুরোহিত অগ্নিহোত্রী। প্রথম স্বরধ্বনি উদাত্ত হইলে শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ এবং মানে হইত—মন্ত্র, যজ্ঞে পঠিতব্য স্তব, মন্ত্র-উক্তি। ব্রাহ্মণে প্রথম অর্থ লুপ্ত, তাহার কারণ ঋগ্‌বেদের পরে পুংলিঙ্গ ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে সৃষ্ট তদ্ধিতান্ত "ব্রাহ্মণ" শব্দ চলিত হইয়া গিয়া পুংলিঙ্গ

১। কোন কোন ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট 'আরণ্যক'। সেখানে আরণ্যকের পরিশিষ্ট 'উপনিষদ্'।

"ব্রহ্মাণ্" শব্দকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে।[১] ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মান্ শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছিল—বেদমন্ত্র, মন্ত্রকথা। ঋগ্‌বেদের "মন্ত্র, মন্ত্রশক্তি" ও ব্রাহ্মণের "মন্ত্র' মন্ত্রকথা"—এই অর্থ হইতে ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মান্ শব্দের অর্থ উপনিষদ্‌গুলির মধ্য দিয়া প্রায় আধুনিক অর্থের কাছাকাছি আসিয়াছে। আধুনিক ব্রহ্ম অর্থে উপনিষদে পাই "আত্মা"। উপনিষদ্‌গুলির বিস্তৃত আলোচনায় ব্রহ্ম শব্দের অর্থপরিবর্তন ধরা পড়িবে।

"উপনিষদ্" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "সমীপে নিষন্ন হওয়া"।[২] তাহা হইতে অর্থ দাঁড়াইয়া ছিল "গোপন সভা, গোপন আলোচনা, গুহ্য বিদ্যা,[৩] নিগূঢ় রহস্য, গভীর জ্ঞান।" উপনিষদে যে অধ্যাত্মকথা আছে তাহা প্রকাশ্য নয়, গুরুশিষ্যের অথবা সমচিন্তকের কানাকানিতেই কহিবার যোগ্য।

উপনিষদের ব্যাখ্যানগুলিতে প্রায়ই একটু কাহিনী-ভূমিকা থাকে। এই ভূমিকার দ্বারা উপনিষদের উক্তিতে সাহিত্যের গুণ কিছু পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদীয় উপনিষদের মধ্যে ঐতরেয় ও কৌষীতকী উপনিষদ্ প্রধান। ঐতরেয়-উপনিষদ ছোট রচনা। কোন কাহিনী নাই। কৌষীতকী ঐতরেয় অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাতে দুইটি কাহিনী-ভূমিকা কাছে, একটি উল্লেখযোগ্য। সেটির যথাযথ অনুবাদ দিতেছি, প্রতর্দন-ইন্দ্র সংবাদ।

> প্রতর্দন দিবোদাসের পুত্র, ইন্দ্রের প্রিয়স্থানে গিয়াছিলেন, যুদ্ধ ও পৌরুষের ফলে। তাহাকে ইন্দ্র বলিলেন, "প্রতর্দন তোমাকে বর দিই।" সে প্রতর্দন বলিল, "তুমিই বল—যাহা তুমি মনুষ্যের হিততম মনে কর।" তাহাকে ইন্দ্র বলিলেন, "অপরের হইয়া বর চায় না।" "(তুমি) এখন আমার ছোট," প্রতর্দন বলিল। তখন ইন্দ্র তো সত্যভ্রষ্ট হইলেন না, সত্যই ইন্দ্র। তিনি বলিলেন, "আমাকেই জানো। ইহাই আমি মনুষ্যের হিততম মনে করি যে আমাকে জানিবে—ত্রিশীর্ষ ত্বাষ্ট্রকে বধ করিয়াছি, অধোমুখ তপস্বীদের সালা-বৃকদেয়[৪] দিয়াছি, বহু সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া দ্যুলোকে প্রহ্লাদী প্রমুখ পুলোমসন্তানদের আমি ধ্বংস করিয়াছি, পৃথিবীতে কালকাশ্যদের। তাহাতে আমার (একগাছি) লোমও খসে নাই। যে আমাকে জানিবে কোন কর্মেই তাহার সদ্‌গতি[৫] নষ্ট হইবে না।..."।

সব মানুষের জন্য বর চাওয়া অত্যন্ত বড় কথা, সেকালের পক্ষেও।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্গত, দুই তিনিটি মুখ্য ও প্রাচীনতম উপনিষদের মধ্যে একটি। আকারে বৃহত্তম। অনেকগুলি ব্যাখ্যান কাহিনী-ভূমিকা আছে।

> তিনজন উদ্‌গীথে[৬] নিপুণ হইয়াছিলেন,—নাম শিলক শালাবত্য, চৈকিতায়ন দাল্‌ভ্য,

১। পরবর্তীকালে পুরাণে ও সাহিত্যে প্রচলিত 'ব্রহ্মান্' শব্দটি অগ্নিদেবতার এক নবরূপ "ব্রহ্মা"-তে পরিণত হইয়াছে। তবে এ ব্রহ্ম দেবতা লোক ব্যবহারে স্বীকৃত হয় নাই।

২। এই সঙ্গে "পরিষদ্" শব্দ তুলনা করা যায়। পরিষদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মণ্ডলী করিয়া (round table) নিষণ্ণ হওয়া।

৩। ইহা হইতে উপনিষদের দ্বিতীয় অর্থ আসিয়াছে। "উপনিষৎপ্রয়োগ" মানে গোপনে বিষ অথবা ঔষধ দেওয়া কিংবা অভিচার করা।

৪। শৃগাল অথবা হায়েনা (গোবাঘা)।

৫। মূলে 'লোক"।

৬। অর্থাৎ সামগানে।

প্রবাহণ জৈবলি। তাঁহারা বলাবলি করিলেন, "উদ্‌গীথে নিপুণ হইয়াছি। উদ্‌গীথ লইয়া প্রশ্নোত্তর করি।"[১] "তাই (হোক", বলিয়া তাঁহারা) এক সঙ্গে কাছাকাছি বসিলেন।

প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন, "আপনারা দুই জন আগে বলুন। দুই ব্রহ্মজ্ঞের আলাপে ভালো ভালো কথা শুনিব।"

শিলক শালাবত্য চৈকিতায়ন দাল্‌ভ্যকে বলিলেন, "আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।" "জিজ্ঞসা করুন", (দাল্‌ভ্য) বলিলেন।

"সামের[২] কী গতি?" "স্বর",[৩] (দাল্‌ভ্য) বলিলেন।

"স্বরের কী গতি?" "প্রাণ," (দাল্‌ভ্য) বলিলেন।

"প্রাণের কী গতি?" "অন্ন," (দাল্‌ভ্য) বলিলেন।

"অন্নের কী গতি?' "জল", (দাল্‌ভ্য) বলিলেন।

"জলের কী গতি?" "ঐ লোক,"[৪] (দাল্‌ভ্য) বলিলেন।

"ঐ লোকের কী গতি?" "স্বর্গলোক পৌছিতে পারে", (দাল্‌ভ্য) বলিলেন।...

উষস্তি চাক্রায়ণের কাহিনীটি বিশেষভাবে মূল্যবান্‌।

কুরুদেশ দুর্ভিক্ষ[৫]-পীড়িত হইলে পর, আটিকী জায়ার সহিত উষস্তি চাক্রয়ণ ইভ্য[৬]-গ্রামে প্রদ্রাণক[৭] হইয়া বাস করিলেন। এক ইভ্য মাষকলাই (সিদ্ধ) খাইতেছিল, তিনি তাহার কাছে (কিছু) ভিক্ষা চাহিলেন। সে বলিল, "আমার সঙ্গে এই যেগুলি রাখা আছে তাহা ছাড়া আর নাই।" "ইহা হইতেই আমাকে দাও,." (তিনি) বলিলেন। সে সেগুলি দিল। (তাহার পর বলিল,) "এখন জল (নাও)।"[৮]

"তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট খাওয়া হইবে।" "ওগুলিও কি উচ্ছিষ্ট ছিল না?" "(ওগুলি) যদি না খাইতাম তবে বাঁচিতাম না।" (আরও) বলিলেন, "জল খাওয়া আমার ইচ্ছাধীন।"[৯] খাইবার পর যাহা সর্বশেষ অবশিষ্ট রহিল তাহা লইয়া পত্নীকে দিলেন।। তাহার আগেই ভালো ভিক্ষা মিলিয়াছিল। সে সেগুলি লইয়া রাখিয়া দিল।

তিনি প্রভাতে উঠিয়া বলিলেন, "যদি কিছু অন্ন পাই তবে কিছু ধনও পাই। অমুক রাজা যজ্ঞ করিবে, আমাকে সব যজ্ঞকার্যে[১০] বরণ করিবে।" তাঁহাকে পত্নী বলিল, "ওগো পতি, এই সেই মাষকলাই।" সেগুলি খাইয়া (উষস্তি) সেই ফলাও যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইলেন।

১। মূলে "বদামঃ"। অব্যয় "কথা" (—কথম্‌) পদের বিশেষ্যে পরিণতি এই প্রথম দেখা গেল।
২। বেদগান।
৩। অর্থাৎ সুর।
৪। অর্থাৎ ঊর্ধ্বাকাশ।
৫। মূলে "মটচীহতেষু"।
৬। ইভ্য শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে। এক ধনী বণিক্‌। আর এক হাতিধরা বা মাহুত। শেষের অর্থই এখানে খাটে।
৭। "প্রদ্রাণক" মানে বোধহয় এখনকার উদ্বাস্তুর মতো।
৮। মূলে "হস্তানুপানম্‌",। অর্থ 'তবে এখন খাইবার পর জল খাও।'
৯। মূলে "কামো ম উদপানম্‌"। অর্থাৎ জল খাওয়া না খাওয়া জীবন-মরণের ব্যাপার নয়, ইচ্ছাধীন।
১০। মূলে "সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ"।

সেখানে যাঁহারা আস্তাব-স্তব করিবেন তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিলেন। তিনি প্রস্তোতাকে বলিলেন, "হে প্রস্তোতা,[১] যে দেবতারা প্রস্তাবের বশ তাঁহাদের না জানিয়া যদি স্তব কর তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে।" এইরকমই উদ্‌গাতাকে বলিলেন, 'হে উদ্‌গাতা, যে দেবতারা উদ্‌গীথের বশ তাঁহাদের না জানিয়া যদি উদ্‌গীথ গাও তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে।" এই রকমই প্রতিহর্তাকে বলিলেন, "হে প্রতিহর্তা, যে দেবতারা প্রতিহারের বশ তাঁহাদের না জানিয়া যদি গ্রতিহরণ কব তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে।"

সমারত[২] তাহারা[৩] চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর যজমান[৪] বলিলেন, "মহাশয়ের পরিচয় আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" "উষস্তি চাক্রায়ণ", (উষস্তি) বলিলেন। তিনি[৫] বলিলেন, "আপনাকেই আমি এই সব যজ্ঞকার্যে (বরণ করিতে) চাহিয়াছিলাম। আপনাকে আমি খুঁজিয়া না পাইয়া অন্যদের বরণ করিয়াছি। আপনিই এখন আমার সকল যজ্ঞকার্যের (কর্তা হোন)।" "বেশ"। কিন্তু তখন এই স্তবকারীদের মধ্যে এই যে কর্মচ্যুত ইঁহাদের যে পরিমাণ ধন দিবে আমাকেও সেই পরিমাণ দিতে হইবে।" "বেশ", যজমান বলিলেন।

তাহার পর প্রস্তোতা ইত্যাদির প্রশ্ন এবং উষস্তির উত্তর।

রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতা সত্যকাম জাবালের কাহিনীকে আমাদের সুপরিচিত করিয়াছে। কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ কতটুকু পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা অনুবাদ হইতে বোঝা যাইবে।

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে ডাকিয়া বলিল, "মা, আমি ব্রহ্মচর্য বাস করিতে চাই। আমি কোন্ গোত্রের?" সে তাহাকে বলিল, "বাবা, তুমি কোন্ গোত্রের তাহা তো আমি জানি না, আমি বহু ঘুরিয়া (বহু) পরিচর্যা করিয়া যৌবনে তোমাকে পাইয়াছিলাম। সে তো আমি জানি না তুমি কোন্ গোত্রে জন্মিয়াছ। আমার নাম তো জবালা, তোমার নাম সত্যকাম। তা সত্যকাম জাবাল বলিও।"

সে হারিদ্রুমত গৌতমের কাছে গিয়া বলিল, "আপনার কাছে[৬] ব্রহ্মচর্য বাস করিতে চাই।[৭] আপনার কাছে আসিতে পারি?"

তাহাকে (গৌতম) বলিলেন, "বৎস,[৮] তুমি কি গোত্র বট?"

সে বলিল, "আমি তা জানি না গো কোন্ গোত্রের আমি। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মাতা উত্তর দিয়াছিল, 'বহু ঘুরিয়া পরিচর্যা করিয়া যৌবনে তোমাকে পাইয়াছিলাম। সে তো আমি জানি না তুমি কোন্ গোত্রের (সন্তান হইয়া) জন্মিয়াছ।

১। যিনি যজ্ঞে স্তব পাঠ করেন।
২। অর্থাৎ যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত।
৩। প্রস্তোতা, উদ্‌গাতা ও প্রতিহর্তা (হোতার সরকারী সঙ্গী)।
৪। যিনি যজ্ঞের আয়োজনকারী ও যজ্ঞফলের অধিকারী। এখানে সেই রাজা।
৫। যজমান।
৬। মূলে "ভগবন্তম্"।
৭। অর্থাৎ শিষ্য হইয়া নিয়মমত শিক্ষা পাইতে চাই।
৮। মূলে "সোম্য"।

আমার নাম তো জবালা তোমার নাম সত্যকাম। তা সত্যকাম জাবাল বলিও।' তাই আমি সত্যকাম জাবাল বটি গো।"

তাহাকে (গৌতম) বলিলেন, "এ কথা যে ব্রাহ্মণ নয় সে বলিতে পারে না। বৎস, সমিধ্[১] সংগ্রহ করিয়া আন, তোমাকে উপনয়ন[২] দিব। তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই।" তাহাকে উপনয়ন দিয়া কৃশ ও অবল চারিশত গোরু দেখাইয়া বলিলেন, "বৎস, ইহাদের পিছু পিছু যাও।" সেগুলি বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, "সহস্র না হইলে[৩] আসিও না।" সে কয়েক বছর বাহিরে কাটাইল, ততক্ষণে তাহাদের সংখ্যা সহস্র হইয়াছে।

তাহার পব তাহাকে (পালের) ষাঁড় সম্বোধন করিল,[৪] "সত্যকাম।" "প্রভূ", (সত্যকাম) প্রত্যুত্তর দিল। "বৎস, (আমরা সংখ্যায়) হাজার হইয়াছি। আমাদের আচার্যগৃহে লইয়া চল। তোমাকে ব্রহ্মের এক পোয়া[৫] বলি।" "প্রভু, বলুন আমাকে।" তাহাকে (বৃষ) বলিল, "পূর্ব দিক্ কলা[৬], পশ্চিম দিক্ কলা, দক্ষিণ দিক্ কলা, উত্তর দিক্ কলা। বৎস, ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল[৭], পাদ, প্রকাশবান্ নাম।...অগ্নি তোমাকে (আর এক) পোয়া বলিবে।"

পরদিন সে গোরু ফিরাইয়া লইয়া চলিল। যেখানে সন্ধ্যা হইল সেখানে আগুন জ্বালাইয়া গোরু আটকাইয়া জ্বালানি কাঠ[৮] জড়ো করিয়া অগ্নির পিছনে পূর্বমুখে বসিল। তাহাকে অগ্নি সম্বোধন করিল, "সত্যকাম।" "প্রভু", (সত্যকাম) প্রত্যুত্তর দিল। "বৎস, ব্রহ্মের এক পোয়া তোমাকে বলি।" "বলুন আমাকে, মহাশয়।" তাহাকে (অগ্নি) বলিল, "পৃথিবী কলা, অন্তরিক্ষ[৯] কলা, দ্যৌ[১০] কলা, সমুদ্র কলা। বৎস, ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদ, অনন্তবান্ নাম।—হংস তোমাকে (আর এক) পোয়া বলিবে।"

পরদিনে সে গোরু ফিরাইয়া লইয়া চলিল। যেখানে সন্ধ্যা হইল সেখানে আগুন জ্বালাইয়া গোরু আটকাইয়া জ্বালানি কাঠ জড়ো করিয়া অগ্নির পিছনে পূর্বমুখে বসিল। (এক) হংস উড়িয়া আসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিল, "সত্যকাম।" "প্রভু", (সে) প্রত্যুত্তর দিল। "ব্রহ্মের এক পোয়া তোমাকে বলি।" "বলুন আমাকে, মহাশয়।"

১। জ্বালানি কাঠ (সহজলভ্য অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়)। তখন গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী হইতে গেলে এই ফী দিতে হইত। যাহারা ব্রহ্মচারী না হইয়া তত্ত্বজ্ঞান-অভিলাষী হইয়া যাইত তাহাদেরও এক টুকরা জ্বালানি কাঠ সমিধের প্রতীক করিয়া লইয়া যাইতে হইত।

২। উপনয়ন (=অত্যন্ত নিকটে আসা) মানে গুরুগৃহে admission।

৩। অর্থাৎ চারি শত গোরুর পাল হাজারে ন দাঁড়াইলে।

৪। মূলে "অভ্যুবাদ"।

৫। "একবাদ", চতুর্থাংশ।

৬। ষোড়শাংশ, ছটাক।

৭। চার ছটাক।

৮। সমিধ্।

৯। নিম্নাকাশ।

১০। উর্ধ্বাকাশ।

(হংস) তাহাকে বলিল, "অগ্নি কলা, সূর্য কলা, চন্দ্র কলা, বিদ্যুৎ কলা। ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদ, জ্যোতিষ্মান্ নাম।—পানকৌড়ি তোমাকে (আর এক) পোষা বলিবে।"

পরদিনে সে গোরু ফিরাইয়া লইয়া চলিল। যেখানে সন্ধ্যা হইল সেখানে আগুন জ্বালাইয়া গোরু আটকাইয়া জ্বালানি কাঠ জড়ো করিয়া অগ্নির পিছনে পূর্বমুখে বসিল। (এক) পানকৌড়ি[১] উড়িয়া আসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিল, "সত্যকাম।" "প্রভু", (সে) প্রত্যুত্তর দিল। "বৎস, ব্রহ্মের এক পোষা তোমাকে বলি।" "বলুন আমাকে, মহাশয়।" তাহাকে (পানকৌড়ি) বলিল, "প্রাণ কলা, চক্ষু কলা, শ্রোত্র কলা, মন কলা। ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদ, আয়তনবান্ নাম।...'

সত্যকাম আচার্যগৃহে পৌছিল। তাহাকে আচার্য সম্বোধন করিলেন, "সত্যকাম।" "প্রভু", (সে) প্রত্যুত্তর দিল। "বৎস, তোমাকে ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া লাগিতেছে। কে তোমাকে উপদেশ দিল?" "মনুষ্য ছাড়া অপরে", সে স্বীকার করিল।

কাহিনীটি যে এক রূপকথার কাঠামোয় বাঁধা বলিয়া বোধ হইতেছে। অনাথ বালককে গুরু কঠিন কাজে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল ষাঁড়, আগুন, হাঁস, পানকৌড়ি। এ ধরনের মোটিফ দেশের ও বিদেশের রূপকথায় অজানা নয়।

অর্বাচীন পুরাণকাহিনীতে ধর্মের চার পা বলা হইয়াছে। সুতরাং সেখানে ধর্মকে ষাঁড় ধরিলে অসংগত হয় না। বস্তুত সেইভাবেই আধুনিক কালে পৌরাণিক কাহিনী রূপবদল করিয়াছে। উপনিষদের এই কাহিনীতে কিন্তু ব্রহ্মের চারি পাদ ও ষোল কলার যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে গোরু-ভাবনার স্থান নাই। এখানে ব্রহ্মকে গতি, স্থিতি, দীপ্তি, ও অনুভূতি (অথবা প্রকাশ, বিস্তার, শক্তি ও অনুভব)—এই চার ভাবে নির্দেশ করিবার চেষ্টা আছে।

শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতার অধ্যাত্মশিক্ষা দান ছান্দোগ্য-উপনিষদের সুবিজ্ঞাত অংশ। ইহাতেই উপনিষদের এক প্রধান বাণী "তৎ ত্বম্ অসি" বিঘোষিত হইয়াছে। আরম্ভকাহিনীটুকু সামান্যই।

শ্বেতকেতু ছিল আরুণির পুত্র। তাহাকে পিতা বলিলেন, "শ্বেতকেতু, ব্রহ্মচর্য বাস কর। বৎস, আমাদের বংশের ছেলে বেদ না পড়িলে ব্রহ্মবন্ধুর[২] মতো হয়।"
সে বারো বছরে পৌছিয়া চব্বিশ বছর হওয়া পর্যন্ত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া মনস্বী বেদজ্ঞ-অভিমানী গর্বিত হইয়া (গুরুগৃহ হইতে) ফিরিয়া আসিল।

তাহাকে পিতা বলিলেন, "শ্বেতকেতু, বৎস, এই যে মনস্বী বেদজ্ঞ-অভিমানী গর্বিত হইয়াছে, কিন্তু সেই আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি যাহাতে অ-শোনা শোনা হয়, অ-ভাবা ভাবা হয়, হয়, অ-জানা জানা হয়?"

"প্রভু, কিরকম সে আদেশ হইতে পারে?"

"বৎস, যেমন একটি মৃৎপিণ্ড হইতে মাটির বিকার সব কিছু জানা যাইতে পারে। বাক্‌ব্যবহার বিকার নামধেয়[৩] (বিভিন্ন হইলেও) মাটি—ইহাই সত্য[৪]।

১। মূলে "মদ্‌গুঃ"। মাগুর-জাতীয় মাছও হইতে পারে। তাহা হইলে "উপনিপত্য" মানে হইবে, 'লাফাইয়া আসিয়া পড়িয়া'।

২। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সহিত কুটুম্বিতার খাতিরেই ব্রাহ্মণসমাজে স্থান পায়, অর্থাৎ যেন পতিত ব্রাহ্মণ।

৩। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং।" অর্থাৎ ভাষায়, উপাদান-বিকৃতিতে, সেগুলির নামে।

৪। অর্থাৎ এক মূল বস্তু।

"বৎস, যেমন একটি লৌহমণির দ্বারা সমস্ত লৌহময় (দ্রব্য) জানা যাইতে পারে। বাক্‌ব্যবাহর বিকার নামধেয় (বিভিন্ন হইলেও) লৌহ ইহাই সত্য।

"বৎস, যেমন একটি নরুন হইতে সকল ইস্পাত-নির্মিত[১] (দ্রব্য) জানা যাইতে পারে। বাক্‌ব্যবহার বিকার নামধেয় (বিভিন্ন হইলেও) ইস্পাত-নির্মিত (দ্রব্য)—ইহাই সত্য।

"বৎস, এইরকমই সে আদেশ হয়।"

"নিশ্চয়ই প্রভুরা[২] ইহা জানিতেন না। যদি ইহা জানিতেন কেন আমাকে তাহা বলিলেন না।

"প্রভু, আপনিই ইহা বলুন।"

(পিতা) বলিলেন, "বেশ, বৎস।"

তাহার পর আরুণি পুত্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—এই ক্রমে। সূক্ষ্মতম উপদেশে পৌঁছিয়া তিনি এক এক ধাপ উঠেন আর বলেন, "সেই (যা কিছু) সব সত্য, সে আত্মা তুমিই, শ্বেতকেতু।"[৩] শেষে বলিলেন,

বৎস, লোককে হাত বাঁধিয়া[৪] লইয়া আসে, (বলে) "অপহরণ করিয়াছে, চুরি করিয়াছে, ইহার জন্য কুঠার গরম কর।" সে যদি সে কাজ করিয়া থাকে[৫] তখন সে নিজেকে মিথ্যাচারী করে।[৬] সে মিথ্যা অভিসন্ধি করে।[৭] মিথ্যার মধ্যে নিজেকে অন্তর্হিত করিয়া[৮] তপ্ত কুঠার হাতে তুলিয়া নেয়। সে পোড়ে সে মরে। কিন্তু যদি (সে) কাজ সে না করিয়া থাকে[৯] তখনই যে নিজেকে সত্যাচারী করে[১০]। সে সত্য অভিসন্ধি করে।[১১] সত্যের মধ্যে নিজেকে অন্তর্হিত করিয়া তপ্ত কুঠার হাতে তুলিয়া নেয়। সে পোড়ে না পরন্তু মুক্তি পায়। সে যে তখন পোড়ে নাই তাহাই আত্মস্বরূপ।[১২] ইহাই সব, তাহাই সত্য, সে আত্মা, সে তুমি বট, হে শ্বেতকেতু।"

(পিতার) সেই (আদেশ) সে বুঝিল, বুঝিল।*

সেকালের বিচার ও শাস্তির স্বয়ংক্রিয় রূপের একটি ছবিও এখানে পাইলাম।

দেবতাদের প্রধান ইন্দ্র ও অসুরদের প্রধান বিরোচনের আত্মজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রজাপতির কাছে ব্রহ্মচর্যবাসের কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। ইহাই ছান্দোগ্য-উপনিষদের শেষ প্রস্তাব।

"যে আত্মা অপাপ অজর অমর অশোক অবুভুক্ষু অপিপাসু সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প, তাহার সন্ধান করিতে হইবে তাহাকে জানিতে হইবে। সে সব লোক[১৩] প্রাপ্ত হয় সব কামনা,[১৪] (যে) সেই আত্মাকে খুঁজিয়া পাইয়া জানিতে পারে।"—(প্রজাপতি) বলিলেন।

১ মূলে "কার্ষ্ণায়সং"। ২। মূলে "ভগবন্তঃ"। অর্থাৎ মাননীয় অধ্যাপকেরা।
৩ "সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো।" ৪। "হস্তগৃহীতম্।
৫ "স যদি তস্য কর্তা ভবতি।৬। "অনৃতমাত্মানং কুরুতে।"
৭ "অনৃতাভিসন্ধঃ।" ৮। "অনৃতেনাত্মানমন্তর্ধায়।"
৯ "অথ যদি তস্য অকর্তা ভবতি।" ১০। "সত্যমাত্মানং কুরুতে"
১১ "সত্যাভিসন্ধঃ।" ১২। "এতদাত্মম্।"
১৩ অর্থাৎ ধাম আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা।
১৪ "কামান্।" অর্থাৎ কাম্য বস্তু অবস্থা বা ভাব সকল।
শেষ পদ দ্বিরুক্ত হওয়ার অর্থ যে কাহিনী এখানে শেষ হইল

দেব ও অসুর উভয় পক্ষই ইহার মর্ম পরে বুঝিল।[১] তাহারা বলিল, "আচ্ছা, সেই আত্মাকে খুঁজিয়া পাই, সে আত্মাকে খুঁজিয়া পাইলে সকল লোক পাওয়া যায় সকল কামনাও।"

দেবতাদের মধ্য হইতে ইন্দ্র আগাইয়া গেল[২] অসুরদের মধ্যে বিরোচন। তাহারা সন্ধান না পাইয়া[৩] সমিধ্-হাতে প্রজাপতি সকাশে আসিল। তাহারা বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য বাস করিল। প্রজাপতি তাহাদের বলিলেন, "কি ইচ্ছা করিয়া (এতদিন) বাস করিলে?" তাহারা বলিল, "যে আত্মা অপাপ অজয় অমর অশোক অবুভুক্ষু অপিপাসু সত্যকাম সত্যসংকল্প তাহাকে সন্ধান করিতে হইবে, তাহাকে জানিতে হইবে। সে সব লোক প্রাপ্ত হয় সব কামনাও, (যে) সেই আত্মাকে খুঁজিয়া পাইয়া জানিতে পারে।—আপনার (এই) বাণীর মর্ম বুঝিয়া তাহাকে ইচ্ছা করিয়া (আমরা) বাস করিয়াছি।"

তাহাদের প্রজাপতি বলিলেন, "এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দেখা যায়[৪] ইহাই আত্মা।" আরও বলিলেন, 'ইহাই অমৃত, অভয়। ইহাই ব্রহ্ম।"

"প্রভু, তাহা হইলে জলে যাহা প্রকটিত হয়[৫] যাহা দর্পণে, সে কে?"

"সে-ই এই সবগুলিতে প্রতিবিম্বিত হয়", (প্রজাপতি) বলিলেন। (তিনি) বলিলেন, "জলভরা শরায় নিজেকে (প্রতিবিম্বিত) লক্ষ্য করিয়াও যদি আত্মাকে চিনিতে না পার তবে আমাকে বল।"

তাহারা জলভরা শরায় লক্ষ্য করিতে লাগিল। প্রজাপতি তাহাদের বলিলেন, "কি দেখিতেছ?" তাহারা বলিল, "ভগবন্, আমাদের নিজেকেই সবটা দেখিতেছি, কেশ হইতে নখ পর্যন্ত প্রতিরূপ।"

তাহাদের প্রজাপতি বলিলেন, "ভালো অলঙ্কার ধারণ করিয়া ভালো বসন পরিয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া জলভরা শরায় নিজেদের দেখ।" তাহারা ভালো অলঙ্কার ধারণ করিয়া ভালো বসন পরিয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া জলভরা শরায় দেখিতে লাগিল।

প্রজাপতি তাহাদের বলিলেন, "কি দেখিতেছ?"

তাহারা বলিল, প্রভু, যেমন আমরা ভালো অলঙ্কার ধারণ করিয়া ভালো বসন পরিয়া পরিচ্ছন্ন হইয়াছি এমনি, প্রভু, উহাও ভালো অলঙ্কার ধারণ করিয়া ভালো বসন পরিয়া পরিচ্ছন্ন।"

"উহাই আত্মা"[৬], (তিনি) বলিলেন, 'ইহা অমৃত অভয়, ইহা ব্রহ্ম[৭]।"

তাহারা শান্তহৃদয়ে চলিল। তাহাদের পিঠের দিকে তাকাইয়া প্রজাপতি বলিয়া দিলেন, "আমাকে না খুঁজিয়া পাইয়া চলিয়া যাইতেছে, (তোমাদের) যাহারা মধ্যে ইহা উপনিষদ্[৮] হইয়া থাকিবে, দেব হোক, অসুর হোক, তাহারা পরাভূত হইবে।"

শান্তহৃদয় হইয়াই বিরোচন অসুরদের কাছে আসিল। তাহাদের এই উপনিষদ্ বলিয়া দিল, "এখানে[৯] নিজেকেই বড় বলিয়া নিজেকে পরিচর্যা করিয়া উভয় লোক পাওয়া যায়—এই[১০] এবং ওই[১১]।

১। "অনুবুবুধিরে"। ২। "অভিবব্রাজ", অর্থাৎ খুঁজিতে চলিল।
৩। "অসংবিমানো"। ৪। অর্থাৎ চোখের তারায় প্রতিবিম্বিত।
৫। "পরিখ্যায়তে"। ৬। অর্থাৎ প্রতিবিম্ব। ৭। এখানে অর্থ চরম তত্ত্ব, পরম জ্ঞান।
৮। অর্থাৎ যে এইখানেই আত্মতত্ত্বের পর্যবসান ভাবিবে।
৯। অর্থাৎ সংসারে। ১০। ইহলোক। ১১। পরলোক।

> সেই জন্য অদ্যাপি এখানে[১] (যে) আদায় করে, (যে) শ্রদ্ধাহীন, (যে) যজ্ঞকারী নয় (তাহাকে লোকে) বলে, "অসুরপ্রকৃতি বটে।" অসুরদের ইহাই উপনিষদ্—অন্ন ও বস্ত্র দিয়া অলঙ্কার দিয়া মৃত শরীর সংস্কার করে।[২] ইহার দ্বারা ওই লোক জয় করা হইবে মনে করে।

বিরোচন খুশি হইয়া অধ্যাত্ম-অন্বেষণে বিরত হইল। ইন্দ্র ক্ষান্ত রহিল না। ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে আসিয়া আরও বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য বাস করিল। তখন প্রজাপতি আরও একটু জ্ঞান দিলেন। তাহাও শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকে খুশি করিতে পারিল না। সে আবার আসিয়া বত্রিশ বছর বাস করিল। প্রজাপতি আরও একটু জ্ঞান দিলেন। ইন্দ্র চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে আবার ইন্দ্র সমিধ-হাতে প্রজাপতির কাছে আসিয়া হাজির। প্রজাপতি বলিলেন, এই তো তুমি শান্তহৃদয়ে চলিয়া গেলে। আবার কি ভাবিয়া ফের আসিলে? ইন্দ্র বলিল, "আমি আছি"—এই সত্য এখন নিজের সম্বন্ধে বুঝিয়াছি। কিন্তু অপরের সম্বন্ধে বুঝি নাই। এই যা কিছু সবই বিনাশশীল জানিয়া আমি তৃপ্তি পাইতেছি না।[৩] প্রজাপতি বলিলেন, আর পাঁচ বছর ব্রহ্মচর্য বাস কর। সে পাঁচ বছর শেষ হইলে প্রজাপতি ইন্দ্রকে এই চরম জ্ঞান উপদেশ করিলেন।

> মর্ত এই শরীর। মৃত্যুর দ্বারা অধিকৃত সেইটুকু অমৃত অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। শরীরধারী প্রিয়-অপ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত। শরীরধারীর নিজের কখনো প্রিয়-অপ্রিয়ের দ্বারা আঘাত নাই। অশরীর[৪] থাকিলে কখনো প্রিয়-অপ্রিয় স্পর্শ করে না।...

এই কাহিনীর ভিতরেও রূপকথার অস্থিপঞ্জর লক্ষ্য করি। ইন্দ্র ও বিরোচনকে প্রজাপতি যে আত্মার ডিমনস্ট্রেশন দিয়াছিলেন তাহা যেন ছেলেভুলানো গল্পের মোটিফের মত,—ভূতের সামনে আরশি ধরিয়া তাহাকে আর এক ভূত দেখানো।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আছে। তাহা ঋগ্‌বেদের সৃষ্টি-সূক্তের (১০.১২৯) সঙ্গে তুলনীয়। সেকালে যে সকালসন্ধ্যায় উলুধ্বনি করিয়া সূর্যবন্দনা হইত তাহার উল্লেখ ইহাতে আছে।

> আদিত্য ব্রহ্ম—এই আদেশ।[৫] তাহার উপাখ্যান—অসৎই আগে ছিল তাহা সৎ হইল।[৬] সেই (সদ্-অসৎ) মিলিত হইল, ডিম উৎপন্ন হইল। তাহা সংবৎসর কালমাত্রা পড়িয়া রহিল। তাহা ফুটিয়া গেল। সেই ডিমের খোলা দুইটি হইল রূপা ও সোনা।
>
> সেই যাহা রূপা তাহা এই পৃথিবী, যাহা সোনা তাহা আকাশ। যাহা জরায়ু তাহা পর্বত, উল্ব তাহা মেঘ ও নীহার,[৭] যাহা ধমনী তাহা নদী, ভিতরে জল তাহা সমুদ্র।

১। সংসারে।

২। মিশর আসীরীয়া প্রভৃতি দেশে মৃতের এইরূপ সাড়ম্বর সমাধি দেওয়া রীতি ছিল। উপনিষদের এই গল্পে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এখানে অসুর আসীরীয়ার (অথবা তৎপ্রভাবিতা ইরানের) অধিবাসীদেয় বুঝাইতেছে, সম্ভবত ইরানীয়। কেন না ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া ভারত ও ইরান খুব ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত ছিল।

৩। "নাহমত্র ভোগ্যাং পশ্যামি।"

৪। অর্থাৎ শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া দেখিলে।

৫। আদেশ শব্দের অর্থ, সিদ্ধান্ত উপদেশ।

৬। "অসৎ" মানে যাহা নাই, ঋগ্‌বেদের সূক্তে "তুচ্ছ", এখনকার কথায় "শূন্য"। "সৎ" যাহা আছে।

৭। অর্থাৎ তুষার।

যে সেই জন্মিল সে এই আদিত্য।* তাহার জন্মিবার কালে উলু-উলু ধ্বনি উঠিল,[১] সর্ব ভূত এবং সর্ব কাম তাহাতে যোগ দিল। সেই হইতে তাহার উদয় এবং অস্তগমন (কালে) উলু-উলু ধ্বনি উঠে, সর্ব ভূত ও সর্ব কামও (তাহাতে যোগ দেয়)।

শুক্ল যজুর্বেদীয় 'বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্' আকারে প্রকারে প্রাচীনতার—সব দিক দিয়াই ছান্দোগ্য-উপনিষদের জুড়ি। এই দুইটি উপনিষদ্ পড়িলে উপনিষদের রহস্য সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। ছান্দোগ্য-উপনিষদে অনেকগুলি ব্রহ্মবিদের কাহিনী আছে। বৃহদারণ্যকে তেমন কাহিনীর সংখ্যা কিছু কম। যাজ্ঞবল্ক্যই এখানে প্রধান ব্রহ্মবিদ্। অন্য ব্রহ্মবিদ্‌দের মধ্যে ছান্দোগ্যে পরিচিত শ্বেতকেতুও আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যকে লইয়া যে সব কাহিনী আছে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত এবং সে কাহিনীগুলি এক সঙ্গে বর্ণিত হয় নাই। একই কাহিনী ছোট ও বড় দুই রকম পাঠে আছে। জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্যকে তিন বার দেখা যায়। তাহার মধ্যে দুই বার পত্নীদের সঙ্গে বিষয় বাঁটোয়ারা লইয়া। জনকের সভায় ব্রহ্মকথায় যাজ্ঞবল্ক্যের জয়লাভ-বৃত্তান্ত অনুবাদে দিতেছি।

জনক বৈদেহ[২] বহু দক্ষিণা দেওয়া হইবে এমন যজ্ঞ করিলেন। সেখানে[৩] কুরুপাঞ্চালের ব্রাহ্মণেরা আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। সেই জনক বৈদেহের জানিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল, কে এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বাধিক দেবজ্ঞ। তিনি সহস্রসংখ্যক গোরু আনিয়া হাজির রাখিলেন। সেগুলির প্রত্যেকের প্রত্যেক শিঙে দশ পাদ[৪] (সোনা) আবদ্ধ রহিল তাঁহাদের (জনক) বলিলেন, "প্রভু ব্রাহ্মণেরা, যিনি আপনাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ তিনিই এই গোরুগুলি লইয়া যান।"

সে ব্রাহ্মণেরা কিন্তু সাহস করিল না। তাহার পর যাজ্ঞবল্ক্য আপন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "বৎস, সামশ্রবস্, এই গোরুগুলি লইয়া যাও।" সেগুলি (সে) লইয়া গেল।

সে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইল, (বলিল) "কিসে তুমি নিজেকে আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ বল?"

এখন জনক বৈদেহের হোতা ছিলেন অশ্বল। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ বট?" তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মিষ্ঠকে আমরা নমস্কার করি। আমরা গোরু চাই।"

তাহারা পর তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন হোতা অশ্বল।...

অশ্বলের পর প্রশ্ন করিতে উঠিলেন জারৎকারব আর্তভাগ। তিনি বসিয়া পড়িলে ভুজ্যু লাহ্যায়নি। ভুজ্যুর পর উষস্তি চাক্রায়ণ। তাহার পর কহোল কৌষীতকেয়। তাহার পর প্রশ্ন করিতে উঠিলেন গার্গী বাচক্নবী।[৫]

গার্গী প্রশ্ন করেন যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দেন। গার্গী বলিলেন, দেবলোক কাহাতে ওতপ্রোত।[৬] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ইন্দ্রলোকে।

১। "তং জায়মানং ঘোষা উলুলবোহনূদতিষ্ঠন্ত।"
২। বিদেহবাসী, বিদেহের রাজা, বিদেহ-বংশীয়—তিন অর্থই হইতে পারে। তবে পুরাণ-কাহিনীর মতে জনক বিদেহের রাজা।
৩। অর্থাৎ যজ্ঞসভায়। ৪। সম্ভবত পল, এখনকার ভরির মত।
৫। অর্থাৎ বচক্নুর কন্যা। ৬। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত।
* আদিত্য মানে যে প্রথম জন্মিয়াছে "অপত্য" শব্দ তুলনীয়।

"কাহাতে ইন্দ্রলোক ওত এবং প্রোত?"
"গার্গী, প্রজাপতিলোকসমূহে।"
"কাহাতে প্রজাপতিলোকসমূহ ওত এবং প্রোত?"
"গার্গী, ব্রহ্মলোকসমূহে।"
"কাহাতে ব্রহ্মলোকসমূহ ওত এবং প্রোত?"
তিনি বলিলেন, "গার্গী, অতিপ্রশ্ন[১] করিও না। তোমার মাথা যেন খসিয়া না পড়ে। অতি প্রশ্ন করা চলে না এমন দেবতাকে[২] অতিপ্রশ্ন করিতেছ। গার্গী, অতিপ্রশ্ন করিও না।"

তখন গার্গী বাচক্নবী চুপ করিয়া রহিলেন।

তখনও যাজ্ঞবল্ক্যের পরীক্ষা শেষ হইতে অনেক দেরি। গার্গীর পর উঠিলেন উদ্দালক আরুণি। উদ্দালকের পর আবার গার্গী উঠিলেন।

তাহার পর বাচক্নবী বলিলেন, "ভগবান্ ব্রাহ্মণেরা, এখন আমি ইঁহাকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। সে দুইটি যদি আমাকে বলেন তবে কখনই আপনাদের কেহ ইঁহাকে ব্রহ্ম-আলোচনায় জিতিতে পারিবেন না।" "বল গার্গী।"

শেষ প্রশ্নের উত্তর পাইয়া গার্গী এই বলিয়া বসিয়া পড়িলেন,

"ভগবান্ ব্রাহ্মণেরা, ইহাই প্রচুর মনে করিবেন যদি শুধু নমস্কার করিয়াই ইঁহার কাছে মুক্তি পান। আপনাদের কেহই ইঁহাকে কখনো ব্রহ্ম-আলোচনায় জিতিতে পারিবেন না।"

এখন পত্নীদ্বয়ের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রসঙ্গ অনুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি। এ কাহিনী অধুনা অনেকেরই জানা।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্যা ছিল, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। দুইজনের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিল, কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীবুদ্ধিসম্পন্না।[৩]

জীবন এখন অন্য পথে চালাইবেন স্থির করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "ওগো মৈত্রেয়ী, এই স্থান হইতে আমি চলিতে ইচ্ছুক।[৪] এখন তোমার আর কাত্যায়নীর (ভাগ) বাঁটোয়ারা করিয়া দিই।"

মৈত্রেয়ী বলিল, "যদি আমার কাছে এই...সর্বপৃথিবী বিত্তে পূর্ণ হয়, তাহার দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব কি পারিব না?"

(যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন, "না।..."

মৈত্রেয়ী বলিল, "যাহাতে আমি অমর হইতে পারিব না তাহা লইয়া আমি করিব কী।"

১। যে প্রশ্নের উত্তর হয় না অথবা যে প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকর্তায় জ্ঞানের সীমার বাহিরে তাহাই অতিপ্রশ্ন।

২। অর্থাৎ দেবত্ব বা পরমশক্তি বিষয়ে।

৩। "স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী"।

৪। অন্যত্র (৪,৪) আছে, "উদ্‌বাস্যন্ বা অরে অস্মাৎ স্থানাস্মি"। এখানে, "অন্যদ্ বৃত্তমুপাকরিষ্যম্", সম্ভবত শ্রামণ্য বা প্রব্রজ্যা।

মৈত্রেয়ীর কথায় প্রীত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাহাকে আত্মজ্ঞান উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বৃহদারণ্যকের বোধ করি সবচেয়ে ভালো আখ্যান-প্রস্তাব হইল দেব-মানুষ্য-অসুরের এক সঙ্গে পিতা প্রজাপতির পাঠশালায় পড়া।

তিন প্রজাপতিসন্তান পিতা প্রজাপতির কাছে ব্রহ্মচর্য বাস করিল—

দেবেরা মনুষ্যেরা অসুরেরা। ব্রহ্মচর্য বাস করিয়া দেবেরা বলিলেন, "আমাদের বলুন আপনি।" তাহাদের এই অক্ষরটি বলিলেন, "দ", "বুঝিলে?" "বুঝিলাম", "দমন কর',—আমাদের বলিলেন।" "হাঁ", বলিলেন, "বুঝিয়াছ।"

তাহার পর মনুষ্যেরা তাঁহাকে বলিল, "বলুন আমাদের আপনি।" তাহাদের এই অক্ষরটি বলিলেন—"দ", "বুঝিলে?" "বুঝিলাম", "দান কর'—আমাদের বলিলেন।" "হাঁ", বলিলেন, "বুঝিয়াছ"।

তাহার পর তাঁহাকে অসুরেরা বলিল, "আমাদের বলুন আপনি।" তাহাদের এই অক্ষরটি বলিলেন—"দ", "বুঝিলে?" "বুঝিলাম", "দয়া কর",—আমাদের বলিলেন।" "হাঁ", বলিলেন, "বুঝিয়াছ।"

তাই গর্জনকারী মেঘ এই দৈবী বাক্ আবৃত্তি করে দ দ দ ঃ দমন কর[১], দান কর[২], দয়া কর[৩]। অতএব এই তিনটি শিক্ষা করিবে—দম, দান, দয়া।

এই তিনটি হইল অমৃত পদ, উপনিষদের মতে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধচিন্তা-সংশোধিত "অমৃত পদ" এক গ্রীক বৈষ্ণবের নিবেদিত গরুড়স্তম্ভে (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে) উৎকীর্ণ আছে।[৪] সে হইল—দম ত্যাগ, অপ্রমাদ।

বৃহদারণ্যকে কিছু কিছু শ্লোক আছে, তাহার মধ্যে দুই একটি বাজসনেয়িসংহিতা-উপনিষদেও পাওয়া যায়। বাজসনেয়িসংহিতা-উপনিষদ্ এখন 'ঈশোপনিষদ্' নামে খ্যাত।[৫] উপনিষদটি অষ্টাদশ শ্লোকাত্মক।

বৃহদারণ্যকের শ্লোকের[৬] কিছু উদাহরণ দিতেছি।

> যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা
> তস্মিন্ সন্দেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।
> স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা।
> তস্য লোকঃ স তু লোক এব।।

'যাঁহার আত্মা অন্বেষণলব্ধ ও প্রতিবুদ্ধ হইয়াছে—
এই (বিনাশী) দেহে গহনে প্রবিষ্ট।
তিনি সব করিতে পারেন, তিনি সবকর্তা।
তাঁহারই লোক এবং তিনিই লোক।।'

> ইহৈব সন্তো অথ বিদ্মস্তদ্ বয়ং
> ন চেদবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।
> য এতদ্ বিদুরবমৃতাস্তে ভবন্তি
> ইতরে দুঃখমেবাভি যন্তি।।

১। "দাম্যত"। ২। "দত্ত" ৩। "দয়ধ্বম্"।

৪। প্রাচীন বিদিশায়, এখন সাঁচীয় নিকটবর্তী ভিলসায়।

৫। প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দ হইতে এই নাম, "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং" ইত্যাদি।

৬। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এগুলিকে "শ্লোক" বলা হইয়াছে "গাথা" নয়।

'এখানে থাকিয়াই আমরা তাহা জানিতে পারি।
যদি জানিতে না পারি তবে একবারে বিনাশ।
যাঁহারা ইহা বুঝেন তাঁহারা অমর হন।
আর অপরে[১] দুঃখেই প্রবিষ্ট হয়।''

সামবেদের অন্তর্গত 'তলবকার-উপনিষদ্' প্রথম শ্লোকের প্রথম পদ হইতে এখন 'কেন-উপনিষদ্' নামেই চলে। প্রথম শ্লোকটি এই,

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ পততি প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।।

'কাহার ইচ্ছায় মন প্রেরণায় ধাবিত হয়?
কাহার (নিয়োগে) স্ফুরণশীল প্রাণ ধাবিত হয়?
কাহার ইচ্ছায় (লোকে) এই বাগ্ ব্যবহার করে?
চক্ষু ও কর্ণ কোন্ দেবতা নিয়োগ করেন?'

এই প্রশ্ন দিয়া স্বল্পকায় কেন-উপনিষদের আরম্ভ। ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতে একটি রূপক-কাহিনী বলা হইয়াছে। সে কাহিনী অত্যন্ত চমৎকার। ইতিহাসের পক্ষেও খুব মূল্যবান্। ইহাতেই দেবী উমা হৈমবতীর প্রথম উল্লেখ পাইতেছি। পর্বতবাসিনী দেবী তখন ইন্দ্রের উপরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। দেবতাদের প্রধান ইন্দ্রও ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ। উমা ইন্দ্রকে ব্রহ্মের স্বরূপ জানাইয়াছিলেন। কাহিনীটির অনুবাদ দিই। (এই কাহিনীতে ব্রহ্মকে আধুনিক অর্থে পাইতেছি। তিনি নিরাকার এবং সাকারও।)

ব্রহ্ম দেবতাদের জিতাইয়া দিলেন। ব্রহ্মের সেই বিজয়ে দেবতারা মহীয়ান্ হইল। তাহারা বিবেচনা করিল, ''আমাদের এই বিজয়, আমাদেরই এই মহিমা।''

তিনি[২] ইহাদের (মনোভাব) জানিলেন, তাহাদের কাছে আবির্ভূত হইলেন। তাহা (দেবতারা) জানিতে পারিল না, (ভাবিল,) ''কী এ যক্ষ।''[৩]

তাহারা অগ্নিকে বলিল, ''হে জাতবেদস্[৪], ইহা জানিয়া আইস এ যক্ষ কী।'' ''বেশ'', (বলিয়া) তাঁহার[৫] দিকে (অগ্নি) গেল। তাহাকে (যক্ষ) বলিলেন, ''তুমিকে বট?'' ''আমি অগ্নি বটি'', বলিল, ''আমি জাতবেদস্ বটি।'' ''তা তোমাতে কী (বিশেষ) শক্তি''?[৬] ''এই যা কিছু পৃথিবীতে আছে সব দগ্ধ করিতে পারি।' তাহাকে (একগাছি) ঘাস দিলেন, (বলিলেন), 'ইহা দগ্ধ কর।'' সে দিকে[৭] (অগ্নি) গেল। সব শক্তি দিয়াও তাহা দগ্ধ করিতে পারিল না। সেখান হইতেই সে ফিরিয়া গেল, (বলিল,) 'সে যক্ষ কী তাহা জানিতে পারিলাম না।''

১। অর্থাৎ যাহারা বুঝে না।
২। ''তৎ'' অর্থাৎ ব্রহ্ম।
৩। ''কিমেৎ যক্ষম্''। এখানে যক্ষ শব্দের মানে স্পষ্ট নয়। টীকাকারেরা বলেন ''পূজনীয়''। ''আশ্চর্য আবির্ভাব'' অথবা ''অদ্ভুত দর্শন'' অর্থ ধরিলে ভালো হয়।
৪। অগ্নির এক নাম। অর্থ, জীবমাত্রে যাহার অধিকার। ৫। ব্রহ্মের।
৬। ''বীর্যং''। ৭। অর্থাৎ ঘাসের কাছে।

তখন (দেবতারা) বায়ুকে বলিল, "হে বায়ু, ইহা জানিয়া আইস, এ যক্ষ কী।" "বেশ", (বলিয়া) তাঁহার দিকে (বায়ু) গেল। তাহাকে (যক্ষ) বলিলেন, "কে তুমি বট?" "আমি বায়ু বটি", (সে) বলিল, "আমি মাতরিশ্বা[১] বটি।" তা তোমাতে কী (বিশেষ) শক্তি?" "এই যা কিছু পৃথিবীতে আছে তাহা সব টানিয়া গ্রহণ করিয়া লইতে পারি।" তাহাকে (একটি) ঘাস দিলেন, (বলিলেন,) "এটি টানিয়া লও।" সেদিকে গেল। সব শক্তি দিয়াও সেটি টানিয়া লইতে পারিল না। সে সেখান হইতেই ফিরিয়া গেল, (বলিল,) "সে যক্ষ কী তাহা জানিতে পারিলাম না।"

তাহার পর (দেবতারা) ইন্দ্রকে বলিল, "হে মঘবন্, জানিয়া আইস কী এ যক্ষ।" "বেশ", (বলিয়া ইন্দ্র) তাঁহার দিকে গেল। তাহার কাছ হইতে (যক্ষ) তিরোধান করিলেন।

সে[২] সেই আকাশেই নারীর সাক্ষাৎ পাইল, অত্যন্ত শোভাশালিনী উমা হৈমবতীর। তাঁহাকে (ইন্দ্র) বলিল, "কে এ যক্ষ?" তিনি বলিলেন, "ব্রহ্ম", "ব্রহ্মের এই বিজয়েই তোমরা মহীয়ান্ হইয়াছ।" তখন হইতে জানিল 'ব্রহ্ম' বলিয়া।

সেই জন্য এই দেবতারা অন্য দেবতাদের উপরে, যেহেতু অগ্নি বায়ু ইন্দ্র তাঁহারাই ইঁহাকে[৩] সবচেয়ে কাছ ঘেঁষিয়া যান, তাঁহারাই ইঁহাকে প্রথম জানিয়াছিলেন ব্রহ্ম বলিয়া।

সেই জন্য ইন্দ্রও অন্য দেবতাদের উপরে। তিনি ইঁহার সব চেয়ে কাছে ঘেঁষিয়াছেন। তিনি প্রথম ইঁহাকে জানিয়াছিলেন ব্রহ্ম বলিয়া।

'কঠ-উপনিষদ্' কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্গত। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির তুলনায় কঠ-উপনিষদ্ অর্বাচীন রচনা হইলেও ইহার বিশিষ্টতা আছে। প্রথম বিশিষ্টতা এই যে ইহা পুরাপুরি কাব্য, অর্থাৎ শ্লোকময়।[৪] দ্বিতীয় বিশিষ্টতা মুখবন্ধ কাহিনীটুকু। তৃতীয় বিশিষ্টতা, ইহার কয়েকটি শ্লোক প্রায় অপরিবর্তিত ভাবে ভগবদ্‌গীতায় স্থান পাইয়াছে। ভগবদ্‌গীতায় যে যোগের কথা আছে তাহার পূর্বাভাস কঠ-উপনিষদে রহিয়াছে। মুখবন্ধ-কাহিনীটুকুর অনুবাদ দিতেছি।

বাজশ্রবস্ কামনা করিয়া (যজ্ঞে) সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নচিকেতস্ নামে পুত্র ছিল। বালক হইলেও, যখন দক্ষিণা[৫] লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন (তাহার) চিত্তে শ্রদ্ধার আবেশ হইল। সে[৬] ভাবিল,

জল যাহারা (শেষ বারের মতো) পান করিয়াছে, ঘাস (যাহারা শেষ বারের মতো) খাইয়াছে, দুধ যাহাদের (শেষ বারের মতো) দোহা হইয়াছে, যাহাদের ইন্দ্রিয় বিকল হইয়াছে, এমন (গোরু) যে দান করে সে নিরানন্দ নামক যে সব স্থান[৭] সেখানে যায়।।

১। বায়ুর নাম। অর্থ অজ্ঞাত। ২। অর্থাৎ ইন্দ্র। ৩। অর্থাৎ ব্রহ্মকে।

৪। প্রথমে সামান্য কিঞ্চিৎ গদ্য আছে। কোথাও কোথাও শ্লোকের মাঝখানে গদ্যাংশ ছিল পরে বাদ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধগাথার সঙ্গে এ বিষয়ে কঠ-উপনিষদের কিছু মিল আছে।

৫। গোরু দক্ষিণা।

৬। অর্থাৎ নচিকেতস্ (প্রথমার এক বচনে নচিকেতাঃ)।

৭। নচিকেতসের কাল পূর্ণ হয় নাই, তাই তিনি যমের প্রজা নন। তিনি অতিথি।

সে পিতাকে বলিল, "বাবা, আমাকে দান করিবে কাহাকে?" দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার (বলিল)। তাহাকে (পিতা) বলিল, "মৃত্যুকে দিলাম তোমাকে।"

পিতার সত্যপালনের জন্য যমের দক্ষিণা হইয়া নচিকেতস্ যম বৈবস্বতের সদনে গেল। যম বাড়িতে ছিলেন না বলিয়া নচিকেতস্ অনভ্যর্থিত ভাবে যমদ্বারে উপবাসী ছিল। যম আসিলে তাঁহার পত্নী অথবা বাড়ির লোক বলিল, এখনি অতিথিকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শান্ত কর, কেন না যাহার ঘরে অতিথি উপবাসী থাকে তাহার আশা-ভরসা ধন-জন সহায়-সম্পত্তি সবই হরণ করিয়া লয়। শশব্যস্ত হইয়া যম নচিকেতস্‌কে অভ্যর্থনা ও পরিচর্যা করিয়া শেষে বলিলেন,

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসী র্গৃহে মে
অনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথি র্নমস্যঃ।
নমস্তে ইস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মে অস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব।।

'তিন রাত্রি যে আমার গৃহে বাস করিয়াছ না খাইয়া, হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমার অতিথি, নমস্য।—তোমাকে আমার নমস্কার, হে ব্রাহ্মণ, আমার যেন ভালো হয়।—তাহার বদলে তিনটি বর লও।।'

নচিকেতস্ বলিল, আমি প্রথম বর চাই এই যে আমার পিতা যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তুমি ছাড়িয়া দিলে আমি যখন ঘরে ফিরিয়া যাইব তখন যেন বিশ্বাস করিয়া আমাকে গ্রহণ করেন। যম বলিলেন, তথাস্তু।

নচিকেতস্ দ্বিতীয় বর চাহিল, স্বর্গসাধক অগ্নির তত্ত্বজ্ঞান। যম তাহাকে অগ্নিতত্ত্ব বুঝাইয়া শেষে বলিলেন যে অগ্নির তত্ত্ব যাহা তিনি প্রকট করিলেন, অতঃপর তাহা নচিকেতসের নামে বিদিত হইবে।

"নচিকেতস্, তুমি তৃতীয় বর চাও",—যম এই কথা বলিলে নচিকেতস্ উত্তর দিল,

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীতি একে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্ট স্তুয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।।

'মরিয়া গেলে মনুষ্যের মধ্যে এই যে সংশয়—
"আছে" অনেকে বলে, "নাই" অনেকে বলে,—
তোমার দ্বারা অনুশিষ্ট হইয়া এই (তত্ত্ব) যেন জানিতে পারি।
বরের মধ্যে এই তৃতীয় বর (আমি চাই)।।'

যম ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। "অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব", বলিয়া অনেক লোভ দেখাইয়া বালককে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। নচিকেতস্‌ও নাছোড়বান্দা "নান্যস্তস্মান্ নচিকেতা বৃণীতে।"[১] অবশেষে যমেরই পরাজয় হইল। যম বালককে গভীর তত্ত্বকথা শুনাইতে লাগিলেন। তাহাই কঠ-উপনিষদের বস্তু।

১। 'নচিকেতস্' নামটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,—"নাবুঝ, অবুঝ।"

তৈত্তিরীয়-উপনিষদও প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে পড়ে না। তবে মনে হয় ইহা কঠ-উপনিষদের আগে রচিত। ইহার বিশেষত্ব প্রধানত দুই বিষয়ে। এক, ছাঁটা ছাঁটা গদ্যে লেখা। এ গদ্যরীতিতে যেন পরবর্তী কালের সূত্র-রীতির পূর্বাভাস। দুই, ইহা অনূচান ব্রহ্মচারীদের (অর্থাৎ গুরুগৃহে থাকিয়া বেদ-অধ্যয়নকারী ছাত্রদের) ব্যবহার্য বিধিবিধান-নিবন্ধের মতো। কতকগুলি শ্লোকও আছে, তবে গদ্যের মতো করিয়া ভাঙ্গিয়া সাজানো। ব্রহ্মচর্যবাসের অন্তে শিষ্যকে গুরু যে সাংসারিক উপদেশ দিয়া বিদায় দিতেন সে অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।...মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি।...
>
> 'সত্য বল। ধর্মে চল। বেদপাঠে শৈথিল্য করিও না। আচার্যকে মনোমত ধন আনিয়া দিয়া বংশধারা অবিচ্ছিন্ন রাখ।[১] সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না। ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইও না। দক্ষতা হইতে ভ্রষ্ট হইও না। কল্যাণ হইতে ভ্রষ্ট হইও না।...মাতা দেবতা হোক।[২] পিতা দেবতা হোক। আচার্য দেবতা হোক। অতিথি দেবতা হোক। যে সব অনিন্দনীয় কর্ম সেগুলি আচরণ করিতে হইবে। অন্যগুলি[৩] নয়। যেগুলি আমাদের[৪] ভালো ব্যবহার সেগুলি তুমি স্মরণে রাখিবে। অন্যগুলি[৫] নয়।...'

১। অর্থাৎ বিবাহ করিয়া সংসারী হও।
২। অর্থাৎ দেবতার মতো ভক্তি ও সেবা কর।
৩। অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম।
৪। অর্থাৎ গুরুর ও গুরুকুলের।
৫। অর্থাৎ নিষ্ঠুর ব্যবহার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিক সাহিত্যের ঠিক পরে

বৈদিক সাহিত্যের যেখানে শেষ, লৌকিক সাহিত্যের সেখানে আরম্ভ।[১] ঠিক আরম্ভ নয়, প্রকাশ। লৌকিক সাহিত্যের বস্তুবীজ ঋগ্‌বেদে কিছু ছিল। সে বীজ অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়া গেলেও কিছু কিছু লৌকিক সাহিত্যে উপচিত হইয়া পরবর্তী কালের সাহিত্যে ফলবান্ হইয়াছিল। কোন কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থেও লৌকিক সাহিত্যের অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল। তাহা পূর্বে যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

লৌকিক সাহিত্যের যে রূপ-(form) বীজ ঋগ্‌বেদ হইতে সরাসরি আসিয়াছিল সে হইল "গাথা"। এ শব্দটি খুব পুরানো, আবেস্তায় আছে। সুতরাং ভারতীয় আর্যেরা শব্দটিকে তাঁহাদের অভিজন ইরান হইতে আনিয়াছিলেন। গাথা মানে ছিল প্রথমে "গান" অর্থাৎ গেয় ছন্দোবদ্ধ রচনা। তাহার পরে মানে হইল, পূর্বাগত গেয় অথবা বাচনীয় ছন্দোবদ্ধ রচনা। এ রচনার সাধারণত মন্ত্রমূল্য ছিল না, গার্হস্থ্য উৎসবে ও যজ্ঞকাণ্ডের বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানে গান কিংবা আবৃত্তি করা হইত। বৈদিক সাহিত্যে যে সব লৌকিক আখ্যায়িকা অথবা অন্য প্রসঙ্গ পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছিল সেগুলি গাথার আধারেই সম্পুটিত ছিল।

ব্রাহ্মণের পরে আর গাথার উল্লেখ পাই না। ব্রাহ্মণে গাথা ও শ্লোক দুইরকমেরই লৌকিক কবিতা উদ্ধৃত আছে। উপনিষদে কেবল শ্লোক, গাথা নাই। সংস্কৃত সাহিত্যেও শ্লোক, গাথা নাই। ব্রাহ্মণের পরে গাথা পাই বৌদ্ধ-সাহিত্যে,—পালিতে এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃতে। তাহার পর প্রাকৃতে।[২] ইহা হইতে এমন অনুমান করা যায় যে ভারতীয় সাহিত্যের শিষ্ট শাখা উপনিষদের পরে হইতে সংস্কৃতের (অর্থাৎ সমসাময়িক শিষ্ট ভাষার) দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই সময় হইতেই শিষ্ট (অর্থাৎ বেদ ও বেদাশ্রিত তত্ত্বময়) ও লৌকিক এই দুই ভাগে ভারতীয় সাহিত্য বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। শিষ্ট সাহিত্যে অতঃপর ব্রাহ্মণের বিবিধ বিদ্যার "সূত্র" অর্থাৎ কড়চা বই (handbook) রচনা হইতে থাকে। তখন লিপিজ্ঞান অবশ্যই ছিল। কিন্তু বেদের বস্তু লিপিতে ন্যস্ত হইত না। সে বস্তু ব্রাহ্মণের মুখে মুখেই রচিত, রক্ষিত ও প্রচারিত হইত। সেইজন্য অর্থাৎ মুখস্থ করিবার পক্ষে সহজ হইবে বলিয়া সূত্রগ্রন্থগুলির বাক্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইত। (এই রীতির গোড়াকার নমুনা তৈত্তিরীয়-উপনিষদ হইতে দিয়াছি।) গার্হস্থ্য বিধির জন্য 'গৃহ্যসূত্র', যজ্ঞবিধির জন্য 'শ্রৌতসূত্র' এবং সমাজ ও নীতিবিধানের জন্য 'ধর্মসূত্র' রচিত হইল। ব্রাহ্মণেরা তখন ঋক্ সাম যজুঃ (ও অথর্ব) বেদের বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। সে সব

১। বৈদিক সাহিত্যের অব্যবহিত পরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার রচনাগুলিকে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে ধরা হয়। তখনকার সাহিত্যের ভাষা পরবর্তী কালের মত সমরূপ (uniform) অর্থাৎ একমাত্র পাণিনি-শাসিত রূপেই দৃশ্যমান নয়। 'সংস্কৃত' নামটিও তখন সৃষ্ট হয় নাই। এ নাম খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিত প্রমাণ নাই। (রামায়ণে আছে, কিন্তু রামায়ণের বর্তমান আকার যে খ্রীষ্টপূর্বাব্দের তাহা প্রমাণিত নয়।)

২। প্রাকৃতে 'গাথা' নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হইয়া সংস্কৃতের গৈ-ধাতুকে বহিষ্কৃত করিয়াছিল।

শাখা-প্রশাখায় বেদবিধি যথাসম্ভব নিষ্ঠার সহিত পালিত হইত। তাঁহারা নিজের নিজের সম্প্রদায় অনুসারে সূত্রগ্রন্থ রচনা করিতেন। এইজন্য নানা নামে সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায়।

বেদবাণী রক্ষা করিবার জন্য বেদবিদ্যায় যাহাতে অপ্রমাদ না ঘটে সে কারণ ব্যাকরণচর্চাও সেই সঙ্গে শুরু হইয়াছিল। বেদের উচ্চারণ নির্দেশকসূত্রগুলি রচিত হইল 'শিক্ষাসূত্র' নামে। ইহাই আমাদের দেশে রীতিমত ব্যাকরণ চর্চার প্রথম নিদর্শন। ব্যাকরণসূত্রও কয়েকটি লেখা হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাকরণসূত্র কি নামে পরিচিত ছিল তাহা আমরা জানি না। এমন কি পাণিনির ব্যাকরণসূত্র যাহাতে "সূত্র" সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহারও কোন নাম নাই। পাণিনি কিন্তু তাঁহার সূত্রাবলির মধ্যে কয়েকজন পূর্ববর্তী বৈয়াকরণের ব্যাকরণবিধির উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণসূত্র সংখ্যায় চার হাজারের কিছু বেশি। আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া ইহা "অষ্টাধ্যায়ী" নামে খ্যাত। রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া মনে হয়। পাণিনি শালাতুর গ্রামের[১] নিবাসী, এবং তাঁহার মায়ের নাম দাক্ষী।—এই কথা পাণিনির প্রধান ব্যাখ্যাকার পতঞ্জলি[২] বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে পাণিনির যশ অল্পবয়সেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পাণিনির সূত্র হইতে তাঁহার সময়ের লৌকিক সাহিত্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার প্রায় দুইশত বছর পরে আবির্ভূত পতঞ্জলির মহাভাষ্যে তখনকার লৌকিক সাহিত্যের বিষয়ে অনেক মূল্যবান টুকরা খবর পাওয়া যায়। প্রধানত পতঞ্জলির উল্লেখ ও উদ্ধৃতি হইতেই খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ হইতে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত কালে—যেকালে পাণিনি-শাসিত অতি-শিষ্ট ভাষায় সাহিত্য প্রথম রচিত হইতেছিল তাহার এবং তৎকালে প্রচলিত পাণিনি-অননুশাসিত ও কথ্যঘেঁষা অনতিশিষ্ট ভাষার—সাহিত্যের কিছু নমুনা আমরা পাইয়াছি। ব্যাকরণ দর্শন ইত্যাদি ও মহাভারতের কোন কোন আখ্যান ছাড়া এই সময়ে—খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ হইতে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃতে লেখা এমন কোন গ্রন্থের হদিস পাই নাই যাহাকে "সাহিত্য" বলিতে পারি।

পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' পাণিনি-ব্যাকরণের সর্বাপেক্ষা পুরানো এবং সবচেয়ে মূল্যবান ব্যাখ্যাগ্রন্থ। পাণিনির সূত্রে সিদ্ধ হয় না এমন কিছু কিছু শব্দ ও পদের সিদ্ধির জন্য পাণিনির পরবর্তী কালে এক বড় বৈয়াকরণ কাত্যায়ন কতকগুলি নূতন সূত্র রচনা করেন। এই নূতন সূত্রগুলিকে বলে 'বার্তিক-সূত্র'। ক্যাতায়নের সূত্রও পতঞ্জলি তাঁহার ভাষ্যে আলোচনা করিয়াছেন। এই তিনি জন—পাণিনি কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি—সংস্কৃত বৈয়াকরণের সর্বমান্য "ত্রিমুনি" বা ত্রিশরণ।

পতঞ্জলির গ্রন্থে তাঁহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তিনি যেভাবে পুষ্যমিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তিনি পাটলিপুত্রের সম্রাট পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যে পূর্বভারতের অধিবাসী ছিলেন তাহাও অনুমান করা যায়।

আধুনিক অর্থে "কাব্য" শব্দ পতঞ্জলির একটি উদাহরণে প্রথম পাওয়া গেল। অবশ্য কবির সৃষ্টি অর্থে শব্দটি অথর্ববেদে আছে, "পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি।" কিন্তু সেখানে "কবি" এখনকার অর্থে ব্যবহৃত নয়, সেখানে শব্দটি মূল অর্থে ধরিতে হইবে—"আশ্চর্য-কৌশলী ও তুরীয়-প্রজ্ঞাবান্।" পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "বাররুচং কাব্যম্" অর্থাৎ বররুচি প্রণীত কাব্য। তবে এ কাব্য এই নামটুকুতেই পর্যবসিত। হয়ত পতঞ্জলির উদ্ধৃত কোন কোন শ্লোক এই কাব্য থেকে নেওয়া। কিন্তু তাহা নির্দেশ করিবার উপায় নাই।

১। এই গ্রাম পেশোয়ার অঞ্চলে ছিল বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।

২। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। পরে দ্রষ্টব্য।

বৈদিক সাহিত্যে আমরা আখ্যান-আখ্যায়িকা পাইয়াছি। এমন অনেক আখ্যান-আখ্যায়িকা ছিল যাহা বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছিল কিন্তু কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। আখ্যান-আখ্যায়িকা বলা তখন বৃত্তি বা পেশায় পরিণত হইয়াছিল (প্রাচীন ইউরোপের rhapsodyদের মতো)। কাত্যায়নের একটি সূত্রে আখ্যান-আখ্যায়িকা-কথন-পটুত্বের প্রথম উল্লেখ পাই। কাত্যায়নের সূত্রে আখ্যান-আখ্যায়িকার সঙ্গে ইতিহাস-পুরাণেরও উল্লেখ আছে। (ইতিহাস পুরাণের উল্লেখ ব্রাহ্মণে উপনিষদেও পাওয়া গিয়াছিল।) পতঞ্জলি এই সূত্রের উদাহরণে তাঁহার সময়ে সুপ্রচলিত কয়েকটি আখ্যান-আখ্যায়িকার নাম করিয়াছেন। যেমন, আখ্যান (নায়ক-নামে) : যবক্রীত, প্রিয়ঙ্গু, যযতি। আখ্যায়িকা (নায়িকা-নামে) : বাসবদত্তা।

ইহার মধ্যে পরবর্তী কালে যযাতি-আখ্যান মহাভারতের মধ্যে মিলিয়াছে, বাসবদত্তা-আখ্যায়িকা প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে গাথা কাব্য ও নাটক আকারে পুনর্বিন্যস্ত হইয়াছে।

পতঞ্জলি একটি ক্ষুদ্র আখ্যান-গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক গল্পটি বুঝিয়া লওয়া কঠিন নয়।

যস্মিন্ দশ সহস্রাণি পুত্রে জাতে গবাং দদৌ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রিয়াখ্যেভ্যঃ সোঽয়মুঞ্ছেন জীবতি।।

'যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে (পিতা) দশ হাজার গোরু দিয়াছিলেন আশীর্বাদক ব্রাহ্মণদের, এই সে (এখন) উঞ্ছবৃত্তি করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে।'

কালিদাসের সময়েও আখ্যান-আখ্যায়িকার খুব চলন ছিল জানপদ সাহিত্যে। তাঁহার সময়ে আখ্যান-আখ্যায়িকার সাধারণ নাম ছিল "কথা"। উদয়ন-বাসবদত্তার গল্প আখ্যান-আখ্যায়িকা (অর্থাৎ "গাথা" রূপে) কালিদাসের কালে সুপরিচিত ছিল। মেঘদূতে অবন্তীর প্রসঙ্গে তাঁহার এই উক্তি স্মরণ করি, "প্রাপ্যাবন্তীন্ উদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্..."।

পতঞ্জলির উদ্ধৃত উদাহরণগুলি হইতে বুঝিতে পারি যে তখনই সংস্কৃতকাব্যের পরিচিত ছন্দোরীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বৈদিক অনুষ্টুপ্-জাত শ্লোক তো ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেই সংস্কৃতের মসৃণতা পাইয়াছিল। উপনিষদের কালে ত্রিষ্টুপ্ হইতে ইন্দ্রবজ্রা-উপেন্দ্রবজ্রা-উপজাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। পতঞ্জলির উদ্ধৃতিতে জগতীজাত বংশস্থ পাই। সংস্কৃতের আরও কয়েকটি বিশিষ্ট ছন্দও (যেমন প্রমিতাক্ষরা, প্রহর্ষিণী, মালতী ও বসন্ততিলক) পতঞ্জলির সময় চলিত হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণলীলা এবং কুরুপাণ্ডব কাহিনীবিজড়িত রচনা হইতে পতঞ্জলির এই উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত।

সংকর্ষণদ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্ধতাম্।।
'সংকর্ষণ[১]—সহায় কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি হোক।'

জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ।।
'কংসকে বধ করিলেন কৃষ্ণ।'

অসিদ্বিতীয়োনুসসার পাণ্ডবম্।।
'অসি সহায় করিয়া (তিনি) পাণ্ডবকে অনুসরণ করিলেন।'

এখানে পাণ্ডবের নাম পাইলাম। কুরু নামও পাইতেছি।

১। বলরামের এক নাম।

ধর্মেণ স্ম কুরবো যুধ্যন্তে।।
'কুরুরা ধর্মত যুদ্ধ করিতেছে।'

কবিতাছত্র-উদ্ধৃতির মধ্যে একটি খুব চমৎকার,

স্মরতি বনগুল্মস্য কোকিলঃ।।
'(পোষা) কোকিল বনকুঞ্জের কথা স্মরণ করিতেছে।'

নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি হয়ত রাম-কাহিনী হইতে উদ্ধৃত নয়, কোন দ্বিসংলাপ নীতিকথা-গাথা (—বৌদ্ধ সাহিত্যের জাতকের মতো—) হইতে লওয়া সম্ভব।

বহূনামপ্যচিত্তানামেকো ভবতি চিত্তবান্।
পশ্য বানরসৈন্যেঽস্মিন্ যদর্কমুপতিষ্ঠতে।।
মৈবং মংস্থাঃ সচিত্তোঽয়মেষহপি হি যথা বয়ম্।
এতদপ্যস্য কাপেয়ং যদর্কমুপতিষ্ঠতি।।

'অনেক নির্বোধের মধ্যেও একজন বুদ্ধিমান্ থাকে।
'দেখ, এই বানর সৈন্যের মধ্যে যেহেতু (এ) সূর্য উপাসনা করিতেছে।।
'এমন ভাবিও না যে এ বুদ্ধিমান্। এ যেমন আমরা তেমনিই।
ইহাও ইহার বানর-স্বভাব, তাই সূর্যের দিকে (মুখ করিয়া) আছে।।'

জনসমাজের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে আহৃত সদুক্তি শ্লোকও দুই চারিটি মহাভাষ্যে উদ্ধৃত আছে। যেমন,

বাতায় কপিলা বিদ্যুদাতপায়াতিলোহিনী।
পীতা ভবতি বর্ষায় দুর্ভিক্ষায় সিতা ভবেৎ।।

'কটা রঙের বিদ্যুৎ ঝড়, অতিশয় রক্তবর্ণ (বিদ্যুৎ) খরা,
পীতবর্ণের (বিদ্যুৎ) বর্ষা, সাদা বিদ্যুৎ দুর্ভিক্ষ সূচনা করে।।'

চাণক্যশ্লোকের মতো শিক্ষা-শ্লোকও আছে। যেমন,

সামৃতৈঃ পাণিভির্ঘ্নন্তি গুরবো ন বিষোক্ষিতৈঃ।
লালনাশ্রয়িনো দোষাস্তাড়নাশ্রয়িণো গুণাঃ।।

'অমৃতময় হাতে গুরুরা আঘাত করেন বিষময় (হাতে) নয়। [১]
লালনে বহু দোষ জোটে, তাড়নে বহু গুণ।। [২]

সুসূক্ষ্মজটকেশেন সুনতাজিনবাসসা।
সমন্তশিতিরন্ধ্রেণ দ্বয়োর্বৃত্তৌ ন সিধ্যতি।।

'অতিশয় সূক্ষ্ম জটাযুক্ত কেশ, অত্যন্ত কোমল চর্মবসন, সীমন্তে সিঁথির গর্ত—দুটি ব্যাপারে মিল হয় না।
দুই কর্ণকুহর শাদা, (এই) হেতু (?) দুইটি বৃত্তিতে খাপ খায় না।।'

অহরহর্নয়মানো গামশ্বং পুরুষং পশুম্।
বৈবস্বতো ন তৃপ্যতি সুরায়া ইব দুর্মদী।।

'প্রত্যহ গোরু ঘোড়া মানুষ পশু লইয়া গিয়াও
যম তৃপ্তি পায় না, যেমন মদখোর মদে।।'

১। অর্থাৎ গুরুর প্রহার প্রহার নয়, উপহার।
২। দ্বিতীয়ার্ধ চাণক্যশ্লোকে পুনরাবৃত্ত।

সেকালেও বেদ-অবিশ্বাসীর অভাব ছিল না, এবং তাহাদের মধ্যে শিষ্ট ব্যক্তিও ছিল। পতঞ্জলি এই লোকায়তিকদের কবিতাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ ধরনের কবিতাকে পতঞ্জলি বলিয়াছেন 'ভ্রাজ' ("ভ্রাজাঃ শ্লোকাঃ") অর্থাৎ চুটকি (হিন্দী "ফুটকল") ছড়া।

যদুদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাং মণ্ডলং মহৎ।
পীতং ন গময়েৎ স্বর্গং কিং তৎ ক্রতুগতং নয়েৎ।।

'বড় মণ্ডল করিয়া সাজানো ঘটী ঘটী ডুমুর-রঙা (মদ) পান করিলেও যদি তা স্বর্গে না লইয়া যায়, তবে কি তা যজ্ঞে ঢালিলে লইয়া যাইবে?'

মনে হয় বেদের সময়ে সংলাপময় আখ্যান-গাথা অভিনয়ের ধরণে গীত ও আবৃত্তি করা হইত। যে সব গাথায় বীরকর্মের উল্লেখ থাকিত ("নারাশংসী গাথা") তাহাতে আখ্যাতা সেকালের দেবতা অথবা মানুষ বীরের সাজ করিত। এই দুই ধরণের "অভিনয়"ই নৃৎ-ধাতুর দ্বারা ব্যক্ত হইত, এবং এই রকম অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ঋগ্‌বেদের সময়ে বলিত "নৃতু"। পরবর্তী সময়ে, মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় প্রথম পদক্ষেপ কালে নৃৎ-ধাতুর দুইটি রূপ দাঁড়াইয়া যায়, "নট" (< নৃত্যতি) আর "নচ্চ" (< * নৃততি)[১] এবং এই দুই রূপের যে দুইটি পৃথক অর্থ উৎপন্ন হইল তাহা সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে গৃহীত হইল। সংস্কৃতে 'নটতি' মানে অভিনয় করে, "নট" মানে অভিনেতা, আর "নৃত্যতি" মানে নাচে "নৃত্য" মানে নাচ। "নাটক" শব্দ ও নাটক-বস্তু তখনো সৃষ্ট হয় নাই।

তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রসঙ্গে পাণিনির একটি সূত্রে নটসূত্রের উল্লেখ আছে, "পালাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ (৪. ৩. ১১০)।" সূত্রটির এই ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দেওয়া হয়,

পারাশর্য ও শিলালি শব্দ দুইটিতে ণিনি প্রত্যয় হয় ভিক্ষুসূত্র ও নটসূত্র অধ্যয়নকারী বুঝাইলে। যেমন "পারাশরীণো ভিক্ষবঃ", "শৈলালিনো নটাঃ"।[২]

এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লইলে পাণিনির সময়ে নটদের শাস্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পণ্ডিতেরাও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সন্দেহাতীত নয়। "ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" বলিতে পাণিনি ভিক্ষুসূত্র ও নটসূত্র না বুঝাইয়া ভিক্ষু ও নটসূত্র বুঝাইতেও পারেন। তা যদি হয় তবে "পারাশরিন্" মানে পারাশর মতের ভিক্ষু, আর "শৈলালিন্" মানে নটের সূত্র। এ সূত্র যে কী, শাস্ত্র-সূত্র না পুতুল নাচাইবার সুতা, তাহাও নিশ্চয় করা যায় না। তবে পরবর্তী কালে উদ্ভূত সংস্কৃত নাটকে নাট্যাধিকারীর নাম "সূত্রধার"[৩] হওয়াতে শেষের অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়।

১। "নট" শব্দে এই ব্যুৎপত্তি সন্দেহাতীত নয়—"নৃততি"—এই রকম (তুদাদিগণীয়) পদ পাওয়া যায় নাই। এক বিশেষজ্ঞ (F. B. J Quiper) শব্দটির উৎপত্তি অন্-আর্য ভাষা হইতে সম্ভব বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে সংস্কৃত "নটতি" পদের অর্থ নাড়ে, যাহা হইতে বাংলায় "নড়া" আগত। এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিলে পুতুলনাচ হইতে নাটকের উৎপত্তি কল্পনার পক্ষে নূতন একটা যুক্তি মিলে। মদীয় 'নট নাট্য নাটক' দ্রষ্টব্য।

২। পতঞ্জলি এ ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন, 'কথং পারাশরিণো ভিক্ষবঃ শৈলালিনো নটাঃ।"

৩। যিনি সুতা ধরিয়া থাকেন। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে যাহারা দড়িটানা পুতুলনাচ দেখিয়াছেন তাঁহারা সূত্রধার নামের মর্ম বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহার সময়ে লোকচিত্তবিনোদনের যে সব সাহিত্যআশ্রিত ব্যবস্থা ছিল পতঞ্জলি তাহার কিছু নির্দেশ দিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই বিষয়ে পতঞ্জলির উক্তি অত্যন্ত মূল্যবান্। আখ্যান-আখ্যায়িকা বলা (অথবা গাওয়া) তখন বিশেষজ্ঞের অধিকারে আসিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে সকলের না হোক কাহারও কাহারও ইহা জীবিকা ছিল। এই হইল এক ধরনের বিনোদন। আর এক ধরনের বিনোদন ছিল ইতিহাস-পুরাণ পাঠ। এ কাজ যাঁহারা করিতেন তাঁহাদের পতঞ্জলি "গ্রন্থিক"[১] বলিয়াছেন। ইঁহাদের প্রাচীনতর নাম "ঐতিহাসিক" ও "পৌরাণিক"।

তৃতীয় এক শ্রেণীর বিনোদনেরও উল্লেখ আছে কিন্তু তাহার নাম কী তাহা পতঞ্জলি বলেন নাই। যাহারা এ কাজ করিত তাহাদের বলিয়াছেন "শৌভনিক"[২] অর্থাৎ যাহারা বিচিত্র সাজ পরিয়া নিজেকে শোভিত করে। ইহারা যে অভিনেতা তাহা পতঞ্জলির বর্ণনা হইতে বোঝা যায়। অতীত ঘটনার বর্ণনায় বর্তমানকালের প্রয়োগ বুঝাইতে গিয়া পতঞ্জলি বলিতেছেন,

> এই যাহাদের শৌভনিক নাম এরা প্রত্যক্ষ কংসকে হত্যা করায় এবং প্রত্যক্ষ বলিকে বন্দী করায় যদিও কংস কত কাল আগে হত এবং বলি কত কাল আগে বন্দী (হইয়াছিল)। (তাহা হইলে) কি করিয়া?[৩] চিত্র সকলেও[৪] উঠা ও পড়া দেখা যায়, কংসকে টানাটানিও। কেহ কেহ কংসের দলে কেহ কেহ বাসুদেবের দলে দেখা যায়। (শৌভনিকেরা) বর্ণের ভিন্নতাও গ্রহণ করে। কেহ কেহ রক্তমুখ হয় কেহ কেহ কালমুখ।[৫]

তাহার পরে পতঞ্জলি যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে এখনকার যাত্রাগান-শ্রোতা দর্শকের কথা মনে পড়ায়।

> যাও, কংসকে মারা হইতেছে। যাও. কংসকে (এবার) মারা হইবে। (আর) গিয়া কি হইবে? কংসকে মারা হইয়া গিয়াছে।

উপনিষদের ভাষণরীতি হইতে সূত্ররীতি উদ্ভুত হইয়াছিল। উপনিষদের নিজস্ব রীতি কিন্তু লুপ্ত হয় নাই। পতঞ্জলির রচনায় তাহার পরিণতি লক্ষ্য করি। এ ভাষা যেমন তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট তেমনি সুমিত ও সরস-উজ্জ্বল।

পাণিনির অন্য একটি সূত্রের পতঞ্জলির প্রশ্নোত্তরময় রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

> "অনিরবসিতানাম্"[৬] বলা হইতেছে। কোথা হইতে অনিরবসিতদের? আর্যাবর্ত হইতে অনিরবসিতদের।
>
> কিন্তু আর্যাবর্ত কী?
>
> আদর্শের পূর্বে কালকবনের পশ্চিমে হিমালয়ের দক্ষিণে পারিযাত্রের উত্তরে।
>
> তাই যদি হয় তবে "কিষ্কিন্ধগন্দিকম্" "শকযবনম্" "শৌর্যক্রৌঞ্চম্" তো সিদ্ধ হয় না।

১। এখনকার কথকের পূর্বপুরুষ।

২। ইহারই সম্পার্কিত "শৌভিক" শব্দ হইতে আমি আধুনিক "ছউ" (বা "ছো") নাচের ব্যুৎপত্তি কল্পনা করি। পতঞ্জলি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এখনকার ছউ নাচের পক্ষে পুরাপুরি খাটে।

৩। এখানে স্পষ্টতই পুতুলনাচের নির্দেশ।

৪। এখানে "চিত্র শব্দের অর্থ (প্রতিমা-পুত্তলিকা, প্রতিমূর্তি) ধরিতে হইতে।

৫। এখনও ছউ নাচে এই রকম। যবদ্বীপের নাচেও তাই।

৬। পাণিনি-সূত্র, "শূদ্রাণামনিরবসিতানাম্" (২. ৪. ১০)।

ঠিক। তাহা হইলে আর্যনিবাস হইতে অনিরবসিতদের। কিন্তু আর্যনিবাস কি?
গ্রাম ঘোষ নগর সংবাহ—এই।
তাহা হইলে এই যে সব বড় বসতি সেগুলির মধ্যে চণ্ডাল ও শবপ্রহরী বাস করে।
সেখানে "চণ্ডালমৃতপাঃ" তো খাটে না।
ঠিক। তাহা হইলে যজ্ঞীয় কর্ম হইতে অনিরবসিতদের।
তাহা হইলে "তক্ষায়স্কারম্" "রজকতন্তুবায়ম্"—ইহাও খাটে না।
ঠিক। তাহা হইলে (ভোজন-) পাত্র হইতে অনিরবসিতদের। যাহারা ভোজন করিলে পর (ভোজন-) পাত্র ধোওয়া মাজায়-শুদ্ধ হয় তাহারা অনিরবসিত, যাহারা ভোজন করিলে পর (ভোজন-) পাত্র ধুইলে মুছিলেও শুদ্ধ হয় না তাহারা নিরবসিত।।

আর একটি সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পতঞ্জলি একটি ছোট গল্প বলিয়াছেন তাঁহার নিজস্ব স্টাইলে। গল্পটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বাংলা দেশের ছোট (অবিবাহিত) মেয়েদের মধ্যে ইতুপূজার ব্রত চিরকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এই কাহিনীতে সেই পূজার প্রাচীনতম নজীর পাইতেছি, এবং ইতু যে "ইঁদু" হইয়া "ইন্দ্র" হইতে আসিয়াছে এই অনুমানেরও নিশ্চিত প্রমাণ পাইতেছি। পতঞ্জলি-র উক্তির অনুবাদ দিতেছি।

অথবা বৃদ্ধকুমারী[১] বাক্যের মতো লইতে হইবে। সে যেমন—
বৃদ্ধকুমারীকে ইন্দ্র বলিলেন, "বর নাও।"
সে বর চাহিল, "পুত্রেরা আমার যেন কাঁসার থালায় প্রচুর দুগ্ধঘৃতযুক্ত অন্ন খাইতে পায়।"
তাহার তো পতিই নাই, কোথায় পুত্রেরা, কোথায় গোরু, কোথায় ধন। এখানে তাহার এক কথায় পতি একাধিক পুত্র গোরু ধন ইত্যাদি সব পাওয়া হইল।

প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যমস্তর।

ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন সাহিত্যের আবহমান ইতিহাসে তিনটি স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরভেদ এতই সুস্পষ্ট, যে ভাষা, বস্তু এবং রচনাশৈলী বিবেচনা করিলে স্তরভেদ বিচ্ছিন্নতার মতো বোধ হয়। প্রথম স্তরভেদ বৈদিক সাহিত্য, অন্ত্যস্তরভেদ সংস্কৃত সাহিত্য আর মধ্যমস্তরভেদ পৌরাণিক সাহিত্য। ঠিক মতো বলিতে গেলে মধ্যমস্তরের নাম দিতে হয় "ইতিহাস পুরাণম্" সাহিত্য। এই বাক্যটি দিয়া ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদে অনেক প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইয়াছে। এটি একটি বাক্য। মানে হইল "এইরকমই ছিল পুরাকালিক (ব্যাপার)।" বাক্যটি অনতিবিলম্বে ঘন সন্নিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় "ইতিহাসপুরাণম্।" কিছুকাল পরে এই বাক্য শব্দটি বিচ্ছিন্ন হইয়া দুটি পৃথক শব্দে পরিণত হয়—'ইতিহাস' এবং 'পুরাণ'। প্রথম শব্দটির অর্থ হইল অতীতের ঘটনা আর দ্বিতীয় শব্দটির মানে হইল পুরাকালের ঘটনা অর্থাৎ জনশ্রুতি। এই পার্থক্য কিন্তু পৌরাণিক সাহিত্যে স্পষ্ট নয়। অধিকাংশ পৌরাণিক রচনাতেই ইতিহাস তলাইয়া গিয়া পুরাণকেই জাঁকাইয়া তুলিয়াছে।

১। যে কন্যা দীর্ঘকাল অবিবাহিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় "থুবড়ো আইবুড়ো মেয়ে।" ঋগ্‌বেদের অপালার কথা এই সঙ্গে মনে আসে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রামায়ণ

ইতিহাস-পুরাণ শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইতেছে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। এ দুটি আমাদের ঐতিহ্য সমর্থিত জাতীয় মহাকাব্য। মহাকাব্যদ্বয়ের মধ্যে রামায়ণই প্রাচীনতর। তবে ইহার মধ্যে "ইতিহাস"-এর অপেক্ষা "পুরাণ"-এর উপাদান এত বেশি যে কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের টুকরাগুলি আবিষ্কার করা দুরূহ গবেষণা সাপেক্ষ।

রামায়ণের যে মূল রূপ ছিল তাহাতেই রাম-কথা প্রথম রচিত হইয়াছিল। এই কাহিনীর আগে আমাদের দেশে এমন কোন আখ্যায়িকা, গাথা বা কাব্য, বিরচিত হয় নাই যাহার বিষয় অর্থাৎ গল্প অপরিচিতপূর্ব। অর্থাৎ এই মূল রামায়ণের আগে কোন আখ্যায়িকা-গাথার (কিংবা কাব্যের) বিষয় রচয়িতার স্বকল্পিত (অর্থাৎ মৌলিক) ছিল না। তখনকার দিনে এরকম সব রচনাতেই পরম্পরাগত উপাখ্যান অবলম্বিত হইত। বাল্মীকির প্রতিভাই প্রথম মৌলিক "কাব্য" সম্ভাবিত করিয়াছিল। মৌলিক বলিতেছি গাঁথনির দিক দিয়া কাহিনীর উপাদানগুলি নানা স্থানের ও নানা সময়ের বিবিধ গল্পকথা হইতে স্বাভাবিকভাবে সংকলিত হইয়াছিল। এই জন্যই বাল্মীকি "আদি কবি", তাঁহার রচনা "আদি কাব্য"। বাল্মীকির আগে লেখা অনেক শ্লোক তো পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেগুলি পরম্পরাগত ছিল বলিয়া অথবা সেগুলির রচয়িতার নাম জানা ছিল না বলিয়াই সেগুলিকে "কাব্য" (অর্থাৎ কোন কবির অদ্ভুত সৃষ্টি) বলা হয় নাই। এইখানে মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাগিতেছে। লিপিব্যবহার চলিত হইবার পরেই কি বাল্মীকি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন? বৈদিক সাহিত্যের মতো বাল্মীকির কাব্য কি মুখে মুখে ধারাবাহিত হয় নাই? প্রথম হইতেই সে রচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল? মহাভারতের সঙ্গে তুলনাও এখানে মনে পড়িতেছে। মহাভারত হইল সংহিতা অর্থাৎ আখ্যান-আখ্যায়িকার সমষ্টি, এবং সেগুলি ব্যাস রচনা করেন নাই, জড়ো করিয়া শিষ্যদের কণ্ঠে সমর্পণ করিয়াছিলেন। মহাভারত-গ্রন্থে কাহিনী বাঁধা পড়িয়াছিল অনেক কাল পরে। সেইজন্য গণেশকে লেখকরূপে কল্পনা করিতে হইয়াছে। রামায়ণের কোনো লেখক নাই, রামায়ণ ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া রামায়ণের ঠাট ব্যক্তিগত রচনার মতো। (বস্তুতঃ বাল্মীকি বলিয়া কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব মিলে না।)

রামায়ণ-কাহিনীর ও বাল্মীকির উল্লেখ বৌদ্ধ সাহিত্যেই প্রথম পাওয়া যায়। একটি পালি জাতক-গাথায় দশরথের মৃত্যুর পরে রামের কাছে ভরতের আগমনের প্রসঙ্গ আছে।[১] খ্রীষ্টপর প্রথম শতাব্দীর বৌদ্ধ কবি পণ্ডিত অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্যে আদিকবি বাল্মীকির স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ক্রৌঞ্চবধখিন্ন মুনির মুখ দিয়া শ্লোক বাহির হইবার ইঙ্গিতও আছে। অশ্বঘোষ লিখিয়াছেন,

বাল্মীকিনাদশ্চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।

১। পরে দ্রষ্টব্য। জাতক-গাথাটিতে যদি বিকৃতি না ঘটিয়া থাকে তবে বুঝিব এই প্রসঙ্গ বাল্মীকি-রামায়ণের মতো ছিল না। এখানে ভরতের কথায় রাম সোজাসুজি, অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'মহর্ষি চ্যবন[১] যাহা গ্রন্থবদ্ধ করিতে পারেন নাই (সেই) পদ্য বাল্মীকির নাদই সৃষ্টি করিয়াছিল।'

আমরা যে রামায়ণ জানি তাহাতে হয়ত বাল্মীকির রচনা কিছু কিছু কিংবা অনেকটাই আছে কিন্তু তবুও তাহা বাল্মীকির মূল রামায়ণ নয়। এমন কি স্পষ্টভাবে পরবর্তীকালের যোজনা উত্তর-কাণ্ড বাদ দিলেও নয়। তবে বাল্মীকির মূল রচনায় রামের জন্ম হইতে অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হওয়া—এই পর্যন্ত কাহিনী অবশ্যই ছিল। গোড়াতে যে শ্লোক-উৎপত্তি বিবরণ আছে তাহা যদিও প্রাচীন কিন্তু বাল্মীকির দেওয়া নয়। তবে শ্লোকটি যেভাবে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে সেটি যে বাল্মীকির লেখা সে বিশ্বাস অন্তত দু হাজার বছর টানা চলিয়া আসিয়াছে। ঘটনাটুকু এই। নারদ আসিয়া বাল্মীকিমুনিকে নরশ্রেষ্ঠ রামের চরিত বর্ণনা করিতে বলিয়া গেলে পর বাল্মীকি তমসাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে এক প্রেমাসক্ত ক্রৌঞ্চদম্পতীর ক্রৌঞ্চকে ব্যাধের বাণে পতিত হইতে দেখিলেন। ক্রৌঞ্চী শোকার্তা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। সেই শোক বাল্মীকির হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাঁহার ইমোশন জাগাইয়া দিল। ফলে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল রামায়ণের বীজ এই আদি শ্লোক ব্যাধের প্রতি অভিশাপরূপে

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।

'নিষাদ, তুমি কখনো স্থিত হইতে পারিবে না।[২]
যেহেতু ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্য হইতে কামমোহিত একটিকে বধ করিলে।।

(এই শ্লোকে একটি অপাণিনীয় পদ আছে—"অগমঃ"।)

রামায়ণে ছয়টি (অথবা সাতটি) কাণ্ড, প্রত্যেক কাণ্ডে কতকগুলি করিয়া সর্গ। সর্বসমেত শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০। মূল রামায়ণে ছিল ছয় কাণ্ড—বাল (বা আদি), অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সৌন্দর ও যুদ্ধ (বা লঙ্কা)। উত্তর-কাণ্ড যে পরে সংযোজিত[৩] তাহার প্রমাণ "উত্তর" এবং "সপ্তকাণ্ড" এই দুইটি বিশেষণেই রহিয়াছে। প্রথম কাণ্ডের প্রথম সর্গে নারদ বাল্মীকিকে সমগ্র রামচরিত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের এবং ১১০০০ বছর ধরিয়া প্রজাপালনের কথা বলিয়াই শেষ করা হইয়াছে।

রামায়ণের কাহিনী বেশ ঠাস-বুনানি, কেবল গোড়াকার ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান ছাড়া। ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী রাম-কথা অপেক্ষা প্রাচীনতর। ঋষ্যশৃঙ্গ অর্ধমনুষ্য অর্ধপশু গ্রীক বনদেবতা প্যানের মতো। মোহেঞ্জোদড়োর যে সীলমূর্তিটি পশুপতি শিবের বলিয়া পণ্ডিতেরা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ঋষ্যশৃঙ্গের মতো কোন আরণ্যক fertility দেবতার হওয়ার বেশি সম্ভাবনা বলিয়া মনে হয়। রামায়ণে এটি গল্প হিসাবে গৃহীত হইয়াছে এবং অপুত্রক দশরথের পক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গের সাহায্য গ্রহণ সঙ্গতই হইয়াছে। অযোধ্যার রাজার গল্প হইলেও রামায়ণ-কাহিনীর ভূমি প্রায় পুরাপুরি আরণ্য। ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞব্যাপারও আসলে আরণ্যই ছিল। বশিষ্ঠ ইত্যাদির সহায়তা পরবর্তী কালের অলঙ্করণ বলিয়া মনে হয়।

ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানে তো বটেই রাম-কথার মধ্যেও রূপকথার কাঠামো অথবা প্রতিবিম্বন

১। বাল্মীকির পিতা অথবা পূর্বপুরুষ।

২। অর্থাৎ তোমাকে (= নিষাদ জাতিকে) যাযাবর হইয়া থাকিতে হইবে। "প্রতিষ্ঠা" পদটির যে মানে করা হয় (= যশঃ, কীর্তি) তাহা নিরর্থ।

৩। সাতকাণ্ড রামায়ণের তিনটি পাঠধারা (version) চলিত আছে—বোম্বাই অঞ্চলের, বাংলাদেশের ও কাশ্মীরের।

লক্ষ্য করা যায়। সুয়োরানীর বশীভূত রাজা যে সে রানীর গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্য দিবেন দুয়ো (বড়) রানীর ছেলের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করিয়া—এ তো রূপকথার অত্যন্ত সাধারণ মোটিফ। বনে গিয়া নানারকম দুঃখভোগ ও শেষে দেশে আসিয়া রাজ্যলাভ—ইহাও তাহাই। সীতাহরণ ও রাবণবধ কাহিনী দ্বিতীয় একটি রূপকথা হইতে লওয়া হইতে পারে এবং কিষ্কিন্ধ্যা-কাহিনী এই দ্বিতীয় রূপকথার অংশ অথবা পরিবর্ধন হওয়া সম্ভব। যাহাই হউক বাল্মীকি তাঁহার সংগৃহীত ও উদ্ভাবিত উপাদানকে একটি সুসঙ্গত সুগঠিত মহাকাব্য-আখ্যানে রূপ দিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব কারিগরির একটি প্রধান বাহাদুরি ছিল ভূমিকাগুলির নামের মধ্যে রূপক-প্রতীকের ব্যবহার। রাম লক্ষ্মণ সীতা রাবণ এই চারিটিই বাল্মীকি অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চরিত্র। "রাম" নামের অর্থ বিরতি শান্তি ও শান্ত অবস্থিতি। রাম বরাবর সেই কাজই করিয়াছেন। তিনি পিতৃসত্য মানিয়া বনে গিয়া পিতার সংসারে শান্তি দিয়াছিলেন, যজ্ঞের বিঘ্নকারী রাক্ষস বিনাশ করিয়া বনবাসী মুনিদের শান্তি দিয়াছিলেন, বালিকে বধ করিয়া মিত্রকে শান্তি দিয়াছিলেন, রাবণকে বধ করিয়া সীতা-উদ্ধারের দ্বারা আপনার চিত্তকে শান্ত করিয়াছিলেন, এবং উত্তর-কাণ্ডকে ধরিলে, সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রজাদের শান্ত করিয়াছিলেন। "সীতা" নামের মূল অর্থ চষাজমিতে লাঙ্গলের রেখা। কৃষিসমৃদ্ধির প্রতীক রূপে সীতা বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে শ্রী-সমৃদ্ধির প্রতীকরূঢ় হইয়া দেবতায় উন্নীত হইতে চলিয়াছিলেন।[১] কৃষিলক্ষ্মী শান্তির অনুগামিনী। তাই "সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মী" সীতা রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। (ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন যে রাম যেন "দক্ষিণখণ্ডে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া" গিয়াছিলেন।)

"লক্ষ্মণ" নামের মানে শুভচিহ্নধারী। লক্ষ্মণ—লক্ষ্মী-শ্রীর পুরুষ রূপ। তাই তিনি শান্তির সহচর। "রাবণ" নামের বুৎপত্তিগত অর্থ যুদ্ধ, যুদ্ধবাহিনী। তবে রাম-কথা রচনার কালে বাল্মীকির মনে নামগুলির প্রতীকতা সর্বদা সজাগ ছিল কিনা জানি না।

বাল্মীকি-রামায়ণ রচিত হইবার পরে দীর্ঘকাল যাবৎ কাব্যখানি উচ্চ সাহিত্যের মঞ্চেই স্থাপিত ছিল। জনসাধারণে যে রাম-কথা জানিত তাহা লৌকিক আখ্যায়িকা, নীতিকথা অথবা রূপকথা রূপেই। বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়া পূজা পাইবার পরেই তবে রামায়ণ জানপদ সাহিত্যের ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছিল। বাল্মীকির কাব্যের নায়ক দেবকল্প নহেন, তিনি সুকৃতকর্মা বীর, তাই তিনি আসল অর্থে নারায়ণ।

বাল্মীকি নামটি কোন আর্যঋষির, যাঁহার পিতা (অথবা পিতৃপুরুষ) চ্যবন। তিনিও আর্যঋষি। বাল্মীকি সম্ভবত উত্তর-কোশলের, অর্থাৎ আধুনিক উত্তর প্রদেশের পূর্বোত্তর অঞ্চলে হিমালয়-পাদদেশের লোক।[২] রাম-কথার উৎপত্তিও এই অঞ্চলে। দশরথ ইক্ষ্বাকুবংশীয়। ইক্ষ্বাকুরা শাক্যদের (ও পরবর্তী কালের লিচ্ছবিদের) মতো উত্তর-কোশলবাসী ছিলেন। দশরথের মৃতদেহ দীর্ঘকাল রক্ষিত হইবার জন্য তৈলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।—এ ব্যাপারের অনুরূপ বুদ্ধের সৎকার।

বাল্মীকির নামের বুৎপত্তি ধরিয়া তাঁহার জীবনী পরবর্তী কালে কল্পিত হইয়াছে। চ্যবনের বংশধর চ্যবনের মতো দীর্ঘ তপস্যায় রত হইবে, খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়া বল্মীকস্তূপ অনেক সময়ে দূর হইতে মাটি-চাপা উপবিষ্ট মানুষের মতো দেখায়। তৃতীয়ত অলৌকিক কবিত্বশক্তি,

১। কৌশিকসূত্র (ব্লুমফীল্ড সম্পাদিত) ১৪.১-৯ দ্রষ্টব্য।

২। "বাল্মীকি" নাম আসিয়াছে বল্মীক (অর্থাৎ উইঢিপি) হইতে। এ শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় "বম্রী (বম্রীক)" রূপে। পূর্ব অঞ্চলের ভাষায় "র" হইত "ল"।

আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারা অনুসারে, দৈব অনুগ্রহ ব্যতিরেকে হয় না, এবং সে দৈব অনুগ্রহের মাহাত্ম্য অনুগ্রহপাত্রের অযোগ্যতা অনুসারে বাড়ে। ঋষি বাল্মীকির কবিত্বনির্ঝরের প্রথম উৎসার ঘটিয়াছিল করুণার বশে। সুতরাং যখন আধ্যাত্মিক পথে আসেন নাই তখন তিনি যে নিষ্ঠুর ছিলেন—এমন কল্পনা, এই যুক্তি অনুসারে সুসঙ্গত।

বাল্মীকিব মূল কাব্য গেয় আখ্যায়িকা রূপে রচিত হইয়াছিল এবং উত্তর-কাণ্ড অনুসারে ইহা রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অন্তে তাঁহার সভায় বাল্মীকির প্রযোজনায় রামেরই পরিত্যক্ত পুত্র কুশ ও লব বীণা সহযোগে গান করিয়াছিল। কুশ ও লব রামের মতোই ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। এবং এই নামের দুই কুশীলব (অর্থাৎ আখ্যায়িকা-গায়ক) রামায়ণ কাব্যের আদি গায়ক ছিলেন কি না বলা অসম্ভব। অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ হইয়া গেলে পর এক বৎসর ধরিয়া সে রাজসভায় বীণা সহযোগে আখ্যায়িকা গান করিবার বিধি ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে আছে। রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানেরও অঙ্গ ছিল আখ্যান-গান। আগে তাহা বলিয়াছি।

মূল রামায়ণের যে আখ্যায়িকা-গাথা রূপ তাহারই ধারা সংস্কৃত ভদ্র-সাহিত্যের অগোচরে এবং অপভ্রংশ সাহিত্যের ঈষৎ গোচরে থাকিয়া অবশেষে বাংলা ভাষায় গেয় পাঞ্চালিকা আকারে পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেখা দিয়াছিল। সুতরাং এখন আমরা যে রামায়ণ গান (রামমঙ্গল পাঁচালী) শুনি তাহা মূল গেয় আখ্যায়িকারই অখণ্ডিত ধারাবাহী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মহাভারত, গীতা ও পুরাণ

মহাভারতের কাহিনী সকলেরই জানা আছে সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি না।

মহাভারত বিষয়ে অনেক জটিল সমস্যা আছে সেগুলির আলোচনা এখন করিতেছি। প্রথমেই মনে আসে তিনটি সমস্যা। একটি নাম লইয়া, আর একটি কাহিনীর গঠন ও অন্যটি গ্রন্থটির আয়তন লইয়া।

'মহাভারত' নামটির অর্থ সম্বন্ধে মহাভারতের আরম্ভেই একটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে পাওয়া যায়—

মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারত উচ্চ্যতে।

অর্থাৎ মহৎ এবং ভারবান বলিয়াই মহাভারত বলা হয়।

গ্রন্থটি বিষয়গৌরবে মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু 'ভারত' কথাটির মানে কি? কথাটির মানে তিন দিক দিয়া করা যায়। প্রথম ভরতবংশীয় কতিপয় রাজার বা রাজ্যাধিকারীর কীর্তি কাহিনী। দ্বিতীয় 'ভরত' অর্থাৎ কথক বা গায়ন যাঁহাদের রাজা অথবা সাধারণ লোকে বৃত্তি দিয়া ভরণপোষণ করিত তাহাদের গাথাসংগ্রহ। এই নামটি যে যথার্থ তাহা বোঝা যায় মহাভারতের অপর নাম 'ভারত সংহিতা'[১] হইতে। তৃতীয় ভরতমুনির প্রদর্শিত ধারার রচনা। প্রথম অর্থ খাটে না যদিও দুষ্মন্ত-শকুন্তলা পুত্র ভরত কৌরব-পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ বলিয়া উল্লেখ আছে, কাহিনীও আছে, তবুও মহাভারত কাহিনীর নায়ক-প্রতিনায়কেরা যে ভরতবংশীয় বলিয়া খ্যাত ছিলেন তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। ইঁহারা ছিলেন কুরুবংশীয়। তৃতীয় ব্যুৎপত্তিটিও গ্রহণ করা যায় না। ভরত মুনি বলিয়া কোন ব্যক্তির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই নাট্যশাস্ত্র প্রণেতার নামরূপেই প্রাচীন জনশ্রুতি ছাড়া। আসলে ভরত এই ব্যক্তি নামটি কল্পিত হইয়াছে দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটির ওপর নির্ভর করিয়া। দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটি যে ঠিক তাহার আরো একটি প্রমাণ আছে। দেবী সরস্বতীর নামান্তর ভারতী নামটির ব্যুৎপত্তি ভরত অর্থাৎ কথক-গায়ন হইতে এই অনুমান খুবই সঙ্গত।

মহাভারত একদিনে রচিত হয় নাই। মোটামুটি যে আকারে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত আমাদের কালে পৌঁছিয়াছে তাহা সংকলনের নিম্নতম কালসীমা হইতেছে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ। কেননা অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্ধনের রচনায়। অষ্টাদশ পর্ব না হোক মহাভারতের সর্বপ্রাচীন সংস্করণ যাহা অনুমান করিতে পারি তাহা প্রচলিত ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ সালের দিকে। কেননা পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্রে (৬.২.১৮) মহাভারত নামটির উল্লেখ করেছেন। ইহা ছাড়া অন্য প্রমাণও আছে। পালি 'খুদ্দক নিকায়'-এর 'জাতক' গ্রন্থের অনেকগুলি গাথায় মহাভারতের পাত্রপাত্রীর কিছু কিছু উল্লেখ ও ইঙ্গিত আছে।

পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলির সময় ভারতকথা যে বেশ প্রচলিত তাহা আগে দেখাইয়াছি।

১। বিস্তৃত আলোচনার জন্য মদীয় 'ভারত কথার গ্রন্থিমোচন' (২য় সংস্করণ ১৯৮২) দ্রষ্টব্য।

মহাভারতের বর্তমান আকার লক্ষ শ্লোকাত্মক—সেই জন্য মহাভারতের পুঁথির পুষ্পিকায় মহাভারতকে "শতসাহস্রী সংহিতা" বলা হইয়াছে। মহাভারতের আয়তন ও আলোচনা পরে করিতেছি। এখানে এইটুকুই বক্তব্য যে প্রথম হইতেই রচনাটি ১৮ ভাগ না থাকিলেও কাহিনীর গ্রন্থিতে ছোটখাট অষ্টাদশ পর্ব ছিল তাহা অনুমান করিবার পক্ষে যুক্তি আছে। সে যুক্তি যথাস্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মহাভারতের আয়তন আমরা এখন পাইতেছি লক্ষ শ্লোকাত্মক। এই আয়তন পাইতে কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছে, সহস্র শতাব্দীও হইতে পারে। পাণিনি-পতঞ্জলির সময় মহাভারতের কি আকার ছিল তাহা জানি না তবে ভারত সংহিতা-র আকার যে কালক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহার প্রমাণ আছে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতের উপক্রমেই। এ বিষয় অন্যত্র যাহা লিখিয়াছি তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"মহাভারতের শেষ সংস্কর্তাদের মনে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত প্রস্তুত হয়েছিল নরলোকের জন্য। দৈব পিতৃ ও গন্ধর্বলোকের জন্যে তৈরি হয়েছিল যথাক্রমে তিরিশ লক্ষ, পনেরো লক্ষ ও চোদ্দ লক্ষ শ্লোকের সংহিতা। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, প্রথমে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'ভারতসংহিতা' করিয়াছিলেন চব্বিশ হাজার শ্লোকে। ইহার মধ্যে উপাখ্যানও ছিল। সেগুলি বাদ দিলে বলা হইত 'ভারত'। এই উক্তিতে আমার যুক্তির সমর্থন মিলিতেছে।

"উপাখ্যানৈঃ সহজ্ঞোয়াম্ আদ্য-ভারত-সংহিতাম্।
চতুর্বিংশ-সাহস্রীংতু চক্রে ভারত সংহিতাম্।।
উপাখ্যানৈব্ বিনা তাবদ্ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
।।১.১.১০২-০৩।।"

মহাভারত সংহিতাগ্রন্থ অর্থাৎ বইটি অনেক রচনার সংকলন। সংকলিত রচনাগুলি প্রায় সবই নারাশংসী গাথা বা আখ্যায়িকা, "নারাশংসী" শব্দের অর্থ বীরত্ব অথবা মহত্ত্ব জ্ঞাপক। মহাভারতের মেরুদণ্ড অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা হইল যে বিরাট নারাশংসী গাথা তাহার বিষয় কৌরব ও পাণ্ডব এই দলের বিরোধ। মহাভারতসংহিতার তুলনা দিতে পারি অরণ্যের সঙ্গে। অরণ্যে যেমন বনস্পতিকে আশ্রয় করিয়া অথবা বনস্পতির আওতায় থাকিয়া ছোট বড় গাছ ও ঝোপঝাড় ঘিরিয়া থাকে মহাভারত-সংহিতায়ও তেমনি ছোট বড় বিচিত্র আখ্যায়িকা মূল কাহিনী কৌরব পাণ্ডব বিরোধকে অলঙ্কৃত করিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। আগেই বলিয়াছি যে কৌরব পাণ্ডব বিরোধ নারাশংসী গাথা। এই গাথার বীজ বৈদিক সাহিত্য হইতে আসিয়াছিল। সুতরাং একথা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে মহাভারত কাহিনী বৈদিক সাহিত্যেরই জের টানিয়া আনিয়াছে।

মহাভারতের তিনটি পাঠধারা (recension) আছে,—কাশ্মীরী, দক্ষিণী ও সাধারণী। মহাভারত এই আঠারো পর্বে বিভক্ত,—আদি সভা আরণ্য (বন) বিরাট উদ্যোগ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য সৌপ্তিক স্ত্রী শান্তি অনুশাসন আশ্বমেধিক আশ্রমবাসিক মৌষল মহাপ্রস্থানিক স্বর্গারোহণ। শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ। তাহার মধ্যে অতি অল্প কিছু অংশ গদ্যে লেখা। মহাভারতের পরিশিষ্ট "খিল" হরিবংশ।[১] খিল মানে অর্গল, অর্থাৎ হরিবংশ যেন মহাভারতের সর্বশেষ পর্ব। "খিল" শব্দের তাই দ্যোতনা হইতেছে যে ইহাতেই মহাভারতের কাহিনী পরম্পরা চুকিয়া গেল আর কিছু যোগ করিবার নাই (অথবা যোগ করা চলিবে না)। মহাভারত যে তিল হইতে তাল—ইহা হইতে প্রকারান্তরে তাহাই বোঝা যায়।

১। হরিবংশ ইতিহাস ও পুরাণের মাঝামাঝি।

মহাভারতের মূল কাহিনী কুরু ও পাঞ্চালদের বিবাদঘটিত, এই সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে যে আভাষ-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে বিচিত্রবীর্য ধৃতরাষ্ট্র ধনঞ্জয় প্রভৃতি নাগ (সর্প) ছিলেন।[১] বেদের এই নামগুলি যদি মহাভারতের নায়কদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তবে কুরু-পাঞ্চাল বা কুরু-পাণ্ডব সংঘর্ষের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুতেই কল্পনা করিতে পারি না। যদি সম্পর্কিত না হয় তা হইলেও কিছু বলিবার নাই। আমাদের ভারততাত্ত্বিক ঐতিহাসিক অনেকে ভারত-যুদ্ধের ঐতিহাসিকত্বে আস্থাবান। তাঁহাদের আস্থার মূলে রহিয়াছে কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্বে বিশ্বাস। মহাভারতে হরিবংশে বিষ্ণুপুরাণে যাঁহার কীর্তি বর্ণিত মহাভারত নাট্যের সেই সূত্রধারের কল্পনা কোনো ব্যক্তি-মানুষের আধারে গড়া—ইহা উপনিষদের উল্লিখিত দেবকীপুত্র কৃষ্ণ হইতে ধরিয়া লওয়া মাত্রাতিরিক্ত অনুমান ছাড়া কিছুই নয়।

পাণিনি একটি সূত্রে বাসুদেব ও অর্জুনের নাম করিয়াছেন। এই অর্জুন মধ্যম পাণ্ডব হইলে পাণিনির সময়ে মহাভারত-কাহিনী চলিত থাকায় দ্বিতীয় প্রমাণ পাই। পতঞ্জলির সময়ে তো ছিলই। তাহা আগে দেখাইয়াছি।

মহাভারত ভারতীয় সাহিত্যের ও সংস্কৃতির এনসাইক্লোপীডিয়া। আখ্যান-আখ্যায়িকা কাব্য-গাথা গাথা-স্তব নীতিকথা সাধারণজ্ঞান যুদ্ধবিদ্যা রাজনীতি ধর্মচিন্তা অধ্যাত্মভাবনা—সবকিছু এখানে উপস্থাপিত। একদা আখ্যায়িকা-গায়ক ভরতদের সম্পত্তি ছিল বলিয়া ইহাতে প্রাচীন আখ্যান-আখ্যায়িকা অনেকগুলিই সঙ্কলিত আছে।[২] যেমন সৌপর্ণ-আখ্যান উতঙ্ক-আখ্যান যযাতি-আখ্যান শকুন্তলা-উপাখ্যান জরুৎকারু-আখ্যান নলদময়ন্তী-উপাখ্যান সাবিত্রী-উপাখ্যান ইত্যাদি। সৌপর্ণ-আখ্যান (—কদ্রু-বিনতার দ্বন্দ্ব ও গরুড়ের অমৃতহরণ কাহিনী) ব্রাহ্মণে পাওয়া গিয়াছে। তবে মহাভারতের গল্পে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। নলদময়ন্তী ও সাবিত্রী কাহিনী দুইটি চমৎকার কাব্য, যেন ধর্ম ও অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যান। ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভুক্ত ভগবদ্‌গীতা (পূর্ণ নাম 'ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ্')[৩] উপনিষদের সারসংগ্রহ তো বটেই অতিরিক্ত একটি উৎকৃষ্ট কাব্য—যদি মানবচিন্তার উচ্চতম প্রকাশকে কাব্য নাম দেওয়া চলে—এবং সরল দর্শনগ্রন্থ।

বিচিত্ররকমের সাহিত্যরস মহাভারতের মধ্যে যেমন আছে ভারতীয় সাহিত্যের আর কোন একটি আধারে তেমন নাই। মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত এই শ্লোকটিতে প্রশংসার মাত্রা একটু চড়া হইলেও অন্যায্য নয়।

শ্রুত্বা তু ভারতং কাব্যং শ্রাব্যমন্যন্ন রোচতে।
পুংস্কোকিলরুতং শ্রুত্বা রুক্ষা ধ্বাংক্ষস্য বাগিব।।

'ভারত কাব্য শুনিলে আর কোনো কাব্য শুনিতে ভালো লাগে না, কোকিলের রব শুনিলে কাকের কর্কশ স্বর যেমন (ভালো লাগে না)।।'

মহাভারত কোন ব্যক্তির রচনা নয়। বহু ব্যক্তির বহু কালের বহু রচনা বহু গায়কের কণ্ঠে বহু লেখনীর সংশোধন পাইয়া তবে গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। রচনার ও সংশোধনের কাজে যাঁহাদের হাত ছিল তাঁহারা যে সবাই বড় কবি অথবা ভালো কবি ছিলেন তা নয়। মহাভারতের আখ্যায়িকা-রচনার কালে ছোট কবিও নিজের অজানিতে বড় কবির উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ রচনায় ভদ্র-সাহিত্যের বাছবিচার ছিল না, অলঙ্কার-শাস্ত্রের শাসন মানিবার

১। কৃষ্ণ ও বলরামেরও নাগ-সম্পর্ক আছে।
২। প্রধানত আদি পর্বে, কিছু বন পর্বে। অন্যান্য পর্বে ছোটখাট কাহিনী।
৩। অর্থাৎ ভগবান্ (কৃষ্ণ) কর্তৃক গীত উপনিষদ্। "উপনিষদ্" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তাই "গীতা"।

কোন দায়িত্ব ছিল না, পাণিনীয়-ব্যাকরণের বেড়ি ছিল না। তাঁহারা কল্পনাকে নিজের মনোমত পথে ছাড়িয়া দিতেন। এই স্বাধীনতার জন্য মহাভারতের মধ্যে সজীব সাহিত্যের রঙ ও রস মাঝে মাঝে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া যায়।

মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলি অধিকাংশই মহাকাব্যোচিত উদার ও স্পষ্টভাবে আলিখিত এবং নাটকীয় গুণযুক্ত। বর্ণনায়ও উজ্জ্বলতা ও সজীবতা আছে। একটু উদাহরণ দিই।

বিরাট-রাজসভায় পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসে আছে, রাজ-সংসারে পরিচারক-পরিচারিণীরূপে। রাজার শ্যালক দ্রৌপদীকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং দাসী বলিয়া তাহাকে ভোগ করিতে চায়। তাহার অনুরোধে ভগিনী-রানী দ্রৌপদীকে মদ্যপূর্ণ পানপাত্র লইয়া তাহার কাছে যাইতে আজ্ঞা করিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্রৌপদী কীচকের কাছে যাইতে বাধ্য হইল। কীচক তাহার হাত ধরিল। দ্রৌপদী হাত ছিনাইয়া লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইলে কীচক তাহার চুল ধরিয়া লাথি মারিল। দ্রৌপদীকে এই অবস্থায় বাহির হইতে আসিতে দেখিয়া ভীম দাঁতে দাঁত ঘষিয়া চোখ লাল করিয়া হাত কচলাইতে লাগিল। ভীমের পাশেই যুধিষ্ঠির ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করিলেন এইবার বুঝি ভীমের অবিবেচনায় আত্মপ্রকাশ হইয়া যায়।[1] তিনি গোপনে ভীমকে ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিলেন।

অথাবমৃদ্নদঙ্গুষ্ঠমঙ্গুষ্ঠেন যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রবোধনভয়াদ্ রাজ্ঞো ভীমং তৎ প্রত্যষেধয়ৎ।।

'তখন যুধিষ্ঠির (নিজের পায়ের) আঙুলের দ্বারা (ভীমের পায়ের) আঙুলে চাপ দিলেন। (বিরাট) রাজা যাহাতে ভীমকে চিনিতে না পারেন তাই (তিনি) নিষেধ করিলেন।।"

ভীম বাহিরের একটি গাছের দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া যুধিষ্ঠির তাহার মুখভারের অর্থ রাজা না বুঝিতে পারেন এই জন্য বলিয়া উঠিল,

আলোকয়সি কিং বৃক্ষং সূদ পাককৃতেন বৈ।
যদি তে দারুভিঃ কৃত্যং বহির্বৃক্ষাৎ নিগৃহ্যতাম্।।

'হে পাচক, পাককাজের জন্য তুমি কি গাছ খুঁজিতেছ?
তোমার কাঠের আবশ্যক যদি, বাহিরের গাছ হইতে সংগ্রহ কর।।"

এমন সময় কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রৌপদী সভাদ্বারে আসিল এবং বিষণ্ণচিত্তে পতিদের দিকে কটাক্ষ হানিয়া এবং অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিল,

যেষাং বৈরী ন স্বপিতি ষষ্ঠেঽপি বিষয়ে বসন্।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ।।

'যাঁহাদের বৈরী ছয়টি বিষয়ের[2] তফাতে থাকিয়াও (ভয়ে) ঘুমাইতে পারে না, তাঁহাদের মাননীয় ভার্যা আমাকে সূতপুত্র[3] পদাঘাত হানিল!'

যে দদ্যুর্ন চ যাচেয়ুর্ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ।।

'যাঁহারা দিয়া আসিয়াছেন—(কখনো) যাচ্ঞা করেন না, যাঁহারা ব্রাহ্মণের মতো (শুদ্ধসত্ত্ব) ও সত্যবাদী, তাঁহাদের মাননীয় ভার্যা আমাকে সূতপুত্র অর্থাৎ (ছুতারের পুত্র) পদাঘাত হানিল!'

১। অজ্ঞাতবাসের সময়ে পরিচয় প্রকাশ হইলে পাণ্ডবদের আবার বারো বছর বনবাস করিতে হইত।

২। "বিষয়" এখনকার জেলা অথবা ডিভিসনের মতো। অর্থাৎ রাজধানী হইতে বহুদূরে থাকিলেও।

৩। ক্ষত্রিয়ের তুলনায় নীচকুলোদ্ভব।

যেষাং দুন্দুভিনির্ঘোষো জ্যাঘোষঃ শ্রূয়তেঽর্নিশম্।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ।।

'যাঁহাদের দুন্দুভির ধ্বনি ও ধনুকের টঙ্কার দিবারাত্রি শোনা যায়, তাঁহাদের মাননীয় ভার্যা আমাকে সুতপুত্র পদাঘাত হানিল!'

যে চ তেজস্বিনো দান্তা বলবন্তোঽভিমানিনঃ।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ।।

'যাঁহারা তেজস্বী সংযত বলবান্ অত্যন্ত অভিমানী,
তাঁহাদের মাননীয় ভার্যা আমাকে সুতপুত্র পদাঘাত হানিল!'

সর্বলোকমিমং হন্যুর্ধর্মপাশাসিতাস্তু যে।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ।।

'যাঁহারা ধর্মপাশে বদ্ধ না হইলে এই লোক ধ্বংস করিতে পারিতেন,
তাঁহাদের মাননীয় ভার্যা আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত হানিল!'

আর একটি অংশের অনুবাদ দিতেছি। কৃষ্ণ সন্ধি করিতে আসিয়া ব্যর্থ হইয়া পাণ্ডবের কাছে ফিরিবার পূর্বে পিতৃষ্বসা কুন্তীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। কুন্তী তাঁহাকে দিয়া পুত্রদের ও পুত্রবধূর কাছে সময়োচিত বার্তা পাঠাইতেছেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি

ব্রূয়াঃ কেশব রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।
ভূয়াংস্তে হীয়তে ধর্মো মা পুত্রক বৃথা কৃথাঃ।।
শ্রোতিয়স্যেব তে রাজন্ মন্দকস্যাবিপশ্চিতঃ।
অনুবাকহতা বুদ্ধির্ধর্মমেবৈকম্ ঈক্ষতে।।

'হে কেশব, তুমি ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিও, "তোমার ধর্ম অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে। হে পুত্র, তুমি বৃথা (ধর্মপালন) করিও না।।
নির্বোধ অপণ্ডিত শ্রোত্রিয়ের মতো, হে রাজন্, তোমার বেদাভ্যাসজড় বুদ্ধি কেবল ধর্মের দিকেই তাকাইয়া আছে।।"

অর্জুন ও ভীমের প্রতি

যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽয়মাগতঃ।
নহি বৈরং সমাসাদ্য সীদন্তি পুরুষর্ষভাঃ।।

'যে উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয়নারী পুত্র প্রসব করে এই তাহার কাল আসিয়াছে।
বৈর উপস্থিত হইলে বিক্রমশালী পুরুষ অবসন্ন থাকে না।।'

মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবের প্রতি

বিক্রমেণার্জিতান্ ভোগান্ বৃণীতং জীবিতাদপি।।

'জীবনের বিনিময়েও অর্জিত বিত্তের ভোগই বরণ করিও।।'

দ্রৌপদীকে অনুযোগ করিবার কিছু ছিল না, তাই কুন্তী তাহাকে প্রশংসাবার্তাই পাঠাইলেন।

যুক্তমেতন্মহাভাগে কুলে জাতে যশস্বিনি।
যন্মে পুত্রেষু সর্বেষু যথাবৎ ত্বমবর্তিথাঃ।।

'হে মহাভাগা, যে যশস্বী কূলে (তুমি) উৎপন্ন তাহার পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই যে তুমি আমার পুত্রের সম্পর্কে যথাযোগ্য আচরণ করিয়াছ।'

মহাভারতের কাহিনী জনমেজয়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞে বৈশম্পায়ন কর্তৃক গীত হইয়াছিল। কিন্তু আখ্যান-আখ্যায়িকাগুলি বিভিন্ন মুনিঋষির উক্তি বলিয়া লেখা আছে। মহাভারত যে সঙ্কলনগ্রন্থ তাহা ইহা হইতেও উপলব্ধি হয়।

মহাভারত-কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণ-কাহিনীর মূল বিষয়ে কোথাও কোথাও নিগূঢ় ঐক্য আছে, এবং কোথাও কোথাও সুস্পষ্ট অনৈক্য আছে। আগে ঐক্যের কথা বলি।

দুইটিই আসলে অশ্বমেধ-যজ্ঞে গেয় ও গীত গাথা। উপসংহারে অথবা উপক্রমে অশ্বমেধে গানের কথা দুই মহাকাব্যেই আছে। দুই মহাকাব্যেরই নায়কভূমিকাগুলির জন্মগ্রহণ-ব্যাপারে অসাধারণত্ব। রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের জন্ম পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের ফলে। যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেবের জন্ম নিয়োগের ফলে—পিতার ঔরসে নয়। দুই মহাকাব্যেরই নায়কদের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে ঘটে নাই। উভয়ত্রই নায়িকা বাহুবল-পরীক্ষায় লব্ধ। এবং উভয়ত্রই নায়িকা একটিমাত্র এবং তাহাকে লইয়াই বিরোধ। দুই মহাকাব্যেই রূপকথার সাজ কিছু আছে—রাজ্যনাশ ও বনবাসে দুঃখভোগ।

এখন অনৈক্যগুলি দেখাই।

মহাভারতের বস্তুতে মিথলজি ও কালাগত জনশ্রুতি মিশ্রিত। রামায়ণের বস্তুতে লোকায়ত-কাহিনী ও কবিকল্পনা মিশ্রিত। মহাভারতের আবেদন ধর্মের, রামায়ণের আবেদন নীতির। মহাভারতের শাস্ত্রকার অবৈদিক ঋষি ব্যাস, রামায়ণের শাস্ত্রকার বৈদিক ঋষি—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ইত্যাদি। মহাভারতের নায়কদের নাম ট্র্যাডিশন-লব্ধ, রামায়ণের নায়কদের নাম রূপকাশ্রিত। মহাভারতের নায়কেরা কুরুপাঞ্চালের লোক, রামায়ণের নায়কেরা কোশল-কেকয়ের।

মহাভারত-কাহিনীর চরম রূপ যে কতকটা রামায়ণের সঙ্গে মিল ও অমিল রাখিয়া গঠিত হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত অনুমান হইলেও অসম্ভব নয়।

মহাভারত-কাহিনীর চরম রূপ খ্রীষ্টীয় ৪০০ সালের আগে ফুটে নাই। অশ্বঘোষ রামায়ণের ইঙ্গিত করিযাছেন, কৃষ্ণলীলারও ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারত-কাহিনীর উল্লেখ করেন নাই। মহাভারতের অনেক কাল আগেই রামায়ণ পরিণত রূপ লইয়াছিল।

কুরু-পাণ্ডব কাহিনী কতকগুলি বৈদিক ও প্রাক্‌বৈদিক ঐতিহ্যের গাঁটছড়া।

গীতা

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের (অধ্যায় ২৫-২৪) মধ্যে এমন একটি উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রথিত আছে যাহাতে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা হীরার মতো ঘনীভূত ও সমুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে রণক্ষেত্রে আসিয়া অর্জুন ও কৃষ্ণের যে সংলাপ হইয়াছিল তাহাই এই আঠারো অধ্যায়ে লেখা 'ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ্‌'-এর, সংক্ষেপে 'ভগবদগীতা'র, আরও সংক্ষেপে 'গীতা'র বিষয়।[১] উচ্চগ্রামের অধ্যাত্মবাণী যে কবিত্বের বাঁশিতেই বাজে তাহার এক বড় প্রমাণ এই গীতা।

উপনিষদের ব্রহ্মবোধ ও জ্ঞানযোগের পরে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায় ভক্তিযোগের সঞ্চার হইয়াছিল। গীতায় ব্রহ্মবোধ ও জ্ঞানযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগের সমন্বয় চেষ্টা আছে, এবং ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে যে-পুরুষবাদের আরম্ভ তাহা ইতিমধ্যে যেভাবে ব্যক্তি-ঈশ্বরত্বে

১। 'গীতা' বা 'ভগবদগীতা' বইটির নাম নয় বিশেষণ। আসল নাম হইল 'ভগবদ্‌গীতোপনিষৎ' (অর্থ ভগবান্‌ কর্তৃক গীত অধ্যাত্মরহস্য)। মূল গ্রন্থের অধ্যায়সমাপ্তি-বচন দ্রষ্টব্য, "ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু...."।

সমুন্নীত হইয়া অবতারবাদের দিকে ঝুঁকিয়াছিল তাহার প্রতিফলনও গীতায় আছে। আগেই বলিয়াছি যে গীতার কয়েকটি শ্লোক প্রায় যথাযথভাবে কঠ-উপনিষদ্ হইতে লওয়া। গীতার 'উপনিষদ্' নামেই প্রকাশ যে গ্রন্থটিতে উপনিষদের জের টানা হইয়াছে।

গীতার পটভূমিকা বেশ নাটকীয় গোছের। যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া প্রতিপক্ষদের দেখিয়া অর্জুনের মন আর্দ্র হইল। ভাবিল, 'এই সবই আমার প্রিয় আত্মীয়-বান্ধব, যাহাদের যত্নে ও স্নেহে মানুষ হইয়াছি, যাহাদের সঙ্গে খেলাধূলা করিয়াছি। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না।' তখন কৃষ্ণ তাহাকে যে প্রত্যুত্তর দিলেন তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্ আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরই উপযুক্ত।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।

'আমিত্বের উপর ভর করিয়া তুমি যে বলিতেছ—"যুদ্ধ করিব না"।
তোমার এ সঙ্কল্প বৃথাই। তোমার স্বভাব তোমাকে যুদ্ধ করাইবে।'

সব দেশের সকল অবস্থার সব মানুষের জন্য গীতায় যে অভয়বাণী আছে তাহার তুল্য আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।

'বুদ্ধির আশ্রয় লও। যাহারা (ধর্মের, সুকর্মের) ফল খোঁজে তাহারা কৃপার পাত্র।'

উদ্ধরেদাত্মনাং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

'নিজেকে নিজেই উদ্ধার করিবে, কখনো নিজেকে অবসন্ন করিবে না।'

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।

'(এই যে মানব-ধর্ম[১]) ইহাতে অভিক্রম-নাশ নাই[২] প্রত্যবায়ও[৩] নাই।
এই ধর্মের অল্পমাত্রাও বিপুল ভয় হইতে ত্রাণ করে।।"

মানবের ধর্মের, তাহার সব চিন্তার সব উন্নতিপ্রগতির পক্ষে এই সংজ্ঞা অত্যন্ত সমীচীন। মানব-ধর্মে প্রয়াসই আছে অগ্রগতিই আছে, সব শেষে আছে কি আছে না আছে সে খোঁজ অনাবশ্যক। কেন না

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।
('এই সৃষ্টি আদিতে অব্যক্ত, মাঝটুকু ব্যক্ত),
হে ভারত, আবার শেষ অব্যক্ত। সুতরাং এখানে কল্পনাজল্পনার স্থান কই?'

১। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজীতে religion of man।
২। অর্থাৎ আরম্ভ করিয়া বিরত হইলে যতটুকু হইয়াছে ততটুকু থাকিয়া যায়।
৩। অর্থাৎ আরম্ভ করিয়া বিরত হইলে পশু যজ্ঞকাণ্ড ও তান্ত্রিক-ক্রিয়ার মতো অনিষ্ট করে না।

পুরাণ

'ইতি হ আস পুরাণম্''—''এই রকমই ছিল সেকালের ব্যাপার'। এই বাক্যটি পরে দাঁড়াইল একটিমাত্র পদে—''ইতিহাসপুরাণম্''। পদটিকে সমাহারদ্বন্দ্ব সমাস মনে করিয়া এই ভাঙ্গিয়া দুইটি শব্দ পাওয়া গেল—'ইতিহাস' ও 'পুরাণ'। বেদের পরবর্তীকালে এইভাবে প্রাচীন কিছু কথাবস্তু বিভিন্নজাতের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। যাহাকে 'ইতিহাস' নাম দেওয়া হইল তাহাতে মানুষ লইয়াই কাববার, সেখানে দেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব নাই। দেবতা মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া যোগ দিতে পারেন তবে তাঁহার ভূমিকা কিছু গৌণ। তবে মানুষ কিছু কিছু অলৌকিক কাজ করিতে পারে। ইতিহাসের পাত্রপাত্রী মানুষই। ইতিহাসের ঘটনায় বাস্তবের রঙ থাকিবে কিন্তু সে ঘটনায় বাস্তব ও কল্পনা পৃথক্ করা যায় না। এই জন্য 'মহাভারত' ইতিহাস। পুরাণের কারবার প্রধানত দেবতা ও অসুর, কখনও কখনও দেবকল্প বা অসুরকল্প মানুষ লইয়া। পুরাণের মানুষকে ইতিহাসে ধরা যায় না, বাস্তবে তো নয়ই। সে সম্পূর্ণভাবে মিথলজির। ইতিহাসের তুলনায় পুরাণে দেবতার অবতারের ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত।

''পুরাণ''—নাম দেওয়া গ্রন্থগুলি বিভিন্ন কালে রচিত ও সংকলিত হইয়াছিল। প্রাচীনতম পুবাণের সংকলনকাল ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে যাই .ব না। অর্বাচীনতম পুরাণ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা। পুরাণগুলিতে বিবিধ দেবতার মাহাত্ম্য স্থাপিত হইলেও বিষ্ণুই সমস্ত পুরাণের অধিদেবতা। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে শিব প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী সংবলিত পুরাণগুলি পরবর্তীকালে বিষ্ণুদৈবত পুরাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। এ নেহাৎ অনুমান মাত্র। অধিকাংশ পুরাণে বিষ্ণুর অবতারবাদ প্রকাশ্য অথবা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত। মহাভারতে সংকলিত হয় নাই এমন অনেক আখ্যান পুরাণগুলিতে আছে, অন্য অনেক কাহিনীও আছে। সে সব কাহিনী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লইয়া দেবতাদের ও অসুরের জন্ম কর্ম বিরোধ লইয়া সূর্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদের কল্পিত ইতিহাস লইয়া ও চতুর্দশ মনুর অধিকার কাহিনী লইয়া। তাই পুরাণকে বলা হয় ''পঞ্চলক্ষণ''।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।

ইতিহাস-পুরাণসাহিত্যে আঠারো এই সংখ্যাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। হয়ত ''অষ্টাদশ বিদ্যা'' এই সঙ্গে জড়িত। মহাভারতের পর্ব-সংখ্যা আঠারো, গীতার অধ্যায় সংখ্যাও আঠারো, পুরাণের সংখ্যাও আঠারো। আসলে পুরাণগ্রন্থের সংখ্যা আঠারোর বেশি। তাই কোন কোন অর্বাচীন পুরাণে পুরাণগুলিকে ''পুরাণ'' এবং ''উপপুরাণ'' এই দুই ভাগে ফেলা হইয়াছে। কোন কোন পুরাণ মতান্তরে উপপুরাণ গণ্য হইয়াছে, কোন কোন পুরাণে বিপরীতও দেখা যায়। যেমন এক মতে বায়ুপুবাণ উপপুরাণ, আর এক মতে অগ্নিপুরাণ উপপুরাণ। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের প্রভাব এবং এই ত্রিগুণের দেবতাত্রয় বিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিবের মাহাত্ম্য ধরিয়া অষ্টাদশ পুরাণ তিনভাগে বিভক্ত। সাত্ত্বত ভাগের অন্তর্গত হইল বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, গরুড়পুরাণ ও পদ্মপুরাণ। রাজস ভাগের মধ্যে পড়ে ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত (অথবা ব্রহ্মকৈবর্ত) পুরাণ, ভবিষ্যৎপুরাণ ও বামনপুরাণ। তামস ভাগের অন্তর্গত অগ্নিপুরাণ (মতান্তরে বায়ুপুরাণ), শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ। উপপুরাণ হইল নৃসিংহপুরাণ, সৌবপুরাণ, দেবীপুরাণ, ধর্মপুরাণ, কল্কিপুরাণ

ইত্যাদি। কয়েকটি পুরাণে পরপর অনেক অংশ ("খণ্ড") নতুন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন পদ্মপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে।

পুরাণ-গ্রন্থগুলি পদ্যে বিরচিত। তবে কোন কোন পুরাণে দৈবাৎ অল্পস্বল্প গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। এমন গদ্যের প্রয়োগ মহাভারতের আদিপর্বেও আছে।

সবচেয়ে পুরানো পুরাণ যাহা আমরা পাইয়াছি তাহাতে কাল্পনিক ইতিহাসের ভাগ অল্প নয়। সে হইল 'হরিবংশ'। ইতিহাসের বস্তুর অল্পতার জন্যই হরিবংশ মহাভারতের "খিল" (অর্থাৎ অর্গলবৎ নিঃশেষ) পর্ব বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। হরিবংশকে পর্বরূপে মহাভারতে যুক্ত করিয়া মহাভারতের শেষ সম্পাদক (বা সম্পাদকেরা) ইহাই জানাইতে চাহিয়াছিলেন যে অতঃপর মহাভারতে আর কোন নূতন পর্বের স্থান রহিল না।

হরিবংশের শ্লোকসংখ্যা ষোল হাজারের বেশি। এই মহাকাব্যবৎ পুরাণটি তিন পর্বে বিভক্ত—হরিবংশ-পর্ব, বিষ্ণু-পর্ব এবং ভবিষ্য-পর্ব। অধ্যায়সংখ্যা যথাক্রমে পঞ্চান্ন, একশ আটাশ ও একশ পঁয়ত্রিশ। হরিবংশ-পর্বের প্রথমে সৃষ্টিকথা সুপ্রাচীন রাজবংশ ও দেবাসুরযুদ্ধ বর্ণিত। বিষ্ণু-পর্বে কৃষ্ণ-অবতারের কথা। ভবিষ্য-পর্বের বিষয় বিমিশ্র[১]—জনমেজয়ের অশ্বমেধ, মধুকৈটভ-কাহিনী, পৃথুর অভিষেক, বরাহ-অবতার কাহিনী, বামন-অবতার কাহিনী, কিছু কিছু কৃষ্ণলীলা কথা (যেমন কৃষ্ণের কৈলাসযাত্রা, পৌণ্ড্রক বাসুদেব বধ, হংস ও ডিম্বকের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ ইত্যাদি), ত্রিপুরবধ, ইত্যাদি।

হরিবংশে সংক্ষেপে পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনী আছে (হরিবংশ-পর্ব চব্বিশ অধ্যায়)। যিনি এই কাহিনী লিখিয়াছিলেন তাঁহার ঋগ্‌বেদ-সূক্তটি পড়া ছিল।[২] এ কাহিনী অনুসারে পুরূরবা ক্ষমাশীল ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী ও ব্রহ্মবাদী বলিয়াই উর্বশী তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। অন্যথা কাহিনী শতপথ-ব্রাহ্মণেরই মতো। তবে হরিবংশের মতো উর্বশীর গর্ভে পুরূরবা সাত পুত্র লাভ করিয়াছিল—আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু।

হরিবংশ-সংকলনের সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় কৃষ্ণলীলা-গাথা প্রচলিত ছিল। সেই গাথা গাহিয়া মেয়েরা নাটগীত করিত। দ্বারকায় কৃষ্ণ-বলরাম সমেত যাদবেরা ও তাহাদের পাণ্ডব-বন্ধুরা এই রকম নৃত্যাভিনয় করিয়াছিলেন।[৩]

হরিবংশের কথা বাদ দিলে প্রাচীনত্বের ও বিষয়গৌরবের দিক দিয়া "বিষ্ণুপুরাণ' প্রথম। হরিবংশে কৃষ্ণলীলা বিস্তৃতভাবে আছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে। সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলার প্রাচীনতম আকরগ্রন্থ এই দুইটি পুরাণ। পুরাণের যে পঞ্চ লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছি তাহা ধরিলে বিষ্ণুপুরাণকে অগ্রে স্থান দিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণ ছয় "অংশ"-এ বিভক্ত। শ্লোকসংখ্যা হরিবংশের প্রায় অর্ধেক।

প্রাচীনত্বের দিক দিয়া বিষ্ণুপুরাণের পরে 'বায়ুপুরাণ' উল্লেখযোগ্য। এ পুরাণে প্রধান দেবতা বিষ্ণু নয় শিব। বায়ুপুরাণ চারি কাণ্ডে ১১২ অধ্যায়ে বিভক্ত। শ্লোকসংখ্যা প্রায় এগারো হাজার।

বিষ্ণুর প্রথম তিন অবতারের নামে তিনটি পুরাণ আছে—কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বরাহপুরাণ। এ পুরাণগুলি যেন উক্ত অবতারদের মুখপদ্ম বিনির্গত। কূর্মপুরাণে শ্লোকসংখ্যা

১। সম্ভবত পরে সংযোজিত।
২। "জায়েহ তিষ্ঠ মনসা ঘোরে বচসি তিষ্ঠ হ।
এবমাদীনি সূক্তানি পরস্পরমভাষত।।"
৩। 'নট নাট্য নাটক' (২য় সং ১৩৯১ পৃঃ ৪৫ দ্রষ্টব্য)

আনুমানিক ছয় হাজার। মৎস্যপুরাণ ২৯১ অধ্যায়ে বিভক্ত। শ্লোকসংখ্যা চৌদ্দ হাজারের উপর। বরাহপুরাণ চারি খণ্ডে বিভক্ত। শ্লোকসংখ্যা পনেরো হাজার। শেষ অবতারের নামে 'কল্কি-পুরাণ' পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহা অর্বাচীন গ্রন্থ এবং মহাপুরাণের তালিকায় নাই। বিবিধ দেবতার নামে এই পুরাণগুলি পাওয়া গিয়াছে—অগ্নিপুরাণ, দেবীপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ (নামান্তরে আদিপুরাণ), ধর্মপুরাণ, শিবপুরাণ, সৌরপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি।

অগ্নিপুরাণ ৩৮৩ অধ্যায়ে বিভক্তি। শ্লোকসংখ্যা এগারো হাজারের উপর। এটিকে পুরাণ না বলিয়া বিশ্বকোষ-গ্রন্থ বলাই সঙ্গত, যেহেতু ইহার বিষয়বস্তুর মধ্যে ব্যাকরণ ছন্দঃ অলঙ্কার জ্যোতিষ ইত্যাদিও আছে। দেবীপুরাণের নামান্তর দেবীভাগবত-পুরাণ। ইহা ভাগবতপুরাণের অনুকরণে দেবীমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক অর্বাচীন উপপুরাণ গ্রন্থ। ধর্মপুরাণ সাধারণ 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' নামে প্রচলিত। বেশ অর্বাচীন সংকলন। 'শিবপুরাণ'[১] কালিদাসের অনেককাল পরে রচিত, কেন না ইহাতে কুমারসম্ভব হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত আছে। সৌরপুরাণ ব্রহ্মপুরাণেরই পরিশিষ্টের মতো। স্কন্দপুরাণ অত্যন্ত অর্বাচীন গ্রন্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্তও সঙ্কলনটি সম্পূর্ণ হয় নাই।

ভাগবতপুরাণের[২] বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রাচীন হোক আর অর্বাচীন হোক পুরাণগুলি মধ্যকালের বাংলা সাহিত্যে প্রচুর বিষয় যোগাইয়াছিল। তাহা ছাড়া পুরাণগুলির মধ্য দিয়াই মুসলমান-অধিকারকালে হিন্দুধর্মের রূপ ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ভাগবতের প্রভাব তাহার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে ভক্তিধর্ম বাংলা দেশ হইতে উৎসারিত হইয়া ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার প্রধান শাস্ত্রভিত্তি ছিল দুটি, গীতা আর ভাগবত।[৩] চৈতন্যের ধর্ম, তাঁহার গুরুদের ও তাঁহার অনুচরদের ধর্ম, ভাগবতের উপর নিষ্ঠিত হইয়া দেশীয় সাহিত্যে জীবনসেক করিয়াছিল। কৃষ্ণকথা, যাহা হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে পরিবর্ধিত ও কবিত্বাভিষিক্ত হইয়া ভাগবতে যেভাবে উপস্থাপিত হইল তাহাই বৈষ্ণবতা ও ভক্তিধর্মের মধ্য দিয়া ভারতীয় ভাবনায় ও সাহিত্যে থিতাইয়া আসিয়াছে।

ভাগবতকে পুরাণগ্রন্থের প্রতিনিধি বলিতে পারি। ইহা বারো স্কন্ধে, ৩৩৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। শ্লোকসংখ্যা আঠারো হাজার। রচনাকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী এবং রচনাস্থান দাক্ষিণাত্য বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীধরস্বামীর টীকা ভাগবত বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক।

প্রথম স্কন্ধে উনিশ অধ্যায়। এই স্কন্ধ ভাগবতের ভূমিকার মতো। ভগবানের অবতারপ্রসঙ্গ করিয়া নারদের পূর্বজন্মের কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হইতে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপপ্রাপ্তি ও তাঁহার সভায় শুকদেবের আগমন পর্যন্ত বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় স্কন্ধে দশ অধ্যায়। বিষয়—যোগী মহাপুরুষ ও ভগবানের লীলা-অবতার প্রসঙ্গ এবং পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর রূপে ভাগবতকথা আরম্ভ। তৃতীয় স্কন্ধে তেত্রিশ অধ্যায়। বিষয় বিচিত্র। বিদুরের তীর্থপর্যটন, বিদুর-উদ্ধব সংবাদ, কৃষ্ণলীলার উত্তর ভাগ, ব্রহ্মার ভগবদ্-দর্শন, সৃষ্টিবর্ণন, পৃথিবীর উদ্ধার, জয়-বিজয়ের অধঃপতন, হিরণ্যাক্ষবধ, মনুচরিত, কর্দমের তপস্যা, কপিল-কর্তৃক সাংখ্যাযোগ কথন। চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিশ অধ্যায়। বিষয়—বংশবর্ণন, দক্ষযজ্ঞ ও সতীর তনুত্যাগ, ধ্রুবচরিত, পৃথু-উপাখ্যান, প্রচেতাগণের উৎপত্তি ও রুদ্রস্তুতি, পুরঞ্জনের রূপক-

১। কোন কোন পুঁথিতে বায়ুপুরাণের নামান্তর 'শিবপুরাণ' পাওয়া যায়।

২। ভাগবতপুরাণ ব্যাসের পুত্র শুক কর্তৃক প্রোক্ত। তাই গ্রন্থটির এক নাম 'বৈয়াসকি-সংহিতা।'

৩। "হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা"—এই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে পূজ্যতম।

উপাখ্যান, প্রচেতাগণের বিবাহ ও রাজত্ব। পঞ্চম স্কন্ধে ছাব্বিশ অধ্যায়। বিষয়—প্রিয়ব্রতের বংশবর্ণন, অগ্নীধ্র ঋষভদেব ও জড়ভরতের বিবরণ, ভরতবংশবিবরণ, ভুবনকোষ বর্ণন, বর্ষ সমুদ্র ও দ্বীপ বিবরণ, ভারতবর্ষের প্রাধান্যখ্যাপন, জ্যোতিশ্চক্র-বিবরণ, সপ্তপাতাল-বিবরণ, সংকর্ষণ-মাহাত্ম্য, নরকবর্ণনা। ষষ্ঠ স্কন্ধে উনিশ অধ্যায়। বিষয়—অজামিলের উপাখ্যান, নারদের প্রতি দক্ষের অভিশাপ, দক্ষকন্যাদের বংশবিবরণ, বিশ্বরূপের পৌরোহিত্য, বৃত্রের উপাখ্যান, চিত্রকেতুর উপাখ্যান, আদিত্য প্রভৃতি দেবগণের বংশবিবরণ ইত্যাদি। সপ্তম স্কন্ধে পনেরো অধ্যায়। বিষয়—প্রহ্লাদ-চরিত্র। অষ্টম স্কন্ধে চব্বিশ অধ্যায়। বিষয়—গজেন্দ্র-মোক্ষণ-কাহিনী, সমুদ্রমন্থন-আখ্যান, মন্বন্তর-বর্ণন, বলিবামন উপাখ্যান, মৎস্যাবতার-কাহিনী। নবম স্কন্ধেও চব্বিশ অধ্যায়। বিষয়—ইলার উপাখ্যান, অম্বরীষের কাহিনী, সৌভরির কাহিনী, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, সগরের উপাখ্যান, রামায়ণ-কাহিনী, রামের বংশবর্ণন, নিমির বংশবিবরণ, পুরূরবার কাহিনী, পরশুরামের কাহিনী, বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান, যযাতির উপাখ্যান, পুরুবংশবর্ণন, বিবিধ রাজবংশ-বর্ণন, বলরাম ও কৃষ্ণের উৎপত্তি। দশম স্কন্ধে নব্বই অধ্যায়। বিষয়—কৃষ্ণলীলা। একাদশ স্কন্ধে একত্রিশ অধ্যায়। বিষয়—কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে বিবিধ আখ্যান ও তত্ত্বকথা। যেমন বসুদেব-নারদ সংবাদ, নিমি-জয়ন্ত সংবাদ, অবধূত-উপাখ্যান, পিঙ্গলার উপাখ্যান, উদ্ধবের জিজ্ঞাসায় বিভূতি যতিধর্ম যোগ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষ্ণের উপদেশ, পুরূরবার নির্বেদ, উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে প্রস্থান, যদুবংশসংহরণ। দ্বাদশ স্কন্ধে তেরো অধ্যায। বিষয়—ভবিষ্য রাজবংশ-বর্ণন, কলিযুগের বর্ণনা, পরমতত্ত্ব-নির্ণয়, বেদের শাখাবিভাগ, পুরাণলক্ষণ, মার্কণ্ডেয়ের ভগবৎমায়া-দর্শন, শিব-মার্কণ্ডেয় সংবাদ, অনুক্রমণিকা।

উপরে দেওয়া নির্ঘণ্ট হইতে ভাগবতের বিষয়বৈচিত্র্য ও বিষয়গৌরব বোঝা যাইবে। ভাগবতের রচনায় এবং সংকলনে জ্ঞান বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় বেশ আছে। সংকলনকালে প্রাচীন বিদ্যায় কোন কোন বিষয়ে ও কোন কোন প্রাচীন কাহিনীতে যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহার সাক্ষ্য ভাগবতপুরাণের মধ্যে আধৃত আছে। এখানে প্রাচীন ও অর্বাচীন দুইটি বৈদিক কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি, পুরূরবা-উর্বশীর এবং মনু-মৎস্যের।

পুরূরবার কাহিনী নবম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে। একাদশ স্কন্ধের ছাব্বিশ অধ্যায়ে সেই কাহিনীর আধ্যাত্মিক উপসংহার জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতের মতে উর্বশী ইন্দ্রসভায় পুরূরবার রূপ-গুণ-বীরত্বের গাথা শুনিয়া না দেখিয়াই তাহার প্রেমে পড়ে। তাহার পর মিত্রাবরুণের শাপে সে নরলোকে আসিয়া এবং উপযাচিকা হইয়া পুরূরবাকে প্রেম নিবেদন করে।

তস্য রূপগুণৌদার্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্।।
শ্রুত্বোর্বশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্ সুরর্ষিণা।
তদন্তিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরার্দিতা।।
মিত্রাবরুণয়োঃ শাপাদাপন্না নরলোকতাম্।
নিশাম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্।।
ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতস্থে তদন্তিকে।

রাজা আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া বলিল,

স্বাগতং তে বরারোহে আস্যতাং করবাম কিম্।
সংরমস্ব ময়া সাকং রতির্নৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ।।

স্বাগত তোমাকে সুন্দরী উপবেশন কর কি করিব। আমার সঙ্গে চিরকাল সহবাস করিতে থাক।

উর্বশী বলিল, বেশ। এই দুইটি মেষশাবক তোমার কাছে গচ্ছিত রহিল।[১] আমার আর দুইটি সর্ত তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। এক, আমি ঘৃত ছাড়া কিছু খাইব না এবং অসময়ে তোমাকে বিবস্ত্র দেখিব না। রাজা স্বীকার করিল।[২]

কিছুকাল যায়। উর্বশীহীন সভায় ইন্দ্র সুখ পাইতেছেন না। তিনি গন্ধর্বদের দিয়া একদা ঘনান্ধকার রজনীতে উর্বশীর লালিত মেষশাবকদুটিকে চুরি করাইলেন। অপহ্রিয়মান মেষের ডাকে উর্বশী ব্যথিত হইয়া বলিল,

হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা।।

'বীর-অভিমানী ক্লীব অক্ষম ভর্তার হাতে পড়িয়া আমি বিনষ্ট হইলাম।'

তাড়াতাড়িতে রাজা বিবস্ত্র হইয়াই ছুটিয়া আসিল। গর্ন্ধবেরাও অমনি মেষ ছাড়িয়া দিয়া বিদ্যুৎ জ্বালাইল। উর্বশী দেখিল রাজা বিবস্ত্র। তাহার পর পুরূরবা-উর্বশী-সংবাদ বেদের কাহিনী অনুসরণ করিয়াছে। উর্বশী চলিয়া গেলে রাজা বিভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া তাহার নাগাল পাইল। দেখিল সে পঞ্চ সখী লইয়া সরস্বতীর জলে বিহার করিতেছে।

ভাগবতে (অষ্টম স্কন্ধ চব্বিশ পরিচ্ছেদ) যে মৎস-অবতার কাহিনী আছে তাহা শতপথ-ব্রাহ্মণের কাহিনীর মতো হইলেও কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখি। প্রথমত—ভাগবতের কাহিনী দক্ষিণ ভারতের। দ্বিতীয়ত—নায়ক সত্যব্রত মনু নয়, মনুসত্ত্ব বলিতে পারি। তৃতীয়ত—হিমালয়ের উল্লেখ নাই (দক্ষিণ ভারতের বলিয়া তাহা হইবারও কথা নয়)। চতুর্থত—মৎস্য পরমেশ্বর। গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

দ্রাবিড়ের রাজা ঋষিকল্প সত্যব্রত কৃতমালা নদীতে স্নান করিতেছেন তখন একটি শফরী (পুঁটি মাছ) তাঁহার হাতে উঠিলে তিনি তাহা জলে ফেলিয়া দিতে যান। তখন শফরী তাহাকে রক্ষা করিতে বলে। দয়ালু রাজা তাহাকে কলসীতে রাখেন। মাছ রাতারাতি এত বাড়িল যে তাহাকে ডোবায় রাখিতে হইল। কিন্তু শফরী বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে সত্যব্রত তাহাকে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিতে গেলেন। মৎস্য বলিল, এখানে ছাড়িও না, প্রবলতর মৎস্য আমাকে খাইয়া ফেলিবে। তখন সত্যব্রত বুঝিলেন, এ তো সামান্য নয় নিশ্চয়ই পরমেশ্বর। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া মৎস্য তাহাকে অচিরাগামী বন্যার বিষয়ে সাবধান করিয়া এবং বন্যা আসিলে তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া চলিয়া গেল। যথাসময়ে বন্যা আসিল এবং একখানি নৌকাও আসিল। ঋষি মুনি ও যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ লইয়া সত্যব্রত নৌকায় উঠিলেন। মাছের শিঙে নৌকা বাঁধা হইল। নৌকায় থাকিয়া সত্যব্রত মৎস্যরূপী পরমেশ্বরের কাছে অধ্যাত্ম-উপদেশ চাহিলেন। তিনিও তত্ত্ববিদ্যা উপদেশ করিলেন। সত্যব্রত পরে বৈবস্বত মনু হইয়াছিলেন।

ভাগবত-পুরাণের এই কাহিনী শতপথ-ব্রাহ্মণের মনু-মৎস্যসংবাদ ও মধ্য বাংলা সাহিত্যের মৎস্যেন্দ্রনাথ ও শিবপার্বতী-সংবাদের সংযোগ সাধন করিয়াছে (মৎস্যেন্দ্রনাথের কাহিনীতে মাছ বক্তা নয় গোপন-শ্রোতা।)

ভাগবতের প্রায় সর্বত্র রচনাকুশলতার পরিচয় ছড়াইয়া আছে। তবে কৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনায় কবিত্বের প্রকাশ স্বভাবতই বেশি। রাসপঞ্চাধ্যায়ের একত্রিশ অধ্যায়ে গোপীগীত হইতে

১। "এতাবুরণকৌ রাজন্ ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ।"

২। "ঘৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যান্নেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ।
বিবাসসং তৎ তথোতি প্রতিপেদে মহামনাঃ।।"

দুইটি শ্লোক উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত করিতেছি। অন্তর্হিত কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে গোপীরা কৃষ্ণের উদ্দেশে বিলাপ করিতেছে।

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তারকা স্বয়ি ধৃতাসব স্বাং বিচিন্বতে।।

'তোমার জন্ম হইতে ব্রজের অধিক উন্নতি, যেন লক্ষ্মী এখানে স্থিরবাস করিয়াছেন। হে প্রিয়, দেখা দাও। তোমাতে প্রাণ ধরিয়া আছে যে (তোমার কিঙ্করী) তাহারা দিকে দিকে তোমাকে খুঁজিতেছে।।'

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।

'কবিদের দ্বারা বর্ণিত তোমার কথা অমৃতের মতো, ক্লিষ্টকে উৎফুল্ল করে, পাপ দূর করে, শুনিলে মঙ্গল হয়, এবং মধুর। পৃথিবীতে (তোমার কথা) যে ব্যক্তিরা বিস্তারিত করিয়া উদ্‌ঘাটন করে তাহারা বহুদাতা।।"

মথুরা হইতে কৃষ্ণ একবার উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন খবরাখবর করিতে। কৃষ্ণপ্রিয় গোপীরা উদ্ধবের কাছে অনুযোগ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'ভ্রমরগীতা' নামে প্রসিদ্ধ।[১] দশটি শ্লোক, মালিনী ছন্দে লেখা। সর্বসমেত একটি ভালো কবিতা। গোপীরা কৃষ্ণকে পলাতক ভ্রমর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। শেষ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতেছি।

অপি যত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যাধাস্যৎ কদা নু।।

'আর্যপুত্র কি এখন মথুরায় আছেন? হে সৌম্য, পিতৃগৃহের কথা বন্ধু গোপদের কথা তাঁহার মনে পড়ে কি? কখনও কি তিনি কিঙ্করী আমাদের কথা বলেন? হায়, কবে তাঁহার সেই অগুরুসুরভিত বাহু (আমাদের) মাথায় দিবেন।।'

১। দশম স্কন্ধ সাতচল্লিশ অধ্যায় শ্লোক ১২-২১।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন প্রাকৃত ও পালি

ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রাচীন অবস্থা বদল হইয়া মধ্য অবস্থা কখন দেখা দিল তাহা ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়। ভাষার বদল অল্পে অল্পে ঘটে এবং কোন সময়েই অব্যবহিত পূর্ব অবস্থার ভাষা পরবর্তী অবস্থায় অবোধ্য হইয়া পড়ে না। তবে দীর্ঘকালব্যাপী পরিবর্তনের হিসাব ধরিলে অবস্থান্তরে ভাষার অবোধ্যতা স্বীকার করিতে হয়। প্রাচীন-আর্য মধ্য-আর্যে পরিণত হইবার কল্পিত কালসীমারেখা ধরা হয় ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই অনুমান হইয়াছে প্রধানত অশোক-অনুশাসনের ভাষা বিচার করিয়া। ভারতবর্ষের উত্তরে ও দক্ষিণে বিভিন্ন স্থানে গিরিগাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসনগুলিতেই আমরা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম অকৃত্রিম ও সমসাময়িক নিদর্শন পাই।[১] অশোক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার অনুশাসনগুলি সেই সময়েরই (তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যভাগের) রচনা। এই অনুশাসনে আর্য ভাষায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে তাহা অনুধাবন করিয়া বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্য অবস্থান্তর প্রাপ্তির উর্ধ্বতন সীমারেখা আরও দুই শত আড়াই শত বছর আগে (অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে) টানা যুক্তিসঙ্গত।

ভারতীয় আর্যের প্রাচীন অবস্থায় মোটামুটি দুইটি ভাষা-ছাঁদ পাইয়াছিলাম। একটি বৈদিক ছাঁদ, আর একটি সংস্কৃত ছাঁদ। দুইটি ছাঁদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। সেই জন্য সাধারণ ব্যবহারে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের নামান্তর 'সংস্কৃত ভাষা' বলা হয়। ভারতীয় আর্যের মধ্য অবস্থায় ভাষাবিভাগ স্পষ্ট, গভীর এবং বহুল। মধ্য-ভারতীয় ভাষাগুলিকে কাল ও পরিণমন অনুসারে তিন পংক্তিতে সাজানো যায়। প্রথম পংক্তিতে পড়ে অশোক-অনুশাসনগুলির ভাষা এবং পালি। দ্বিতীয় পংক্তিতে পড়ে "প্রাকৃত" নামে পরিচিত বিভিন্ন ভাষা—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, মাগধী ইত্যাদি। তৃতীয় পংক্তিতে পড়ে অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ। প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির মাঝখানে পড়ে 'বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত'।

এখন অশোক-অনুশাসন, পালি ও বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত—এই ভাষাগুলি ধরিয়া সাহিত্যকর্মের পরিচয় দিতেছি।

অশোকের অনুশাসনগুলি ব্যবহারিক প্রয়োজনের রচনা। সাহিত্যের ছাঁচে ঢালা এবং বিনোদনের উদ্দেশ্যে লেখা না হইলেও অশোক-অনুশাসনগুলিকে সাহিত্যরসবর্জিত বলা যায় না। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর সমসাময়িক গদ্যরীতির নিদর্শন এগুলিতে আছে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে হিউম্যান্ ডকুমেন্ট তাহার মূল্য অশোকের অনুশাসনে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

অশোকের সময় থেকে শুধু আমাদের লিপি-ব্যবহারেরই নমুনা মিলিতেছে তা নয় সমসাময়িক ভাষার, খোদাইচিত্রের এবং গৃহতক্ষণেরও নিদর্শন পাইতেছি। অশোকের কালসি অনুশাসনের শিরঃস্থানে একটি হাতি আঁকা আছে, ধৌলি অনুশাসনের শীর্ষেও হাতির মূর্তি

১। সমসাময়িকতার বিচার করিলে অশোকের অনুশাসনই ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম কথ্য নিদর্শন। রাজার অনুজ্ঞা বলিয়া অশোকের নীতিতে সাহিত্যের ছাঁচ আছে।

খোদিত আছে। অশোকের স্তম্ভশীর্ষে খোদাই গো অশ্ব সিংহ হস্তী ও মৃগ তক্ষণশিল্পের ভালো উদাহরণ। গয়ার কাছে বরাবর পাহাড়ে গুহার দ্বারে সেকালের কাঠখড়ের বাড়ির আদল পাই।

বুদ্ধের ও অন্য বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণও দেবতার মূর্তি গঠন করিয়া তাহার পূজার জন্য অর্থসংগ্রহ মৌর্য যুগেই শুরু হইয়াছিল। এই কথা পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক।

অশোকের অনুশাসনের সমকালের একটি গুহালিপিতে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর সমকালীন পদ্যরচনার এবং প্রত্যুৎপন্ন পদ্যরচনার নিদর্শন রহিয়াছে। এখানে দুইটি কবিতা আছে, কোন এক নিরাশ প্রণয়ীর উচ্ছ্বাসের বাণী। তাহার মধ্যে প্রথম কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম পদটির অনুসারে কবিতাটি সুতনুকা-লিপি নামে পরিচিত হইয়াছে। ভাষা পূর্ব অঞ্চলের এক উপভাষা। ছন্দ বৈদিক জগতী, তবে চতুষ্পাদ নয় ত্রিপাদ। কবিতাটি অনুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি।

সুতনুকা[১] নামে দেবদাসিকা
তাহাকে ভালোবাসিয়াছে বারাণসেয়[২]
দেবদিন্ন[৩] নামে রূপদক্ষ[৪]।

পুরাণো ভারতীয় ভাষার চলতি মুহূর্তের স্বচ্ছন্দ রচনা অত্যন্ত দুর্লভ, নাই বলিলেই হয়। দেবদিন্নের ভণিতাযুক্ত এই কবিতাটি সেই সুদুর্লভ রচনার সবচেয়ে পুরাণো নিদর্শন বলিয়া অত্যন্ত মূল্যবান্।

বুদ্ধ তাঁহার মাতৃভাষায় শিষ্য ও ধর্মার্থীদের উপদেশ দিতেন। বুদ্ধের মাতৃভাষা ছিল কপিলবস্তু অঞ্চলে (নেপাল তরাইয়ে) ব্যবহৃত তৎকালীন (অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর) এক ভারতীয় আর্য ভাষা যাহা তখন মধ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে যাহা অর্ধমাগধী প্রাকৃত নাম পাইয়াছিল সেই মধ্য ভারতীয় উপভাষার যে গোড়াকার রূপ ছিল তাহাই বুদ্ধের মাতৃভাষা, অনুমান করা গিয়াছে। বুদ্ধের জীবৎকালে তাঁহার কোনো কোনো শিষ্য গুরুর উপদেশাবলী নোট বা কড়চা করিয়া লইয়াছিলেন কিন্তু তখনই কোনো গ্রন্থে তাহা সংকলিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। তবে সেই সব কড়চা বুদ্ধের তিরোধানের দুই এক শত বৎসরের মধ্যে গ্রন্থাকারে লিখিত ও বিস্তারিত হইতে শুরু হইয়াছিল। এই গ্রন্থগুলিই বৌদ্ধধর্মের মূল শাস্ত্র। কোন্ ভাষায় বুদ্ধের বাণী ও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের তত্ত্ব গ্রন্থবদ্ধ হইবে, বুদ্ধ শিষ্যানুশিষ্যদের মধ্যে তাহা লইয়া মতভেদ হইয়াছিল। এক দলের মতে সমগ্র দেশের শিষ্ট ভাষা সংস্কৃতই বুদ্ধ-বাণীর বাহক ও বৌদ্ধধর্মের ধারক হওয়ার যোগ্য। অপর দলের মতে সাধারণের বোধগম্য ভাষা—অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা এ কাজের সমুপযুক্ত। অন্য কারণে আগে হইতেই বৌদ্ধনেতাদের মধ্যে মতভেদ ও দলভেদ শুরু হইয়াছিল। (অবশ্য এই মতের ও দলের ভেদ গোড়ার দিকে ভাসা ভাসা রকমেরই ছিল।) এখন ভাষা লইয়া বিভিন্ন দলগুলি দুইটি শ্রেণীতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। এক শ্রেণী গ্রহণ করিলেন সংস্কৃতকে, আর এক শ্রেণী সমসাময়িক মধ্যভারতীয় আর্য ভাষাকে। কিন্তু গোড়াতেই দুই শ্রেণীরই কিছু কিছু অসুবিধা ছিল এবং সে অসুবিধা এক রকমের নয়। বুদ্ধ তাঁহার ধর্মমত শিষ্ট ও পণ্ডিতদেরই বোধগম্য করিয়া রাখিতে চাহেন নাই, সাধারণ অ-শিষ্ট লোকেও যাহাতে তাঁহার ধর্মে সহজ

১। নামটির মানে, যে সুন্দরী ও তন্বী।

২। অর্থাৎ বেনারসের অধিবাসী।

৩। এখনকার বেনারস-অঞ্চলের ভাষায় নামটি হইবে দেওদীন।

৪। মানে মুদ্রাপরীক্ষক অথবা মুদ্রানির্মাণপটু।

প্রবেশপথ পায় সেই দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সংস্কৃত ভাষা শিষ্টের ভাষা পণ্ডিতের অনুশীলিত, দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস না করিলে সে ভাষায় অধিকার জন্মায় না। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইলে তাহাতে সাধারণ লোকের প্রবেশ সরাসরি নিষিদ্ধ হইবে। যাঁহারা সংস্কৃতকে গ্রহণ করিলেন তাঁহারা অভিনব কৌশলে এই বাধা কাটাইলেন। পাণিনির ব্যাকরণশাসিত নয় এমন সহজ ও শিথিল অ-সংস্কৃত ভাষায় রচিত আখ্যায়িকা ও পুরাণ-কাহিনী সেকালে অল্পশিক্ষিত জনসমাজে ব্যবহৃত ছিল। এই লৌকিক সংস্কৃত গ্রহণ করা হইল এবং এই পরিগৃহীত ভাষার ব্যাকরণবন্ধন আরও শিথিল করা হইল আর তাহাতে সমসাময়িক মধ্যভারতীয় ভাষার শব্দ পদ ও ইডিয়মের যথেচ্ছ প্রবেশ নির্বাধ রাখা হইল। উত্তর ভারতের অধিকাংশ বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই শিথিল মিশ্র-সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করিলেন।

যাঁহারা সংস্কৃত অথবা মিশ্র-সংস্কৃত গ্রহণ করিলেন না তাঁহাদের সমস্যা কিছু কম কঠিন ছিল না। মধ্যভারতীয় বলিতে কোনো একটিমাত্র ভাষা ছিল না, ছিল অনেকগুলি উপভাষা। সেই উপভাষার মধ্যে একটি হইল বুদ্ধের নিজের ভাষা। কিন্তু সে ভাষা এ কাজে চলিবে না। তাহার দুইটি প্রধান কারণ। এক, এ ভাষা নিতান্ত গ্রাম্য ভাষার মতো, সাহিত্যচর্চা অথবা ধর্মকথা ও দর্শনচিন্তা করিবার মতো সামর্থ্য সে ভাষার ছিল না। ইতিমধ্যে একাধিক শ্রেণীর বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা দেশে ছড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিভিন্ন ভাষাসম্প্রদায়ের লোক। বুদ্ধের মাতৃভাষা তাঁহাদের সকলের ব্যবহারের উপযোগী ছিল না, বিশেষ কোনো একটি মধ্য ভারতীয় উপভাষারই তা ছিল না। এ সমস্যার সমাধানও সহজে ঘটিল। সে সময়ে—অর্থাৎ অশোকের প্রায় শতাব্দ কাল পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের ও সংস্কৃতির হৃৎকেন্দ্র হইয়াছিল মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী। সেখানে দেশদেশান্তর দূরদূরান্তর হইতে লোক আসিত নানা কাজে। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজধানীর সঙ্গে উজ্জয়িনীর পথবাঁধা যোগাযোগ ছিল। এই সব কারণে উজ্জয়িনী অঞ্চলের, মালবের, উপভাষা নানা প্রদেশের নানা দেশের লোকের নানা কাজে ব্যবহৃত হইয়া একটি সর্বসাধারণের ভাষায় (যাহাকে বলে লিঙ্গুআ ফ্রাঙ্কা) পরিণত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ-সম্প্রদায়গুলি এই ভাষাকেই গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে মাজিয়া ঘষিয়া ক্রমাগত সংস্কৃত ভাষার ধার-করা পালিশ চড়াইয়া শাস্ত্রের উপযুক্ত বাহন করিয়া তুলিলেন। এই ভাষাই এখন 'পালি' নামে পরিচিত। অধিকাংশ প্রকাশিত বৌদ্ধশাস্ত্র এই পালি ভাষাতেই লেখা।

দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ-কেন্দ্র ক্রমশ পিছু হটিতে হটিতে অবশেষে ভারতবর্ষের বাহিরে সিংহলে গিয়া ঠেকে। পালি সাহিত্যের শেষের দিকের গ্রন্থগুলি (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে) সব সিংহলে সংকলিত ও রচিত। উত্তর ভারতের বৌদ্ধ-কেন্দ্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বৌদ্ধ মত ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে মিলাইয়া আসে। তাহার আগেই উত্তর ভারতের বৌদ্ধ-মতে অসাধারণ বিশিষ্টতা—যোগাচার ও তান্ত্রিকতা দেখা দিয়াছিল। সেই বিশিষ্টতা বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সঞ্চারিত হইতেছিল। সে কথা যথাস্থানে বলিব।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার ব্যবহার খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রথম পাওয়া গেল, বিশেষ করিয়া অশোকের অনুশাসনে। সেগুলি তাঁহার প্রাদেশিক কর্মচারীদের ও প্রজাসাধারণের জন্য লেখা। রচনা পুরাপুরি কথ্য ছাঁদের নয়, অনেকটাই লেখ্য রীতি। সংস্কৃতের সঙ্গে মিলাইলে অশোক-অনুশাসনের রচনার মধ্যে সাহিত্য বীজ ধরা পড়ে। অথচ সংস্কৃতের অনুবাদ নয়, সংস্কৃতের অনুসরণও নয়। বেদজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজের বাহিরে সাধারণ শিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাচীন

ভারতীয় আর্য ভাষার যে সমসাময়িক সাধু রীতি ব্যবহার করিতেন সেই রীতিরই মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষায় এই প্রতিফলন অশোক-অনুশাসনের ভাষা শিষ্টের রচনা তবুও অ-শিষ্টের অনধিগম্য ছিল না। অশোক-অনুশাসনকে সকলে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন কিনা জানি না। তবে এ রচনা যদি সাহিত্য না হয় তবে সাহিত্যের সংজ্ঞা সাহিত্যদর্পণের দ্বারাই নির্দিষ্ট করিতে হয়। অশোক-অনুশাসনের দুইটি উদাহরণ মূলনিষ্ঠ অনুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি।

অশোকের রাজ্যভোগকালের দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে পর তিনি এই অনুশাসন জারি করিয়া তাঁহার রাজ্যে ধর্মের ও নীতির প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি কী করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন এবং প্রজাদের কী করা উচিত সে সম্বন্ধে বলিতেছেন।

> বহুশত বৎসরের কালান্তর গেল বাড়িয়াই চলিয়াছে প্রাণিহত্যা আর জীবদের মধ্যে হানাহানি জ্ঞাতিদের মধ্যে অসম্প্রীতি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের[1] মধ্যে অসম্প্রীতি। তবে আজ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী[2] রাজার ধর্মাচরণের হেতু ভেরীঘোষ হইয়াছে ধর্মঘোষ বিমানদর্শন আর হস্তিদর্শন আর অগ্নিকাণ্ড এবং অন্য অলৌকিক দৃশ্য জনসাধারণকে দেখাইয়া।[3] যে রকমটি বহু শত বর্ষের মধ্যে ঘটে নাই তেমনটি আজ বাড়িয়াছে দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মানুশাসনের ফলে—প্রাণীদের হত্যানিরোধ জীবদের মধ্যে অবিরোধ জ্ঞাতিদের সম্প্রীতি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের মধ্যে সম্প্রীতি মাতার ও পিতার আনুগত্য বয়োবৃদ্ধের আনুগত্য। এই এবং অন্য বহুবিধ ধর্মকাজ বাড়িয়াছে। বাড়াইবেনও দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই ধর্মকাজ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার পুত্রেরা ও পৌত্রেরা ও প্রপৌত্রেরাও বাড়াইবেন এই ধর্মকাজ প্রলয়কাল অবধি। (তাঁহারা) ধর্মে ও সদাচরণে রহিয়া ধর্ম অনুশাসন করিবেন। ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম যাহা ধর্মানুশাসন। ধর্মকাজ কিন্তু শীলবিহীনের দ্বারা হয় না অতএব এই ব্যাপারে বৃদ্ধি এবং না-কমা ভালো। এই উদ্দেশ্যে এই (ফরমান) লেখানো হইল এই উদ্দেশ্যের পোষকতায় লাগা হোক বিপরীত যেন মনেও না আনা হয়।
>
> দ্বাদশ বর্ষ হইল যাহার অভিষেক হইয়াছে (সেই) দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক ইহা লেখানো হইল।[4]

কলিঙ্গ-বিজয়ে বহু প্রাণনাশ হইয়াছিল, তাহাতে অশোকের মনে পরিবর্তন আসিয়াছিল। কলিঙ্গ ও কলিঙ্গের প্রত্যন্তবাসীদের প্রতি নৃশংস আচরণের জন্য অশোক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। এই অঞ্চলের প্রজাদের প্রতি তিনি অনুকম্পা জানাইয়া তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া অশোক দুইটি বিশেষ অনুশাসন লিখাইয়াছিলেন। এই দুইটি অনুশাসন তাঁহার রাজ্যের অন্যত্র উৎকীর্ণ হয় নাই। এই বিশেষ কলিঙ্গ অনুশাসনের দ্বিতীয়টি অনুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি। "আমার প্রজারা আমার সন্তান"—অশোকের এই উদার বাণী, যাহা কোনো দেশের কোনো

১। ব্রাহ্মণ = ধর্মনিষ্ঠ সাধুশীল ব্রাহ্মণজাতীয় গৃহস্থ ব্যক্তি। শ্রমণ = তপস্বী সন্ন্যাসী, যতী।

২। অশোকের অনুশাসনে তাঁহার নামের স্থানে "প্রিয়দর্শী" অভিধাই পাওয়া যায়। শুধু দুটি অনুশাসনে তাঁহার ব্যক্তিনাম "অশোক" পাওয়া গিয়াছে।

৩। এই বাক্যটির অর্থ কিছু সংশয়িত। এক মানে হইতে পারে—অশোক ধর্মপ্রচারের জন্য শোভাযাত্রা ("যাত্রা") বাহির করিতেন। তাহাতে ধর্মের শ্লোগান থাকিত ("ধর্মঘোষ"), ভেরী বাজিত, তিনচারি তলা রথ বা তাজিয়া থাকিত, হাতি থাকিত, আতশবাজি হইত এবং নানারকম চমৎকার পুতুলবাজি দেখানো হইত। অন্য মানে হইতে পারে—ধর্মাচরণ করিয়া অশোকের এত দৈবশক্তি লাভ হইয়াছিল যে তিনি আসমানে এই সব অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতে পারিতেন।

৪। গিরনার শিলা অনুশাসনমালার চতুর্থ অনুশাসন।

রাজা কখনো বলেন নাই, তাহা এইখানেই আছে। এটি যে অত্যন্ত সহৃদয় ভাষণ এবং সেই হেতু সাহিত্যরসস্নিগ্ধ তাহা পড়িলেই বোঝা যাইবে।

দেবতাদের প্রিয় এই (কথা) বলিতেছেন। সমাপার[১] মহামাত্রদের রাজ-মুখের আদেশ জানাইতে হইবে।—যত কিছু দেখিতেছি আমি তাহাতে ইচ্ছা করিতেছি আমি যে কি কর্ম আমি ত্বরিত করিতে পারি, (কি) উপায়ে আমি সিদ্ধকাম হইতে পারি। ইহাই আমি প্রধান উপায় মনে করি এই ব্যাপারে যা তোমাদের প্রতি দৃঢ় আদেশ।

সব মানুষ আমার সন্তান। যেমন আমার (নিজের) সন্তানদের বিষয়ে (আমি) চাই যেন (তাহারা) ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কল্যাণ ও সুখ লাভ করুক তেমনি আমার ইচ্ছা সব মানুষেরই হোক।

যে প্রান্ত দেশগুলি (আমার খাশ) দখলে (তাহারা যেন ভাবে)—'কেমন মনোভাব রাজার আমাদের প্রতি।' এইটুকুই আমার ইচ্ছা প্রান্তবাসীদের বুঝাইয়া দিতে হইবে—রাজা এইমাত্র ইচ্ছা করেন (যে সকলে) অনুদ্বিগ্ন হোক আমার দিক থেকে আশ্বস্ত থাকুক, আর আমার কাছ থেকে সুখই লাভ করুক আমার কাছে যেন (কখনো) দুঃখ না (পায়)। ইহাও.... বুঝাইয়া দিতে হইবে—রাজা আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন যাহারা ক্ষমার যোগ্য এবং আমার নিমিত্ত[২] ধর্মাচরণ করিতে হইবে। ইহলোক এবং পরলোক আরাধন করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাদের[৩] আদেশ দিতেছি। এই উপায়ে আমি ঋণমুক্ত (হইব)—তোমাদের আদেশ দিয়া এবং অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইয়া যাহা আমার অবিচলতা ও অচল প্রতিজ্ঞা। অতএব এমন কর্ম করিয়া চলিতে হইবে যাহাতে (প্রজারা) আশ্বস্ত হয় এবং যাহাতে তাহারা আমার (বাণী) বুঝিতে পারে—'যেমন পিতা তেমন রাজা আমাদের।'—এই (কথা) 'যেমন (তিনি) নিজেকে অনুকম্পা করেন সেই ভাবে আমাদের অনুকম্পা করেন যেমন সন্তান তেমনি আমরা রাজার।...'

এমন করিলে (তোমরা) স্বর্গ আরাধন করিতে পারিবে আমারও ঋণশোধ করিতে পারিবে।

এই লিপি চাতুর্মাস্য ধরিয়া শুনিতে হইবে,[৪] তিষ্য (নক্ষত্র) ছাড়াও শুনিতে হইবে। এইরকম করিলে কার্যসিদ্ধিতে সমর্থ হওয়া যায়।

তিষ্য (অর্থাৎ পুষ্যা) নক্ষত্র পবিত্র গণ্য হইত। শস্য রোপণ ও বপন উপলক্ষ্যে পূর্বভারতের জনপদবাসীরা তিষ্য নক্ষত্রে উৎসব করিত। এই উৎসব কালধারাবাহিত হইয়া বাংলা দেশে আধুনিক দিন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এখনকার "তুসু (টুসু), তোসলা"—তিষ্য নামটি বহন করিতেছে। পুষ্যা হইতে "পোষলা" আসিয়াছে। "ভাদু" ("ভাজো") পরব ও "ইতু" ব্রত এই সঙ্গে সম্পর্কিত।

এইসব কারণে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে অশোকের দ্বিতীয় কলিঙ্গ অনুশাসনের একটু বিশেষ মূল্য আছে।

১। কলিঙ্গপ্রদেশের দক্ষিণ অংশের রাজধানী। ইহারই অদূরে (আধুনিক গঞ্জাম জেলায় জৌগড়ে) শিলায় এই অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। দ্বিতীয় পাঠ উত্তর কলিঙ্গের প্রধান নগর ভোসলীর কাছে (আধুনিক ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী ধৌলীতে) শিলায় উৎকীর্ণ আছে।

২। অর্থাৎ আমার খাতিরে বা আদর্শে।

৩। মহামাত্রদের।

৪। এইখানে একটু বাদ গিয়েছে। সেটুকু ধৌলী অনুশাসনে আছে—"তিষ্য নক্ষত্রে শুনতে হইবে"।

নিয়া প্রাকৃতে পত্রাবলী

অশোকের পরেও দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুশাসন ও বিবিধ ব্যবহার-লিপি মধ্য ভারতীয় ভাষায় উৎকীর্ণ হইত। এ কাজে সংস্কৃতের ব্যবহার প্রথম দেখা দিয়াছে দ্বিতীয় খ্রীষ্টশতাব্দীর মাঝামাঝি। কিন্তু তাহার পরেও দুই তিন শতাব্দী, কোনো কোনো অঞ্চলে চারি পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া মধ্য ভারতীয় ভাষার ব্যবহার চলিয়াছে। কিন্তু অশোকের সময়ের অল্পকাল পর হইতেই এই সব উৎকীর্ণ লিপির ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ও অনুকরণ দ্রুত বাড়িয়াছে। অশোকের অনুশাসনের পর মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় লেখা কোন অনুশাসনের সাহিত্যমূল্য প্রায় নাই বলিলেই হয়। কেবল একটি বিশেষ ব্যতিক্রম আছে।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চীনীয় তুর্কীস্থানে নিয়ায় (ও পার্শ্ববর্তী স্থানে) যে রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার ভাষা ছিল মধ্য ভারতীয় আর্য। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে অশোকের যে অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে সেই অনুশাসনের ভাষার সঙ্গে নিয়া অনুশাসনের ভাষা ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। এ ভাষার নাম দেওয়া হইয়াছে 'নিয়া প্রাকৃত'। সে ভাষায় লেখা বহু রাজকীয় চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে। এই চিঠিপত্রের মধ্যে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার (যেমন বাংলার) আধুনিক চিঠিপত্রের ছাঁদের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে পত্ররচনারীতির প্রাচীন এবং খাঁটি—অর্থাৎ 'পত্রকৌমুদী'র মতো পাঠ্যগ্রন্থের আদর্শ লিপির নয়—নিদর্শন বলিয়া এগুলির মূল্য আছে।

একটি উট বিক্রয়ের দলিলের যথাযথ অনুবাদ দিতেছি।

সংবৎসরে ১০ মাসে দিবস ১৮ এমন ক্ষণে[১]—খোতন মহারাজ রাজাধিরাজ হিনস অবিজিতসিংহের এই কালে[২]—আছে মানুষ নাগরিক খ্র্নস নাম এমন মন্ত্রণা দিতেছে—[৩] আছে আমার উট নিজের। সে উট অভিজ্ঞান[৪] বহন করে। তাহাতে অঙ্কিত দৃঢ় ব শো।[৫] কিন্তু সে উট বিক্রয় করিতেছি দাম মাষা হাজার আট ১০০৮ সুলিগ[৬] বজিতি বধজের কাছে। সেই উটের জন্য বজিতি বধজ নিরবশেষ[৭] মূল্য মাষা দিয়া খ্‌র্নসের কাছে লইয়া শুদ্ধি পাইয়াছে; আজ হইতে সে উট বজিতি বধজের নিজের হইল। কাম করাইবে সব কাজ করাইবে। যে পরবর্তী কালে সে উট লইয়া গোলমাল করিবে[৮] বিবাদ উঠাইবে[৯] তাহাদের তেমন দণ্ড দেওয়া যাইবে যেমন রাজধর্ম হইবে।

আমি বহুবিধ এই দলিল লিখিলাম খ্র্নসের আগ্রহে সম্মুখে...[১০] বধজ সাক্ষী সচিবক সাক্ষী স্পনিয়ক সাক্ষী।

১। অর্থাৎ সময়ে।
২। অর্থাৎ রাজ্যকালে।
৩। অর্থাৎ আর্জি দিতেছে।
৪। অর্থাৎ মার্কা, ছাপ।
৫। এই অক্ষর দুইটি উটের গায়ে দাগা ছিল।
৬। জাতিনাম, = Sogdian।
৭। অর্থাৎ পুরা।
৮। মূলে "চুদিয়তি বিদিয়তে"।
৯। অর্থাৎ নালিশ করিবে।
১০। এইখানে কতকগুলি সই-অক্ষর আছে।

পালি গাথা

বুদ্ধের তিরোধানের (৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পরে বুদ্ধ-শিষ্যেরা রাজগৃহে সম্মিলিত হইয়া ("সঙ্গীতি" করিয়া) বুদ্ধবচন প্রথম সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ উপদেশ দিতেন নিজের মাতৃভাষায়। সে ভাষা আঞ্চলিক মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা। পরবর্তী কালে সেখানের ভাষা অর্ধমাগধী নাম পাইয়াছিল। সুতরাং বুদ্ধের মাতৃভাষাকে প্রাচীন অর্ধমাগধী বলা যায়। বুদ্ধবাণীর প্রথম সংহিতা এই ভাষাতেই হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। তবে প্রথম সংকলনের পরেও বুদ্ধবচন জমিতে থাকে, বুদ্ধবচনের ব্যাখ্যা করিয়া বুদ্ধশিষ্যবচন রচিত হইতে থাকে, বুদ্ধাগম-শাস্ত্রের বিস্তার ঘটিতে থাকে। রাজগৃহ-সঙ্গীতির একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় "সঙ্গীতি" হয়। তখন বুদ্ধশাস্ত্রে বিভিন্ন মত মাথা তুলিতেছে। তৃতীয় সঙ্গীতি হয় অশোকের রাজ্যকালে (২৭৩-২৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তাহার পূর্বেই বৌদ্ধধর্মের দুইটি বড় শাখা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। একটি শাখাশ্রয়ীদের নাম 'মহাসাঙিঘক"। অপর একটি শাখাশ্রয়ীদের নাম "থেরবাদী"। তৃতীয় সঙ্গীতিতে থেরবাদীদের শাস্ত্রের শেষ সংস্করণ হইল। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র (পালিতে মহিন্দ) সিংহলে থেরবাদী বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। সেই শাস্ত্র সিংহলে দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে যে রূপ লইয়াছিল তাহাই পালি সাহিত্যের প্রাচীন স্তর। অশোকের সময়ে থেরবাদী শাস্ত্রের ভাষা ঠিক পালি ছিল কিনা বলা যায় না। তবে অশোকের ভাবরা-অনুশাসনে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের অবশ্যপাঠ্য বলিয়া যে কয়টি "সুত্ত" উল্লিখিত আছে তাহার ভাষা পালির মতোই। কিন্তু পালি সাহিত্যের কোন পুঁথি ভারতবর্ষের ভিতরে পাওয়া যায় নাই, এবং থেরবাদ এখানে বেশ কিছুকাল প্রচলিত থাকিলেও তাঁহাদের সে শাস্ত্র যে তখন সব পালিতেই লেখা ছিল তাহারও প্রমাণ নাই।[১] ভারতবর্ষে পালি শাস্ত্র যখনই আসুক তাহা সিংহল হইতে আসিয়াছিল অথবা সিংহল হইতে প্রচারিত হইয়া চীনে গিয়া সেখান হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছিল।

পালির মুখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। পালি শাস্ত্রমতে শ্রেণী না বলিয়া রত্ন-আধার ("পিটক") বলা হইয়াছে।[২] তাই এ মতে শাস্ত্র "তিপিটক" (সংস্কৃত ত্রিপিটক) নামে প্রসিদ্ধ। তিন পিটক এই — সুত্ত-পিটক, বিনয়-পিটক ও অভিধম্ম-পিটক। সুত্ত-পিটকে সংলাপ, বুদ্ধের উপদেশ ও তাঁহার ধর্মব্যাখ্যা এবং বিবিধ পুরানো পদ্য ও গদ্য রচনা সঙ্কলিত আছে। পালি শাস্ত্রে সাহিত্যের পর্যায়ে যা কিছু আছে তা বেশির ভাগ সুত্ত-পিটকেই। বিনয়-পিটকে আছে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণীয় ও অনাচরণীয় বিধিনিষেধের বিস্তারিত বিবরণ। অভিধম্ম-পিটকের বিষয় দর্শন ও নীতিঘটিত তত্ত্বালোচনা।

প্রাচীনত্বের ও সাহিত্যরসের দৃষ্টিতে সুত্ত-পিটকের এই গ্রন্থগুলি সবিশেষ মূল্যবান্—ধম্মপদ, সুত্তনিপাত, থেরগাথা, থেরীগাথা, উদান ও জাতক।

"ধম্মপদ' বৌদ্ধদের সবচেয়ে মান্য গ্রন্থ, ব্রহ্মণ্য ধর্মে যেমন গীতা। ইহাতে ৪২৩ সদুক্তি শ্লোক আছে। সব শ্লোকই বৌদ্ধ ধর্মের ভাববিজড়িত নয়। পূর্বকাল হইতে আগত এবং সমসাময়িক ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও বহুদর্শিতা-মূলক অনেক ভালো সূক্তি ইহার মধ্যে গ্রথিত আছে। বইটি সর্বদেশের সর্বকালের সর্বধর্মের সৎপথগামী ব্যক্তির অবশ্যপঠনীয়। সদুক্তি যেমন

১। থেরবাদীরা সাধারণত "হীনযানী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। আগে ইঁহাদের অধিষ্ঠান দক্ষিণ ভারতেই ছিল।

২। এখানে মনুসংহিতার এই উক্তি তুলনা করিতে পারি

বিদ্যা ব্রাহ্মণমাগত্য শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্।

বৈরের দ্বারা (বৈরকর্মের) প্রশমন এ সংসারে কখনই করা যায় না।
অবৈরের দ্বারাই (বৈর) প্রশমিত হয়।—ইহাই সনাতন ধর্ম।

অপরের দোষ, অপরের কাজ-অকাজ (লক্ষ্য করিও না)।
লক্ষ্য রাখিতে হইবে নিজেরই কাজে ও অকাজে।।

যে (লোক) যুদ্ধে হাজার মানুষ জয় করে (তাহার তুলনায়)
যে জয়যোগ্য আত্মাকে জয় করিতে পারে সেই শ্রেষ্ঠ যুদ্ধজয়ী।।

সকলেই শাস্তি ভয় করে। প্রাণ সকলেরই প্রিয়।
নিজেকে দৃষ্টান্ত করিয়া (কাহাকেও) আঘাত করিবে না হত্যা করিবে না।।

(পূর্বে) কৃত পাপ কাজ যে ভালো কাজ দিয়া ঢাকা দেয়[১]
সে ইহলোক উজ্জ্বল করে, যেমন মেঘমুক্ত চন্দ্র।।

জয়ে বৈর জন্মায়। পরাজিত দুঃখে থাকে।
উপশান্ত[২] যে সে সুখে থাকে—জয়পরাজয় এড়াইয়া।।

প্রিয়ের সহিত তোমার সমাগম না হোক। কখনো অপ্রিয়ের সঙ্গেও না।
প্রিয়দের অদর্শন দুঃখকর, অপ্রিয়বস্তুর দর্শনও তাহাই।।

অক্রোধের দ্বারা ক্রুদ্ধকে জয় করিবে। সাধুত্বের দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে।
নীচকে দান দ্বারা জয় করিবে। সত্য দ্বারা মিথ্যাবাদীকে।।

তাহাতে পণ্ডিত হয় না যদি (কেউ) বহু ভাষণ[৩] দেন।
(যিনি) ক্ষেমঙ্কর, বৈরহীন—(তাঁহাকেই) পণ্ডিত বলি।।

বন কাটো, গাছ নয়। বন থেকে ভয় জন্মায়।
বন ও আগাছা কাটিয়া, হে ভিক্ষু, তোমরা "নিব্বণ"[৪] হও।।

কর্মে যদি শৈথিল্য থাকে, শীল-সংকল্পে যদি কষ্ট ভাবনা থাকে,
ব্রহ্মচর্য যদি বিশুদ্ধ না হয়, (তবে) কিছুতে মহৎ ফল দেয় না।।

হস্তী যেমন সংগ্রামে ধনু-নিক্ষিপ্ত শর (সহ্য করে, তেমনি) আমি
অন্যায় দোষারোপ সহ্য করিব, (কেন না) বেশির ভাগ লোকই দুর্বৃত্ত।

১। অর্থাৎ সংশোধন করে।
২। অর্থাৎ জয়পরাজয়ে নিস্পৃহ।
৩। অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যান।
৪। পালি "নিব্বণ" = সংস্কৃত (১) "নির্বন" অর্থাৎ নির্ঝঞ্ঝাট, জঞ্জালহীন. অথবা, (২) নির্বাণপ্রাপ্ত, অথবা (৩) "নির্ব্রণ" অর্থাৎ ব্রণহীন, নীরোগ। এখানে বন শব্দের সিম্বলিক অর্থ কামনাজালজঞ্জাল।

গীতার উক্তি—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ"[১]—ধর্ম্মপদের এই দুই শ্লোকার্ধের সঙ্গে ভাব মিলিয়া যায়

অত্তনা চোদয় 'ত্তানং পটিমংসেথ অত্তনা।

'নিজেকে নিজে ঠেলা দিবে, নিজেই নিজেকে বিচার করিবে।'

অত্তা হি অত্তনো নাথো অত্তা হি অত্তনো গতি।

'আত্মাই আত্মার প্রভু, আত্মাই আত্মার গতি।'

প্রহেলিকার ধরণের সিম্বলিক অর্থময় শ্লোক ("গাথা") ধম্মপদে এক সঙ্গে দুই তিনটি মাত্র পাইয়াছি। একটি যেমন

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ সোত্থিয়ে।
রট্‌ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো যাতি ব্রাহ্মণো।।

'মাতা ও পিতাকে হত্যা করিয়া দুই যজ্ঞপরায়ণ রাজাকে (এবং)
অনুচর সমেত রাষ্ট্রকে হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ শান্ত মনে চলিয়া যায়।।'[২]

ধর্মপদ সংস্কৃত ভাষায় এবং গান্ধারীতে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কথ্য মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায়ও পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত পাঠ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লেখা পুথিতে মিলিয়াছে। তাই তাহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। একটি গাথার পালি ও গান্ধারী পাঠ উদ্ধৃত করিয়া দুইটির ভাষায় ও পাঠে ভিন্নতা দেখাইতেছি।

পালি	গান্ধারী
অভিবাদনসীলিসস	অহিবদনশিলিস
নিচ্চং বুদ্ধাপচাযিনো।	নিচ ব্রিদ্ধবয়ারিণো।
চত্তারো ধম্মা বড্‌ঢন্তি।	চত্বরি তস বর্ধন্তি
আয়ু বণ্ণো সুখং বলম্।।	অয়ো কীর্ত সুহ বল।।
'যে অভিবাদনশীল (ও)	'যে অভিবাদনশীল (ও)
নিত্য বৃদ্ধ-পূজাকারী	নিত্য বৃদ্ধপরিচর্যাকারী
চারটি ধর্ম বাড়ে—	চারটি তাহার বাড়ে—
আয়ু কান্তি সুখ বল।।'	আয়ু কীর্তি সুখ বল।।

সুত্ত-নিপাতে সুত্ত[৩]-সংখ্যা তিয়াত্তর। প্রাচীনত্বের হিসাবে সুত্ত-নিপাতের [৪] কবিতাগুলি মূল্যবান্ এবং সাহিত্য হিসাবে অনেকগুলিই উৎকৃষ্ট। ঋগ্‌বেদে যে সংলাপময় আখ্যান পাইয়াছিলাম তাহার অনুবৃত্তি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সামান্যই আছে, সংস্কৃত (পৌরাণিক) সাহিত্যে আরও কম আছে, এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের ও সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যের আখ্যান ঋগ্‌বেদের আখ্যানের মতো নয়। কিন্তু সুত্ত-নিপাতে প্রাপ্ত দুই একটি আখ্যানে যেন ঋগ্‌বেদের আখ্যানের উত্তরাধিকার সোজাসুজি আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ উত্তরাধিকার বস্তুতে নয় ভাবেও নয়, আধারে গঠনে। উদাহরণ হিসাবে 'ধনিয়-সুক্ত' (সুত্ত-নিপাতের দ্বিতীয় সুত্ত) যথাযথ অনুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি।

১। "নিজেই নিজেকে উদ্ধার করিবে, নিজেকে অবসাদে ফেলিও না।"

২। গাথাটির ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই। সাধারণত মানে করা হয় এইভাবে,—মাতা = বাসনা, পিতা = অহঙ্কার, রাজদ্বয় = জন্ম ও মৃত্যু, সানুচর রাষ্ট্র = সংসার।

৩। শব্দটির মূল সংস্কৃত ধরা হয় "সূত্র"। "সূক্ত" ধরিলে ভালো হয়।

৪। সংস্কৃত করিলে সূক্তনিপাত শব্দের অর্থ সদুক্তি সংগ্রহ। স্মরণ করিতে হইবে ঋগবেদের কবিতার নামও সূক্ত।

এক সম্পন্ন চাষী গৃহস্থের সঙ্গে নির্লিপ্ত বুদ্ধের এই সংলাপ গার্হস্থ্যসুখের সঙ্গে প্রব্রজ্যাসুখের তুলনা যেন "বাদাবাদি তরজা"। বর্ষাকাল। তাই বর্ষণোন্মুখ মেঘকে উদ্দেশ করিয়া ধুয়া ছত্র, 'এখন যদি ইচ্ছা কর তবে ঢালিতে পার, দেবতা।'

ধন্য[১] গোপ — ভাত রাঁধা হইয়াছে দুধ দোহা হইয়াছে আমার।
মহী[২]-তীরে স্থায়ী বাস।
ঘর ছাওয়া আছে, আগুন জ্বালানো আছে।
এখন যদি ইচ্ছা কর ঢালিতে পার দেবতা।। ১।।

ভগবান্[৩] — ক্রোধবিহীন, ক্লেশশূন্য আমি।
মহী-তীরে বাস (আমার) এক রাত্রির জন্য।
ঘর খোলা, আগুন নিভানো।
এখন যদি ইচ্ছা কর, ঢালিতে পার, দেবতা।। ২।।

ধন্য গোপ — ডাঁশ মশা নাই।
ঘাসগজানো সৈকতে গোরু চরিতেছে।
বৃষ্টি আসিলে সহিতে পারিবে।
এখন যদি ইচ্ছা কর, ঢালিতে পার, দেবতা।। ৩।।

ভগবান্ — তৃণ আসন[৪] ভালো করিয়া বাঁধা আছে।
স্রোত সহ্য করিয়া নদী-পারে আসিয়াছি।
তৃণ-আসনে আর প্রয়োজন নাই।
এখন যদি ইচ্ছা কর, ঢালিতে পার, দেবতা।। ৪।।

ধন্য গোপ — পত্নী আমার বশীভূত, অচঞ্চল,
অনেক রাতের সহবাসিনী, প্রিয়া।
তাহার কিছুমাত্র দোষ শুনি না।
এখন যদি ইচ্ছা কর, ঢালিতে পার, দেবতা।। ৫।।

ভগবান্ — চিত্ত আমার বশীভূত, বিমুক্ত,
অনেক রাতের (ধ্যানে) পরাভূত, সুদান্ত[৫]।
পাপ তো আমার নাই।
এখন যদি ইচ্ছা কর, ঢালিতে পার, দেবতা।। ৬।।

ধন্য গোপ — নিজেরই বেতনে খাই পরি আমি।
পুত্রেরাও আমার ভদ্রমতো, সুস্থকায়।
তাহাদের আমি কোন দোষ শুনি না।
এখন যদি ইচ্ছা কর, ঢালিতে পার, দেবতা।।৭।।

ভগবান্ — আমি কাহারও বেতন খাই না।
বেগার[৬] আমি সর্বলোকে বিচরণ করি।

১। নাম হইতে পারে, বিশেষণও হইতে পারে। পালি "ধনিয়"।
২। নদী-নাম।
৩। অর্থাৎ প্রভু বুদ্ধ।
৪। এখানে মানে সোলার ভেলা।
৫। অর্থাৎ উত্তমরূপে দমন করা।
৬। সংস্কৃত "বিষ্টি" = বেগার খাটা।

আমার খোরপোষের আবশ্যক নাই।
এখন যদি ইচ্ছা কর, ঢালিতে পার, দেবতা।।৮।।

ধন্য গোপ — বাঁঝা গাই আছে, সবৎস গাই আছে।
গোঠ আছে, চালাঘরও আছে।
পালের গোদা ষাঁড়ও এখানে আছে।
এখন যদি ইচ্ছা কর, ঢালিতে পার, দেবতা।।৯।।

ভগবান্ — নাই বাঁঝা গাই, নাই সবৎস গাই।
গোঠ (নাই), চালাঘরও নাই।
পালের গোদা ষাঁড়ও এখানে নাই।
এখন যদি ইচ্ছা কর. ঢালিতে পার, দেবতা।।১০।।

ধন্য গোপ — গোঁজ পোতা হইয়াছে, অনড়।
মুঞ্জ ঘাসের দড়ি, নূতন সুঠাম।
তাহা ছিঁড়িতে সবৎস গাইও পারিবে না।
এখন যদি ইচ্ছা কর, ঢালিতে পার, দেবতা।। ১১।।

ভগবান্ — ষাঁড়ের মতো বাঁধন ছিঁড়িয়া
হাতির মতো পুতিলতা দলন করিয়া
আমি আর কখনো গর্ভশয্যায় শুইব না।
এখন যদি ইচ্ছা কর, ঢালিতে পার, দেবতা।।১২।।

ধন্য ও বুদ্ধের বাক্যাবাক্য এই পর্যন্ত আসিলে আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিল। তখন

ধন্য গোপ — আমাদের লাভ তো অল্প নয়।
যে আমরা ভগবান্‌কে দেখিলাম।
'হে চক্ষুষ্মান্,[১] তোমার শরণ লইলাম।
হে মহামুনি, তুমি আমাদের গুরু হও।।'১৪।।
পত্নী আর আমি বিশ্বস্ত (হইয়া)
সুগতের[২] অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব।
জন্ম-মরণের পারগামী (এবং)
দুঃখের মূলনাশকারী হইব।।১৫।।

ধন্যের এই সংকল্প শুনিয়া মার[৩] তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল।

মার পাপী — পুত্রবান্ (ব্যক্তি) পুত্রদের লইয়া সুখী হয়।
গোপেরা তেমনি গোরু লইয়া সুখী হয়।
বাসনা মানুষের দুঃখের হেতু।
সে কখনো দুঃখ পায় না, যাহার বাসনা নাই।।১৭।।

প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় বুদ্ধশিষ্যানুশিষ্যদের গাথার সংগ্রহ 'থেরগাথা' ও 'থেরীগাথা'। থেরগাথা[৪] ভিক্ষুদের রচনা, থেরীগাথা[৪] ভিক্ষুণীদের। এই দুই গ্রন্থে এমন কিছু কিছু কবিতা

১। অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানবান্।
২। বুদ্ধের এক নাম সুগত, যেহেতু তিনি উত্তম গতি অর্থাৎ নির্বাণপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।
৩। বৌদ্ধমতে শয়তান (Satan) স্থানীয়।
৪। থের = সংস্কৃত স্থবির (= বৃদ্ধ), থেরী = স্থবিরা (= বৃদ্ধা)। পালি যে বৌদ্ধমতের শাস্ত্রভাষা তাহাতে থের থেরী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সর্বোচ্চ শ্রেণী।

আছে যাহাতে বৌদ্ধধর্ম অথবা অপর কোন ধর্মেরই রঙ চড়ে নাই। এই কবিতাগুলি রচয়িতাদের ধর্মের পথে আসিবার আগে লেখা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহাদের পরবর্তী, ধর্মঘটিত, রচনার সঙ্গে এগুলিও প্রতিফলিত মাহাত্ম্যযোগে সংগ্রহমধ্যে স্থান পাইয়াছে। এ ধরণের কবিতা সবই খুব ছোট (কয়েকটি গাথার পাঠান্তর ধম্মপদে পাওয়া যায়।)

একটি ছোট ভালো গাথা উদ্ধৃত করিতেছি। রচয়িতার নাম বিমল। বর্ষার প্রসন্নতা জলে স্থলে আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া মানুষের মনের উগ্রতা প্রশমিত এবং কবির চিত্ত একাগ্র করিতেছে।

ধরণী চ সিচ্চতি বাতি মালুতো বিজুতা চরন্তি নভে।
উপসম্মন্তি বিতক্কা চিত্তং সুসমাহিতং ময়া।।

'ধরণী সিক্ত হইতেছে, বাতাস বহিতেছে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। বিতর্ক থামিয়া যায়। চিত্ত আমার সুসমাহিত।।'

প্রায় আধুনিক কালের কবিতার মতোই চমৎকার বর্ষাশোভার ছবি রহিয়াছে সপ্পক (বা সব্বক) কবির গাথায়। কবিতাটির চার শ্লোকের।

যদা বলাকা সুচিপণ্ডরচ্ছদা
কালস্‌স মেঘস্‌স বয়েন তজ্জিতা।
পলেহিতি আলয়মালয়েসিনী
তদা নদী অজকরণী রমেতি মং।।১।।

'শুচিশুভ্র-পক্ষ বলাকা যখন কালো মেঘের ভয়ে তাড়িত (ও) আশ্রয়কামী (হইয়া) আশ্রয় খুঁজিতে ছুটিবে তখন নদী অজকর্ণী আমাকে মুগ্ধ করে।।'

যদা বলাকা সুবিসুদ্ধপণ্ডরা
কালস্‌স মেঘস্‌স ভনে তজ্জিতা।
পরিয়েসতি লেণমলেণদস্‌সিনী
তদা নদী অজকরণী রমেতি মং।।২।।

''সুবিশুদ্ধ শুভ্রকায় বলাকা যখন কালো মেঘের ভয়ে তাড়িত (হইয়া) নীড় না দেখিয়া নীড় খুঁজিয়া ফিরে তখন নদী অজকর্ণী আমাকে মুগ্ধ করে।।'

কং নু তখ ন রমেন্তি জম্বুয়ো উভয়ো তহিং।
সোভেন্তি আপগাকূলং মম লেণসস্ পচ্ছতো।।৩।।

'কাহাকে না মুগ্ধ করে। সেখানে দুই দিকে জামগাছের শ্রেণী নদীতীরে শোভা পায়—আমার বাসগুহার পিছনে।।'

তা মতমদসঙ্ঘসুপ্পহীনা[১] ভেকা মন্দবতী পনাদয়ন্তি।
নাজ্জ গিরিনদীহি বিপ্রবাসসময়ো খেমা অজকরণী সিবা সুরম্মা।।৪।।

'..... মণ্ডুকেরা বীণা বাজাইতেছে। আজ আর গিরিনদী হইতে দূরে থাকিবার সময় নয়। অজকর্ণী এখন কল্যাণী মঙ্গলময়ী সুন্দরী।।'

থেরী-গাথাগুলি প্রায় সবই রচয়িত্রীদের প্রব্রজ্যাগ্রহণের পরে লেখা। তাই সেগুলিতে ধর্মের ফলশ্রুতি আছে। তবুও বর্ণনার গুণে কোন কোন গাথা মনোরম। যেমন বণিক্ মধ্যের কন্যা অনুপমা (মূলে ''অনোপমা'') থেরীর গাথা। যথাযথ অনুবাদ দিতেছি।

উচ্চকুলে আমি জন্মিয়াছি। অনেক সম্পত্তি অনেক ধন।
আমার রঙ আছে রূপ আছে। মধ্যের নিজের মেয়ে আমি।।১।।

১। এই অংশের অর্থগ্রহণ হয় না। পাঠে ভ্রম থাকা সম্ভব।

রাজপুত্রেরা প্রার্থনা করিয়াছিল, বণিকপুত্রেরা লোভ করিয়াছিল।
(তাহারা) পিতার কাছে দূত পাঠাইয়াছিল, 'অনুপমাকে দাও'।।২।।
'যতটা তোমার মেয়ের—এই অনোপমার—ওজন,
তাহার আটগুণ দিব—সোনায় ও রত্নে'।।৩।।
সেই আমি লোকজ্যেষ্ঠ অনুত্তর সম্বুদ্ধকে দেখিয়া
তাঁহার পদদ্বয় বন্দনা করিয়া একধারে বসিলাম।।৪।।
তিনি, গৌতম, অনুকম্পা করিয়া আমাকে ধর্ম শিক্ষা দিলেন।
সেই আসনে বসিয়াই আমি (সাধনার) তৃতীয় ফল পাইলাম।।৫।।
তাহার পর কেশ মুড়াইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা লইলাম।
আজ আমার সপ্তম রাত্রি। এখন তৃষ্ণা শুখাইয়া গিয়াছে।।৬।।

'উদ্যান' বুদ্ধের সূক্তি, সুতরাং নীতিগর্ভ। যেমন

নোদকেন সুচী হোতি বহ্বেত্থ স্থায়তী জনো।
যস্মি সচ্চং চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।।

'জলে পবিত্র হওয়া যায় না। এখানে তো বহু লোকেই স্নান করে।
যাহার মধ্যে সত্য ও ধর্ম (আছে) সেই পবিত্র সে-ই ব্রাহ্মণ।।'

জাতক

'জাতক' বলিতে নীতিকথামূলক গল্প, যাহার বীজ সাধারণত গাথায় পাই। এ গল্পে যিনি নায়ক (অর্থাৎ বুদ্ধিতে শক্তিতে সাহসে ধৈর্যে ক্ষমায় সহিষ্ণুতায় কর্তব্যকর্মে পরোপকারে নীতিতে ও ধর্মজ্ঞানে যাঁহারই শ্রেষ্ঠ ভূমিকা) তিনি পশু পক্ষী অথবা মানব যে রূপধারীই হোন—বিগত সেই সেই জন্মে ভবিষ্য-বুদ্ধের অবতার ছিলেন। মানুষের চরিত্র লইয়া নীতি-গল্প রচনা আমরা বৈদিক গদ্য সাহিত্যে লক্ষ্য করিয়াছি। পশুপক্ষী লইয়া নীতিগল্পের আভাস সেখানে অল্পই পাইয়াছি। তবে ঋগ্বেদের একটি ঋকে পক্ষী-ঘটিত একটি নীতিগল্প আভাষিত আছে যা পরবর্তী সাহিত্যে একটু অন্যভাবে পাই। এই ঋক্‌টি উপনিষদে সিম্বলিক অর্থে গৃহীত এবং উপনিষদের সূত্রেই শ্লোকটি এখন আমাদের পরিচিত।[১] পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের 'ভারণ্ডপক্ষিকথা' বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। এই গল্পেরই যে বীজ ঋগ্‌বেদের কবিতায় আছে তাহা প্রমাণ করিতে ঋক্‌টির অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

দুইটি পক্ষী তাহারা সংযুক্ত ও বন্ধুভাবাপন্ন।
একই গাছের ডালে বসিয়া আছে।
তাহাদের এক জন মিষ্ট ফল খাইতেছে।
না খাইয়া অপরটি চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে।

যে সব নীতিকথা ও গল্প বৌদ্ধ জাতকে, বৌদ্ধ ও সংস্কৃত পুরাণে ও পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি আখ্যায়িকাগ্রন্থে গদ্যে-পদ্যে পুরাপুরি গল্পের আকারে পাই সেগুলি সেকালে ধর্মমতনির্বিশেষে সকলের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। ব্রাহ্মণের শাস্ত্র উপদেশ পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই পড়িবার শুনিবার জন্য। তাই লোকপ্রচলিত গল্পগুলি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে উপেক্ষিত এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রে সাদরে সংগৃহীত ও পরিমার্জিত। মহাভারতের মতো ইতিহাস-পুরাণগ্রন্থ অনেকটা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য রচিত। তাই সেখানে নীতিগল্প বর্জিত হয় নাই। পরবর্তীকালে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থের

১। ঋগবেদ ১.১৬৪. ২০।

প্রয়োজনে নীতিগল্প লইয়া সংস্কৃত গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল, সেকথা আগে বলিয়াছি। ভাস্কর্য শিল্পে জাতক গল্পের ব্যবহার খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারহুত স্তূপে মিলিয়াছে।

জাতক-গাথাগুলি লোকপ্রচলিত নীতিগল্পের মতো এক দুই বা ততোধিক শ্লোকের আকারে চলিয়া আসিয়াছিল। এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রে জাতকগুলি প্রথমে গাথার আকারেই সংগৃহীত হইয়াছিল। পরে তা গাথারূপ আঁটির গায়ে গদ্য শাঁস লাগাইয়া বিস্তারিত রূপ পাইয়াছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে। পালি খুদ্দক-নিকায়ে সংগৃহীত জাতকগুলি সংখ্যায় ৫৪৭। সবচেয়ে ছোটগুলি এক শ্লোকের, আর সবচেয়ে বড়টিতে ৭৬৮ শ্লোক আছে। জাতকে সবশুদ্ধ ২৪৪০ শ্লোক (গাথা) আছে।[১]

মূল গাথারূপে জাতকের কিছু উদাহরণ দিই। মিতচিন্তী জাতক।

> বহুচিন্তী অপ্পচিন্তী উভো জালে অবজ্ঝরে।
> মিতচিন্তী প্রমোচেসী উভো তত্থ সমাগতা।।
> 'বহুবুদ্ধি ও অল্পবুদ্ধি উভয়েই জালে বদ্ধ হইল।
> পরিমিতবুদ্ধি পলাইল। উভয়ে সেখানে আনীত হইল।[২]

যিনি পঞ্চতন্ত্রে প্রত্যুৎপন্নমতি মৎস্যের গল্প পড়িয়াছেন তিনি, কিছু কিছু অমিল থাকিলেও সহজেই পালি জাতকটির বস্তুটুকু বুঝিতে পারিবেন। পঞ্চতন্ত্রে গল্পের বীজ এই শ্লোক।

> অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিস্তথা
> দ্বাবেতৌ সুখমেধেতে যদ্‌ভবিষ্যো বিনশ্যতি।।

'যে ভবিষ্যতের প্রতিকার ভাবিয়া রাখে আর যাহার বুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে খেলে,—এই দুই জন সুখ ভোগ করে। যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন সে বিনষ্ট হয়।।'

পঞ্চতন্ত্রে 'মকরবানরকথা' আমাদের অনেকেরই পড়া অথবা শোনা আছে। এই দীর্ঘদিন ধরিয়া কাহিনীটির খুব চল ছিল। ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর মন্দিরের বহির্ভিত্তিতে ভাস্কর্যচিত্রণে এই গল্পটি অঙ্কিত আছে, দেখিয়াছি। পালি জাতকে, গল্পটির রূপান্তর খুব সামান্যই। সেখানে নাম 'সুসুমারজাতক'। দুইটি গাথা আছে. উপসংহারে নায়কের উক্তি।

> অলমেতেহি অম্বেহি জম্বুহি প'নসেহি চ।
> যানি পারং সমুদ্দস্স বরং মষ্হং উদুম্বরো।।১।।
> 'প্রয়োজন নাই (আমার) এই সব আম জাম কাঁঠালে,
> যা (আছে) সমুদ্রের ওপারে। ডুমুরই আমার ভালো'।।১।।
> মহতী বত তে বোন্দি ন চ পঞ্ঞা তদূপিকা।
> সুসুমার[৩] বঞ্চিতো ভেসি গচ্ছ দানিং যথাসুখং।।২।।
> 'বিরাট তোমার ভুঁড়ি, বুদ্ধি কিন্তু তাহার মাপে নয়।
> হে শিশুমার,[৩] তুমি ঠকিলে। এখন যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও।।'২।।

ঈসপ্‌স্ ফেবল্‌সের মতো বিদেশী নীতিগল্প-সংগ্রহের কোন কোন কাহিনীর সঙ্গে জাতক-কাহিনীর আশ্চর্য মিল দেখা যায়। ভারতবর্ষের গল্প যে কিছু কিছু ইউরোপে গিয়াছিল তাহা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন। তবে ভারতবর্ষে ও ইউরোপে (অথবা অন্যদেশে) একই নীতিবাহী গল্পের কতকটা একই রূপ নেওয়ায় সর্বদা ঋণসম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। সভ্য

১। বিহার গভর্নমেন্ট পালি প্রকাশন বোর্ড প্রকাশিত ও ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ সম্পাদিত গ্রন্থ অনুসারে।

২। অর্থাৎ বহুবুদ্ধি-অল্পবুদ্ধিকে বিক্রয়ের জন্য হাটে আনা হইল।

৩। শুশুক। পালিতে "সুংসুমার" পাঠও আছে।

মানুষের সত্য ও সাহিত্য-চিন্তার মূলে সাধারণ মানুষের যে মৌলিক বুদ্ধি ক্রিয়াশীল তাহা সব দেশে প্রায় একই রকম। সুতরাং মিল থাকিলেই যে দেনা-পাওনা সম্পর্ক ধরিতে হইবে তাহা নয়। মনে হয় এমন একটি আকস্মিক মিল ঈসপের সোনার ডিম-পাড়া হাঁসের গল্পের ও 'সুবন্ন-হংস' জাতকের মধ্যে রহিয়াছে। জাতক গাথাটি এই

যং লব্ধং তেন তুট্‌ঠব্বং অতিলোভো হি পাপকো।
হংসরাজং গহেত্বান সুবণ্ণা পরিহায়থা।।

'যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তুষ্ট থাকা উচিত। অতিলোভ পাপ কাজ। রাজহংসকে গ্রহণ করিয়া (তুমি)সোনা হারাইলে।।"

এই জাতকবীজটি অবলম্বন করিয়া পরে যে গদ্য-গল্প নির্মিত হইয়াছে তাহাতে আছে যে কোন এক পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব[১] সুবর্ণহংস রূপে জন্মিয়াছিলেন! তাহার আগেকার জন্মে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। হংস-জন্ম পাইয়াও তিনি ব্রাহ্মণ-জন্মের কথা ভুলেন নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণ-জন্মের স্ত্রী-কন্যারা দাসীবৃত্তি করিতেছে জানিয়া তিনি একদিন তাহাদের কাছে গিয়া বলিলেন, 'আমি রোজ তোমাদের একটি করিয়া সোনার পালক ফেলিয়া দিয়া যাইব। সেই সোনার পালক বেচিয়া স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইও।' এই উপায়ে ব্রাহ্মণী ধনী হইল কিন্তু তাহার লোভ বাড়িতে লাগিল। সে প্রত্যহ একটি করিয়া পালক পাইয়া আর সন্তুষ্ট রহিল না। একদিন সে হংসরূপী বোধিসত্ত্বকে পাকড়াইয়া তাহার সমস্ত পালক ছিঁড়িয়া লইল। বোধিসত্ত্ব স্বেচ্ছায় পালক পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া সে পালক সোনার রহিল না সাধারণ হাঁসের পালকের মতো সাদা হইয়া গেল। গাথাটি এই সময়ে বোধিসত্ত্বের উক্তি।

গদ্য-গল্পে কাহিনীকে আরও বাড়ানো হইয়াছে। পালক ছিঁড়িয়া লওয়ায় রাজহংস উড়িতে পারিল না। তখন ব্রাহ্মণী তাহাকে যত্ন করিয়া পুষিতে লাগিল। ক্রমশ তাহার পালক গজাইল কিন্তু সোনার নয়, বকের পালকের মতোই শাদা। বোধিসত্ত্ব উড়িয়া গেলেন। বিগত জন্মের স্ত্রী-কন্যাকে আর কখনো দেখিতে আসেন নাই।

গাথার গল্পবীজ হইতে সোনার ডিমের কল্পনাও সহজে আসিতে পারে। যাঁহারা হাঁসের ডিম আহার করেন না তাঁহাদের পক্ষে পালক কল্পনাই সঙ্গততর। তাছাড়া ডিম নেওয়া মানে ভ্রূণ নষ্ট করা। অহিংস বৌদ্ধশাস্ত্রের পক্ষে তাহা অকরণীয়। তবুও সোনার পালক কল্পনাকে অর্বাচীন বলা চলে না। ল ফন্‌ত্যানের গল্পে সোনার পালকের কথা আছে। বাংলাদেশের রূপকথাতেও এমন এক গল্প চলিয়া আসিয়াছে যাহার বীজ হয়ত জাতকের গাথা হইতে নয়, গাথারও আগেকার স্মৃতিভাণ্ডার হইতে আগত।[২] নীতিকথা-রূপকথার তৌলন আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়া বাংলা রূপকথার আসল অংশটুকু বলিতেছি।

দুই ভাই থাকে পাশাপাশি বাড়িতে। বড় ভাই ধনী, ছোট ভাই গরীব। ছোট ভাইয়ের যমজ পুত্র। একদিন ছোট ভাই বনে শিকার করিতে গিয়া এক সোনার পাখি দেখিল এবং তাহার দিকে তীর ছুঁড়িল। তাহাতে একটি পালক ফেলিয়া পাখি উড়িয়া গেল। সে দেখিল পালক সোনার। ঘরে ফিরিয়া দাদাকে দেখাইলে দাদা তা কিনিয়া লইল এবং পরের দিন পাখিটাকে ধরিয়া আনিতে বলিল। পরের দিন শিকারে গিয়া ছোট ভাই পাখিটা ধরিল এবং আনিয়া দাদাকে দিল। দাদা ভাবিল পাখিটাকে খাইলে সে প্রত্যহ সোনা পাইবে। সে তাহার স্ত্রীকে পাখিটা রাঁধিয়া দিতে বলিল। রান্না হইবার পর বড় ভাইয়ের স্ত্রী অন্য ঘরে গিয়াছে এমন সময়ে ছোট ভাইয়ের পুত্র দুইটি আসিয়া পাখির মেটে ও ফুসফুস খাইয়া ফেলিল। বড় ভাইয়ের স্ত্রী

১। বুদ্ধত্ব পাইবার পূর্বে বুদ্ধের অবস্থা ও সাধারণ নাম।

২। মূলে কি স্বর্ণবিষ্ঠা-ত্যাগের কথা ছিল? মহাভারতে সুবর্ণষ্ঠীবী রাজার গল্প আছে। সে থুতু ফেলিলে তা সোনা হইয়া যাইত।

আসিয়া ব্যাপার বুঝিল, এবং স্বামীর রোষ এড়াইবার জন্য অন্য এক পাখি মারিয়া তাহার মেটে ও ফুসফুস রাঁধিয়া সোনার পাখির মাংসের মধ্যে মিশাইয়া দিল। অতঃপর যমজ ভাই দুইটি প্রত্যহ সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বালিশের নীচে দুইটি করিয়া সোনার মোহর পাইতে লাগিল। বড় ভাই একেবারেই বঞ্চিত হইল। ধূর্ত বড় ভাই ছোট ভাইকে বুঝাইল যে তাহার ছেলে দুইটিকে ভূতে পাইয়াছে। বোকা ছোট ভাই তাহাদের তাড়াইয়া দিল। কিছু দূর একসঙ্গে গিয়া যমজ ভাইদের ছাড়াছাড়ি হইল। তাহার পর কাহিনীতে শুধু ছোট যমজ ভাইটির কথাই আছে। সে বুদ্ধি ও সাহস বলে এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

দীর্ঘতর জাতক-গাথাগুলি অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এগুলির গঠনে যে বৈদিক আখ্যান-গাথারই কালোচিত রূপান্তর তা সহজে বোঝা যায়। এ গাথাগুলির বিষয় ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-ইতিহাস ও জানপদ কথা হইতে সংগৃহীত।

ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-ইতিহাস ও প্রাচীন কাব্যগাথা হইতে নেওয়া জাতকগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ঘটপণ্ডিত' (৪৫৪) ও 'দসরথ' (৪৬১) জাতক দুটি। প্রথমটির বিষয় কৃষ্ণকথা, দ্বিতীয়টির বিষয় রামকথা।

ঘটপণ্ডিত-জাতকের গাথাগুলিতে কৃষ্ণের শৈশবলীলার সামান্য কিছু উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্য দিক দিয়া এই জাতকটি বিশেষ মূল্যবান। এখানে বলরামের নাম ঘটপণ্ডিত এবং তিনি কৃষ্ণের কনিষ্ঠ। দুই ভাইকেই কেশব বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের পোষা খরগোস মরিয়াছে, কৃষ্ণ তাহার শোকে মুহ্যমান হইয়া শুইয়া আছে। ঘট তাহাকে উঠাইয়া প্রবোধ দিয়া বলিল খরগোসের অভাব কি।

> সোবণ্ণময়ং মণীময়ং লৌহময়ং অথ রূপিয়াময়ং
> সঙ্খসিলাপ্রবালময়ং কারয়িস্সামি তে সসং।।
> সন্তি অঞ্ঞে পি সসকা অরঞ্ঞে বনগোচরা।
> তে পি তে আনয়িস্সামি কীদিসং সসমিচ্ছসি।।

'সোনার মণিমাণিক্যের লোহার কিংবা রূপার শাঁখের পাথরের পলার শশ তোমাকে করাইয়া দিব।

অন্য অনেক শশও আছে, অরণ্যে বনে পাওয়া যায়। সেও অনেক আনাইয়া দিতে পারি। কি রকম শশ চাও।।'

কন্‌হ[১] উত্তর দিল

> ন চাহমেতে ইচ্ছামি যে সসা পথবিস্সিতা।
> চন্দতো সসমিচ্ছামি তং মে ওহর কেশব।।

'এ সব আমি চাই না—যে শস পৃথিবীতে আশ্রিত। চন্দ্র হইতে আমি শশ চাই। হে কেশব, তাই আমাকে আনিয়া দাও।।'

ঘট শেষপর্যন্ত কৃষ্ণকে ভুলাইতে পারিয়াছিল।

ঘটপণ্ডিত জাতকে সেকালের "শিশু"-সাহিত্যের একটু আভাস পাওয়া গেল।

দশরথ-জাতকে এক বিনষ্ট পূর্ণতর জাতক-আখ্যায়িকার শেষ অংশের তেরটি গাথামাত্র আছে। আরম্ভ আকস্মিক, শেষ জোড়াতাড়া। তবে এটুকুকে যদি রামভরত-সংবাদ বলিয়া নেওয়া যায় তবে খণ্ডিত ধরিবার আবশ্যকতা নাই।

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসে আছেন। দশরথের মৃত্যু হইলে ভরত আসিয়া তাহাদের খবর দিল। ভরতের উক্তিতে জাতক-কাহিনী শুরু।

১। সংস্কৃত কৃষ্ণ = পালি কন্‌হ।

এথ লক্‌খন সীতা চ উভো ওতরথোদকং।
এবয়াং ভরতো আহ রাজা দসরথো মতো।।

"'এস (তোমরা দুই জন), লক্ষ্মণ ও সীতা, উভয়ে জলে নামো।"
এই কথা সে ভরত বলিল, "রাজা দশরথ মরিয়াছেন।'"
তাহার পরেই রামকে বলিল

কেন রাম প্রভাবেন সোচিতব্যং ন সোচসি।
পিতরং কালকং সুত্বা ন তং পসহতে দুখং।।

'রাম, কোন্ শক্তিবলে শোকের ব্যাপারেও শোক করিতেছ না?
পিতাকে কালগত শুনিয়া দুঃখ তোমায় হানিতেছে না?

তাহার পর শেষ গাথা ছাড়া সবই রামের উক্তি। তাহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতো নিরাসক্ত মনেরই প্রতিফলন এবং তাহা ধর্মপদের সূক্তিতে আকীর্ণ। শেষে রাম বলিলেন, অতঃপর আমি রাজধর্ম পালন করিব।

সোহং দস্‌সং চ ভোক্‌খং চ ভরিস্সামি তু ঞাতকে।
সেসং চ পালয়িস্‌সামি কিচ্চমেতং বিজানতো।।

'সেই আমি দান করিব, ভোগ করিব, ভরণ করিব জ্ঞাতিদের।
অপর সকলকে পালন করিব।—এই আমার কর্তব্য জানিয়ো।।'

তাহার পর সমাপ্তি-গাথা।

দশ বস্ সহস্‌সানি সট্‌ঠি বস্ সসতানি চ।
কম্বুগ্‌গীবো মহাবাহু রামো রজ্জমকারয়ি।।

'দশ হাজার বছর আর ষাট শ বছর কম্বুগ্রীব[১] মহাবাহু রাম রাজত্ব করিয়াছিলেন।।'

'কুস-জাতক' (৫২১) একটি সংলাপময় আখ্যান-কাব্য। মদ্র-রাজকন্যা প্রভাবতীর সহিত কুশরাজার বিবাহ হইয়াছে। কুশ অত্যন্ত কালো ও কুদর্শন বলিয়া সুন্দরী প্রভাবতী পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছে। কুশ পত্নীকে ফিরাইয়া আনিতে রাজধানী কুশাবতী ছাড়িয়া যাইতেছে। প্রথম গাথায় মাতার প্রতি কুশের উক্তি।

এই (রহিল) তোমার রাষ্ট্র—ধনসমেত,
যানবাহনসমেত, সর্ব্বালঙ্কার-সমেত।
ওগো মা, তোমার এই রাজ্য (তুমিই) শাসন করো।
যাই আমি যেখানে প্রিয়া প্রভাবতী।

পরের গাথা প্রভাবতীর উক্তি। (ইতিমধ্যে কুশ মদ্র-রাজধানীতে তাহার কাছে পৌঁছিয়াছে।) প্রভাবতী কুশকে আমলই দিল না। বলিল

কুশ, তুমি এখনি কুশাবতী ফিরিয়া যাও।
কালো কুৎসিতের সঙ্গে আমি বাস করিতে চাহি না।।

তিনটি গাথায় জবাব দিল কুশ। সে প্রভাবতীর সৌন্দর্যে পাগল হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতে যে সে আসিয়াছে তাহারও ঠিক নাই। সে বলিল, হে শোভন-সুন্দরী, আমি তোমাকে চাই, রাজ্য চাই না।

ঋগ্‌বেদ-গাথার উর্বশীর মতোই যেন প্রভাবতী বলিল

১। যাহার গ্রীবায় শাঁখের মতো খাঁজ থাকে। সেকালে ইহা দেহসৌন্দর্যের এক বড় চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত।

দুর্ভাগ্য তাহার ঘটে যে অনিচ্ছুককে ইচ্ছা করে।
রাজা তুমি অকামাকে কামনা করিতেছ, যে ভালোবাসে না
তাহাকে পাইতে চাহিতেছ।

কুশের উত্তর গোঁয়ার বীরের মতো।

অকামা অথবা সকামা—যে মানুষ প্রিয়াকে লাভ করে, তাহার লাভই এখন প্রশংসা
করি। না পাওয়াটাই পাপ।।

প্রভাবতী বলিল

পাথরের ভিতর খুঁড়িতেছ কর্ণিকার কাঠ দিয়া!
হাওয়াকে জালে আটকাইতেছ! তুমি যে অনিচ্ছুককে চাহিতেছ।।

কুশ উত্তর দিল

পাষাণ তো তোমার মৃদুলক্ষণ হৃদয়ে নিহিত।।

তবুও কুশ আশা ছাড়িল না, নিজের দাবি জানাইয়াই চলিল। সে মনে মনে ঠিক করিল

যখন রাজপুত্রী ভ্রূকুটি করিয়া আমার দিকে তাকাইবে
তখন আমি মদ্র-রাজার অন্তঃপুরে জলবাহক হইব।।
যখন রাজপুত্রী হাসিয়া আমার দিকে তাকাইবে
তখন আমি জলবাহক হইব না, তখন আমি, কুশ, রাজা হইব।।

রাজপুত্রী কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। কুশ ছদ্মবেশে রাজান্তঃপুরে দাসের কাজ করিতে লাগিল।

এদিকে প্রভাবতীকে পাইবার বাসনায় সাত রাজা সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিয়া মদ্র-রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা মদ্র-রাজকে এই চরমপত্র দিল।

এই সব হাতি প্রস্তুত রহিয়াছে। সকলে বর্ম পরিয়া রহিয়াছে।
নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আগে প্রভাবতীকে আনিয়া দাও।।

উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা ঠিক করিলেন

সাতটি সর্ত করিয়া আমি এই প্রভাবতীকে দিব,
ক্ষত্রিয়দের যাহারা আমাকে মারিতে এখানে আসিয়াছে।।

শুনিয়া প্রভাবতী বিলাপ করতে করিতে মাতাকে অনুরোধ করিল

দূরপথের যাত্রী ক্ষত্রিয়েরা যদি (শুধু আমার) মাংসটুকু লয়,
তবে, মা, আমার হাড়গুলি চাহিয়া লইয়া পথের ধারে দাহ করিও।।
ওগো মা, একটু মাটি খুঁড়িয়া সেখানে কণিকার পুতিও।
যখন তাহারা ফুল ধরিবে, হেমন্তের[১] হিম কাটিয়া গেলে,
তখন, মা আমার কথা মনে পড়িবে—'এই রঙেরই (ছিল) প্রভাবতী'।

রানী বলিলেন, তুমি তো আমার কথা শোন নাই। কুশকে গ্রহণ করিতে যদি তবে ধন্য হইতে পারিতে। তখন তোমার

দ্বারে ঘোড়া ডাকিত, ঘরে শিশু কাঁদিত।
ক্ষত্রিয়ের ঘরে, বাছা, আর কি বেশি সুখের আছে।।

প্রভাবতী তখন বিলাপ করিয়া বলিল

কোথায় এখন সেই শত্রুমর্দন পররাষ্ট্রপ্রমর্দন
উদার প্রজ্ঞাবান্ কুশ যে আমাদের বিপদ হইতে মোচন করিতে পারে।।

১। হেমন্ত = শীতকাল।

রাজকন্যার সখী কুশের রহস্য জানিত। রাজকন্যার বিলাপ শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল

এখানেই (রহিয়াছেন) সেই শত্রুমর্দন পররাষ্ট্রপ্রমর্দন
উদার প্রজ্ঞাবান্ কুশ, যিনি উহাদের সকলকে বধ করিবেন।।

বিস্মিত হইয়া প্রভাবতী বলিল

পাগলের মতো বকিতেছিস, অবোধশিশুর মতো বলিতেছিস।
কুশ যদি এখানে হাজির থাকিত, আমরা কি তাহাকে চিনিতাম না।।

তখন দাসী দেখাইয়া দিল।

ওই যে জলবাহক পোষ্য কুমারীমহলের ভিতরে
অবনত হইয়া দৃঢ় করিয়া ঘড়া মাজিতেছে।।

প্রভাবতী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল

তুই বেণী, তুই চণ্ডালী অথবা তুই কুলনাশিনী।
মদ্রকুলে জন্ম লইয়া কেমনে তুই দাসকে উপপতি করিলি।।

দাসী বলিল

আমি বেণী নই, চণ্ডালী নই, কুলনাশিনীও নই।
তোমার ভালো হোক, ইক্ষ্বাকুপুত্র উনি—তুমি দাস মনে করিতেছ।।

দাসী এই পর্যন্ত বলিতে কুশ আসিয়া নিজের গুণ ছয় গাথায় বর্ণনা করিল। দাসীর শেষ গাথার মতো এই ছয় গাথায়ও দ্বিতীয় চরণে এই ধুয়া

ওক্খাকপুত্তো ভদ্দন্তে তং তু দাসো তি মঞ্ঞসি।।

রাজা কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন

যাও, বালিকা, মহাবল কুশ রাজার ক্ষমা চাও।
ক্ষমা করিলে কুশ রাজা তোমাদের জীবন দান করিবেন।।

পিতার কথা শুনিয়া প্রভাবতী কুশের পায়ে মাথা রাখিল।

হাতির উপর চড়িয়া কুশ যুদ্ধ করিতে গেল। কিন্তু যুদ্ধ করিতে হইল না, বার কয়েক সিংহনাদ ছাড়িতেই সাত রাজার চতুরঙ্গ সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। সাত রাজাকে বন্দী কবিয়া আনিয়া কুশ শ্বশুরকে উপহার দিল। মদ্ররাজ বলিলেন, 'ইহারা তোমারই শত্রু। তুমি যাহা করিবার করিতে পার।' কুশ ভালো যুক্তি দিলেন

এই তো আপনার সাত মেয়ে দেবকন্যার মতো সুন্দরী।
ইহাদের এক এক করিয়া দিয়া দিন। আপনার সাত জামাই হোক।।

তাহাই হইল। সাত রাজা খুশি হইয়া চলিয়া গেল। সাত-রাজার যুদ্ধে কুশের সিংহনাদ শুনিয়া প্রীত হইয়া ইন্দ্র তাহাকে বৈরোচন মণি দিলেন। বৈরোচন মণি পরিতেই কুশের দুর্বর্ণ দূর হইল। প্রভাবতীকে লইয়া কুশ কুশাবতীতে ফিরিয়া আসিল। মাতা পুত্রকে ফিরিয়া পাইল।

রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের বিষয় এই 'কুশজাতক'।

বৌদ্ধ-সংস্কৃত অবদান

উত্তরাপথের বৌদ্ধেরা সম্প্রদায়নির্বিশেষে তাঁহাদের শাস্ত্র সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে কথা আগে বলিয়াছি। ইহাও বলিয়াছি যে বৌদ্ধদের শাস্ত্র-ব্যবহৃত সংস্কৃত পাণিনীর ব্যাকরণের বাঁধনমানা খাঁটি সংস্কৃত নয়। সে ভাষায় তখনকার দিনের কথ্য ভাষা হইতে শব্দ পদ ও পদপ্রয়োগরীতি আবশ্যক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছিল। তবে এই বৌদ্ধ-সংস্কৃত (বা বৌদ্ধ মিশ্র-সংস্কৃত) একটিমাত্র আদর্শভূত (standardized) ভাষা নয়। গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে এ ভাষার কিছু কিছু রূপান্তরও দেখা যায়। এমন কি একই গ্রন্থের গদ্যাংশের ভাষা সর্বত্র এক রকম নয়। পদ্যের তুলনায় গদ্যের ভাষা বিশুদ্ধতর।

বৌদ্ধ-সংস্কৃত শাস্ত্রে পালি শাস্ত্রের মতো বিষয়-অনুযায়ী গ্রন্থবিভাগ নাই। বুদ্ধবচনব্যাখ্যা ভিক্ষুভিক্ষুণীচর্যা জাতক ও পুরানো গল্প—সবই সাধারণত একই গ্রন্থে সংকলিত। পরে যাহারা মহাযান-মতকে গঠন করিয়া তত্ত্ব আলোচনায় এবং সূক্ষ্মতর দার্শনিক বিশ্লেষণে রত হইয়াছিলেন তাঁহাদের গ্রন্থ ঠিক শাস্ত্র নয় এবং তাঁহাদের রচনা সাধারণ সংস্কৃত হইতে খুব ভিন্ন নয়। বৌদ্ধ-সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে যে সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়া যাইবার প্রবণতা দেখা যায় তাহার মূলে মহাযানিক মহাপণ্ডিত দার্শনিকদের প্রয়াস।

বৌদ্ধ-সংস্কৃত শাস্ত্র যখন সংকলিত হয় তখন দক্ষিণাপথের হীনযানিক থেরবাদীদের মতো উত্তরাপথের বৌদ্ধমতাবলম্বীদের মধ্যে—তা সে মহাযানিক মহাসাঙ্ঘিক ইত্যাদি হোক অথবা হীনযানিক মূলসর্বাস্তিবাদী হোক—সংঘে পণ্ডিত-মূর্খের ভিন্নতা ছিল না। তাই জনসমাজে প্রচলিত ভদ্রভাষায় তাঁহাদের শাস্ত্রকে সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিতে হইয়াছিল। এ ভাষা সংস্কৃত (প্রাচীন আর্য) বটে এবং প্রাকৃতও (মধ্য আর্য) বটে। তাহার পর সব ধর্মেই যেমনটি ঘটিয়াছে —শাস্ত্র গড়া হইলে পর শাস্ত্রের শাসন দৃঢ়তর হইতে থাকে, শাস্ত্রও কঠিনতর হইতে থাকে—উত্তরাপথের বৌদ্ধসংঘে তাহাই ঘটিয়াছিল। তবে উত্তরাপথের বৌদ্ধসংঘে, বিশেষ করিয়া মহাযানে, থেরবাদের মতো শুধু প্রব্রজ্যা ও শ্রামণ্যকেই চরম বলিয়া মানা হয় নাই। উভয়ের মাছামাঝি আধ্যাত্মিক অবস্থাও স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে মিলনের পথ খানিকটা খোলা ছিল। এই সূত্রেই উত্তরাপথের বৌদ্ধসংঘে স্থাপত্য শিল্পচর্যা শুরু হইয়াছিল এবং শাস্ত্রমধ্যে সাহিত্যের রস কিছু অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছিল। মহাযানের—অর্থাৎ উত্তরাপথের বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলির পথ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিল্পচর্যা যে কতটা অগ্রসর হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে অজানা নয়।

বৌদ্ধ-সংস্কৃতে রচিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনত্বের বস্তুর ভাষার দিক দিয়া এই কয়খানি অবদান প্রধান,—'মহাবস্তু'. 'ললিতবিস্তর', 'দিব্যাবদান' এওবং 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'। ভাষার দিক দিয়া মহাবস্তু ও ললিতবিস্তর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি গ্রন্থের "গাথা" অর্থাৎ পদ্য অংশের ভাষায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত অত্যন্ত বিকৃত এবং ছন্দ অত্যন্ত অভিনব দেখা যায়। যেমন ললিতবিস্তরে, বুদ্ধকে তাঁহার অতীত জন্মের কথা স্মরণ করাইতে ঋষির উক্তি

> পুরি তুম নরবরসুতু নৃপু যদভু
> নর তব অভিমুখ ইম গিরমবচী।

দদ মম ইম মহি সনগরনিগমাং
ত্যজি তদ প্রমুদিতু ন চ মনু ক্ষুভিতো।।[১]

'পুরাকালে তুমি, হে নরশ্রেষ্ঠপুত্র, নৃপ হইয়াছিলে, তখন এক ব্যক্তি তোমার অভিমুখে এই বাক্য বলিয়াছিল।
"দাও আমাকে এই নগরগ্রামসমেত এই পৃথিবী।"
তাহা ত্যাগ করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলে, মন ক্ষুব্ধ হয় নাই।।"

(এই গাথার ছন্দ রবীন্দ্রনাথের মানসীর দুইটি কবিতায়—'বিরহানন্দ' ও 'ক্ষণিক মিলন'-এ পাই।)

বৌদ্ধ-সংস্কৃত শাস্ত্রে জাতক-কাহিনী আছে। তবে পালি শাস্ত্রে জাতককাহিনীর উপর ঝোঁক যতটা বেশি এখানে ততটা নয়। বৌদ্ধ-সংস্কৃতে জাতক-কাহিনীগুলি দীর্ঘতর রচনা এবং সেগুলির বিষয় সাধারণত বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব রূপে জন্মের "জাতক " অর্থাৎ স্মৃতি-কথা এবং বুদ্ধের ও বুদ্ধশিষ্যদের "অবদান" অর্থাৎ কীর্তিকাহিনী। বৌদ্ধ-সংস্কৃতে জাতকের অপেক্ষা "অবদান" কাহিনীর দিকে ঝোঁক অনেক বেশি। পালি সাহিত্যে অবদান-কাহিনীর কোন প্রাধান্য নাই। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব (অর্থাৎ বুদ্ধের পূর্বজন্ম এবং শেষ জন্মে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বাবস্থা), পূর্বতন বোধিসত্ত্ব ও পূর্বতন বুদ্ধদের অমল কীর্তি-কাহিনীই "অবদান" বলিয়া খ্যাত।

পালি জাতকে যেমন পাওয়া যায় তেমনি ছোট একটি পশু-জাতকের নিদর্শন মূলসর্বাস্তিবাদীদের শাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়া দিতেছি। গল্পটির প্রতিরূপ অনেকেরই বাল্যকালে ঈসপ্‌স-ফেব্‌লসে পড়া নেকড়ে ও মেষশাবকের গল্প। গল্পটি বুদ্ধ শিষ্যদের কাছে বলিতেছেন।

অতীতকালে, হে ভিক্ষুগণ, কোনো গ্রামে[২] এক গৃহস্থ থাকিত। তাহার ভেড়ার পাল (ছিল)। তাহা চরাইবার জন্য মেষপালক লোকালয়ের[৩] বাহিরে গেল। তাহার পর চরানো হইলে পর সূর্য অস্ত-গমনকালের সময়ে গ্রামে ফিরিতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে এক বুড়ী ভেড়ীর পাছু লইয়া এক নেকড়ে চলিল। যখন নেকড়ে তাহার লাগ ধরিল সে[৪] কহিল[৫]

মামা তোমার কুশল তো? তোমার ভালো তো মামা? একেলা এই অরণ্যে সুখ পাইতেছ তো মামা?

সেও[৬] কহিল

আমার লেজ মাড়াইয়া আমার লেজের লোম খসাইয়া এখন মামা মামা বলিয়া কোথায় পার পাইবে, ভেড়ী?

১। প্রথম দুই ছত্রের শুদ্ধ সংস্কৃতে অনুবাদ করিলে এইরকম হয়

পুরা ত্বম্‌ নরবরসুত নৃপো যদাভূঃ
নরস্তবাভিমুখ ইমাং গিরমবোচৎ।
দেহিমে ইমাং মহী সনগরনিগমাং
ত্যক্ত্বা তদা প্রমুদিতো ন চ মনঃ ক্ষুভিতম্‌।।

২। মূলে "কর্বটিকে"। যে গ্রামে হাট বসে তাহাকে বলিল কর্বটক।
৩। মূলে "গ্রামং"।
৪। অর্থাৎ ভেড়ী।
৫। উত্তর প্রত্যুত্তর সবই গাথায়।
৬। নেকড়ে।

ভেড়ী আবার বলিল

পিছনে তোমার লেজ, আগে আগে আসিতেছি আমি। তবে কোন ফিকিরে (তোমার) লেজ আমি মাড়াইলাম?

নেকড়ে আবার কহিল

চারটি তো এই দ্বীপ, সমুদ্রসহিত পর্বতসহিত।
সর্বত্র আমার লেজ। এখন তুমি আসিলে কিসে?

ভেড়ী বলিল

মহাশয়, আগেই আমি জ্ঞাতিদের কাছে শুনিয়াছিলাম (যে),
সর্বত্র তোমার লেজ। আমি আকাশে (উড়িয়া) আসিয়াছি।।

নেকড়ে বলিল

ও বুড়ী ভেড়ী, আকাশে উড়িয়া আসিতে আসিতে তুমি
সে মৃগসমূহ তাড়াইয়াছ যাহারা আমার যোগানো খাদ্য।।
অতঃপর সে[১] যখন বিলাপ করিতেছে (তখন) লাফ দিয়া
সেই পাপকারী[২] ভেড়ীর মাথা ভাঙিল আর মারিয়া মাংস খাইল।।

বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যের অবদানগুলিতে যে খুব ভালো সাহিত্যবস্তু নিহিত আছে তাহা রবীন্দ্রনাথই প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে তাঁহার কোন কোন কবিতার ও নাটকের বীজ অথবা উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইরকম অবদানের আলোচনা করিলেই বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যের স্থায়ী-সম্পদের উপযুক্ত পরিচয় দেওয়া হইবে। প্রথম তিনটি কাহিনী দিব্যাবদান হইতে যথাসম্ভব অনুদিত। প্রথমে বাসবদত্তার আখ্যায়িকা।[৩]

মথুরায় বাসবদত্তা নামে গণিকা। তাহার দাসী উপগুপ্ত[৪] সকাশে গিয়া গন্ধদ্রব্য কিনিয়া থাকে। বাসবদত্তা তাহাকে বলিল, 'মেয়ে, গন্ধ-ব্যবসায়ীকে তুমি ঠকাইতেছ। এত গন্ধ আনিতেছ!' মেয়েটি বলিল, 'হে আর্যদুহিতা, উপগুপ্ত গন্ধব্যবসায়ীর পুত্র, রূপসম্পন্ন, চাতুর্য-মাধুর্য-সম্পন্ন, ধর্মত ব্যবসা করে।' শুনিয়া উপগুপ্তের প্রতি বাসবদত্তার চিত্ত অনুরাগযুক্ত হইল। তাহার পর উপগুপ্ত সকাশে দাসীর দ্বারা বলিয়া পাঠাইল, 'তোমার কাছে আসিব। তোমার সহিত প্রেমের আনন্দ অনুভব করিতে চাই।' তাহার পর দাসী (এই কথা) উপগুপ্তকে নিবেদন করিল। উপগুপ্ত বলিল, 'ভগিনী, আমার দেখা পাইবার পক্ষে তোমার এ অসময়।'

বাসবদত্তা পাঁচ শ পুরাণ পাইলে পরিচর্যা করে।[৫] তাহার মনে হইল, '(আমার) নির্ধারিত (মূল্য) পাঁচ শ পুরাণ (উপগুপ্ত) দিতে চায় না।' তাহার পর সে দাসীকে উপগুপ্ত সকাশে পাঠাইল (এই বলিয়া), 'আর্যপুত্রের কাছে আমার কার্যাপণেও[৬] প্রয়োজন নাই। কেবল আর্যপুত্রের সঙ্গে প্রমোদ করিতে চাই।' দাসী তাহা নিবেদন করিল। উপগুপ্ত বলিল, 'ভগিনী আমাকে দেখার এ তোমার অসময়।'

১। ভেড়ী।
২। নেকড়ে।
৩। 'পাংশুপ্রদানাবদান' হইতে।
৪। মথুরাবাসী সুগন্ধ-দ্রব্যব্যবসায়ী বণিক্ গৃহস্থের তৃতীয় পুত্র। বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত ধার্মিক-প্রকৃতি, উদাসীনচিত্ত, সাধু। তাহার ধর্মজীবন পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট আছে।
৫। অর্থাৎ বাসবদত্তার ফী পাঁচ শ।
৬। কার্যাপণ নিম্ন মানের মুদ্রার (অথবা কড়ির) কাহন।

তাহার পর আর এক শ্রেষ্ঠী[১]-পুত্র বাসবদত্তার কাছে (প্রেমপ্রার্থী হইয়া) আসিল। অপর এক সার্থবাহ[২] উত্তরাপথ হইতে ঘোড়ার দাম[৩] পাঁচ শ পুরাণ লইয়া মথুরায় পৌঁছিল। সে (পথের লোককে) জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ বেশ্যা সকলের প্রধান?' সে শুনিল 'বাসবদত্তা।' সে[৪] পাঁচ শ পুরাণ আর বহু উপহার পাইয়া সেই[৫] শ্রেষ্ঠীপুত্রকে মারিয়া উচ্ছিষ্ট-স্থানে ফেলিয়া দিয়া স্বার্থবাহের সঙ্গে প্রেমক্রীড়া করিল।

তাহার পর সেই শ্রেষ্ঠীপুত্রকে বন্ধুরা উচ্ছিষ্ট-স্থান হইতে তুলিয়া আনিয়া রাজাকে জানাইল। তখন রাজা (কর্মচারীদের) বলিলেন, 'যান আপনারা, বাসবদত্তার হাত পা কান নাক কাটিয়া শ্মশানে ফেলিয়া দিন।' তাহার পর তাহারা বাসবদত্তার হাত পা কান নাক কাটিয়া শ্মশানে ফেলিয়া দিল।

তাহার পর উপগুপ্ত শুনিল, বাসবদত্তা হাত-পা-কান-নাক-কাটা হইয়া শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহার মনে হইল, 'আগে ও আমার বিষয়ে দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল। এখন তো উহার হাত পা কান নাক কাটা, এখনই উহার দর্শনকাল।'

তাহার পর একটি বালককে সহায় করিয়া ছাতা লইয়া প্রশান্তচিত্তে শ্মশানে উপস্থিত হইল। তাহার[৬] দাসী পূর্বগুণ-উপকার মনে রাখিয়া কাছে বসিয়া কাক প্রভৃতি তাড়াইতেছে। সে বাসবদত্তাকে জানাইল, 'আর্যদুহিতা, যাহার কাছে তুমি আমাকে বার বার পাঠাইয়াছিলে, সে উপগুপ্ত আজ হাজির। নিশ্চয়ই কাম-অনুরাগপীড়িত হইয়া আসিয়া থাকিবে।' শুনিয়া বাসবদত্তা বলিল[৭]

যাহার সৌন্দর্য প্রনষ্ট, যে দুঃখে পীড়িত, ভূমিতে রক্তের পিঞ্জরের (মতো পড়িয়া আছে, এমন) আমাকে দেখিয়া কিসে ইহার কাম-অনুরাগ হইবে?

তাহার পর সে দাসীকে বলিল, 'আমার হাত পা কান নাক কাটিয়া শরীর হইতে দূর হইয়াছে, সেগুলি জুড়িয়া দাও।' তখন সে তাহা জুড়িয়া দিয়া পটি দিয়া ঢাকিয়া দিল।

উপগুপ্ত আসিয়া বাসবদত্তার আগে[৮] রহিল। তখন উপগুপ্তকে আগে উপস্থিত দেখিয়া বাসবদত্তা হাসিয়া কহিল, 'আর্যপুত্র, যখন আমার দেহ সুস্থ ও বিষয়রতির অনুকূল (ছিল) তখন আমি আপনার কাছে বারবার দূতী পাঠাইয়াছিলাম। আর্যপুত্র বলিয়াছিলেন, "ভগিনী, (এখন) তোমার অসময় আমাকে দেখার পক্ষে।" এখন আমার হাত পা কান নাক কাটা, নিজের রক্তে কাদায় এই (ভাবে) রহিয়াছি। এখন কি জন্য আসিলেন?'

উপগুপ্ত বলিল[৯]

ভগিনী, আমি কামবশ হইয়া তোমার নিকটে আসি নাই।
অশুভ কামবৃত্তিগুলির স্বভাব দেখিতেই আসিয়াছি।।

১। শ্রেষ্ঠী = ধনী বণিক্।
২। যাহারা দল বাঁধিয়া পণ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরবরাহ করে।
৩। অর্থাৎ ঘোড়া কিনিবার টাকা।
৪। বাসবদত্তা।
৫। অর্থাৎ তখন যে প্রণয়ীর সঙ্গে তাহার যোগ ছিল।
৬। বাসবদত্তার
৭। গাথায়।
৮। অর্থাৎ সম্মুখে।
৯। গাথায়।

বাহিরের ভদ্র রূপ দেখিয়া মূর্খ অনুরক্ত হয়।
ভিতরের অত্যন্ত মন্দগুলি জানিয়া ধীর বিরক্ত হয়।।

উপগুপ্ত এইভাবে বুদ্ধমার্গীয় উপদেশ দিতে লাগিলেন। শুনিয়া বাসবদত্তার মোহমোচন হইল এবং সেই অবস্থায়ই সে মনে মনে বুদ্ধের ও বৌদ্ধসঙ্ঘের শরণ লইল। তাহার পর উপগুপ্ত চলিয়া গেলে বাসবদত্তা প্রাণত্যাগ করিল।

উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার মিলনের উপলক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া পরিবেষণ করিয়াছেন।[১]

দ্বিতীয় কাহিনীটি শার্দুলকর্ণাবদানের প্রথম গল্প, সম্ভবত সত্যঘটনাশ্রিত। এই রকম শুনিয়াছি[২]—

এক সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন, জেতবনে অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে। একদিন আয়ুষ্মান্[৩] আনন্দ পূর্বাহ্নে পাত্র[৪] ও চীবর[৫] লইয়া ভিক্ষার্থ শ্রাবস্তী মহানগরীতে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর আয়ুষ্মান্ আনন্দ শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিয়া ভোজন কাজ শেষ করিয়া যেদিকে একটি ইঁদারা[৬] ছিল সেদিকে চলিলেন। সেই সময়ে সেই ইঁদারায় প্রকৃতি নামে চণ্ডাল[৭] কন্যা জল তুলিতেছিল। তখন আয়ুষ্মান্ আনন্দ মাতঙ্গ-কন্যা প্রকৃতিকে ইহা বলিলেন, 'ভগিনী, আমাকে পানীয় দাও, পান করিব।' এমন বলিলে চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি আয়ুষ্মান্ আনন্দকে ইহা বলিল, 'মহাশয় আনন্দ, আমি চণ্ডাল-কন্যা।' 'ভগিনী, আমি তোমার বংশ বা জাতি জিজ্ঞাসা করি নাই। যাই হোক, যদি তোমার ফেলিয়া দিবার মতো জল (থাকে) দাও পান কবিব।' তখন চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি আয়ুষ্মান্ আনন্দকে পানীয় দিল। তাহার পর আয়ুষ্মান্ আনন্দ জল পান করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখন চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি আয়ুষ্মান্ আনন্দের শরীরে মুখে স্বরে উত্তম ও সুন্দর ভাবভঙ্গি স্মরণ করিয়া মনে গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়া চিত্তে দৃঢ় অনুরাগ উৎপাদন করিল, 'আর্য আনন্দ যেন আমার স্বামী হন। আমার মা বড় গুণিন[৮]। সে আর্য আনন্দকে আনিতে পারিবে।' তাহার পর চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি জলের ঘড়া লইয়া যেদিকে চণ্ডালগৃহ সেদিকে গিয়া জলেব ঘড়া একধারে রাখিয়া নিজের মাকে এই (কথা) বলিল, 'মা, এ কথায় মন দাও—আনন্দ নামে শ্রমণ মহাশ্রমণ গৌতমের শিষ্য ও পরিচারক। তাহাকে আমি স্বামী (রূপে) চাই। পারিবে তাহাতে আনিতে?' সে তাহাকে বলিল, 'কন্যে পারি আমি আনন্দকে আনিতে। যে মৃত আর যে নিষ্কাম—ইহা ছাড়া (আমি সবাইকেই আনিতে পারি)। কিন্তু (কথা আছে), কোশলবংশীয় রাজা প্রসেনজিৎ শ্রমণ গৌতমকে অত্যন্ত ভক্তি করেন এবং সেবা করেন। যদি জানিতে পারেন তবে তিনি চণ্ডালকুল ধ্বংস করিতে উদ্যোগ করিবেন। শ্রমণ গৌতম তো

১। 'কথা ও কাহিনী' দ্রষ্টব্য।
২। 'এবং ময়া শ্রুতম্''। বৌদ্ধ-সংস্কৃত শাস্ত্রে জাতক-অবদান কাহিনীগুলি এই বাক্য দিয়াই শুরু।
৩। বুদ্ধের স্নেহভাজন বয়ঃকনিষ্ঠদের বিশেষণ। বুদ্ধ যেমন ভগবান্ আনন্দ তেমনি আয়ুষ্মান্।
৪। ভিক্ষা ও ভোজন পাত্র।
৫। পরিধেয় বস্ত্র।
৬। মূলে "উদপান"।
৭। মূলে "মাতঙ্গ"।
৮। মূলে "মহাবিদ্যাধরী" অর্থাৎ অনেকরকম গুহ্য বিদ্যা যে জানে।

নিষ্কাম—শোনা যায়। নিষ্কামের (মন্ত্র) কিন্তু সমস্ত হীনমন্ত্রকে পরাভূত করে।' এই কথা শুনিয়া চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি মাকে এই (কথা) বলিল, 'মা, যদি এমন হয়, শ্রমণ গৌতম নিষ্কাম, তাঁহার নিকট হইতে শ্রমণ আনন্দকে পাইব না (তবে) প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি পাই, জীবনধারণ করিব।' 'বাছা, প্রাণ পরিত্যাগ করিও না। শ্রমণ আনন্দকে আনাইতেছি।'

তাহার পর চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতির মা ঘরের আঙিনার মধ্যে গোবর লেপিয়া তাহাতে বেদী করিয়া কুশ ছড়াইয়া অগ্নি জ্বালিয়া আট শ অর্কপুষ্প লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে এক একটি অর্কপুষ্প জপ করিয়া অগ্নিতে ফেলিতে লাগিল।...

এদিকে আয়ুষ্মান্ আনন্দের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনি বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেদিকে চণ্ডালগৃহ সেইদিকে চলিলেন। দূর হইতে চণ্ডালী[১] আয়ুষ্মান্ আনন্দকে আসিতে দেখিল। দেখিয়া সে আবার কন্যা প্রকৃতিকে এই বলিল, 'কন্যা, এই শ্রমণ আনন্দ আসিতেছেন। শয্যা রচনা কর।' তখন চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি হৃষ্ট ও তুষ্ট হইয়া আনন্দিত মনে আয়ুষ্মান্ আনন্দের জন্য শয্যা রচনা করিতে লাগিল।

তাহার পর আয়ুষ্মান্ আনন্দ যেদিকে চণ্ডালগৃহ সেদিকে আসিলেন। আসিয়া বেদী আশ্রয় করিয়া বসিয়া পড়িলেন। একান্তে বসিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ কাঁদিতে লাগিলেন। চোখের জল ঝরাইতে ঝরাইতে এই (কথা মনে মনে) বলিতে লাগিলেন, 'আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি। ভগবান্‌ও আমাকে ফিরাইয়া লইতেছেন না!' তাহার পর ভগবান্ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে ফিরাইয়া লইলেন।[২] ফিরাইয়া লইবার সময় সম্বুদ্ধমন্ত্রের দ্বারা চণ্ডালমন্ত্র প্রতিহত হইতে লাগিল।

চণ্ডালমন্ত্রের প্রভাব দূর হইলে তখন আয়ুষ্মান্ আনন্দ চণ্ডালগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেদিকে নিজের বিহার সেইদিকে চলিতে লাগিলেন।

চণ্ডাল-কন্যা আয়ুষ্মান্ আনন্দকে ফিরিয়া যাইতে দেখিল। দেখিয়া সে নিজের জননীকে এই বলিল, 'মা এই সেই শ্রমণ আনন্দ ফিরিয়া যাইতেছেন।' তাহাকে মা বলিল, 'নিশ্চয়ই, বাছা, শ্রমণ গৌতমের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া থাকিবেন।' প্রকৃতি বলিল, 'মা তবে কি শ্রমণ গৌতমের মন্ত্রগুলিই বেশি বলবান্, আমাদের নয়?' মা তাহাকে বলিল, 'শ্রমণ গৌতমের মন্ত্রগুলিই অধিক বলবান্, আমাদের নয়। বাছা, যে সব মন্ত্র সমস্ত লোকের উপরে খাটে শ্রমণ গৌতম ইচ্ছা করিলে তাহা প্রতিহত করিতে পারেন। কিন্তু (অন্য) লোক শ্রমণ গৌতমের মন্ত্রসকল প্রতিহত করিতে পারে না। এইজন্য শ্রমণ গৌতমের মন্ত্রগুলি অধিক বলবান্।'

তাহার পর আয়ুষ্মান্ আনন্দ যেখানে ভগবান্ সেখানে গেলেন। গিয়া ভগবানের পাদদ্বয় মাথায় বন্দনা করিয়া একধারে বসিলেন। একধারে নিষণ্ণ আয়ুষ্মান্ আনন্দকে ভগবান্ ইহা বলিলেন, 'আনন্দ, তুমি এই ষড়ক্ষরী বিদ্যা গ্রহণ কর ধারণ কর বাচন কর আয়ত্ত কর নিজের হিতের জন্য সুখের জন্য ভিক্ষুদের উপাসকদের হিতের জন্য সুখের জন্য।...'

তাহার পর চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি সেই রাত্রি কাটিলে চুল ভিজাইয়া স্নান করিয়া কোরা কাপড় পরিয়া মুক্তামালা আভরণ করিয়া[৩] যেদিকে শ্রাবস্তী নগরী সেইদিকে

১। প্রকৃতির মা।
২। অর্থাৎ তাহার চিত্ত তাঁহার দিকে ফিরাইলেন।
৩। অর্থাৎ আনন্দকে আকৃষ্ট করিতে।

গিয়া নগরদ্বারে কপাটের গোড়ায় থাকিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল,—'নিশ্চয়ই এই পথে আয়ুষ্মান্ আনন্দ আসিবেন।' আয়ুষ্মান্ আনন্দ দেখিলেন যে চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি তাঁহার পিছনে পিছনে লাগিয়া আছে। দেখিয়া লজ্জিত স্ফূর্তিহীন বিষণ্ণ ও বিমনা হইয়া তাড়াতাড়ি শ্রাবস্তী হইতে বিনির্গত হইয়া যেদিকে জেতবন সেদিকে চলিয়া আসিলেন। আসিয়া ভগবানের পাদদ্বয় মাথায় বন্দনা করিয়া একধারে বসিলেন। একধারে বসিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবান্‌কে ইহা বলিলেন, 'ভগবন্, এই চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি আমার পিছনে পিছনে লাগিয়া থাকিয়াই (আমি) চলিলে চলিতেছে (আমি) দাঁড়াইলে দাঁড়াইতেছে। যখনই কোন গৃহস্থবাড়িতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করি সে সেই বাড়ির ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।' ভগবান্ প্রকৃতিকে ইহা বলিলেন, 'ওগো চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি, ভিক্ষু আনন্দের সঙ্গে তোমার কী?' প্রকৃতি বলিল, 'মহাশয়, আনন্দকে স্বামী (রূপে) চাই।' ভগবান্ বলিলেন, 'প্রকৃতি, আনন্দের জন্য বাপমায়ের অনুমোদন পাইয়াছ?' 'হে ভগবন্, অনুমোদন পাইয়াছি। হে সুগত, অনুমোদন পাইয়াছি।' ভগবান্ বলিলেন, 'তাহা হইলে আমার সম্মুখে (তাহাদের) মত জানাও।'

তখন চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি ভগবান্‌কে প্রতিশ্রুতি দিয়া ভগবানের পদদ্বয় মাথায় বন্দনা করিয়া ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের সকাশ হইতে চলিয়া গেল। যেখানে নিজের মাতাপিতা (ছিল) সেখানে গেল। গিয়া বাপমায়ের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া একধারে বসিল। একধারে বসিয়া বাপমাকে এই বলিল, 'ও মা, ও বাবা, শ্রমণ গৌতমের সম্মুখে আমাকে আনন্দের উদ্দেশে দিয়া দাও।'

তাহার পর চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতির মাতাপিতা প্রকৃতিকে লইয়া যেখানে ভগবান্ সেখানে গেল। গিয়া ভগবানের পদদ্বয় মাথায় বন্দনা করিয়া একধারে বসিল। তাহার পর চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি ভগবানের পাদদ্বয় মাথায় বন্দনা করিয়া একধারে বসিল। একধারে বসিয়া ভগবানকে ইহা বলিল, 'ভগবন্, এই দুই আমার মাতা ও পিতা আসিয়াছে।' তখন ভগবান্, চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতির মাতাপিতাকে বলিলেন, 'আনন্দকে (স্বামী করিতে) প্রকৃতি তোমাদের আজ্ঞা পাইয়াছে?' তাহারা বলিল, 'হে ভগবন্, আজ্ঞা পাইয়াছে। হে সুগত, আজ্ঞা পাইয়াছে।' 'তাহা হইলে তোমরা প্রকৃতিকে রাখিয়া নিজগৃহে যাও।' তখন চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতির মাতাপিতা ভগবানের পদদ্বয় মাথায় বন্দনা করিয়া ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের নিকট হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পর চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতির মাতাপিতা অল্পক্ষণ চলিয়া গিয়াছে জানিয়া ভগবান্ চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতিকে ইহা বলিলেন, 'হে প্রকৃতি, আনন্দ ভিক্ষুকে পাইতে চাও?' প্রকৃতি বলিল, 'হে ভগবান্, চাই। হে সুগত, চাই।' 'তাহা হইলে, প্রকৃতি আনন্দের যে বেশ তাহা তোমাকে ধারণ করিতে হইবে।' সে বলিল, 'হে ভগবন্, ধারণ করিব। হে সুগত, ধারণ করিব। হে সুগত, আমাকে প্রব্রজ্যা দিন। হে ভগবন্, আমাকে প্রব্রজ্যা দিন।' তখন ভগবান্ চণ্ডাল-দারিকা প্রকৃতিকে ইহা বলিলেন, 'এস তুমি, ভিক্ষুণী, আচরণ কর ব্রহ্মচর্য।' ইহা বলিয়া চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি ভগবান্ কর্তৃক মুণ্ডিত ও কাষায়-পরিবৃত হইল।[১]

১। অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ তাহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন। কাষায়—বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর গৈরিক বসন।

অতঃপর প্রকৃতি-কাহিনী বেশি নাই। যেটুকু আছে তাহা গল্পের বাহিরে।

কি পালিতে, কি বৌদ্ধ-সংস্কৃতে গদ্য সর্বদা পুনরুক্তি-কণ্টকিত। প্রকৃতির কাহিনীতেও পুনরুক্তি আছে, তবে কম এবং তা কতকটা স্বাভাবিক বলা চলে। বর্ণনা হিসাবেও বেশ স্বচ্ছন্দ। কাহিনীর আসল গৌরব চরিত্র-চিত্রণে। প্রকৃতি, আনন্দ, ভগবান্ বুদ্ধ, প্রকৃতির মা—এই কয়টি ভূমিকা খুব স্বভাবসঙ্গত। প্রত্যাখ্যাত প্রকৃতির আচরণও অত্যন্ত স্বভাবসঙ্গত ও মনোরম। বুদ্ধের সহিত কথা হইবার পর সে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বাপমাকে প্রণাম করিয়াছিল। ইহার আগে মাকে প্রণাম করিবার উল্লেখ নাই। বুদ্ধ যখন বলিলেন, বাপমায়ের মত হইলে সে আনন্দকে পাইবে তখনই তাহার অন্তরে দীক্ষার বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

আধুনিক কালের আগেকার ভারতীয় সাহিত্যে যেসব প্রেমের গল্প আছে সেগুলি হইতে প্রকৃতি-কাহিনীর স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট। এটিকে আমি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রাপ্ত সর্বকালের আধুনিক প্রেমের গল্পের মর্যাদা দিই।

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র কাহিনী এখান হইতে নেওয়া।

তৃতীয় কাহিনীটিতে গল্পত্ব সামান্যই। রবীন্দ্রনাথের অচলায়তনের দুই প্রধান ভূমিকার—পঞ্চকের ও মহাপঞ্চকের—অতি ক্ষীণ ছায়া আছে বলিয়াই গল্পটুকুর অতিরিক্ত মূল্য। যথাযথ অনুবাদ না দিয়া মূল সংক্ষেপ করিয়া ভাষান্তরিত করিতেছি।[১]

বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডদের উদ্যান জেতবনে ছিলেন তখন সে মহানগরীতে এক ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিত, তাহাদের সন্তান জন্মিয়াই মারা পড়িত। ব্রাহ্মণীর আবার গর্ভসঞ্চার হইলে ব্রাহ্মণ ভাবনায় পড়িল। তাহার বাড়ির কাছে এক "বৃদ্ধযুবতি"[২] বাস করিত। সে ব্রাহ্মণকে সব কথা বলিল। বৃদ্ধযুবতি বলিল, 'এবার প্রসবকাল হইলে আমাকে ডাকিও।' প্রসবকালে তাহাকে ডাকা হইল। সে প্রসব করাইল। পুত্রসন্তান হইয়াছে। শিশুকে ধুইয়া মুছিয়া কাপড় জড়াইয়া মুখে একটু ননী লাগাইয়া দাসীর হাতে দিয়া বলিল, ইহাকে লইয়া চার বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া থাক। কোনো ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ যদি দেখিতে পাও তবে তাঁহাকে বলিবে—"এই শিশু আপনার পাদবন্দনা করিতেছে।" সূর্যাস্ত অবধি যদি বাঁচিয়া থাকে তো ঘরে লইয়া আসিবে। যদি মারা যায় তো সেইখানেই রাখিয়া আসিও।' সেইমত দাসী বলে, 'এই শিশু মহাশয়ের পাদবন্দনা করিতেছে।' তাঁহারা বলেন, 'দীর্ঘ জীবন হোক, মাতাপিতার মনোরথ পূর্ণ কর।' ভগবান্, বুদ্ধও সেই পথে ভিক্ষার জন্য একবার গেলেন একবার ফিরিলেন। তিনিও দুইবার সেই আশীর্বাদ দিলেন। শিশু বাঁচিয়া রহিল। মহাপথে ভগবান্ বুদ্ধের ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ পাইয়া বাঁচিয়া রহিল বলিয়া শিশুর নাম রাখা হইব মহাপন্থক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুদ্ধি ও বিদ্যা বাড়িতে লাগিল। কালে সে নানা বিদ্যা ও বেদবিদ্যা অধিগত করিয়া ষট্‌কর্ম-নিরত ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য হইল।

ব্রাহ্মণপত্নীর আবার সন্তানসম্ভাবনা হইল। প্রসবের সময়ে সেই বৃদ্ধযুবতি আসিলেন। এবারেও পুত্রসন্তান। যথারীতি দাসীকে দিয়া শিশুকে বড় চার রাস্তার মোড়ে পাঠানো হইল। শিশু বাঁচিয়া গেল। ঘরে ফিরিলে দাসীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'কোন্ রাস্তার মোড়ে ছিল?' সে বলিল, 'অমুক ছোট রাস্তার মোড়ে।' সেই কারণে শিশুর নাম রাখা হইল পন্থক। লেখাপড়ায় পন্থকের মন কিছুতেই বসে না। তাহার শিক্ষক বলিলেন, 'অনেক ছেলেকে

১। 'চূড়াপক্ষাবদান' হইতে।

২। ব্যাখ্যাতারা অর্থ করেন দূতী অথবা ধাত্রী। অবিবাহিতা বর্ষীয়সী মহিলা এবং তন্ত্রজ্ঞ—এই অর্থ সঙ্গততর বলিয়া মনে করি।

পড়াইয়াছি কিন্তু এমন স্মৃতিশক্তিহীন বালক কখনো দেখি নাই। "ওম্" বলিতে "ভূর্" ভোলে, "ভূর্" বলিতে "ওম্" ভোলে।[১] তবুও তিনি তাহাকে ভালোবাসিতেন, কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে তাহাকে লইয়া যাইতেন।

কিছুকাল পরে শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন[২] ভিক্ষুসংঘকে লইয়া শ্রাবস্তীতে আসিলেন। এক ভিক্ষুর সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে মহাপন্থকের কৌতূহল জাগিল। তিনি বুদ্ধবচন শুনিয়া বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইলেন এবং ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি ধ্যান ও অধ্যয়ন দুই কর্মই করিতে থাকিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার অর্হত্ত্ব[৩] লাভ হইয়াছিল।

পিতৃধন ব্যয় করিতে করিতে পন্থক নিঃস্ব হইয়া পড়িল। তখন সে ভাবিল, 'আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন যাই শ্রাবস্তীতে। সেখানে ভগবানের পর্যুপাসনা করিব।' শ্রাবস্তীতে পৌঁছিয়া দেখিল পথে খুব ভিড়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল আর্য মহাপন্থক পঞ্চশত শিষ্য লইয়া কোশল হইতে শ্রাবস্তী আসিতেছেন। পন্থক ভাবিল, 'মহাপন্থক ইহাদের তো কেহই নয় তবু ইহারা যাইতেছে। আমি তাহার ভাই, যাইব না কেন।' মহাপন্থক তাহাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'করিতেছ কী?' সে বলিল, 'আমি পরম মূর্খ, কে আমাকে প্রব্রজ্যা দিবে?' মহাপন্থক তাহাকে প্রব্রজ্যা দিয়া একটি শিক্ষাপদ গাথা অভ্যাস করিতে বলিলেন।

বিহারে থাকিয়া পন্থক সেই গাথা অভ্যাস করিতে লাগিল, কিন্তু তিন মাসেও মুখস্থ হইল না। অথচ তাহার মুখে শুনিয়া শুনিয়া গোপালক পশুপালক সবাই তাহা শিখিয়া ফেলিল। তাহার কিছুই হইবে না বুঝিয়া মহাপন্থক ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বিহার হইতে দূর করিয়া দিলেন।

'এখন আমি না গৃহী, না প্রব্রজিত',—এই ভাবিয়া বিহার হইতে বিতাড়িত পন্থক কাঁদিতে লাগিল। এই অবস্থায় সে ভগবান্ বুদ্ধের দৃষ্টিপথে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া বুদ্ধ তাহার রোদনকারণ জানিয়া লইলেন আর বলিলেন, 'তুমি বুদ্ধের কাছে পাঠ লইতে পার না।' পন্থক বলিল, 'মহাশয় আমি পরম মূর্খ।' শুনিয়া বুদ্ধ এই গাথাটি পড়িলেন

যো বালো বালভাবেন পণ্ডিতস্তত্র তেন সঃ।
বালঃ পণ্ডিতমানী তু স বৈ বাল ইহোচ্যতে।।

'যে অজ্ঞ অজ্ঞভাবে (থাকে) সে সেহেতু তখন পণ্ডিতই।
অজ্ঞ যদি নিজেকে পণ্ডিত ভাবে তবে তাহাকেই সংসারে অজ্ঞ বলে।।'

ভগবান্ আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ইহাকে পড়াও।' আনন্দ পন্থককে পড়াইতে পারিল না। আনন্দ বুদ্ধকে বলিলেন, 'আমি পন্থককে পড়াইতে পারিব না।' ভগবান্ তখন পন্থককে দুইটি শিক্ষাপদ দিলেন, "রজো হরামি, মলং হরামি"।[৪] এই পদ দুটিও পন্থক আয়ত্ত করিতে পারিল না। তখন ভগবান্ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি ভিক্ষুদের জুতা তলা হইতে উপর পর্যন্ত সাফ করিতে পারিবে?' পন্থক বলিল, 'হাঁ পারিব।' এই কাজ সে স্বাধ্যায়ের মতো নিষ্ঠার সহিত করিতে লাগিল। ক্রমশ শিক্ষাপদ দুটির মর্ম তাহার মনোগহনে বসিয়া গেল। হঠাৎ একদিন ভোরের বেলায় পন্থকের মনে হইল, 'ভগবান্ তো এই উপদেশ দিয়াছিলেন—"রজো হরামি, মলং হরামি"। তবে কি তিনি আধ্যাত্মিক রজঃ ভাবিয়া বলিয়াছিলেন, না বাহ্য রজঃ

১। ব্রাহ্মণের অবশ্যপঠনীয় মন্ত্র "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ।"
২। বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্য।
৩। মহাযান-মতে অর্হত্ত্ব লাভ—হীনযান-মতে থেরত্ব-প্রাপ্তি।
৪। অর্থাৎ, ধূলা ঝাড়িয়া ফেলি, ময়লা সাফ করি।

উদ্দেশ করিয়া?' এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে তিনটি গাথা জাগিয়া উঠিল। গাথা তিনটির মর্ম,—"রজ" ধূলিকণা নয় চিত্তের বিকার—রাগ দ্বেষ মোহ, বুদ্ধের অনুশাসনে যাঁহারা অবিচলিত তাঁহারা পণ্ডিত, (চিত্ত হইতেই) রজঃ দূর করেন। তাহার পর পন্থকের অর্হত্ত্ব পাইতে বিলম্ব হইল না।

ভিক্ষুসংঘে পন্থককে গ্রহণ করায় বুদ্ধের ছিদ্রান্বেষীরা উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া পন্থকের ও বৌদ্ধসংঘের নিন্দা ছড়াইতে লাগিল। এ নিন্দা বুদ্ধের কানে গেল, তিনি ভাবিলেন পন্থকের গুণ প্রকট করিতে হইবে। তিনি আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি গিয়া পন্থককে বল যে তাহাকে ভিক্ষুণীসংঘে গুরুর অভিভাষণ দিতে হইবে।' পন্থক বুঝিল, 'ভালো ভালো ও বয়স্ক স্থবিরদের ছাড়িয়া যখন ভগবান্ আমাকে এই কাজের ভার দিতেছেন তখন তিনি বোধহয় আমার গুণ প্রকট করাইবেন। পন্থক রাজি হইল। ভিক্ষুণীদের মধ্যে বারো জন অন্তরে বিদ্রোহী হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, 'যে তিন মাসেও একটা গাথা শিখিতে পারে নাই সে আমাদের কাছে গুরুর অভিভাষণ দিতে আসিতেছে!' অভিভাষণের দিনে তাহারা পন্থককে অপদস্থ করিবার জন্য লতাপাতার সিংহাসন গড়িয়া রাখিল। পন্থক কিছু গ্রাহ্য না করিয়া অভিভাষণ দিতে লাগিল। তাহার জ্ঞানের গভীরতা ও আধ্যাত্মিক উষ্ণতা সকলকে অভিভূত করিল। পন্থকের যশ প্রতিষ্ঠিত হইল।

রবীন্দ্রনাথের অচলায়তনের সঙ্গে মিল আছে নামে ও চরিত্রে। "পন্থক-মহাপন্থক" নাম দুটির পাঠান্তর আছে "পঞ্চক-মহাপঞ্চক"। রবীন্দ্রনাথ এই পাঠান্তরনামই পাইয়াছিলেন। পঞ্চক-পন্থকের চরিত্রে বেশ গভীর মিল। মহাপঞ্চক-মহাপন্থকের মিল চরিত্রের দৃঢ়তায়, পাণ্ডিত্যে ও ধীশক্তিতে এবং পঞ্চককে বিহার হইতে বহিষ্কারে। বুদ্ধ-গুরুর মিল আরও গভীর অবধানগম্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংস্কৃত সাহিত্য

অশ্বঘোষের প্রাপ্ত সাহিত্যগ্রন্থ তিনটিই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার সম্পর্কিত। বলিতে পারি তিনি প্রোপাগ্যান্ডার কাজে সাহিত্যকে লাগাইয়াছিলেন। তাঁহার আগেকার কোন কাব্য পাই নাই সুতরাং বলিতে পারি না তিনিই এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক কিনা। হয়ত ভাঙ্গা সংস্কৃতে (বৌদ্ধ মিশ্র-সংস্কৃতে) যে পদ্য-গদ্য বুদ্ধকথা ছিল তাহাই পণ্ডিতের উপযোগী করিয়া কাব্য ও নাটক আকারে পরিবেষণ করিয়াছিলেন। অশ্বঘোষের পরে আমরা কালিদাসকে পাই। তাঁহার কাল সম্বন্ধে এককালে প্রচুর মতভেদ ছিল, এবং এখনও কিছু আছে। তবে মোটামুটি স্বীকৃত হইয়াছে যে তিনি সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালের শেষভাগে এবং অথবা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে) বিদ্যমান ছিলেন। কালিদাসের লেখা কাব্য ও নাটক দুইই পাইয়াছি। সে কাব্য ছোটও আছে বড়ও আছে। তাহার মধ্যে একটির বিষয় পৌরাণিক হইলেও তাহাতে তিনি ধর্মকে সাধারণ মানুষের জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই। দ্বিতীয়টিতে ধর্মকে আরো দূরে রাখিয়াছেন। নাটক তিনটির মধ্যে একটির বিষয় ইতিহাস-জনশ্রুতি, দুইটির বিষয় প্রাচীন আখ্যায়িকা। তিনটি নাটকের একমাত্র সাধারণ রস হইতেছে নরনারীর প্রেম। সুতরাং এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে কালিদাসের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যরস অতিমর্ত্য ও অধ্যাত্মভূমি হইতে মর্ত্য ও পার্থিব ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে।

অশ্বঘোষ যখন কাব্য-নাটক রচনা করিয়াছিলেন তখন রাজকার্যে এবং ধর্মকার্যে, প্রশাসনে এবং অনুশাসনে, যেখানে যেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতভাষীরা কার্যক্ষেত্রে সমবেত, সেখানে সেখানে সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত ভাষাকে স্থানচ্যুত করিতে লাগিয়া গিয়াছে। প্রত্নলিপির সাক্ষ্য অনুসারে বলিতে হয় যে প্রশাসনে প্রাকৃতের স্থানে সংস্কৃতের ব্যবহার যাঁহারা করিয়াছিলেন সেই রাজবংশ বিদেশ হইতে আগত।[১] কিন্তু যদি মনে করি যে সংস্কৃতের ব্যবহার এইভাবে অন্যত্র হয় নাই বা হইতে দেরি হইয়াছিল তাহা হইলে ভুল হইবে। প্রাকৃত (অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্য) ভাষাগুলি খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অন্ত পর্যন্ত পরস্পর-অবোধ্য ছিল না। তাহার উপর, একটি "প্রাকৃত" ভাষা (—যাহার আধারে পালি গড়িয়া উঠিয়াছিল—) lingua franca-র মত চালু ছিল! কিন্তু lingua franca অর্থাৎ সর্বজনিক স্বয়ম্ভু প্রাকৃতও আঞ্চলিক প্রাকৃতের মতো স্বাভাবিক পরিবর্তনের অতীত ছিল না। এই পরিবর্তনের বশে এই সর্বজনিক প্রাকৃত বিভিন্নভাষী অঞ্চলে একটু একটু করিয়া বিভিন্নতা পাইতেছিল। যদি বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে সার্বভৌম হইয়া বেদ-বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিকে কোণঠেষা করিতে পারিত তাহা হইলে সর্বজনিক প্রাকৃতটি পরিবর্তন নিরোধ করিয়া সংস্কৃতের স্থান অবশ্যই গ্রহণ করিত। তাহা তো হয়ই নাই বরং বৌদ্ধধর্মকে উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকেই হটিয়া যাইতে

১। কাথিয়াওয়াড়ে গিরনার পাহাড়ে ক্ষত্রপ (গ্রীক-শক-কুষাণ ইত্যাদি বংশীয়) রাজা রুদ্রদামনের শিলালিপিই (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে) সংস্কৃতে লেখা প্রথম প্রত্নলিপি ও অনুশাসন।

হইয়াছিল। উত্তরের বৌদ্ধধর্ম প্রথমে আশ্রয় করিয়াছিল ভাঙ্গা সংস্কৃত পরে শুদ্ধতর ও পাণিনীয় সংস্কৃত। তাই ইহা দীর্ঘদিন দেশের মাটিতে টিকিয়া থাকিয়া অবশেষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল। দক্ষিণের বৌদ্ধধর্ম বোধ করি সংস্কৃতকে আমল না দিয়া অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের সমসাময়িক। এ শাস্ত্রের ভাষা ছিল একটি পূর্ব অঞ্চলের প্রাকৃত (অর্ধমাগধীর মতো), যাহা বুদ্ধের নিজেরও কথ্য ভাষা ছিল। জৈনের শাস্ত্র—বৌদ্ধ শাস্ত্রের বেশ কিছুকাল পরে—এই প্রাকৃতে লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু তা প্রথম কবে হয় তাহা জানি না। জৈন শাস্ত্র যা আমাদের হস্তগত তাহার প্রাচীনতম গ্রন্থটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আগেকার নয়। জৈনেরা সংস্কৃতে শাস্ত্র না লিখিলেও সংস্কৃত ভালো করিয়া শিখিতেন। পরে সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে নিজেদের ধর্ম প্রসারিত করিয়াছিলেন।

সমাজের উচ্চস্তরে—বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক, ব্রাহ্মণ্য হোক—ধর্ম লইয়া জীবনযাত্রায় কোন বিভিন্নতা তখন ছিল না। বিভিন্নতা যা ছিল তা অ-গৃহস্থদের—অর্থাৎ শ্রমণ-ভিক্ষু-যোগি-তপস্বীদের আচারে। সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্যরীতির প্রাধান্য ক্রমশ একচ্ছত্র হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের শাসন সংস্কৃতবাণীকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ্যবর্ণকে সমাজব্যবস্থার নিয়ন্তা করিয়া তুলিল। তাই রাজশক্তি—যাহা সাধারণত ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অধিগত ছিল, তাহা দিন দিন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের ও ব্রাহ্মণ মহামন্ত্রীদের অনুগত ও অধীন হইতে লাগিল। জনসংখ্যাও বেশ বাড়িতেছিল এবং সেইসঙ্গে জীবিকার—কৃষির, শিল্পের ও বাণিজ্যব্যাপারের ক্ষেত্রও প্রসারিত হইতেছিল। সেই কারণে ব্রাহ্মণেতর বর্ণে শ্রেণী (পরে জাতির) বিভাগ স্বতই দেখা দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ-পরিচালিত সমাজ-ব্যবস্থার এই প্রসারণের মুখে কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। কালিদাসের সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দুটি বিশিষ্ট দেবতার—বিষ্ণুর ও শিবের—উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের যেটুকু অবশেষ রহিয়া গিয়াছিল তাহা চিরাচরিত অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছে এবং মুক্তি মানুষের চরম আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে কালিদাসের কাব্যে-নাটকে সেকালের অন্তর্বাণী স্পষ্টভাবে শোনা যায়। তপোবনের দিন তখন অনেক কাল গত হইয়া গিয়াছে। তপোবন যে কেমন ছিল তাহাও তখনকার ধারাবাহিত সাহিত্য হইতে বুঝিবার যো ছিল না। কালিদাসের সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠার, ত্যাগের ও করুণার একটি আদর্শ অঙ্কিত হইল। সে আদর্শে গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে তপশ্চর্যার বিরোধ রহিল না। কালিদাস শিক্ষিত চৌকস নাগরিক কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্পৃহা ছিল আরণ্যক জীবনের প্রতি। ভারতীয় কবিভাবনায় এই তপোবন-চিন্তা বা ঘরছাড়া ভাব কালিদাসের রচনাতেই দেখা গেল। ভারতীয় মানুষের জীবনভাবনার যথাসম্ভব সর্বময় প্রতিফলন সাহিত্যে প্রথম কালিদাসের লেখাতেই পরিস্ফুট হইল।

কবিতার যে বিশেষ গুণ শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ লিরিক গুণ, সে বিশেষ গুণটি — যাহাকে সহজ কথায় বলিতে পারি অন্তরঙ্গতা—তাহা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শুধু ঋগ্‌বেদের কোন কোন সূক্তে এবং কালিদাসের রচনাতে খাঁটিভাবে পাওয়া যায়। ভারতীয় কবিতায় ঋগ্‌বেদের কবির পরেই কালিদাস। কিন্তু ঋগ্‌বেদের কবি আমাদের কাছে প্রাগিতিহাসের লোক, ঋগ্‌বেদের সময়ের ভারতীয় মানুষ ও ভারতীয় জীবন বলিয়া যাহা বুঝি তাহা শুধু অনুভবেই পাওয়া যায়, দেখিলে চিনিতে পারিব না। ঋগ্‌বেদের ও এখনকার দিনের মধ্যে ঠিক মাঝামাঝি কালটিতে কালিদাস ছিলেন। "হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের

কাল!''—আমাদের জীবনে ও সমাজে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে। উলটপালট হইয়াছে বলিতে পারি, কিন্তু সে বহুবিগত দিনের জীবন কালিদাসের বাণী আমাদের কাছে প্রত্যক্ষের মতো ধরিয়া রাখিয়াছে। মানুষের জীবনে বিগত বাল্যের ও যৌবনের স্মৃতির মতো কালিদাসের কল্পনা আমাদের চিত্তে সুধাধারা যোগায়, আমাদের মর্মে জীবনের গভীরতর চেতনার সাড়া জাগায়। ঐতিহাসিক সময়ের প্রাচীন ভারত বলিতে যে ছবি আমাদের মনে উদিত হয় সে ছবিতে ইতিহাসের বস্তু কতখানি আছে জানি না, তবে কালিদাসের রেখা ও রঙ অনেকখানিই।

ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য প্রধানত কবিত্বশক্তিমান্ পণ্ডিতের সৃষ্টি। পণ্ডিতগোষ্ঠীতে ও পণ্ডিত-অধিষ্ঠিত রাজসভায় অনুশীলিত হইবার জন্যই সংস্কৃত কাব্য রচিত হইত। এই কাব্যের দুইটি প্রধান ধারা—কাব্য ও নাটক। অপ্রধান তৃতীয় ধারা গদ্য আখ্যায়িকার সৃষ্টি বেশ কিছুকাল পরেই হইয়াছিল। বড় ও ছোট কাব্যগ্রন্থ রচনার অভ্যাস কমিয়া আসিলে প্রকীর্ণ কবিতার চলন হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীর শেষ কয় শতকে প্রকীর্ণ কবিতার মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ দশার দীপ্তি বিকীর্ণ।

অশ্বঘোষ

যে সব কাব্য ও নাটক পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সবচেয়ে যা প্রাচীন তা বোধ করি অশ্বঘোষের রচনা। অশ্বঘোষ বৌদ্ধমতাবলম্বী খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের গুরু অথবা গুরুতুল্য মাননীয়। সুতরাং তাঁহার জীবনকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ। তাঁহার নিবাস ছিল সাকেত (অর্থাৎ অযোধ্যা)। মায়ের নাম সুবর্ণাক্ষী। জাতি ব্রাহ্মণ। আর কিছু জানা নাই।

অশ্বঘোষের রচিত দুইটি কাব্য[1], এবং দুইটি নাটকের অতি অল্প কিছু অংশ পাওয়া গিয়াছে। একটি কাব্যে বুদ্ধের জীবনকথা বর্ণিত। নাম 'বুদ্ধচরিত'। কাব্যটি পঞ্চম শতাব্দীতে চীনা ভাষায় এবং সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে আটাশ সর্গ আছে। মূল কাব্যের তেরো সর্গ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় কাব্য 'সৌন্দরনন্দ'। ইহাতে বুদ্ধের বৈমাত্র ভাই নন্দের বিলাসী গৃহস্থজীবন হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত। কাব্যটিতে আঠারো সর্গ। কাব্য দুইটিরই পুথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। তবে এদেশে অপ্রচলিত হইবার পূর্বে অশ্বঘোষের কাব্যদ্বয় বাংলাদেশে সমাদৃত ছিল। অমরকোষের প্রথম বাঙালী টীকাকার সর্বানন্দ (দ্বাদশ শতাব্দী) কাব্য দুইটি হইতে কিছু উদ্ধৃতি দিয়াছেন। অশ্বঘোষের নাটক দুইটির মধ্যে যেটির বেশি অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা এক বুদ্ধশিষ্যের জীবনঘটিত। নাম 'শারিপুত্রপ্রকরণ'। অত্যন্ত পুরানো (প্রায় সমসাময়িক) তালপাতার পুথির কয়েকটি টুকরা চীনীয় তুর্কিস্থানের প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের বিধ্বস্ত বালুকাস্তূপ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ জার্মান পণ্ডিত হাইনরিখ ল্যুডর্স তাঁহার পত্নীর সহকারিতায় টুকরাগুলি সাজাইয়া দুইটি নাটকের কিছু ভগ্নাংশের পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। ল্যুডর্সের এই আবিষ্কার ভারতীয় সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহাতে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের ঊর্ধ্বতন সীমা দুই তিন শ বছর পিছাইয়া গেল, এবং জানা গেল যে অলঙ্কার শাস্ত্রে বিবিধ নাট্যরচনার যে শ্রেণীবিভাগ ও লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে সেই অনুসারে নাট্যরচনা খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতেও হইত। অশ্বঘোষের নাটকটি বহু অঙ্কে

১। অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে মহাকাব্য।

বিভক্ত, তাই নাম "প্রকরণ"। গঠন কালিদাস-প্রমুখ নাট্যকারদের রচনার রীতি অনুযায়ী। মনে হয় অশ্বঘোষের আগেই সংস্কৃতে এইরকম নাট্যরচনার রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অশ্বঘোষের কাব্য সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। যে মহাকাব্য-রীতিতে কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব' রচিত সেই রীতিতেই 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ'ও লিখিত। অর্থাৎ অশ্বঘোষের আগেই সর্গবন্ধ "মহাকাব্য" রচনার ধারা শুরু হইয়া গিয়াছিল।

অশ্বঘোষ বৌদ্ধ মহাযানমতাবলম্বী বড় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি পাণ্ডিত্যের তলায় চাপা পড়িয়া যায় নাই। ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যে, কালিদাস ছাড়া, তাঁহার সমকক্ষ কবি নাই। কালিদাসও কোন কোনও বর্ণনায় অশ্বঘোষের অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

অশ্বঘোষের কাব্যশক্তির পরিচয় দিবার জন্য বুদ্ধচরিতের পঞ্চম সর্গ হইতে কয়েকটি শ্লোক (৫০-৫২) উদ্ধৃত করিতেছি। বুদ্ধের মহাভিনিষ্ক্রমণের রাত্রিতে সুষুপ্ত বিলাসিনীদের বর্ণনা।

নবপুষ্করদর্ভকোমলাভ্যাং তপনীয়োজ্জ্বলসঙ্গতাঙ্গদাভ্যাম্।
স্বপিতি স্ম তদা পুরা ভুজাভ্যাং পরিরভ্য প্রিয়বন্মৃদঙ্গমেব।।
নবহাটকভূষণাস্তথান্যা বসনং পীতমনুত্তমং বসানাঃ।
অবশা বত নিদ্রয়া নিপেতু গর্জভগ্না ইব কর্ণিকারশাখাঃ।।
অবলম্ব্য গবাক্ষপার্শ্বমন্যা শায়িতা চাপরিভুগ্নগাত্রষষ্টিঃ।
বিররাজ বিলম্বিচারুহারা রচিতা তোরণশালভঞ্জিকেব।।

'নব পদ্মকেশরের মত কোমল, সোনার উজ্জ্বল অঙ্গদযুক্ত বাহুদ্বয় দ্বারা (কোন নারী) তখন প্রিয়ের মতো মৃদঙ্গকেই আলিঙ্গন করিয়া ঘুমাইতেছিল।
তেমনি আর এক (নারী) নূতন ও স্বর্ণভূষণ উত্তম পীতবসন পরিয়া নিদ্রায় অবশ হইয়া পড়িয়া ছিল যেন হস্তী কর্ণিকারশাখা ভাঙিয়া দিয়াছে।।
অপর একজন জানলার ধারে ঠেস দিয়া আধশোঁয়া। তাহার ছিপছিপে দেহ বাঁকানো, চারু হার (বক্ষে) দুলিতেছে, তাহাকে দেখাইতেছে যেন তোরণ-পাশের খোদিত মূর্তি।।।

পরবর্তী কালের তক্ষণশিল্পে এমন ছবি পাওয়া যায়।

সৌন্দরনন্দ "মহাকাব্য", আঠারো সর্গ।[১] ইহাতে গৃহবিলাসী, সুপুরুষ, বুদ্ধের বৈমাত্র ভাই নন্দের সংসার-পরিত্যাগ ও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ হইতে প্রব্রজ্যাগ্রহণ অবধি বর্ণিত আছে। সৌন্দরনন্দ সম্ভবত বুদ্ধচরিতের আগে লেখা। রচনায় কবিত্বের দীপ্তি আছে, পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় আছে এবং পাণ্ডিত্যের সে পরিচয় লুকাইবার চেষ্টা নাই। কোন কোন শ্লোক যেভাবে ব্যাকরণের বিশিষ্ট পদের উদাহরণপরম্পরায় গাঁথা তাহাতে মনে হয় যে কাব্যটি রচনার এক উদ্দেশ্য ছিল পঠন-পাঠন। একটি উদাহরণ দিতেছি। ইহাতে যে লিট্-পরম্পরা আছে তাহা পরবর্তীকালের ভট্টিকাব্যের কথা স্মরণ করায়।[২]

রুরোদ মম্লৌ বিরুরাব জগ্লৌ বভ্রাম তস্থৌ বিললাপ দধ্যৌ।
চকার রোষং বিচকার মাল্যং চকর্ত বক্ত্রং বিচকর্ষ বস্ত্রম্।।

১। সুন্দরী ও নন্দের কাহিনী বলিয়া এই নাম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত। ভালো সংস্করণ ই.এচ. জনস্টনের (অক্সফোর্ড ১৯২৬)।

২। এই লেখকের Language of Asvaghosa's Saundarananda প্রবন্ধ (এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা ১৯৩০ প্রথম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

"(নন্দ-কান্তা) কাঁদিল, ম্লান হইল, চীৎকার করিল, অবসন্ন হইল, ছটফট করিতে লাগিল, চুপ করিয়া রহিল, বিলাপ করিল, গুম হইয়া রহিল। রোষ দেখাইল, মালা ফেলিয়া দিল, (নিজের) মুখ আঁচড়াইতে লাগিল, বসন ছিঁড়িয়া ফেলিল।।'

সৌন্দরনন্দের রচনায় কালিদাসের লেখনীর প্রসন্নতার পূর্বাভাস মাঝে মাঝে অনুভূত হয়। নিম্নের আলোচনা হইতে তাহার কিছু ইঙ্গিত মিলিবে। সৌন্দরনন্দ মোটামুটি অখণ্ডিত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সর্গ ধরিয়া ধারাবাহিক পরিচয় দিতেছি।

প্রথম সর্গে কপিলবস্তুর বর্ণনা। শ্লোকসংখ্যা ৬২। এখানে অনেক প্রাচীন মুনির ও বীরের উল্লেখ আছে। শকুন্তলাপুত্র ভরতের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে কণ্ব তাঁহার জাতকর্ম করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সর্গে গৃহজীবন পর্যন্ত বর্ণনা। শ্লোকসংখ্যা ৬৫। শুদ্ধোদনের দুই পুত্র দুই পথ ধরিলেন।

ততস্তয়োঃ সংস্কৃতয়োঃ ক্রমেণ নরেন্দ্রসূনোঃ কৃতবিদ্যয়োশ্চ।
কামেষ্বজস্রং প্রমমাদ নন্দঃ সর্বার্থ সিদ্ধস্তু ন সংররজ।।
'কালক্রমে রাজার দুই পুত্র সংস্কারপ্রাপ্ত ও কৃতবিদ্য হইল। নন্দ প্রচুর ভোগে প্রমত্ত হইল, কিন্তু সিদ্ধার্থ আসক্ত হইল না।।'

তৃতীয় সর্গে সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণ, বুদ্ধত্বলাভ, মৃগদাবে ধর্মচক্রপ্রবর্তন ও কপিলবস্তুতে ধর্মপ্রচারার্থে আগমন বর্ণিত। শ্লোকসংখ্যা ৪২।

বুদ্ধ নন্দের গৃহদ্বারে আসিয়াছেন, নন্দ তাহার বণিতার সঙ্গে হাস্যপরিহাস করিতেছে। ভ্রাতার দেখা না পাইয়া বুদ্ধ ফিরিয়া গেলেন। একথা জানিতে পারিয়া নন্দ বুদ্ধের কাছে যাইতে চায়, সুন্দরী তাহাকে যাইতে দিবে না। অনেক কষ্টে অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি মিলিল। এই হইল চতুর্থ সর্গের বিষয়। শ্লোকসংখ্যা ৪৬।

নন্দ ও সুন্দরী রূপে পরস্পর অত্যন্ত যোগ্য।

তাং সুন্দরীং চেন্নলভেত নন্দঃ সা বা নিষেবেত ন তং নতভ্রূঃ।
দ্বন্দ্বং ধ্রুবং তদ্ বিকলং ন শোভেতান্যোন্যহীনাবিব রাত্রিচন্দ্রৌ।।
'সে সুন্দরীকে নন্দ যদি না পাইত আর সে সুন্দরী[১] যদি নন্দকে পরিচর্যা না করিত (তবে) অবশ্যই সে মিথুন অঙ্গহীন হইয়া শোভা পাইত না, যেমন রাত্রি ও চন্দ্র পরস্পর বিযুক্ত হইলে হয়।।[২]

বুদ্ধ ভিক্ষাটনে বাহির হইয়া ভাইয়ের ঘরের দ্বারে আসিয়াছেন।

অবাঙ্মুখো নিষ্প্রণয়শ্চ তস্থৌ ভ্রাতুর্গৃহে ঽন্যস্য গৃহে যথৈব।
তস্মাদথো প্রেষ্যজনপ্রমাদাদ্ ভিক্ষামলব্ধ্বৈব পুনর্জগাম।।
'অধোমুখ, নির্বিকার—(বুদ্ধ আসিয়া) ভাইয়ের ঘরে দাঁড়াইলেন, যেমন অপর লোকের ঘরে তেমনি। দাসীদের অবিবেচনায় (তিনি) ভিক্ষা না পাইয়াই সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।'

দাসীরা তখন নন্দ-সুন্দরীর বিলাসের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিল।

কাচিৎ পিপেষাঙ্গাবিলেপনং হি বাসোঽঙ্গনা কাচিদবাসয়চ্চ।
অযোজয়ৎ স্নানবিধিং তথান্যা জগ্রন্থুরন্যাঃ সুরভীঃ স্রজশ্চ।
'কেহ অঙ্গবিলেপন পেষণ করিতেছিল, কেহ বা বস্ত্রপরিচর্যা করিতেছিল। আবার একজন স্নানের যোগাড় করিতেছিল, কেহ কেহ বা সুগন্ধ মালা গাঁথিতেছিল।।'

১। মূলে "নতভ্রূ" = যাহার ভ্রূ ধনুর মতো বাঁকা।
২। তুলনীয় রঘুবংশ ৭.১৪।

এক দাসী ছাদের উপরে ছিল। সে বুদ্ধকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নামিয়া আসিয়া নন্দকে জানাইল

অনুগ্রহায়াস্য জনস্য শঙ্কে গুরুর্গৃহং নো ভগবান্ প্রবিষ্টঃ।
ভিক্ষামলব্ধা গিরমাসনং বা শূন্যাদরণ্যাদিব যাতি ভূয়ঃ।।
এই (বাড়ির) লোককে অনুগ্রহ করিবার জন্যই বোধহয ভগবান্ আমাদের ঘরে আসিয়াছিলেন। ভিক্ষা, (এমন কি) স্বাগত অথবা আসন না পাইয়া তিনি যেন শূন্য অরণ্য হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন।।'

বুদ্ধ ঘরে আসিয়াছিলেন এবং অভ্যর্থনা না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন এই কথা শুনিয়াই নন্দ যেন ঝটিকাহত গাছের মত বিচলিত হইল। মাথায় হাত জুড়িয়া সে বুদ্ধদর্শনে যাইতে পত্নীর অনুমতি চাহিল। সুন্দরী তখন প্রসাধন করিতেছিল, সে ভয পাইয়া অনেক কষ্টে অনুমতি দিল এই বলিয়া

গচ্ছার্যপুত্রেহি চ শীঘ্রমেব বিশেযকো যাবদয়ং ন শুষ্কঃ।।
'আর্যপুত্র, যাও। শীঘ্র আসিও, যতক্ষণে এই প্রসাধনলেপ না শুকায়।'

পঞ্চম সর্গে নন্দের প্রব্রজ্যাগ্রহণ বর্ণিত। শ্লোকসংখ্যা ৫৩। ষষ্ঠ সর্গে পতিব প্রব্রজ্যা গ্রহণে সুন্দরীর হতাশা। শ্লোকসংখ্যা ৪৯। সুন্দরীর প্রধান ক্ষোভ, নন্দ বুঝি তাহাব চেয়ে আর একজনকে বেশি ভালোবাসে।

সেবার্থমাদর্শমনন্যচিত্তো বিভূষয়ন্ত্যা মম ধারয়িত্বা।
বিভর্তি সোঽন্যস্য জনস্য তং চেন্নমোঽস্তু তস্মৈ চলসৌহৃদায়।।
'আমি যখন প্রসাধন করি তখন সে আমার সেবায় একমনে আরশি ধরিয়া থাকিত। সে যদি এখন তা অন্য জনের করে তবে সে চপল মিত্রকে নমস্কার।'

নন্দের বিরহে সুন্দরীর দশা ক্ষীণ হইয়াছে।

তাভির্বৃতা হর্ম্যতলেঽঙ্গনাভিশ্চিন্তাতনুঃ সা সুতনুর্বভাসে।
শতর্হ্রদাভিঃ পরিবেষ্টিতেব শশাঙ্কলেখা শরদভ্রমধ্যে।।
'গৃহমধ্যে সেই নারীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া চিন্তাকৃশ সে সুন্দরীকে দেখাইতেছিল যেন শরৎমেঘের মধ্যে বিদ্যুৎমালা-পরিবেষ্টিত চন্দ্রকলা।।'

প্রব্রাজ্যা লইয়াও নন্দ সুন্দরীকে ভুলিতে পারিতেছে না। সপ্তম সর্গে নন্দের সেই বিলাপ বর্ণিত। শ্লোকসংখ্যা ৫২।

নন্দের হাবভাব এক শ্রমণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

অথ নন্দমধীরলোচনং গৃহযানোৎসুকমুৎসুকোৎসুকম্।
অভিগম্য শিবেন চক্ষুযা শ্রমণঃ কশ্চিদুবাচ মৈত্রয়া।।
'তখন নন্দকে চকিতচক্ষু, গৃহগমনে উদ্গ্রীব, অত্যন্ত উৎসুক দেখিয়া এক শ্রমণ আসিয়া স্নিগ্ধ নয়নে বন্ধুভাবে সম্বোধন করিল।।'

বলিল, তোমার মন চঞ্চল কেন? তোমার কী দুঃখ বল।

অথ দুঃখমিদং মনোময়ং বদ বক্ষ্যামি যদত্র ভেষজম্।
মনসো হি রজস্তমস্বিনো ভিষজোঽধ্যাত্মবিদঃ পরীক্ষকাঃ।।
'যদি এই দুঃখ মানসিক হয় তো বল, তাহার ঔষধ বলিয়া দিব।
কারণ, রজস্তমোময় মনেব পরীক্ষাকারী চিকিৎসক অধ্যাত্মবিদেরাই।।'

নন্দ বলিল, এ সব আমার ভালো লাগিতেছে না।

বনবাসসুখাৎ পরাঙ্মুখঃ প্রযিযাসা গৃহমেব যেন মে।
ন হি শর্ম লভে তয়া বিনা নৃপতিহীন ইবোত্তমশ্রিয়া।।
'বনবাসসুখে (আমি) পরাঙ্মুখ, তাই ঘরে ফেরাই আমার মন।
তাহাকে ছাড়িয়া সুখ পাইতেছি না, উত্তমশ্রীহীন যেমন রাজা।।'

শ্রমণ তাহাকে উদাহরণ দিয়া নারীসঙ্গের দোষ বুঝাইতে লাগিল। এই হইল অষ্টম সর্গের বস্তু। শ্লোকসংখ্যা ৬২।

শ্রমণের নারীনিন্দা নন্দকে বিচলিত করিতে পারিল না। তখন শ্রমণ সংসারের অনিত্যতা বুঝাইতে লাগিল কিন্তু তাহার মন কিছুতেই ফিরাইতে পারিল না। ইহাই নবম সর্গের বিষয়। শ্লোকসংখ্যা ৫১।

শ্রমণের মুখে নন্দের কথা শুনিয়া বুদ্ধ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নন্দ আসিলে তিনি তাহাকে লইয়া হিমালয় পর্বতে চলিয়া গেলেন। সেখানে এক বানরীকে দেখাইয়া সুন্দরীর সহিত তুলনা করিলেন। হিমালয় হইতে তাঁহারা ইন্দ্রালয়ে গেলেন। সেখানে অপ্সরাদের দেখিয়া নন্দ মুগ্ধ হইয়া গেল। বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন, যদি কঠোর সংযম আশ্রয় করিয়া তপস্যা কর তবেই এই অপ্সরাদের সঙ্গ পাইতে পারিবে। নন্দ রাজি হইয়া বুদ্ধের সহিত ফিরিয়া আসিল। এইখানে ৬৪ শ্লোকে দশম সর্গ সমাপ্ত।

অশ্বঘোষের হিমালয়-বর্ণনা কালিদাসের রচনা স্মরণ করায়।

সুবর্ণগৌবাশ্চ কিরাতসংঘা ময়ূরপক্ষোজ্জ্বলগাত্রলেখাঃ।
শার্দুলপাতপ্রতিমা গুহাভ্যো নিষ্পেতুরুদ্গার ইবাচলস্য।।
'সোনার মতো রঙ কিরাতের দল ময়ূরপুচ্ছের উজ্জ্বল রেখা গায়ে লাগাইয়া
বাঘ ঝাঁপাইবার মতো করিয়া বাহির হইল, যেন পর্বতের উদ্গার।।

একাদশ সর্গে (শ্লোকসংখ্যা ৬২) আনন্দ নন্দকে বুঝাইয়া দিল যে স্বর্গে গিয়া অপ্সরাদের লাভ করিলে সার্থকতা মিলিবে না।

দ্বাদশ সর্গে (শ্লোকসংখ্যা ৪৩) নন্দ স্বর্গের লোভ ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধের কাছে আসিল। বুদ্ধ তাহাকে ধর্মের পথ দেখাইলেন।

ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ সর্গ পর্যন্ত (শ্লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৫৬, ৫২, ৬৯ ও ৯৮) নন্দকে বুদ্ধের শিক্ষাদান চলিয়াছে।

সপ্তদশ সর্গে (শ্লোকসংখ্যা ৭৩) নন্দের অর্হত্ত্বলাভ বর্ণিত। শেষ এগারো শ্লোকে নন্দের মনে মনে বুদ্ধবন্দনা।

অষ্টাদশ সর্গে (শ্লোকসংখ্যা ৬৪) নন্দ বুদ্ধের সঙ্গে মিলিল। বুদ্ধ তাহার কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে সুন্দরীও পরে ভিক্ষুণী হইয়া ধর্মদেশনা করিবে।

সৌন্দরনন্দের শেষ শ্লোকে অশ্বঘোষ কাব্যরচনার কৈফিয়ৎ নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রায়েণালোক্য লোকং বিষয়রতিপরং মোক্ষপ্রতিহতং
কাব্যব্যাজেন তত্ত্বং কথিতমিহ ময়া মোক্ষঃ পরমিতি।
তদ্‌বুদ্ধা শামিকং যত্তদবহিতমিতো গ্রাহ্যং ন ললিতং
পাংশুভ্যো ধাতুজেভ্যো নিয়তমুপকরং চামীকরমিতি।।
'লোকে প্রায়ই বিষয়ভোগে লিপ্ত এবং মোক্ষে বিমুখ,
(তাই) কাব্যচ্ছলে এখানে আমি মোক্ষই চরম এই তত্ত্ব কহিলাম।
তাই বুঝিয়া যাহা শান্তিপ্রদ এখানে তাহাই গ্রহণযোগ্য—ললিত নয়,
ধূলা ও ধাতুচূর্ণ হইতে যেমন সোনা ছানিয়া লওয়া হয়।।'

কালিদাস

কালিদাসের কাব্য চারখানির মধ্যে ছোট দুইখানি (খণ্ড কাব্য) সম্পূর্ণ, কিন্তু বড় দুইখানি ("সর্গবন্ধ মহাকাব্য") সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। রঘুবংশ সম্পূর্ণ হইতে পারে, কুমারসম্ভব অসম্পূর্ণ হওয়াই সম্ভব। কালিদাসের ছোট ও বড় কাব্যগুলি জাতে আলাদা। ছোট কাব্য দুইটি—'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত'—প্রেমের কবিতা। বড় কাব্য দুইটি—'কুমারসম্ভব' ও 'রঘুবংশ'—যথাক্রমে মানবাচারী দেবতার মহৎ প্রেমকাহিনী ও মহৎ রাজবংশের উন্নতি-অবনতির চিত্রশালিকা। প্রথমে বড় কাব্য দুইটিরই আলোচনা করিতেছি। সবার আগে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। কালিদাসের কাব্যের বিষয়বস্তু মৌলিক হউক বা না হউক সে তাঁহার নিজস্ব। ঋতুসংহারের ও মেঘদূতের বিষয় সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব, কুমারসম্ভবের কাহিনীও নিজস্ব তবে কাহিনীর বীজ সম্ভবতঃ লোককাহিনী হইতে লওয়া। কালিদাসের কবিত্ব খ্যাতি যে সবটাই অথবা অনেকটাই "উপমা কালিদাসস্য" বলিয়াই চুকাইয়া দেওয়া যায় না তাহা রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত সত্ত্বেও এখন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। কালিদাসের সমসাময়িকেরা ও অদূরকালের পরবর্তীরা জানিতেন যে কাব্য-নাটকের বিষয়ে ও পরিকল্পনায় কালিদাস অত্যন্ত মৌলিক ছিলেন। এই জন্যই সেকালের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহাকে বাল্মীকি ও ব্যাসের পরেই মহাকবি হিসাবে এবং সকলের উপরে কবি হিসাবে স্থান দিয়াছিলেন।

কুমারসম্ভব

কালিদাস কুমারসম্ভব কোন সর্গ পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে এখন খুব মতভেদ নাই। নবম হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত অংশ যে প্রায়-আধুনিক কালের সংযোজন তাহাতে ন্যায়-আঁকড়িয়া দুএকজন পণ্ডিত ছাড়া কাহারো সংশয় নাই। অষ্টম সর্গের পর আর কোন প্রাচীন টীকা পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ অষ্টম সর্গকেও প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। এই সর্গে শিবপার্বতীর প্রেমক্রীড়ার যে নিবিড় বর্ণনা আছে তাহা প্রগাঢ় আদিরসাসিক্ত। এই জন্য কোন কোন আধুনিক সমালোচক এই সর্গটি বাদ দিতে চাহেন। অষ্টম সর্গের রচনা নবম-সপ্তদশ সর্গের মতো অত্যন্ত কাঁচা ও অপরিচ্ছিন্ন রচনা নয়, এবং ইহাতে কালিদাসের স্টাইল স্পষ্ট না হইলেও পুরাপুরি ঝাপসা নয়। তবে অষ্টম সর্গকে কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে এই এক যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি হইল যে এমন কামক্রীড়ার বর্ণনা তখন অর্থাৎ কালিদাসের সময়ের সাহিত্যে ও শিল্পরুচিতে অস্বীকৃত ছিল না।[১] তৃতীয় যুক্তি হইল, রঘুবংশের শেষ সর্গেও এমনি বর্ণনা—অবশ্য খুব সংক্ষেপে—আছে। তবে বিপক্ষেও একাধিক যুক্তি আছে। প্রথমত, কামক্রীড়া বর্ণনায় স্থূলতার মাত্রাধিক্য এবং পুনরুক্তি। কালিদাসের রচনায় এ ব্যাপার অপ্রত্যাশিত। দ্বিতীয়ত, শিবের যে ভূমিকা কালিদাস প্রথম সর্গ হইতে সপ্তম সর্গ অবধি গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা অষ্টম সর্গে যেন ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়ত, প্রথম-সমাগমভীরু পার্বতীর

১। তক্ষণশিল্পে কামক্রীড়ার ছবি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে (এমন কি তাহারও কিছু পূর্ব হইতে) অল্পস্বল্প পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে এমন চিত্রণের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা কালিদাসের কাব্যের প্রসারের ফলে ঘটা অসম্ভব নয়।

বর্ণনা খুব স্বভাবসঙ্গত এবং কালিদাসের লেখনীরই উপযুক্ত বটে, কিন্তু পার্বতীর তো প্রৌঢ় প্রেম। পার্বতী শিবকে অনেকদিন ধরিয়া কামনা করিয়াছেন। সুতরাং একটা সঙ্কোচ ও ভয় অপেক্ষিত নয়।[১] চতুর্থত, অষ্টম সর্গে পার্বতীর সখী বিজয়ার নাম পাওয়া যায়। আগেকার সর্গগুলিতে দুইজন ('সখীভ্যাম্'') অথবা একজন (''আলি'') সখীরই উল্লেখ আছে, কোন নাম নাই। গঙ্গার নাম ''জাহ্নবী'' অষ্টম সর্গে দুইবার আছে। অন্যত্র কোথাও কালিদাস এ নামটি করেন নাই (শুধু মেঘদূতে আছে ''জহ্নোঃ কন্যাম্'')। পঞ্চমত, একটি পুথিতে মল্লিনাথের নামে অষ্টম সর্গের যে টীকাটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা মল্লিনাথের রচনা বলিয়া নেওয়া যায় না। সুতরাং মল্লিনাথ অষ্টম সর্গ পান নাই। ষষ্ঠত, অষ্টম সর্গে কুমারের ''সম্ভব'' (জন্ম) জলে শিববীর্য নিক্ষেপেই অবসান হইয়াছে। কাহিনীর বাকিটুকু কালিদাসের যে ভালোই জানা ছিল তাহা মেঘদূতে ও রঘুবংশে উল্লেখ হইতে বোঝা যায়।

প্রাচীন টীকাকারেরা নির্বোধ ছিলেন না। কালিদাসের কাব্যে তাঁহাদের প্রীতি এবং ভক্তি ছিল, তাই অসাঙ্গ শিবলীলা কাব্যকে তাঁহারা সাঙ্গ করিতে চাহেন নাই। পরে অর্থাৎ বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কোনো একজন তাহা চাহিয়া ছিলেন। কে তিনি জানা নেই। যথাসাধ্য কালিদাসের ষ্টাইল অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া শেষ নয় সর্গ লিখিয়া তিনি কালিদাসসাগরে কাব্য ও নিজ নাম দুই-ই ভাসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস-কাব্যসাগর তাঁহার ভেজাল মাল তীরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিতে ছাড়ে নাই। তাঁহার নামটি ডুবিয়া গিয়াছে।

কুমারসম্ভব যে কালিদাসের অসমাপ্ত রচনা তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, এবং রচনাটি যে কেন অসমাপ্ত রহিয়া গেল তাহারও তিনি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এ ব্যাখ্যা অবশ্যই বাস্তব ব্যাখ্যা নয়, অর্থাৎ ইতিহাসসঙ্গত নয়। তবে সহৃদয় হৃদয়-অনুমোদিত বটে। চৈতালির 'কুমারসম্ভব' কবিতা দেখুন

যখন শুনালে কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভব গান, চারদিকে ঘিরে
দাঁড়াল প্রমথগণ—শিখরের 'পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যামেঘস্তর
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, কভু অশ্রুকলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে—যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন নিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবী-পানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

কবিতাটি লেখা হইয়াছিল ১৫ই শ্রাবণ ১৩০৩।

১৩০৬ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় বেশি করিয়া আকৃষ্ট হন। সেই সময় তিনি রসিকের দিক দিয়া নয় রসের ভিয়ানীর দিক দিয়া অর্থাৎ ষ্টাইল বিচার করিয়া

১। তবে মনে হয় কাহিনীর বীজে ছিল শিব কামুক আর উমা প্রেমিক। তাহা হইলে বলিব কালিদাস এখানে খুব আধুনিক হইয়াছেন।

কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গ যে জাল তাহার প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই অনুমান নির্ভর করিতেছে একটি অস্বাক্ষরিত ছোট প্রবন্ধের উপর। প্রবন্ধটির নাম 'জাল কুমারসম্ভব'। প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছিল ১৩০৮ সালের 'সমালোচনা' পত্রিকার দ্বিতীয় (ফাল্গুন) সংখ্যায়। (এই বছর বঙ্গদর্শন পৌষ সংখ্যায় তাঁহার 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধও বাহির হইয়াছিল।) আমার বিশ্বাস রচনাটি রবীন্দ্রনাথেরই। এটি সমগ্র ভাবে উদ্ধৃত করিতেছি। "কুমার-সম্ভবের প্রথম সাতটি সর্গের পরে আরো দশটি সর্গ বাজারে চলিয়াছে। উক্ত দশ সর্গকে কালিদাসের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করেন, আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নাই। লোকমুখে কবিবরের অনেক দুর্গতি হইয়াছে, ইহাও তাহার মধ্যে একটি।

কবিত্বের তুলনা করিয়া ঝুটাসাচ্চার প্রভেদ দেখান যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা অষ্টম সর্গ হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত কালিদাসের বলিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছেন, সম্ভবত তাঁহারা কাব্যের ভালমন্দ সম্বন্ধে পরমযোগীর ন্যায় ভেদজ্ঞানরহিত !

সেইজন্য আমরা একটা অপেক্ষাকৃত সহজ প্রমাণের আশ্রয় লইব। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে মুদ্রাদোষ দেখা যায় না। এমন কোন ভঙ্গিমা নাই, যাহাকে রচনাগত অভ্যাসদোষ বলা যাইতে পারে।

কিন্তু অষ্টম হইতে সপ্তদশ সর্গের মধ্যে একপ্রকার প্রশ্নাশ্রিত ভঙ্গী বারংবার দেখা যায়, যাহা প্রথম সাত সর্গের মধ্যে দুর্লভ। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

দশম সর্গের নবম শ্লোকে অগ্নি বলিতেছেন আমার স্তব শুনিয়া মহাদেব প্রীতিমান্ হইলেন।—স্তোত্রং কস্য ন তুষ্টয়ে? স্তোত্রে কে না তুষ্ট হয়? উক্ত সর্গেই ঃ

অথ দিব্যাং নদীং দেবম্
অভ্যনন্দন্ বিলোক্য তাঃ।
কং নাভিনন্দয়ত্যেষা দৃষ্টা
পীযূষবাহিনী।।

দিব্যা নদী দেবীকে দেখিয়া তাঁহারা অভিনন্দিত হইলেন। এই পীযূষবাহিনীকে দেখিলে কে আনন্দিত না হয়?

ইন্দ্র মহাদেবকে দেখিয়া
আসীৎ ক্ষণং ক্ষোভপরো, নু কস্য
মনো নহি ক্ষুভ্যতি ধামধাম্নি?

ক্ষণকাল ক্ষোভপর হইয়া রহিলেন, তেজোধামকে দেখিয়া কে না ক্ষোভপর হইয়া থাকেন?

প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া
প্রাপোপবিশ্য প্রমদং সুরেন্দ্র
প্রভুপ্রসাদো হি মুদে ন কস্য?

উপবেশনপূর্বক সুরেন্দ্র প্রমোদিত হইলেন, প্রভুপ্রসাদ কাহাকেই বা প্রমোদিত না করে?

কার্তিককে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাভিলাষ ইন্দ্র প্রমোদপরায়ণ হইলেন—

ধ্রুবমভিমতে পূর্ণে কো বা মুদা নহি মাদ্যতি? অভিলাষপূর্ণ হলে আমোদে কে না মত্ত হয়?

শৈলসুতা আর কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া পুত্রের সমীপস্থ হইলেন—

পুত্রোৎসবে মাদ্যতি কা ন হর্ষাৎ
পুত্রোৎসবে কে না হর্ষে মত্ত হয়?

পুত্রকে দেখিয়া পার্বতী সহস্র চক্ষু পাইতে ইচ্ছা করিলেন—ন নন্দনালোকনমঙ্গলেষু ক্ষণং ক্ষণং তৃপাতি কস্য চেতঃ — পুত্রদর্শনমঙ্গল ব্যাপারে কাহার চিত্ত প্রতিক্ষণে তৃপ্ত না হয়?

কুমার বাললীলা দ্বারা গিরিশ-গৌরী উভয়ের হৃদয় হরণ করিলেন—

মুদে ন হৃদা কিমু বালকেলিঃ?

হৃদা বাললীলা কাহাকে না আমোদ দেয়?

মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কুমারকে দেখিয়া যুদ্ধে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন—ন কস্য বীর্যায় বরস্য সঙ্গতিঃ? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গলাভ কাহার না বীর্যের কারণ হয়?

আরো কি প্রমাণের প্রয়োজন আছে? কাব্যে উপমা-তুলনা দ্বারা ভাবকে পরিস্ফুট ও পাঠকের কল্পনাকে উত্তেজিত করা হইয়া থাকে, কিন্তু বারংবার এমন অনাবশ্যক প্রশ্নের খোঁচা মারিয়া পাঠককে ব্যস্ত করিয়া তোলা কালিদাসের কোথাও ত দেখি নাই। কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গের মধ্যে এমন মূঢ়ের মত প্রশ্ন একটিও কেউ করিতে পারিবেন না। উপরি উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে দেখা যাইবে প্রশ্নের দ্বারা যে কথাগুলাকে আলোড়িত করিয়া তোলা হইয়াছে, সে কথাগুলা অতি সামান্য, তাহাতে কোন পাঠকের সংশয়ের অবকাশ মাত্র থাকিতে পারে না। মা ছেলেকে দেখিয়া খুসি হইলেন,—ইহার পরে যদি কোন কবি প্রশ্নস্বরূপে পুনর্বার লেখেন, কোন মা ছেলেকে দেখিয়া খুসি না হন্? তবে তিনি কালিদাসের সিংহচর্ম পরিয়া আসিলেও কণ্ঠস্বরেই ধরা পড়েন। উপরের প্রশ্নমালা যদি কালিদাসের রচনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহার কাব্য হইতে আরো এমন সহস্র প্রশ্ন হারাইয়া গেছে—সেগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যেমন হরকোপানলে —ভস্মাবশেষং মদনং চকার,—এইখানে থাকা উচিত ছিল অনলে কে না ভস্ম হয়? যেখানে রতি বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা, সেখানে লেখা উচিত, বিপদকালে কোন্ রমণীর মাথার চুল ঠিক থাকিতে পারে?"

কুমারসম্ভবের শেষ দশটি সর্গকে জাল প্রমাণ করিবার যে যুক্তি দেখানো হইয়াছে তা অব্যর্থ যাহাকে বলে ব্রহ্মাস্ত্র।*

শিব-পার্বতীর কাহিনী কালিদাস কোথা হইতে পাইলেন? সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা বলেন, অথবা অনুমান করেন, কালিদাস পুরাণ হইতে কাহিনীটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন এই প্রশ্ন জাগে, কোন পুরাণ হইতে? পণ্ডিতেরা উত্তর দেন, শিবপুরাণ হইতে। কিন্তু শিবপুরাণ যে কালিদাসের আগে রচিত তাহার কোনই প্রমাণ নাই বরং বিপরীত প্রমাণ আছে। শিবপুরাণের কাহিনী হুবহু কুমারসম্ভবের মতো এবং কুমারসম্ভব হইতে গোটা গোটা শ্লোক ও শ্লোকাংশ সেখানে উদ্ধৃত হইয়াছে। "পুরাণ" শুনিলেই কালিদাসের প্রতি আমরা এতটা অবিচার করিতে সাহসী হই যে বহু অধস্তন কালের রচনা হইতে তাঁহার রচনায় চোরাই মাল চাপাইয়া দিতে দ্বিধা করি না।

কুমারসম্ভবের কাহিনী-বীজ কোথা হইতে আহৃত তাহা কাব্যটির আলোচনায় কাহিনী-বিশ্লেষণ হইতে অনুমান করা যায়। আলোচনার শেষে আমার বক্তব্য বলিব।

হিমালয়ের বর্ণনায় কাব্যের আরম্ভ। প্রথম শ্লোক

> উত্তর দিকে আছেন পর্বতমালার অধিরাজ হিমালয় নামে, (বাহিরে তিনি পর্বত,) অন্তরে দেবতা।
>
> পূর্ব ও পশ্চিম দুই সাগর অবগাহন করিয়া তিনি পৃথিবীর মানবদণ্ডের[১] মতো (বিরাজমান)।।

* শারদীয়া জনসেবক ১৩৭০ পত্রিকায় আমার 'কালিদাসের অসমাপ্ত কাব্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১। অর্থাৎ গজকাঠি, মাপিবার দণ্ড।

তাহার পর পনেরো শ্লোকে দেবতাত্মা হিমালয়ের মাহাত্ম্য বিবৃতি ও পর্বতকায়ের সৌন্দর্য বর্ণনা। যজ্ঞের এক প্রধান উপকরণের (সোমের) জন্ম হিমালয়ে এবং পৃথিবীকে স্থির রাখার উপযুক্ত ভার এবং সার হিমালয়ের আছে বলিয়া প্রজাপতি নিজেই তাঁহাকে পর্বতদের আধিপত্যে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার পর বংশরক্ষার জন্য হিমালয় পিতৃদেব মানসী কন্যা, মুনিদেরও মাননীয়, মেনাকে[১] যথাবিধি বিবাহ করিলেন। যথাকালে প্রথমে জন্মিল পুত্র মৈনাক তাহার পরে

> দক্ষের কন্যা, শিবের প্রথম পত্নী সতী পিতৃকৃত অপমানে যোগবলে শরীর বিসর্জন করিয়া শৈলবধূকে আশ্রয় করলেন।।

কন্যার জন্ম হইলে পব ধরিত্রী ও প্রসবিত্রী দুই হইল কল্যাণময়ী। শিশুটি নব শশিকলার মতো দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। তাহার পর নামকরণ।

আত্মীয় স্বজনের প্রিয় তাই তাহাকে আত্মীয়স্বজনে বংশ-নামে পার্বতী বলিয়া ডাকিত। "উ মা"—এই বলিয়া মায়ের দ্বারা তপস্যায় নির্বারিত হওয়ার পরে সুমুখী উমা নাম পাইয়াছিল। হিমালয় কন্যাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতে লাগিলেন। পার্বতীকে পাইয়া হিমালয় যেন তেমনি ধন্য হইল "যেমন সংস্কৃত বাণী শিখিয়া মনীষী ব্যক্তি হয়।"[২]

> মন্দাকিনীর (তীরে)বালুবেদিকা (করিয়া), গেডু (লুফিয়া) ও পুতুল-পুত্র লইয়া বাল্যে ক্রীড়ারস উপভোগের ছলে পার্বতী সর্বদা সখীদের মধ্যে থাকিয়া খেলা করিত।।

শিক্ষার বয়স হইলে পার্বতীর পূর্বজন্মের[৩] বিদ্যা যেন আপনিই আসিয়া গেল। নবযৌবন আবির্ভূত হইলে পর তাহার অবয়ব দিনে দিনে তুলির দ্বারা চিত্রফলকে আঁকা ছবির মতো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কালিদাস আঠারো শ্লোকে পার্বতীর পা হইতে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন। এমন দীর্ঘ নারীসৌন্দর্য বর্ণনা কালিদাস আর কোথাও করেন নাই।

পার্বতীর বিবাহের বয়স হইলে একদিন নাবদ আসিয়া হিমালয়কে বলিয়া গেলেন যে তাঁহার মেয়ের একমাত্র যোগ্য বর শিব। কিন্তু যাচিয়া তো মেয়ে দেওয়া যায় না, হোক না কেন শিবের মতো বর।

এদিকে দক্ষসুতার আত্মহত্যার পর শিব আর সংসার না করিয়া তপস্যায় মন দিয়াছিলেন। গঙ্গাপ্রবাহবিধৌত মৃগনাভিসুরভিত কিন্নরকূজিত হিমালয়ের এক স্থলীতে তিনি সেই সময় তপস্যা করিতে আসিয়াছিলেন। হিমালয় শিবকে যথোচিত অর্চনা করিয়া কন্যাকে আদেশ দিলেন সংযত হইয়া সখীদের লইয়া তাঁহার আরাধনা ও পরিচর্যা করিতে। তপস্যার বিঘ্নকর হইলেও শিব পার্বতীর শুশ্রূষা অনুমোদন করিলেন। কেন না

> বিকারহেতু বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহাদের চিত্ত অবিকৃত তাঁহারাই ধীর।

প্রত্যহ পূজার ফুল তুলিয়া বেদি পরিষ্কার করিয়া নিত্যকর্মের জল তুলিয়া কুশ আহরণ করিয়া পার্বতী শিবের পরিচর্যা করিতে লাগিল।[৪]

১। পুরাণে মেনকা। নামটির আসল অর্থ হস্তিনী।

২। "সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী" (২৮)। এখানে 'সংস্কারবতী গীঃ" মানে সংস্কৃত ভাষা নয়, বেদের ভাষা।

৩। পার্বতীর পূর্বজন্ম হইয়াছিল প্রজাপতি দক্ষের জ্যেষ্ঠ কন্যা সতীরূপে। সতী শিবের প্রথম পত্নী ছিলেন।

৪। শ্লোক ৬০। এইখানে প্রথম সর্গ শেষ।

দ্বিতীয় সর্গের দৃশ্য দেবলোকে। তারক-অসুরের দ্বারা পর্যুদস্ত ও পীড়িত হইয়া দেবগণ ইন্দ্রকে নেতা করিয়া ব্রহ্মার কাছে গেলেন। দেবতারা ব্রহ্মাকে স্তব করিতে লাগিলেন।[১]

ত্রিমূর্তি তোমাকে নমস্কার। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তুমিই ছিলে।
তুমি গুণত্রয় বিভাগের জন্য পরে বেদবিধি স্বীকার করিয়াছ।

হে জন্মহীন, যেহেতু জলের মধ্যে অমোঘ বীজ বপন করিয়াছিলে সেহেতু চরাচর বিশ্বের মূল বলিয়া তুমি গীত হও।।[২]

সৃষ্টির জন্য ইচ্ছুক হইয়া তুমি নিজেকে ভাগ করিয়াছিলে, সেই (আদি) স্ত্রী ও পুরুষ তোমারই নিজের দুই ভাগ। তাহারা দুজনেই মিথুনজাত সৃষ্টির মাতা পিতা বলিয়া গণ্য।।[৩]

জগতের উৎপত্তি-স্থান তুমি, তোমার উৎপত্তি নাই। জগতের নিধনভূমি তুমি, তোমার নিধনভূমি নাই। জগতের আদি তুমি, তোমার আদি নাই। জগতের ঈশ্বর তুমি, তোমার ঈশ্বর নাই।

দ্রব্য, সংঘাতকঠিন,[৪] স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু, ব্যক্ত, অব্যক্ত—তুমিই হও। বিভূতিতে[৫] তোমার বিচিত্রতা[৬]। যাহার আরম্ভ ওঁ-কারে, উচ্চারণ তিন প্রকারে,[৭] (যাহার) কর্মযজ্ঞ-ফল স্বর্গ, (বেদ-) বাণীর তুমি উৎস।।

তোমাকে (জ্ঞানীরা) ধারণা করেন পুরুষের কাম্যপ্রবর্তিনী প্রকৃতি (বলিয়া)। সেই (প্রকৃতির) দ্রষ্টা উদাসীন পুরুষ বলিয়াও তোমাকে (তাঁহারা) জানেন।[৮]

দেবতাদের এই স্তব শুনিয়া খুশি হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাদের স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কী। ইন্দ্রকে বলিলেন, তোমার বজ্রের ধার ভোঁতা দেখাইতেছে কেন? বরুণকে বলিলেন, তোমার হাতে পাশ মন্ত্রপড়া সাপের মতো নত হইয়া ঝুলিতেছে কেন? কুবেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার হাতে গদা নাই বলিয়া তোমাকে ডালভাঙ্গা গাছের মতো দেখাইতেছে। যমের প্রসঙ্গে বলিলেন, অমোঘদণ্ড নেবানো মশালের দাণ্ডার মতো করিয়া যম কেন আঁচড় কাটিতেছে। আদিত্যদের দেখাইয়া বলিলেন, কেন ইহাদের ছবিতে আঁকার মতো তেজোহীন দেখাইতেছে। রুদ্রদের[৯] সম্বন্ধে বলিলেন, উহাদের মস্তকে জটা ও শশিকলা নাই কেন।

দেবতাদের হইয়া ইন্দ্র আরজি পেশ করিলেন। প্রথমে দেবলোকে তারকের অত্যাচারের এক এক করিয়া বর্ণনা।[১০] তাহার পর ইন্দ্র জানাইলেন, তারকের অত্যাচারের কোন প্রতিকারই হইতেছে না।

১। শ্লোক ৪-১৫।
২। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির ইঙ্গিত। ঋগ্‌বেদের নাসদীয় সূক্ত তুলনীয়।
৩। মধ্য বাংলা সাহিত্যের ধর্মঠাকুরের সৃষ্টিপ্রসঙ্গ তুলনীয়।
৪। অর্থাৎ পিণ্ডীভূত জড়।
৫। অর্থাৎ manifestation-এ।
৬। মূলে "প্রাকাম্যম্‌"।
৭। "ন্যারৈস্ত্রিভিঃ", অর্থাৎ তিন স্বরধারায়—উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরিতে। এইখানে কালিদাসের বেদজ্ঞানের কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে।
৮। কালিদাসের সাংখ্যদর্শনজ্ঞানের পরিচয় এই শ্লোকে।
৯। "রুদ্রাণাম্‌"। ঋগ্‌বেদে রুদ্রশব্দ বহুবচনে রুদ্রপুত্র মরুদ্‌গণকেই বোঝায়। কালিদাসও এখানে তাহাই বুঝিয়াছেন। কালিদাসের মতে এই রুদ্রেরা মূল রুদ্রের মতোই জটাজূট ও চন্দ্রকলাধারী।
১০। শ্লোক ৩০-৪৭।

নিষ্ঠুর তাহার (বিরুদ্ধে) আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে,
যেমন সান্নিপাতিক বিকারে তেজী ঔষধও (বিফল হয়)।

বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তাহাকে তো পাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই, উপরন্তু তাহার গলায় হাঁসুলির মতো লাগিয়া রহিয়াছে।

তাহার পর ইন্দ্রের প্রস্তাব।

অতএব, প্রভু, তাহার (শাস্তির)[১] জন্য আমরা সেনাপতি সৃষ্টি করিতে চাই। (যেমন চায়) মোক্ষকামীরা সংসারের[২] কর্মবন্ধনচ্ছেদক ধর্মকে।।

ব্রহ্মা বলিলেন, বেশ। তবে একটু দেরি হইবে। আমি উহাকে বর দিয়া বাড়াইয়াছি। আমি নিজে উহাকে নষ্ট করিতে পারি না।

বিষবৃক্ষও রোপণ করিয়া (পরে) তাহাকে নিজে কাটিয়া ফেলা অনুচিত।

ব্রহ্মা আরও বলিলেন, শিবের বীর্যাংশ ছাড়া আর কেহ যুদ্ধে তারকের সম্মুখীন হইতে পারিবে না। কেন না

তিনি সেই দেব যিনি তমঃ-পরে অবস্থিত পরম জ্যোতিঃ।
তাঁহার প্রভাব ও ঋদ্ধি আমিও জানি না বিষ্ণুও জানেন না।[৩]
সে শম্ভুর সংযম-অবিচঞ্চল মন তোমরা উমার রূপের দ্বারা আকর্ষণ করিতে প্রযত্ন করো, যেমন চুম্বকের দ্বারা লোহা।।
(আমাদের) দুই জনের নিক্ষিপ্ত বীর্য দুই জনেই বহনে সক্ষম,—
শম্ভুর সেই নিজ (পূর্বপত্নী) এবং আমার জলময়ী মূর্তি।।[৪]

ব্রহ্মার বাণীতে আনন্দিত হইয়া দেবতারা ফিরিয়া গেল। ইন্দ্র কামদেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।[৫]

কাম হাজির হইলে ইন্দ্র তাহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া কাজের কথা পাড়িলেন। তারককে পরাজিত করিবার জন্য দেবতারা সেনানী চায়। সে সেনানী হইবে শিবের পুত্র। অতএব

১। অর্থাৎ তারকের বধ।
২। অর্থাৎ জন্মমরণপরম্পরা।
৩। এখানে সম্ভবত বৌদ্ধমতের প্রভাব আছে।
৪। শিবের বীর্য পার্বতী ধারণ করিতে না পারিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। (সতী অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।) অগ্নি তাহা বহন করিতে না পারিয়া গঙ্গার জলে পরিত্যাগ করে। সেই "স্কন্দ" (অর্থাৎ স্খলিত শিববীর্য) জল ধারণ করিতে না পারিয়া কৃত্তিকাদের গর্ভে সঞ্চারিত করে এবং কৃত্তিকারা সেই গর্ভ শরবনে মোচন করে। তাই স্কন্দের নাম কার্তিকেয় (কৃত্তিকাপুত্র)। এই কাহিনী কুমারসম্ভবের প্রক্ষিপ্ত অংশে (নবম-একাদশ সর্গে) খুব বিস্তৃতভাবে আছে। সে বর্ণনা কালিদাসের নয়। তবে শরবনে স্কন্দের জন্মকাহিনী কালিদাসের অজানা ছিল না। (তুলনীয় মেঘদূতে "শরবণভবং দেবং"।)

এই জন্মকাহিনী হইতে স্কন্দের এক বৈদিক পূর্বরূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সে হইল অগ্নির "অপাং নপাৎ" (অর্থাৎ জলধারার সন্তান) রূপ, যে রূপে তিনি নদী-যুবতিদের দ্বারা পোষিত ও পরিচারিত।

বীর্য-উৎপন্ন হইলেও দেবতার পুত্র গর্ভজাত হইতে পারে না, তাহাকে অযোনিজ হইতে হইবে। তাই স্কন্দের উৎপত্তি এইভাবে। মধ্য বাংলা মনসামঙ্গলে এই রকমে শিববীর্যে কন্যা মনসার উৎপত্তিকল্পনা আছে।

৫। এইখানে দ্বিতীয় সর্গ শেষ। শ্লোকসংখ্যা ৬৪।

হিমালয়ের ব্রতচারিণী কন্যা যাহাতে সংযতেন্দ্রিয় শিবের ভালো লাগে তাই চেষ্টা করো। নারীদের মধ্যে তিনিই শিববীর্য ধারণে সমর্থ, এই কথা ব্রহ্মা বলিয়াছেন।

ইন্দ্র আরও বলিলেন যে, তিনি অপ্সারদের কাছে শুনিয়াছেন যে এখন শিব হিমালয়ের অধিত্যকায় তপস্যা করিতেছেন এবং পার্বতী পিতার আজ্ঞা অনুসারে তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত।

ইন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য করিয়া কামদেব কার্য-উদ্ধারে লাগিল। সখা মাধবকে লইয়া সে হিমালয়ের প্রস্থে স্থাণুর আশ্রমের দিকে চলিল। ভয়চকিত নেত্রে রতিও তাহার অনুসরণ করিল। বসন্তের পদক্ষেপে স্থাণ্বাশ্রম[১] আকুল হইল। দখিন হাওয়া বহিল, অশোক-সহকার-কর্ণিকার মঞ্জরিত হইল, পলাশের রক্তিমা দেখা দিল, পশুপক্ষী মন্মথচঞ্চল হইয়া উঠিল। স্থাণ্বাশ্রমের তপস্বীরা এই অকালবসন্তাগমে উদ্বিগ্ন হইয়া নিজেদের মন অনেক কষ্টে সংযত করিয়া রাখিল। পশু হোক পক্ষী হোক তরুলতা হোক—মিথুনের পরস্পর-প্রেমে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল।

> ভ্রমর একই কুসুমপাত্রে নিজ প্রিয়ার পরে মধু পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দ্বারা মৃগীর অঙ্গে কণ্ডূয়ন করিতে থাকিল। সে স্পর্শে মৃগীর চক্ষু মুদিয়া আসিল।।
>
> প্রেমভরে হস্তিনীকে হস্তী পদ্মগন্ধময় জলের গণ্ডুষ দিল। চক্রবাক অর্ধভুক্ত মৃণাল দিয়া চক্রবাকীকে সন্তুষ্ট করিল।।
>
> প্রচুর পুষ্প যাহাদের স্তনের মতো, উদ্ভিন্ন নবপত্র মনোহর ওষ্ঠের মতো সেই লতাবধূদের বিনত শাখার ভুজবন্ধন তরুরাও লাভ করিল।।

চারিদিকে বসন্তের এই আয়োজন শিবের গোচরে আসে নাই। তবে অপ্সরাদের গান মুহূর্তের জন্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি ধ্যানে চিত্তমগ্ন করিয়াছিলেন। পাছে কেহ বা কিছু তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিয়া ফেলে এই আশঙ্কায় নন্দী

> লতা-গৃহদ্বারে গিয়া বামকক্ষে স্বর্ণবেত্র রাখিয়া মুখে একটি আঙ্গুল দিয়া "চপলতা নয়"—এই সংকেতে অনুচরদের সাবধান করিয়া দিল।
>
> বৃক্ষ নিষ্কম্প, ভ্রমর গুঞ্জনক্ষান্ত,[২] পক্ষী কুজনহীন, মৃগ শান্তগতি।
> তাহার[৩] শাসনে সকল কানন আলেখ্যসমর্পিতবৎ[৪] হইয়া রহিল।।
>
> কামদেব সন্তর্পণে ধ্যানমগ্ন শিবের অদূরে গিয়া দাঁড়াইল।[৫] দেখিল, তিনি পা মুড়িয়া উপবিষ্ট।[৬] দেহের পূর্বার্ধ স্থির ঋজু এবং অসঙ্কুচিত। স্কন্ধদ্বয় অবনত। পাণিদ্বয় উত্তান করিয়া রাখায় (বোধ হইতেছে) যেন কোলের উপর একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত।।
>
> জটাজূট সর্পবন্ধনে উঁচু করিয়া বাঁধা। কানে লাগিয়া আছে দুই ফের রুদ্রাক্ষমালা। কণ্ঠপ্রভা-প্রতিবিম্বনে অত্যন্ত কালো দেখাইতেছে যেন কৃষ্ণশার-চর্ম গিঁঠ দিয়া বাঁধা।
>
> স্তব্ধবৃষ্টি মেঘের মতো, নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো,
> প্রাণবায়ু-নিরোধের ফলে বায়ুহীন স্থানে নিষ্কম্প প্রদীপের মতো।।

১। হিমালয়ে শিবের এই তপস্যাস্থানকে কালিদাস "স্থাণ্বাশ্রম" বলিয়াছেন। নামটির অর্থ হইল চেত্য-আশ্রম। সম্ভবত হিমালয়স্থিত কোন সুপ্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ।

২। মূলে "নিভৃতদ্বিরেফম্"।

৩। অর্থাৎ নন্দীর।

৪। মূলে "চিত্রার্পিতারম্ভঃ"। চিত্র এখানে আঁকা নয় গড়া মূর্তি।

৫। কামের সঙ্গে শিবের এই সংঘাত বুদ্ধের সঙ্গে মায়ের বিরোধের কথা স্মরণ করায়। এ কল্পনা কালিদাসের নিজস্ব না হইলে বুদ্ধকাহিনী হইতে নেওয়া সম্ভব। রুদ্রশিবের স্মরহরত্ব পূর্বপ্রসিদ্ধ। এ গল্পনার বীজ বোধহয় বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত প্রজাপতির কামুকত্বে রুদ্ররোষের ঘটনায়।

৬। মূলে "পর্যঙ্কবন্ধঃ"।

নবদ্বার রুদ্ধ, তাই স্থিরসমাধির বশ মনকে হৃদয়ে সংস্থাপন করিয়া,
ক্ষেত্রবিদেরা যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া জানেন[১] সেই আত্মাকে[২] (নিজের) আত্মায় অবলোকন করিতেছেন।।

দূর হইতে শিবকে ধ্যানাবস্থিত দেখিয়া কামের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে বাণ খসিয়া পড়িল। ঠিক এমনি সময়েই পার্বতী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার অঙ্গে বসন্ত-আভরণ, সবশুদ্ধ যেন বাসন্তী প্রতিমা।

স্তনভারে আনমিত, তরুণসূর্যকান্তি বসন পরিহিত (পার্বতী)
যেন প্রচুর পুষ্পগুচ্ছভরে অবনত পল্লবময়ী জঙ্গমলতা।।

দেখিয়া কামের সাহস ফিরিয়া আসিল।

উমা যেই দ্বারপ্রান্তে আসিয়াছেন অমনি শিবের ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি 'পরমাত্মা যাঁহার সংজ্ঞা সেই পরমজ্যোতিঃ দেখিয়া ধ্যানে বিরত হইলেন।'

শিব যোগাসন ভঙ্গ করলে নন্দী আসিয়া নিবেদন করিল, হিমালয়ের কন্যা আসিয়াছেন। ভ্রূভঙ্গে অনুমতি পাইয়া নন্দী পার্বতীকে ভিতরে আসিতে দিল। পার্বতীর সঙ্গে দুই সখী। সকলে মিলিয়া প্রণিপাত করিল এবং শিবের পায়ে ফুল ছড়াইয়া দিল। তাহার পর

উমা, কালো চূর্ণকুন্তলের মধ্যে শোভাকারী নবকর্ণিকারকে বিস্রস্ত করিয়া ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া শিবকে প্রণাম করিল। তাহার কানের পল্লব-আভরণ খসিয়া পড়িল।।

শিব আশীর্বাদ করিলেন, 'অন্য নারীতে নিস্পৃহ এমন পতি লাভ কর।'[৩] সেই সময়ে কামের হাত নিশপিশ করিয়া উঠিল। তাহার পর পার্বতী শিবকে একগাছি মালা দিতে গেলেন। মন্দাকিনীর পদ্মবীজ শুখাইয়া সে মালা গাঁথা। ভালোবাসিয়া দেওয়া বস্তু গ্রহণ করিতে শিব হাত বাড়াইয়াছেন অমনি কাম তাহার ধনুতে সম্মোহন বাণ জুড়িল।

শিবের মনে ঈষৎ চঞ্চলতা জাগিল যেমন চন্দ্রোদয়মুহূর্তে সমুদ্রে ঘটে।
(তাঁহার) বিভ্রান্ত নয়ন উমার মুখে, বিম্বফলবৎ ওষ্ঠাধরে, পড়িল।।

পার্বতীরও ভাবান্তর হইল, তাহার গায়ে কাঁটা দিল। মাথা হেলাইয়া পার্বতী দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দ্রিয়ক্ষোভ তৎক্ষণাৎ দমন করিয়া শিব কারণ জানিবার জন্য চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, অদূরে কাম তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত। শিব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে আগুন ছুটিল। সর্বনাশ ভাবিয়া চারিদিক হইতে দেবতারা কাতর ধ্বনি তুলিল, 'প্রভু, ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সংবরণ করুন।' কিন্তু ইতিমধ্যেই কাম ভস্মসাৎ। রতি মূর্ছা গেল। স্ত্রীলোকের সন্নিধানে আর থাকিবেন না ঠিক করিয়া শিব অনুচরসহ তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। আর

শৈলদুহিতাও উচ্চশির পিতার অভিলাষ এবং নিজের কমনীয় রূপ ব্যর্থ হইল জানিয়া, সখীদ্বয়ের সম্মুখে তাই অধিকতর লজ্জিত হইয়া শূন্যহৃদয়ে কোনরকমে গৃহে ফিরিয়া গেল।।[৪]

চতুর্থ সর্গ সবটাই রতিবিলাপ।[৫] বিলাপ-অন্তে রতি বসন্তকে বলিল, সহমরণের যোগাড় করিয়া দাও।

১। তুলনীয় গীতা।
২। অর্থাৎ পরমাত্মাকে।
৩। মূলে "অনন্যাভাজং পতিমাপ্লুহি"।
৪। এইখানে তৃতীয় সর্গ শেষ।
৫। শ্লোক ২-৩৭।

হে মাধব, পরলোকবিধিমতে কামকে উদ্দেশ করিয়া বিলোলপল্লবযুক্ত আম্রমঞ্জরী ছড়াইয়া দিত।[১] তোমার সখার অত্যন্ত প্রিয় ছিল আম্রমঞ্জরী।।

রতিকে সান্ত্বনা দিয়া আকাশবাণী হইল

পার্বতীর তপস্যায় মন গলিলে শিব যখন তাঁহাকে বিবাহ করিবেন তখন সুখের স্বাদ পাইয়া শিব কামকে পূর্বশরীরযুক্ত করিবেন।।

বিরহিণী ধৈর্য ধরিয়া দুর্দিনের শেষের প্রতীক্ষায় রহিল, 'দিনের বেলায় কিরণহীন ম্লান চাঁদের ফালি যেমন সন্ধ্যাকে (প্রতীক্ষা করে)'।[২]

কুমারসম্ভবের শ্রেষ্ঠতম সর্গ পঞ্চম। ইহাতে উমার তপস্যায় শিবকে আকর্ষণ, শিব কর্তৃক উমার প্রণয় পরীক্ষা ও পরিশেষে স্বীকার বর্ণিত।

চোখের সামনে শিব কামকে ভস্ম করিলেন দেখিয়া পার্বতী নিজ রূপে লজ্জা অনুভব করিল। রূপে যাহাকে ভোলানো গেল না তাহাকে সে তখন তপস্যার গুণে ভুলাইতে মন করিল। তপস্যায় ছাড়া 'তেমন প্রেম আর তেমন পতি পাওয়া যায় কি।'

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মেনকা তপস্যা করিতে মানা করিল। সে বলিল, 'মনের মতো দেবতা তো ঘরেই পূজা করিতে আছে। তোমার এ শরীরে তপস্যা সহিবে না।'

মায়ের কথায় মেয়ের মন টলিল না। ঢালু স্রোতের জলকে কে উজানে টানিতে পারে? সুযোগ মতো একদিন উমা পিতার মন বুঝিয়া সখীর দ্বারা বনবাসের অনুমতি চাহিল। যতদিন না বাঞ্ছাপূর্তি হয় ততদিন ধরিয়া সে বনে তপস্যা করিবে। পিতা অনুমতি দিলেন। হিমালয়ের শৃঙ্গোচ্ছ্রিত একস্থানে সে গেল। সেস্থান পরে লোকসমাজে তাহারই নামে গৌরীশিখর বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

তাহার পর আট হইতে উনত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত উমার তপস্যার কথা। (নারীর তপস্যা শুধু কালিদাসই এইখানে বলিয়াছেন!) বসনভূষণ ছাড়িয়া উমা বাকল পরিল, চুলে জটা বাঁধিল। তিনফের মৌঞ্জী[৩] ধারণ করিল, তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ ছড়িয়া যায়। কুশ তুলিতে তুলিতে আঙুল ক্ষতবিক্ষত হয় এবং সেই আঙুলে জপের রুদ্রাক্ষমালা আটকাইয়া রয়। শয়ন তাহার ভূমিতলে, বালিশ নিজের হাত। অক্লান্তভাবে সে গাছ আজাইয়া তাহাতে জলসেক করে। সেগুলি যেন তাহার প্রথমজাত সন্তান। তাহাদের উপর তাহার যে বাৎসল্যপ্রীতি তাহা পরে গুহও[৪] দূর করিতে পারিবে না। উমার হাতে নীবার খাইয়া হরিণেরা তাহার এত বিশ্বস্ত হইল যে তাহাদের কাছে উমাকে বসাইয়া সখী উভয়ের চোখের তুলনা করিত।

স্নান করিয়া উত্তরীয় পরিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া উমা বেদপাঠ করিত। তাহাকে দেখিতে ঋষিরা আসিতেন। পশুরা পরস্পর হিংসা ছাড়িল। গাছপালা অতিথির সেবার জন্য যথেষ্ট ফল দিতে লাগিল। সে স্থান পুণ্য তপোবনে পরিণত হইল।

অগ্নিহোত্রে ও স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ বেদোক্ত উপায়ে যখন অভীষ্টফল ফলিল না তখন উমা শরীরের দিকে দৃক্পাত না করিয়া কষ্টতপস্যায় রত হইল। চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড, তাহার মধ্যে বসিয়া উমা সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকে।[৫] সূর্যের তাপে তাহার মুখ শুকাইল না, তবে চোখের

১। মনসামঙ্গল কাব্যে সহমরণের বধূর আমডাল ভাঙা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।
২। এইখানে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।
৩। ঘাসের দড়ি, ব্রহ্মচারীদের মেখলার মতো পরিতে হইত।
৪। কার্তিকের নামান্তর।
৫। ইহার নাম "পঞ্চতপঃ"।

কোণে কালি মাড়িয়া গেল। জীবনধারণে সে বৃক্ষবৃত্তি অবলম্বন করিল,[১] অযাচিত বৃষ্টিবারি ও চন্দ্রকিরণ। এই ভাবে

> আপনি খসিয়া পড়া পাতা[২] খাইয়া জীবনধারণ তপস্যার পরকাষ্ঠা। সে তাহাও পরিত্যাগ করিল। এ কারণে প্রিয়ংবদা তাহাকে পুরাবিদেরা অপর্ণা বলিয়া থাকেন।

উমার তপস্যা কঠোরতার এমন চরমে উঠিলে পর একদিন এক তরুণ ব্রহ্মচারী তাহার আশ্রমে দেখা দিলেন। তাঁহার পরিধান মৃগচর্ম, হাতে দণ্ড, মাথায় জটা, জ্বলন্ত ব্রহ্মতেজ। সবশুদ্ধ যেন মূর্তিপরিগৃহীত ব্রহ্মচর্যাশ্রম। উমা তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিল। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়া ব্রহ্মচারী উমার দিকে ঋজু দৃষ্টিতে চাহিয়া তপস্বীর উপযুক্ত কুশল প্রশ্ন করিলেন।

> যজ্ঞ ক্রিয়ার জন্য সমিধ ও কুশ বেশ পাওয়া যায় তো? তোমার স্নানাদির জন্য জল?
> নিজের সামর্থ্য মতো তপস্যা করিতেছ তো? শরীরই ধর্মের প্রথম উপকরণ।।

তাহার পর আশ্রমপদের কুশল জিজ্ঞাসা, উমার তপস্যার প্রশংসা ইত্যাদি করিয়া ব্রহ্মচারী জানিতে চাহিলেন তাহার তপস্যার উদ্দেশ্য কী। পিতৃগৃহে নিশ্চয়ই তাহার অবমাননা হয় নাই। তরুণ যৌবনের অত্যন্ত অযোগ্য এই তপস্যার কারণ খুঁজিবার ছলে ব্রহ্মচারী উমার মন বুঝিতে চেষ্টা করিলেন।

> তুমি যদি স্বর্গ চাও তবে বৃথা এ শ্রম। তোমার পিতার প্রদেশই তো দেবভূমি। যদি পতি চাও তবে সমাধি নিষ্প্রয়োজন। রত্ন (গ্রাহক) খোঁজে না, তাহাকেই খোঁজা হয়।।
> তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমার মনে সেই সন্দেহ জাগিতেছে।
> তুমি চাহিতে পার এমন (কাহাকেও) তো দেখি না। চাহিয়া পাওয়া যাইতেছে না এমন কিসে সম্ভব?
> আহা কে এমন সে উদাসীন যুবা যাহাকে চাও, তোমার কর্ণ ও কপোল দেশ বহুদিন যাবৎ উৎপলহীন[৩] এবং ধানের শিষের মতো পিঙ্গল জটা শিথিলভাবে (লম্বমান দেখিয়াও) উপেক্ষা করিয়া আছে।।
> মুনির মতো তপস্যা করিয়া তুমি অত্যন্ত কৃশ হইয়াছ, (তোমার অঙ্গে) ভূষণ-পরিধানস্থানগুলি রোদ লাগিয়া ঝলসাইয়া গিয়াছে। দিনের বেলায় চন্দ্রকলার মতো (তোমাকে) দেখিয়া সহৃদয় কাহার মন কেমন না করে।।
> মনে হয় রূপগুণ ঐশ্বর্যে তোমার প্রিয় ভুলিয়া আছে। তাই সে (তোমার) এই মধুর-চাওয়া ঘনপক্ষ্ম চোখের গোচরে নিজের মুখ আনিতেছে না।।
> গৌরী, আর কতকাল তপস্যা করিবে? অমারও কিছু ব্রহ্মচর্যলব্ধ তপস্যা[৪] সঞ্চিত আছে। তাহার অর্ধভাগের দ্বারা তুমি যাহাকে চাও সেই বরকে লাভ কর। কে সে, (আমি) ভালো করিয়া জানিতে চাই।।

ব্রহ্মচারীর প্রশ্নের উত্তর উমা দিতে পারিল না। পাশে সখী ছিল, তাহার দিকে চোখ ফিরাইল। সখী উত্তর দিল, শুন মহাশয়, কেন ইনি তপস্যা করিতেছেন।

১। "ন বৃক্ষবৃত্তিব্যতিরিক্তসাধনঃ"।

২। "পর্ণ"। এইভাবে কালিদাস "অপর্ণা" নামটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন। মনে হয়, আসলে মানে ছিল উলঙ্গ নারী,—যে পত্রবসনও পরে না (অর্থাৎ "পর্ণশবরী"ও নয়)।

৩। কানে আভরণরূপে পরা।

৪। অর্থাৎ তপস্যার পুণ্যফল।

মনস্বিনী ইনি ইন্দ্র প্রভৃতি ঐশ্বর্যশালী চারিদিকের অধিপতিদের অগ্রাহ্য করিয়া, মদনের নিগ্রহের ফলে রূপের দ্বারা অলভ্য এমন একজনকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন।।

তাহার পর সখী মদনভস্মের কথা বলিয়া উমার তপস্যা ও শিবের প্রতি তাহার প্রণয়গাঢ়তার উল্লেখ করিল।

শিবচরিত্র-গীত আরম্ভ করিলে ইঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয় এবং পদগুলি[১] স্খলিত হয়। এইভাবে (ইনি) বনস্থলীর সঙ্গীতসখী কিন্নররাজকন্যাদের অনেকবার কাঁদাইয়াছেন।[২]

বিরহভারে রাত্রিতে নিদ্রা নাই। যদিও বা তন্দ্রা আসে তখন শিব যেন চলিয়া যাইতেছেন এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠে। কখনও বা স্বহস্তে শিবের মূর্তি আঁকিয়া বাস্তব ভ্রমে তাঁহার প্রতি প্রণয়কোপ প্রদর্শন করে। শিবকে পাইবার উপায়ান্তর খুঁজিয়া না পাইয়াই উমা পিতার আজ্ঞা লইয়া আমাদের সঙ্গে করিয়া তপস্যা করিতে এই তপোবনে আসিয়াছে।

যে গাছগুলি সে নিজে রোপণ করিয়াছে, যাহারা তাহার তপস্যার সাক্ষী সেগুলিতে ফল ধরিতে দেখা গেল, অথচ ইহার অভীষ্ট শিবসমাগমের অঙ্কুরোদ্‌গমও দেখা যাইতেছে না।।

এইভাবে সখী উমার অন্তরের কথা জ্ঞাপন করিলে পর চতুর ব্রহ্মচারী[৩] মনের হর্ষ চাপিয়া রাখিয়া উমাকে বলিল, ওগো, এ কী সত্য না পরিহাস?

তখন

হাতের আঙুলগুলি মুকুলিত করিয়া স্ফটিকের জপমালা রাখিয়া দিয়া অদ্রিকন্যা দীর্ঘ মৌন ভঙ্গ করিয়া কোন রকমে অল্প কথায় বলিতে লাগিল।।

হে বেদজ্ঞপ্রবর, যাহা শুনিলে (তাহা ঠিকই)। এই ব্যক্তি [৪] উচ্চস্থানে চড়িতে উৎসুক। সে (উচ্চতা) প্রাপ্তির উপায় তপস্যা হয়ত নয়। (তবে) মনোরথের পথে কোথাও বাধা নাই।

ব্রহ্মচারী উত্তর দিল, শিবকে জানি। তুমি তাহারই অভিলাষিণী হইয়াছ। অমঙ্গলের পথে টান দেখিয়া তোমাকে সমর্থন করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না।

ওগো, তুমি যাহার ঝোঁকে পড়িয়াছ, শিবের সাপজড়ানো হাতের সেই প্রথম অবলম্বন আলগাভাবে বিবাহমঙ্গলসূত্র বাঁধা তোমার এই হাত (কি করিয়া) সহ্য করিবে?

তুমি নিজেই ভাবিয়া বল, এ দুইটিতে গাঁট ছড়া বাঁধা যায় কিনা,—
কলহংসচিত্রিত নববধূর শাড়ি আর রক্তঝরা হাতির ছাল!

কে এমন শত্রু আছে যে অনুমোদন করিবে,—পুষ্প ছড়ানো প্রাঙ্গণে চলা তোমার আলতা পরা পা দুটি চুল ছড়ানো শ্মশানভূমিতে (বিচরণ করুক)?

তোমার সম্মুখে এই এক বিড়ম্বনা।—বিবাহ হইলে পর যাহার যোগ্য যান রাজহস্তী সেই তোমাকে বৃদ্ধ বৃষের উপর অধিষ্ঠিত দেখিয়া ভব্য লোকের মুখেও হাসি ফুটিবে।।

শিবের দেহসৌন্দর্য? তিন চোখ। (বংশ?) জন্মের ঠিক নাই। ধন? উলঙ্গ বেশেই বোঝা যায়। ওগো শিশুহরিণ-আঁখি, বরের যে সব গুণ খোঁজা হয় তাহার ছিটা ফোঁটাও কি শিবের আছে?

১। "পদ" মানে গানের পদ অথবা শব্দ।
২। এইখানে সম্ভবত সেকালের মেয়েলি তন্ত্রের শিবের গানের ইঙ্গিত।
৩। "নৈষ্ঠিকসুন্দর"।
৪। অর্থাৎ আমি।

ব্রহ্মচারীর কথায় উমার রোষ হইল। তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, ভ্রূকুঞ্চিত হইল, চোখের প্রান্ত লাল হইল। অন্যদিকে চাহিয়া উমা ব্রহ্মচারীর উক্তির প্রতিবাদ করিতে লাগিল।[১] উমা

> উহাকে বলিল শিবকে তুমি আসলে নিশ্চয়ই চেন না, তাই আমাকে এমন বলিতেছ। সাধারণ লোকের অপরিচিত ও বুদ্ধির অগম্য মহাত্মাদের আচরণের নিন্দা মূঢ়েরা করে।।
>
> অকিঞ্চন হইয়াও সম্পদের উৎস, ত্রিভুবনের ঈশ্বর হইয়াও শ্মশানচর, সেই ভীমদর্শন শিব বলিয়া প্রথিত। পিনাকীর[২] যথার্থ পরিচয় জানে এমন (কেহ) নাই।।
>
> বিভূষণে উদ্‌ভাসিত হোন অথবা সর্পপরিহিত হোন, গজচর্ম গ্রহণ করুন অথবা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করুন, নরকপাল ধারণ করুন অথবা অর্ধচন্দ্র মাথায় রাখুন,—বিশ্বমূর্তি তাঁহার বপু অবধারণ করা যায় না।।
>
> দোষ বলিতে গিয়া তুমি স্বভাবচ্যুত হইয়া[৩] সেই ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটি খাঁটি (কথা) বলিয়াছ। যাঁহাকে (তত্ত্বজ্ঞেরা) স্বয়ম্ভূরও কারণ[৪] বিবেচনা করেন তাঁহার জন্মের নির্ণয় কি করিয়া হয়?
>
> বিবাদে প্রয়োজন নাই। তুমি শুনিয়াছ যেমন তিনি অশেষভাবে সেই রকমই হইতে পারেন। তবে আমার মন একভাবের রসে তাঁহাতেই মগ্ন। স্বেচ্ছাচারিণী অপবাদের ভয় করে না।।

ব্রহ্মচারীকে প্রত্যুত্তর দিবার সময় না দিয়া উমা সখীকে বলিল,

> সখী, বারণ করো। এই ব্রহ্মচারী আরও কিছু বলিতে চায়, উহার ঠোঁট নড়িতেছে। মহৎ ব্যক্তিকে যে নিন্দা করে শুধু সে নয়, তাহার কথা যে শোনে সেও পাপসঞ্চয় করে।
>
> 'আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব।' এই বলিয়া উমা পা বাড়াইলে তাহার স্তনপ্রান্ত হইতে বল্কল একটু স্খলিত হইল। অমনি শিব নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া মুখ হাসিহাসি করিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন।।
>
> তাঁহাকে দেখিয়া (উমার) দেহলতা রোমাঞ্চিত হইল, সে কাঁপিতে লাগিল, পদক্ষেপে একটি পা তোলাই রহিল। পথের মধ্যে পাহাড় পাইলে নদী যেমন আকুলিত হয় পর্বতরাজ-কন্যাও তেমনি যেন চলিতে পারিল না, রহিতেও পারিল না।।

'আজ হইতে আমি তোমার তপস্যায় কেনা দাস হইলাম,' শিবের এই স্বীকৃতি শুনিয়া উমার দেহমনের তাপ জুড়াইয়া গেল।[৫]

ষষ্ঠ সর্গের বিষয় শিবপার্বতীর বিবাহসম্বন্ধ। সখীকে দিয়া উমা শিবকে জানাইল, 'আমার পিতা কন্যাদাতা, তাঁহাকে মান্য করুন।' শিব সে কথা মানিয়া লইলেন এবং উমার কাছে বিদায় লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াই সপ্তর্ষিকে স্মরণ করিলেন। তাঁহারা অরুন্ধতীকে[৬]

১। উমার দ্বারা কালিদাস যেন বিরোধীদের মুখ বন্ধ করিয়া শিবমাহাত্ম্য স্থাপন করিতেছেন। শ্লোক ৭৫-৮২।
২। শিবের এক নাম। অর্থাৎ যিনি পিনাক (ধনু বিশেষ) ধারণ করেন।
৩। অর্থাৎ ভুল করিয়া।
৪। অর্থাৎ ব্রহ্মার স্রষ্টা।
৫। শ্লোক ৮৬। এইখানে পঞ্চম সর্গের সমাপ্তি।
৬। শত ঋষির অন্যতম বশিষ্ঠ। তাঁহার পত্নী অরুন্ধতী, পতিব্রতা নারীর আদর্শ।

সঙ্গে লইয়া সত্বর শিবের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাহার পর আট শ্লোকে (৫-১২) সাত ঋষির ও অরুন্ধতীর বর্ণনা। ঋষিদের মধ্যবর্তিনী অরুন্ধতীকে দেখিয়া শিবের দাম্পত্যজীবনে স্পৃহা বাড়িল। সপ্তর্ষি শিবকে বন্দনা করিয়া[১] কার্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শিব বলিলেন, আমার বিবাহ করা এখনি আবশ্যক। পাত্রী হিমালয়ের কন্যা। আপনারা অব্যর্থ ঘটক। সম্বন্ধ ঠিক করুন। আর

> আর্যা অরুন্ধতীও এখানে সহায়তা করুন।
> এমন কাজে গৃহিণীদেরই উৎসাহ (সর্মধিক)।।
> অতএব (এই কার্য) সিদ্ধির জন্য হিমালয়ের রাজধানী ওষধিপ্রস্থে[২] যান মহাকোশীপ্রপাতে[৩] আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হইবে।।

ঋষিরা ওষধিপ্রস্থে আর শিব মহাকোশীপ্রপাতে চলিয়া গেলেন।

> সেই পরম ঋষিরা তরবারির মতো নীল[৪] আকাশে উঠিয়া মনের মতো দ্রুতবেগে ওষধিপ্রস্থে পৌঁছিলেন।।

তাহার পর দশ শ্লোকে (৩৭-৪৬) ওষধিপ্রস্থের বিবরণ।[৫] সপ্তর্ষি হিমালয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। হিমালয় অত্যন্ত বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের স্তব করিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'আপনাদের কি প্রয়োজন বলুন। এই আমরা (স্বামী স্ত্রী), এই পরিজন, এই আমার সংসারের প্রাণ কন্যা। কাহাকে কি করিতে হইবে আদেশ করুন।'

আট শ্লোকে (৬৬-৭৩) হিমালয়কে প্রশংসা করিয়া সপ্তর্ষি শিবের সহিত পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,

> তোমার কন্যাকে বিশ্বের সকল কর্মের প্রত্যক্ষ সেই
> বরদাতা শম্ভু (বিবাহ করিতে) চাহিতেছেন, আমাদের দূত করিয়া।[৬]
> উমা বধূ, তুমি সম্প্রদানকারী, ঘটক আমরা, শিব বর।
> তোমার সংসারের উন্নতির পক্ষে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট।
> দেবর্ষিরা যখন এই কথা বলিতেছেন তখন পিতার পাশে অধোমুখী পার্বতী (হাতের) লীলাকমলের পাপড়িগুলি গুণিতেছিলেন।।

কথা দিবার আগে হিমালয় পত্নী মেনার দিকে চাহিলেন। মেনার অমত নাই জানিয়া মঙ্গল-অলঙ্কারধারিণী কন্যার হাত ধরিয়া হিমালয় তাহাকে বলিলেন,

> এস, বৎসে। (তুমি) বিশ্বাত্মার ভিক্ষা কল্পিত হইয়াছে।
> অর্থী (হইয়া) মুনিরা (আগত)। আমি গৃহবাসীর পুণ্যলাভ করি।।

কন্যাকে এই কথা বলিয়া হিমালয় ঋষিদের বলিলেন, "এই শিববধূ আপনাদের সকলকে প্রণাম করিতেছে।' ঋষিরা আশীর্বাদ করিলেন।

> প্রণামের আগ্রহে উমার কানে সোনার দুল বিপর্যস্ত (হইল)।
> লজ্জিত তাহাকে অরুন্ধতী কোলে বসাইলেন।।

১। শ্লোক ১৬-২৩।
২। পর্বতরাজ হিমালয়ের রাজধানীর নাম।
৩। এইখানে বোধহয় প্রাচীন শিবতীর্থ ছিল।
৪। "অসিশ্যামম্"।
৫। এই বর্ণনায় মেঘদূতের সঙ্গে কিছু মিল দেখা যায়।
৬। "অস্মৎসংক্রামিতৈঃ পদৈঃ"।

কন্যাস্নেহে বিগলিত অশ্রুমুখী মেনাকে অরুন্ধতী বরের গুণ বর্ণনা করিয়া সান্ত্বনা দিলেন।

হিমালয় বিবাহের দিন জানিতে চাহিলে সপ্তর্ষি বলিলেন, "তিন দিন পরে।" বলিয়া ঋষিরা চলিয়া গেলেন এবং মহাকোশীপ্রপাতে গিয়া শিবকে কার্যসিদ্ধি নিবেদন করিলেন। শিব তাঁহাদের বিদায় দিয়া বিবাহপ্রতীক্ষায় কাল গুণিতে থাকিলেন।[১]

সপ্তম সর্গে বিবাহ বর্ণনা। অন্তঃপুরের কথা। মেয়েলি আচার অনুষ্ঠান এমন করিয়া কালিদাসই সেকালের মধ্যে প্রথম এবং শেষ বার শোনাইয়াছেন।

> চন্দ্রের বৃদ্ধি পক্ষে জামিত্রগুণ সমন্বিত[২] তিথিতে আত্মীয়-বন্ধুদের আনাইয়া হিমালয় কন্যার বিবাহদীক্ষা-অনুষ্ঠান করিলেন।।

বিবাহ মঙ্গল-আচার উৎসবের উৎসাহে ঘরে ঘরে পুরনারীরা ব্যস্তসমস্ত। নগরটিই যেন একটি সংসারে পরিণত। পথঘাট এমন সুসজ্জিত যে স্বর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিলে পিতামাতার মন বিশেষভাবে ব্যাকুল হইল।[৩] আত্মীয়স্বজনেও উমাকে যেন এক দণ্ড ছাড়িতে চাহে না।

> উচ্চারিত আশীর্বাদ লইয়া সে কোল হইতে কোলে বসিতে লাগিল, ভূষণের পর ভূষণ উপহার পাইতে লাগিল। সম্পর্ক বিভিন্ন হইলেও হিমালয়ের বংশের স্নেহ যেন এক পাত্রে আসিয়া পড়িল।।
>
> চন্দ্রের সহিত যখন উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে মিত্রদেবতার সেই (পুণ্য) মুহূর্তে[৪] আত্মীয় মেয়েরা, যাহারা পতিপুত্রবতী, তাহার[৫] শরীরে আনুষ্ঠানিক প্রসাধন[৬] সম্পন্ন করিল।।
>
> শ্বেতসর্ষপ দূর্বা ও প্রবাল দিয়া, বিচিত্র শোভা করিয়া, নাভিনিম্ন হইতে কৌশেয়[৭] পরাইয়া, (হাতে) বাণ দিয়া[৮] অভ্যঙ্গ[৯] সাজ সাজানো হইল। লোধ্ররেণু মাখাইয়া তাহার অঙ্গের তৈল শুখানো হইল, গাঢ় গন্ধপিষ্ট[১০] দিয়া অঙ্গরাগ করা হইল। মঙ্গলস্নানযোগ্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া নারীরা (তাহাকে) প্রাঙ্গণের দিকে লইয়া গেল। সেখানে মুক্তাফলের আলিপনা আঁকা বৈদূর্যশিলার ফলকে তাহাকে (বসাইয়া) সোনার ঘড়ায় জল ঢালিয়া স্নান করাইল। সেই সঙ্গে বাজনা বাজিতে লাগিল।

১। শ্লোক ৯৫। এইখানে ষষ্ঠ সর্গ শেষ।

২। লগ্নের সপ্তম স্থানে গ্রহদোষ না থাকিলে জ্যোতিষশাস্ত্রে জামিত্র গুণ বলে। জামিত্র শব্দের মূল গ্রীক (diametron)।

৩। শ্লোক ২-৪।

৪। "মৈত্রে মুহূর্তে"। মিত্র বিবাহের অধিদেবতা।

৫। অর্থাৎ উমার।

৬। "প্রতিকর্ম চক্রুঃ", অর্থাৎ গায়ে হলুদ দিল।

৭। সিল্‌কের কাপড়।

৮। এখনকার দিনে বিবাহের পূর্বে কন্যা যেমন গায়ে-হলুদের পর হাতে কাজললতা ধরে তখন বোধ হয় তেমনি বাণ লইত। কাজলপাতাও মোটামুটি বাণের আকৃতি।

৯। অর্থাৎ তেলহলুদ মাখানো ইত্যাদি স্নান ব্যাপার (গায়ে-হলুদ)।

১০। "আশ্যানকালেয়কৃতাঙ্গরাগাম্"। আশ্যানকালেয়" এখনকার cosmetic cream-এর মতো।

মঙ্গলস্নানে শুদ্ধ শরীর হইয়া বরের সম্ভাষণযোগ্য কাপড় পরিয়া[১] সে শোভা পাইল যেন মেঘ বর্ষণে শেষে কাশ-ফোটানো বসুধা।।

সেস্থান হইতে ছাউনি করা চার মণিময় স্তম্ভ-ঘেরা স্ত্রী-আচারের বেদিতে[২] নির্দিষ্ট আসনে পতিব্রতারা[৩] তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গেল।

সেখানে তন্বীকে পূর্বমুখে বসাইয়া, তাহার সামনে বসিয়া কিছুক্ষণ বিলম্ব করিল মেয়েরা। চোখ তাহাদের (উমার) স্বাভাবিক শোভায় মুগ্ধ, যদিও প্রসাধনের দ্রব্য কাছেই ছিল।।[৪]

ধূপের ধোঁয়ায় কেশপাশ শুখানো হইল। তাহার উপর, মধ্যে ফুল গাঁথা দূর্বা দেওয়া শাদা মহুয়ার বিচিত্রবন্ধন মালা একজন পরাইয়া দিল।।

তাহার অঙ্গে শুক্ল অগুরু ও গোরোচনা দিয়া পত্রলেখা আঁকিল। (তাহাতে যেন) সে চক্রবাক-অঙ্কিতসৈকত গঙ্গার শোভাও অতিক্রম করিল।।

কন্যার সাজ শেষ হইয়া গেলে

'পতির শিরঃস্থিত চন্দ্রকলাকে ইহা দ্বারা ছুঁইও।'—সখী এই পরিহাস-বাক্যে, পায়ে আলতা পরাইয়া, আশীর্বাদ করিলে (উমা) নিঃশব্দে মালা ছুঁড়িয়া (তাহাকে) মারিল।

তাহার পর আঙুলে মাঙ্গলিক হরিতালপঙ্ক ও মনঃশিলা লইয়া মা তাহার কানে দুল-পরানো[৫] মুখ তুলিয়া উমার স্তনোদ্‌গম হইতে যে প্রথম বাসনা পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে তাহাতে যেন কোনরকমে বিবাহ্ দীক্ষার তিলক আঁকিয়া দিল।।

তাহাব[৬] চোখ অশ্রুপ্লাবিত হওযায় অস্থানে পরানো উর্ণাময় মাঙ্গলিক হস্তসূত্র[৭] ধাত্রী আঙুল দিয়া ঠিক করিয়া দিল।।

অতঃপর নতুন ক্ষৌমবসন পরাইয়া উমার হাতে দর্পণ দেওয়া হইল। তাহার পর কুলদেবতাদের সম্মুখে প্রণাম করাইয়া মেনা কন্যাকে একে একে সতীদের পাদবন্দনা করাইল। তাঁহারা আশীর্বাদ করিলেন, পতির অখণ্ড প্রেমের অধিকারী হও।

এদিকে বিবাহসভায় বন্ধুবান্ধব লইয়া হিমালয় ববেব আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

শিব বরযাত্রায় বাহির হইলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বেশই বরপ্রসাধন রইল। নন্দীর হাত ধরিয়া তিনি ষাঁড়ে চড়িলেন। ষাঁড়ের পালান বাঘের চামড়া। সঙ্গে চলিল অনুচরেরা। মাতৃকারাও বরযাত্রায় যোগ দিলেন।

কনকগৌর (তিনি), তাঁহার পিছনে কপালাভরণা কালী[৮] শোভা পাইল। যেন বলাকামণ্ডিত কালো মেঘ সামনে কতদূব পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটাইতেছে।।

বরকে ঘিরিয়া চলিলেন দেবতারা, নিজ নিজ বিমানে চড়িয়া। দেবশিল্পী যে নূতন ছাতা গড়িয়া দিয়াছেন তাহা সূর্য বরের মাথায় ধরিলেন। গঙ্গা ও যমুনা শাদা-কালো চামর ঢুলাইতে

১। "গৃহীতপত্যুদ্‌গমনীয়বস্ত্রা"। অর্থাৎ উমা।
২। "কৌতুকবেদিমধ্যম্'।
৩। অর্থাৎ সধবা মেয়েরা।
৪। অর্থাৎ উমার অসজ্জিত রূপেই মেয়েরা মুগ্ধ হইয়া সাজ করাইবার কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া গিয়া তাহার দিকে চাহিয়া ছিল।
৫। "কর্ণাবসক্তামলদন্তপত্রং"। দন্তপত্র আসল অর্থে হস্তিদন্তনির্মিত।
৬। অর্থাৎ মেনার।
৭। অর্থাৎ পশমি কিংবা রেশমি রাখী।
৮। কালী তখন-ও গৌরী হন নাই।

লাগিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যাত্রারম্ভে বরকে আশীর্বাদ করিলেন।[১] ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপাল আসিয়া হাত জুড়িয়া প্রণাম করিল। শিব যথাযোগ্য সম্মান দেখাইলেন। তিনি

> ব্রহ্মাকে মথা ঢুলাইয়া, বিষ্ণুকে সম্ভাষণ করিয়া, ইন্দ্রকে হাসিয়া আর সকল দেবতাকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রাধান্য অনুসারে সংবর্ধনা করিলেন।।

আগে আশীর্বাদ করিলেন সপ্তর্ষিরা। শিব পূর্বেই তাঁহাদের পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিশ্বাবসু প্রমুখ প্রবীণ (গন্ধর্বেরা) ত্রিপুরাবদান[২] গাহিতে গাহিতে চলিল। ষাঁড়ের শিঙে সোনার ঘণ্টাঘুঙুর লাগানো। সে তাহা বাজাইয়া বিভিন্ন গতিভঙ্গি করিয়া চলিল।[৩] বরযাত্রা হিমালয় নগরদ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। হিমালয় আগাইয়া আসিয়া জামাতাকে নামাইলেন। আগুল্ফ-আকীর্ণ ফুলের উপর দিয়া পদক্ষেপ করিয়া শিব শ্বশুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বর দেখিবার জন্য ঘরে ঘরে মেয়েদের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কেহ চুল বাঁধিতেছিল, তাহা শেষ না করিয়াই হাতে চুলের গোছা ধরিয়া জানালার দিকে ছুটিল। কেহ বা পায়ে আলতা দিতেছিল, একপায়ে আলতা পরিয়া হাতে আলতাকাঠি লইয়া ছুটিল। কেহ বা নীবী বাঁধিবার ত্বর না সহিয়া বসনগ্রন্থি মাথায় ধরিয়া গবাক্ষপথে চোখ দিয়া রহিল। তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া কাহারও বা কাঞ্চীদাম খুলিয়া গেল, সে বাঁধিবার অবকাশ পাইল না। ওষধিপ্রস্থের প্রাসাদগবাক্ষগুলি মেয়েদের উৎসুকনেত্রে ও আসবাবসুগন্ধ মুখে যেন পদ্মফুল ফুটাইল।[৪]

> একমাত্র দৃশ্য সেই (শিবকে) মেয়েরা চোখ দিয়া পান করিতে লাগিল, অন্যদিকে ফিরিল না। ইহাদের অন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি সব যেন চক্ষুতেই প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।।

বরের প্রশংসায় মেয়েরা মুখর হইল এবং গবাক্ষপথে বরের উপর লাজমুষ্টি কেয়ূরে পিষিয়া চূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল।[৫]

হিমালয়ের বাসগৃহে পৌঁছিলে বিষ্ণু হাতে ধরিয়া বরকে নামাইলেন। ব্রহ্মা আগে আগে চলিলেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা সপ্তর্ষি অপর ঋষিরা পিছনে পিছনে চলিলেন। এইভাবে বিবাহসভায় বরের প্রবেশ হইল। বরের আসনে বসিয়া শিব মধুপর্ক অর্ঘ্য ও নূতন উত্তম বসন-জোড় শ্বশুরের হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন। শিব অজিন ছাড়িয়া বসন-জোড় পরিলেন ও বধূর সমীপে নীত হইলেন।[৬] শিব উমার পাণিগ্রহণ করিলেন। দুই জনে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন।[৭] পুরোহিত বধূকে লাজহোম করাইলেন। লাজহোমের ধূম অঞ্জলি করিয়া উমা মুখে লাগাইল। তাহার পর

> বধূকে ব্রাহ্মণ[৮] বলিল, 'বৎসে, তোমার বিবাহে অগ্নি কর্মসাক্ষী রহিলেন। দ্বিধা ছাড়িয়া ভর্তা শিবের সহিত ধর্মচর্চা তোমার কর্তব্য।।

১। শ্লোক ৩১-৪৩।

২। "সংগীয়মানস্ত্রিপুরাবদানঃ"। তুলনীয় মেঘদূত, "ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ"। শিবের ত্রিপুরবিজয়-অবদানগীতি কালিদাসের সময়ে অবশ্যই প্রসিদ্ধ ছিল। মনে হয় ইহা প্রধানভাবে গানই, গেয় আখ্যায়িকা নয়। তাহা হইলে কোথাও না কোথাও বিষয়টির ইঙ্গিত কালিদাস দিতেন।

৩। শ্লোক ৪৮-৪৯।

৪। শ্লোক ৫৫-৬৩।

৫। শ্লোক ৬৫-৬৯।

৬। শ্লোক ৭০-৭৩।

৭। শ্লোক ৭৪-৭৫।

৮। শ্লোক ৮০-৮১।

ভর্তা ধ্রুবদর্শন করিতে বলিলে উমা মুখ তুলিয়া লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে কোনরকমে বলিল, 'দেখিলাম'। এইভাবে বিধিজ্ঞ পুরোহিত বিবাহকার্য সম্পন্ন করিলে পর দম্পতী পদ্মাসনস্থ পিতামহকে[১] প্রণাম করিল। বিধাতা[২] আশীর্বাদ করিলেন, 'বীরপ্রসবিনী হও'। তাহার পর বরবধূকে স্ত্রী-আচারের জন্য অন্তঃপুরে সজ্জিত বেদির উপর সোনার সিংহাসনে বসানো হইল।[৩] লক্ষ্মী দুইজনের উপরে ছাতা ধরিলেন। সরস্বতী দুই জনকে স্তুতি করিলেন—বরকে শুদ্ধ পবিত্র (ভাষায়), বধূকে সহজবোধ্য ছাঁদে।[৪] তাহার পর অল্প সময় বরবধূ অপ্সরাদের নৃত্য দেখিলেন। তাহার পর দেবতরা হাতজোড় করিয়া কামের পুনর্জীবন ও সেবা প্রার্থনা করিলে, শিব রাজি হইলেন।[৫]

> তাহার পর দেবগণকে বিদায় দিয়া শিব পর্বতরাজকন্যাকে হাতে ধরিয়া কনককলসযুক্ত আলিম্পনশোভাময় বাসরঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে ভূমিতে শয্যা বিরচিত (ছিল)।।
>
> সেখানে, নবপরিণয়ের লজ্জা যাহার শোভা বাড়াইয়াছে সেই গৌরীর মুখ ফিরাইতে শিব আকর্ষণ করিলে, মর্মসখীদের কাছেও কোন রকমে দুই একটি কথা বলিলেন, (শেষে) অনুচরদের মুখবিকৃতি দ্বারা (পার্বতীকে) গোপনে হাসাইলেন।

এইখানে সপ্তম সর্গ শেষ।

কুমারসম্ভবের যে আলোচনা করিলাম তাহা হইতে বোঝা দুরূহ নয় যে কাব্যটির বিষয় ঘরোয়া অর্থাৎ সংসারী মানুষঘটিত। কন্যার জন্ম, তাহার শৈশবচেষ্টা, যৌবনোদ্গম, বিবাহব্যবস্থায় মাতাপিতার উদ্যম, বিবাহ-সমারোহের বিবরণ ইত্যাদি ঘরোয়া-ব্যাপার— মেয়েদের তরফে—কুমারসম্ভবে আমরা পাইলাম। কোন সংস্কৃত প্রাকৃত অথবা ভাষা কাব্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে এমন খুঁটিনাটি সমেত গার্হস্থ্য চিত্র পাই নাই। বিবাহের পূর্বে সঞ্জাত প্রেমের, অর্থাৎ অনুরাগের, এমন নিখুঁত বিশ্লেষণ এবং দাম্পত্য প্রেমের এমন নিত্যসত্য আদর্শ প্রাচীন সাহিত্যেও আর কোথাও নাই। কুমারসম্ভবে কালিদাস একালের গল্প-উপন্যাস-লেখকের যেন কাছাকাছি আসিয়াছিলেন। কুমারসম্ভবে কালিদাস ভারতীয় সাহিত্যে কবিভাবনায় এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিলেন। তাহা হইল পুরুষের প্রতি নারীর অনুরাগ ও ব্যাকুলতা। ইতিপূর্বে শুধু পুরুষের অনুরাগই সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

সেকালে শিবের সম্বন্ধ নানারকম গল্প মেয়েলি আখ্যায়িকায় ও গানে গ্রথিত ছিল। এরকম কাহিনীতে কামের স্থূলতাও ছিল, যেমন ছিল কৃষ্ণের ব্রজলীলায়। বস্তুত এই দুই দেবতার লৌকিক লীলায় এ বিষয়ে বেশ মিল পাই।[৬] হয়ত কালিদাস এমনি কোন এক গল্প অবলম্বনে

১। অর্থাৎ পুরোহিত।
২। ব্রহ্মা।
৩। শ্লোক ৮৫-৮৮।
৪। অর্থাৎ শিবকে বৈদিক ভাষায় উমাকে প্রাকৃতে।
৫। শ্লোক ৯১-৯৩।
৬। কৃষ্ণ যেমন ষোল হাজার গোপী লইয়া রাস এবং সেই-সংখ্যক মহিষী লইয়া বিলাস করিয়াছিলেন, শিবও তেমনি হাজার মুনিপত্নীর প্রেমিক হইয়াছিলেন। তুলনায় দশকুমারচরিতে—"ভবানীপতের্মুনিপত্নীসহস্রসন্দূষণং পদ্মনাভস্য ষোড়শসহস্রান্তঃপুরবিহারঃ" (উত্তর-পীঠিকা)। অথর্ব-সংহিতায় মর্ত্যনারীর প্রতি ইন্দ্রের আসক্তির উল্লেখ আছে (৩.৪.৬)।

কুমারসম্ভবের বিষয়পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সে গল্পটি যে কি তাহা জানি না তবে অনুমান করিতে পারি। অনুমানের নির্দেশ পাই মধ্য বাংলা সাহিত্যে মনসা-কাহিনীর উপক্রমণিকারূপে বর্ণিত আখ্যানে। শিব হিমালয়ের একস্থানে ফুলের মালঞ্চ করিয়াছিলেন। পার্বতী সেইখানে ফুল তুলিতে গিয়াছিলেন। সেখানে শিবের সঙ্গে তাঁহার অনিচ্ছা-মিলন ঘটে। ঘরে ফিরিলে মেনকা তাহা জানিতে পারিয়া ভর্ৎসনা করেন। তাহার পরে শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ হয়। এই কাহিনীর অনুরূপ গল্প হয়ত কালিদাসের জানা ছিল[১] তবে সে কাহিনীকে তিনি যে নূতন সাজে সাজাইয়াছেন তাহাতে চরিত্রে দুটি মহিমান্বিত হইয়াছে। কাব্যটি পড়িলে মনে হয় যেন শিবের মহিমাসংস্থাপন ও শিবপূজার পোষকতা কালিদাসের (—তিনি শৈব ছিলেন, সন্দেহ নাই—) কুমারসম্ভব রচনার এক উদ্দেশ্য ছিল।

কালিদাস উমা নামের নিরুক্তি দিয়াছেন। সেই নিরুক্তির উপর কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গ প্রতিষ্ঠিত। নামটি প্রাচীন। তলবকার-ব্রাহ্মণে উমা হৈমবতীকে "বহু-শোভমানা', রুদ্রের মর্মজ্ঞ এবং আদি-ব্রহ্মজ্ঞ বলা হইয়াছে। সেখানে শিবের সঙ্গে উমা হৈমবতীর কোন সম্পর্ক উল্লিখিত নয় এবং হিমালয়ের সঙ্গে সম্বন্ধও সংশয়িত।[২]

রঘুবংশ

রঘুবংশ কালিদাসের সবচেয়ে বড় কাব্য। কাব্যটিকে আখ্যায়িকা-মালা বলিতে পারি। আধুনিক কালে লেখা হইলে রঘুবংশ ঐতিহাসিক "কথা ও কাহিনী" হইত। আসলে কিন্তু কাব্যটি পুরানো টাইপের রচনা নব্য সংস্করণের মতো। নামটি তাহাই প্রকাশ করে। ইহাতে উনিশ সর্গে ইক্ষ্বাকুবংশস্তম্ভের একটি বংশযষ্টির (অর্থাৎ branch line-এর) পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক পরিচয় বর্ণিত। 'রঘুবংশ' নামটির "বংশ" অংশে একটু শ্লেষ আছে,—(১) পুরুষানুক্রম এবং (২) বাঁশি অর্থাৎ কীর্তিগাথা। কালিদাস তাঁহার কাব্যে এই শ্লেষটুকু উপেক্ষা করেন নাই। রঘুবংশের সবটাই যে কীর্তিগাথা তা নয়। কোন বড় কবি অসত্যভাষণ করেন না, কালিদাসও করেন নাই। কিন্তু কবির কাজ অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘোষণ নয়। সে কাজে শাস্ত্রকার পণ্ডিতেরা আছেন। কবি কালিদাস তাই কীর্তির বেলায় মুখর এবং অকীর্তির বেলায় নীরব অথবা স্বল্পভাষী। কবির এই অলঙঘনীয় মানাটুকু মনে রাখিয়া আমরা রঘুবংশকে ইতিহাসও বলিতে পারি। সে ইতিহাস অবশ্য ইস্কুলকলেজে পঠনপাঠনযোগ্য দস্তুরমতো "হিস্টরি" নয়। তবুও রঘুবংশে সেকালের ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতির জীব-প্রকৃতির ও মানবপ্রকৃতির পরিচয় যতটা খাঁটিভাবে পাই ততটা কালিদাসের কাব্যের বাহিরে আর কোন গ্রন্থে শিলালেখে মুদ্রায় তাম্রপট্টে কলসীর কানায় শাঁখের পিঠে অথবা আধুনিক পণ্ডিতের রচিত কোন প্রবন্ধে কিংবা গ্রন্থে পাই নাই। রঘুবংশ শুধু ইতিহাস নয় ভূগোলও। সেকালের ভারতবর্ষের সমগ্র ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রঘুবংশ ছাড়া আর কোন একটি গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

১। পার্বতীর প্রতি শিবের প্রেম জাগিয়াছিল। এ কাহিনী অশ্বঘোষেরও জানা ছিল। তুলনীয়, "শৈলেন্দ্রপুত্রীং প্রতি যেন বিদ্ধো দেবোঽপি শম্ভুশ্চলিতো বভুব" (বুদ্ধচরিত ১৩.১২ কখ)।

২। হৈমবতী শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে। এক স্বর্ণালঙ্কারভূষিত (হেম, তুলনীয় "বহুশোভমানাম্")। আর হিমবান্ (তুষারগিরি) সম্পর্কিত।

কালিদাস রাখাল-রাজা দিলীপকে লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন। দিলীপের পুত্র রঘু দিগ্‌বিজয় করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামেই বংশ পরিচিত হইয়াছিল। দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত আটাশ জন রাজার কথা কালিদাস বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে দিলীপ রঘু অজ দশরথ ও রাম—এই পাঁচজনের পরিচয়ে পনেরো সর্গ লাগিয়াছে। কুশ, অতিথি ও অগ্নিবর্ণ—প্রত্যেকে মোটামুটি এক সর্গ করিয়া লইয়াছেন। বাকি বিশ জন[১] একটিমাত্র—অষ্টাদশ সর্গে স্থানপ্রাপ্ত।

কুমারসম্ভব মেঘদূত ঋতুসংহার—এই তিনটি কাব্যে কালিদাস নমস্ক্রিয়ার দ্বারা কাব্যারম্ভ করেন নাই। তা শুধু রঘুবংশেই করিয়াছেন। তাহার কারণ মনে করি যে এই কাব্য পুরাণ-আখ্যায়িকার মতো, এবং রাজসভায় পঠিত হইবার যোগ্য। তা ছাড়া কাব্যটি কালিদাসের পরিণত বয়সের রচনা বলিয়াও বোধ হয়। মেঘদূত ও ঋতুসংহারের মতো রঘুবংশ খণ্ডকাব্য নয় এবং কুমারসম্ভবের মতো খণ্ডিত কাব্যও নয়।

রঘুবংশের আরম্ভ এই শ্লোকে

> বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
> জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।।

'শব্দ ও অর্থের মতো যাঁহাদের (নিত্য-) সম্পর্ক, জগতের মাতা পিতা, পার্বতী ও পরমেশ্বরকে, বাক্যের অর্থপ্রতিপত্তির জন্য[২] বন্দনা করি।।"

তাহার পর বিনয় প্রকাশ।

> কোথায় সূর্য-উৎপন্ন বংশ, কোথায় (আমার মতো) ক্ষুদ্রবুদ্ধি !
> (আমি যেন) মোহবশে ভেলায় চাপিয়া সাগর ডিঙাইতে চাহিতেছি।।
> কমবুদ্ধি (আমি) কবিযশের প্রার্থী, (সুতরাং) উপহাসপাত্রই হইব।
> যেমন দীর্ঘকায়ের লভ্য ফলের লোভে বামন হাত উঁচু করে।।

কিন্তু কালিদাস একেবারে নির্ভরসা নন।

> তবে পূর্ব মনীষীদের দ্বারা এই বংশে[৩] বাক্যের পথ করা আছে। (তাই)
> বজ্রসূচি-ছিদ্রিত মণিতে সুতার মতো আমারও প্রবেশ হইতে পারে।।

তাহার পর চার শ্লোকে মানুষ ও রাজা দুই ভাবেই রঘুবংশের রাজাদের মহত্ত্ব নির্দেশ করিয়া কালিদাস বলিতেছেন যে রঘুবংশের গুণগাথা শুনিয়াই তিনি এই ধৃষ্টতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই রচনা ভালো কি মন্দ তাহা শুনিয়া তবে বিচার করিতে হইবে।

> ভালো কি মন্দ বিচারের যাঁহারা হেতু সেই সৎ ব্যক্তিরা শুনিবেন।
> সোনা খাঁটি কি ভেজাল তাহা অগ্নিতেই ধরা পড়ে।।

তাহার পর কথারম্ভ। রাজার মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম সেই বৈবস্বত মনুর সাগরের মতো বিস্তীর্ণ বংশে (অর্থাৎ সূর্যবংশে) রাজেন্দুর্দিলীপ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর দিলীপের

১। নিষধ, নল, নভস্‌, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অহীনগু, পারিযাত্র, শিল, উন্নাভ, বজ্রনাভ, শঙ্খণ, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, সোমসূত, ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মিষ্ঠের পুত্র (নাম পুত্র?) পুষ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন।

২। অর্থাৎ বাগ্‌ব্যবহারে ঈপ্‌সিত অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তিলাভের জন্য।

৩। এখানে ছিদ্র করা বাঁশে বাঁশি বজাইবার শ্লেষ আছে।

শক্তিসামর্থ্যের ও ধর্মশাসনের প্রশংসা।[১] দিলীপের প্রিয় পাটরানী মগধ (রাজ-) বংশের[২] কন্যা, নাম সুদক্ষিণা। সুদক্ষিণার গর্ভে পুত্রসন্তান লাভ দিলীপের আকাঙ্ক্ষিত। পুত্রজন্মের জন্য আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা না করিয়া সপত্নীক দিলীপ রূপকথার রাজরানীর মতো সৈন্যসামন্ত না লইয়া বনে চলিয়া গেলেন। (কালিদাস অবশ্য গহন বনে বলেন নাই, বলিয়াছেন তপোবনে—গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে।)

বারো শ্লোকে (৩৬-৪৭) তপোবন-যাত্রার বর্ণনা। বৃদ্ধ গোয়ালাদের কাছে টাটকা ঘি লইয়া দিলীপ ও সুদক্ষিণা রাস্তার ধারের সব গাছ চিনিয়া লইতে লাগিলেন। সন্ধ্যার মুখে রাজারানী গুরুর আশ্রমে পৌঁছিলেন। তখন নিজেরাও ক্লান্ত, রথের পশুও শ্রান্ত। পাঁচ শ্লোকে (৪৯-৫৩) আশ্রমপদের বর্ণনা। রথ হইতে নামিয়া পত্নীকে নামাইয়া রাজা সারথীকে বাহনদের বিশ্রাম করাইতে বলিলেন। আশ্রমবাসী মুনিরা রাজদম্পতীকে যথারীতি স্বাগত করিল। আশ্রমে সন্ধ্যার্চনা শেষ হইলে রাজা ও রানী গিয়া গুরু বশিষ্ঠ ও গুরুপত্নী অরুন্ধতীর পাদবন্দনা করিলেন। তাঁহারাও রাজদম্পতীকে অভিনন্দিত করিলেন। গুরুগৃহে আতিথ্য ও বিশ্রাম লাভ করিলে পর রাজাকে মুনি রাজ্যের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কহিলেন, আপনার মন্ত্র ও যজ্ঞ বলে এবং আপনার ব্রহ্মতেজে আমার প্রজারা দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে আছে, কিন্তু আপনার এই বধূ পুত্রপ্রসবিনী না হওয়ায় আমার রাজ্যধন কিছুই ভালো লাগিতেছে না। ছয় শ্লোকে রাজা তাঁহার অপত্যহীনতার মর্মবেদনা জানাইয়া নিবেদন করিলেন

> বাবা, যাহাতে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হই আপনাকে সেই ব্যবস্থা করিতে
> হইবে। ইক্ষ্বাকুদের দুষ্প্রাপ্য কামনায় সিদ্ধিলাভ আপনারই ইচ্ছাধীন।।

রাজার কথা শুনিয়া মুনি স্তব্ধনেত্রে কিছুক্ষণ ধ্যানমৌন রহিলেন, যেন মাছ সব ঘুমাইয়া পড়ায় অচঞ্চল হ্রদ। রাজার সন্তান না হওয়ার কারণ ধ্যানে জানিয়া লইয়া বশিষ্ঠ দিলীপকে বলিলেন, তুমি একদিন ইন্দ্রের দরবারে হাজিরি দিয়া পৃথিবীতে ফিরিতেছিলে। পথে তরুচ্ছায়ায় সুরভি[৩] শুইয়াছিল। তুমি পত্নীর কথা ভাবিতেছিলে বলিয়া তাহাকে নজর কর নাই। সুরভিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসা তোমার উচিত ছিল। তাহা কর নাই বলিয়া সুরভি শাপ দিয়াছিল। তখন আকাশগঙ্গায় দিগ্‌গজেরা উদ্দাম জলক্রীড়া করিতেছিল বলিয়া সে শাপ তোমার অথবা সারথীর কর্ণগোচর হয় নাই। পূজ্যের পূজা না করিলে কল্যাণের প্রতিবন্ধকতা হয়। তোমাকে সে শাপমোচন করাইতে হইবে। সুরভিকে এখন পাওয়া যাইবে না। সে এখন বরুণের দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের প্রয়োজনে পাতালে রহিয়াছে সেখানে যাইবার উপায় নাই, কেন না পাতালের দ্বার সর্পরুদ্ধ। সুরভির সন্তান আমার এই নন্দিনী গাভীটিকে তাহার প্রতিনিধি করিয়া তুমি সপত্নীক শুদ্ধাচারে থাকিয়া সেবা কর। প্রীত হইলে সে বাঞ্ছা পূরণ করিতে পারে।

এই কথা বলিতে বলিতেই নন্দিনী বন হইতে চরিয়া ফিরিয়া আসিল। কালিদাস অল্পকথায় গোরুটির উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়াছেন।

> **ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লবস্নিগ্ধপাটলা।**
> **বিভ্রতী শ্বেতরোমাঙ্কং সন্ধ্যেব শশিনং নবম্।।**

১। শ্লোক ১৩-৩০।

২। মগধরাজবংশ প্রাচনীত্ব ও সার্বভৌমত্ব গৌরবে অত্যন্ত মর্যাদাবান ছিল। অশোক তাঁহার এক অনুশাসনে নিজেকে "রাজা মাগধ" বলিয়াছেন।

৩। স্বর্ধেনু কপিলার সন্তান।

'পল্লবের'[১] মতো স্নিগ্ধ পাটল তাহার রঙ। কপালের উপর শাদা রোঁয়ার বাঁকা চিহ্ন। যেন নবশশীকে[২] ধারণ করিয়া সমাগত সন্ধ্যা।।'

বশিষ্ঠ বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনী আসিয়া পড়িল! তোমার বাঞ্ছাসিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি এইভাবে ইহার পরিচর্যা করিবে,

বনের তৃণভোজী এই গাভীকে সর্বদা নিজে অনুগমন করিবে। অভ্যাসে যেমন বিদ্যা তেমনি (সতত সেবায়) ইহাকে প্রসন্ন করিবে।।

এ যখন চলিবে তুমিও চলিবে, এ যখন থামিবে তুমিও থামিবে। এ যখন নিষণ্ণ হইবে তুমিও বসিবে, যখন জল খাইবে তুমিও জল খাইবে।।

বধূও ভক্তিমতী ও সংযত হইয়া অর্চনা করিয়া তপোবনের সীমা পর্যন্ত সকালে অনুগমন করিবে এবং সন্ধ্যায় আগ বাড়াইয়া আনিবে। যতদিন না নন্দিনী প্রসন্ন হয় ততদিন এইভাবে সেবা করিতে হইবে।

রাজা সাগ্রহে সম্মত হইলেন। বশিষ্ঠ রাজার বাসের জন্য পর্ণশালা ও আহারের জন্য বুনো ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। রাজদম্পতী তপোবনের পর্ণশালায় কুশশয্যায় রাত কাটাইলেন। এইখানে প্রথম সর্গ শেষ।[৩]

রূপকথার রাজা কিংবা রাজকুমারের মতো, অর্বাচীন কালের অনেক রাজবংশকর্তার আদ্য কাহিনীর মতো, উপনিষদের কালের গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীর মতো, দিলীপ নিষ্ঠার সহিত গুরুর গোরু চরাইতে লাগিলেন। রানীর গোপূজা আধুনিককালের অবিবাহিত কন্যাদের গোকুল ব্রতের মতোই।

সকালবেলায় দুধ দোয়ার পর বাছুরকে খাওয়াইয়া বাঁধিয়া রাখা হইত, আর রাজা নন্দিনীকে লইয়া বনে যাইতেন। সমস্ত দিন বনে চরিয়া নন্দিনী সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিত। রাজা সর্বদা ছায়ার মতো সঙ্গে লাগিয়া থাকিতেন এবং নন্দিনী যাহাই করিত, তিনিও তাহাই করিতেন। রানী সকালবেলায় নন্দিনীর পূজা করিয়া তাহার পিছু পিছু আশ্রমপ্রান্ত পর্যন্ত যাইতেন আর সন্ধ্যাবেলায় প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিতেন। সন্ধ্যাবেলায় কিভাবে সুদক্ষিণা নন্দিনীর অর্চনা (অর্থাৎ বরণ) করিতেন তাহার একটু বর্ণনা আছে।

সুদক্ষিণা খই সমেত পাত্র ধরিয়া (সেই) পয়স্বিনী (গাভীকে) প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিয়া তাহার বিশাল শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থলে অর্চনা করিত[৪] সে মধ্যস্থল যেন উদ্দেশ্যসিদ্ধির দ্বার।।

তাহার পর গোয়ালে নন্দিনীর কাছে সুদক্ষিণা পূজাদীপ রাখিয়া দিতেন।[৫] রাজা ও রানীর অষ্টপ্রহর গোসেবার বর্ণনা আছে বিশ শ্লোকে (৫-২৪)।

এইভাবে নন্দিনীর সেবায় একুশ দিন কাটিয়া গেল। বাইশ দিনের দিন বশিষ্ঠ মুনির হোমধেনু, গঙ্গাধারাপতনের ফলে ঘাস জন্মাইয়াছে এমন এক হিমালয়গুহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। অমনি তাহাকে এক সিংহ আসিয়া আক্রমণ করিল। রাজা গুহার বাহিরে ছিলেন। নন্দিনীর আর্তনাদ গুহায় দ্বিগুণ প্রতিধ্বনিত হইয়া রাজার কানে পৌঁছিল। রাজা দেখিলেন,

১। অর্থাৎ কচি পাতার মতো।
২। অর্থাৎ শুক্লপক্ষের গোড়ার দিকের চন্দ্রকলা।
৩। শ্লোকসংখ্যা ৯৫।
৪। অর্থাৎ সেই পাত্রটি ঠেকাইত।
৫। "অন্তিকন্যস্তবলিপ্রদীপাম্" (২৪)।

পাটল-গাভীর পৃষ্ঠে এক সিংহ থাবা রাখিয়াছে। তখনি তিনি তূণ হইতে বাণ লইয়া ধনুতে চড়াইতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার হাত বাণের পুঙ্খে লাগিয়াই রহিল। গড়া প্রতিমার মতো রাজা নিশ্চেষ্ট হইয়া গেলেন।[১] নন্দিনীকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া রাজার মনে ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য সাপের মতো রাজা নিজের ক্ষোভে নিজেই অন্তরে পুড়িতে লাগিলেন। তখন হঠাৎ রাজাকে চমকাইয়া দিয়া সিংহ মানুষের গলায় কথা বলিতে লাগিল। সিংহ বলিল, রাজা অশান্ত হইও না। তুমি আমার কিছুই করিতে পারিবে না। আমাকে শিবের কিঙ্কর কুম্ভোদক বলিয়া জানিও। নিকুম্ভ আমার মিত্র। আমার পিঠে পা দিয়া শিব তাঁহার ষাঁড়ে চড়েন।

> অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।
> যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ।।
> 'সামনে এই যে দেবদারু দেখিতেছ, শিব ইহাকে পুত্র করিয়াছেন।
> এ স্কন্দের মাতার স্তনবৎ হেমকুম্ভের পানীয়ের[২] রস পাইয়াছে।।'[৩]

একদিন কোন বন্যগজ গা ঘষিয়া গাছটির ছাল তুলিয়া দিয়াছিল। তাহাতে পার্বতীর ততটাই দুঃখ হইয়াছিল যতটা দুঃখ অসুরদের অস্ত্রে বিক্ষত কুমারকে[৪] দেখিয়া। তাহার পর এই অদ্রিকুক্ষি হইতে বন্যহস্তীদের দূরে রাখিবার জন্য শিব আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি সিংহরূপ ধরিয়া আছি। আমার দিন চলে হাতের কাছে আসা আগন্তুককে খাইয়া।[৫] অতএব তোমার লজ্জা করিবার কিছু নাই। তুমি যথেষ্ট গুরুভক্তি দেখাইয়াছ। এখন ঘরে ফিরিয়া যাও।

সিংহের কথা শুনিয়া রাজার আত্ম-অবজ্ঞা ঘুচিল। রাজা বলিলেন, আপনি আমার মনের কথা সব বুঝিতেছেন। আমার কোন কিছু করিবার নাই, বলিতে গেলে হাস্যকর হইবে। তবুও বলিতেছি। স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্তা (শিব) আমার মান্য। কিন্তু আমার গুরু আহিতাগ্নি।[৬] তাঁহার ধন চোখের সামনে নষ্ট হইবে, তাহা তো উপেক্ষা করা যায় না। অতএব

> স ত্বং মদীয়েন শরীরবৃত্তিং দেহেন নির্বর্তয়িতুং প্রসীদ।
> দিনাবসানোৎসুকবালবৎসা বিসৃজ্যতাং ধেনুরিয়ং মহর্ষেঃ।।
> 'আপনি আমার দেহ লইয়া আপনার শরীরপোষণের কাজ নিষ্পন্ন করিয়া অনুগৃহীত করুন। দিবাবসানের প্রতীক্ষায় ইহার কচি বাছুরটি উৎসুক হইয়া আছে। মহর্ষির এই গাভীটিকে ছাড়িয়া দিন।।'

একটু হাসিয়া, দাঁতের ছটায় গিরগহ্বরের অন্ধকার ফিকা করিয়া দিয়া সিংহ বলিল, (তোমার) একছত্র রাজত্ব, নবযৌবন, সুন্দর দেহ। অল্পের জন্য অনেক ছাড়িতেছ! তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। যদি তোমার জীবে দয়া হইয়া থাকে তবে তোমার মৃত্যুতে শুধু এই একটি গোরুই পরিত্রাণ পাইবে। আর তুমি নিজে যদি বাঁচিয়া থাক তবে, হে প্রজানাথ, পিতার মতো তুমি প্রজাদের চিরকাল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। তুমি কি একটি গাভীর বিনাশে

১। "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে" (৩১)।
২। মূলে "পয়সাং"। পয়স্ দুধ এবং জল দুইই বোঝায়।
৩। অর্থাৎ পার্বতী সোনার ঘড়া কাঁখে করিয়া তাহাকে জল দিয়া বাড়াইয়াছে।
৪। অর্থাৎ কার্তিককে।
৫। "অঙ্কাগতসত্ত্ববৃত্তিঃ"।
৬। যিনি প্রত্যহ অগ্নিষ্টোম করেন। প্রত্যহ হোম করিতে ঘি লাগে, সুতরাং গোরু না হইলে তাঁহার ধর্মকার্য চলে না।

গুরুর কোপের ভয় করিতেছ? কোটি কোটি দুধালো গোরু দিয়া তো তুমি তাঁহার ক্রোধ অপনয়ন করিতে পারিবে। অতএব কল্যাণ-সূত্র অচ্ছিন্ন রাখো, ভোগে সমর্থ ওজস্বী নিজের শরীরকে রক্ষা কর। তোমার রাজ্য তো ইন্দ্রত্ব, তবে পৃথিবীতে (এই যা)।[১]

এই বলিয়া সিংহ থামিলে কিছুক্ষণ প্রতিধ্বনি চলিল। বোধ হইল গুহা যেন তাহাকে সমর্থন করিতেছে। রাজা উত্তর দিতে গিয়া নন্দিনীর দিকে চাহিলেন। দেখিলেন গোরুটি কাতরভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। রাজার মন গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, ক্ষত[২] হইতে রক্ষা করে বলিয়াই ক্ষত্র নামটি ভুবনে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যদি তাহার বিপরীত করা হয়। তাহা হইলে রাজ্য লইয়া কী হইবে? যদি নিন্দার পঙ্কলেপ হয় তবে প্রাণ লইয়া কী হইবে? আর এ গাভী সুরভির সন্তান। কোটি কোটি গোরু দিলেও ইহার মূল্য শোধ হইবে না। তুমি আমাকে খাও, তাহা হইলে তোমার শরীরবৃত্তি সাধিত হইবে এবং মুনি বশিষ্ঠেরও ধর্মকর্ম অব্যাহত রহিবে। তুমিও তো অন্যের নিযুক্ত হইয়া কাজ করিতেছ। তুমিই বল, নিজে অক্ষত থাকিয়া রক্ষণীয়কে কি বিনষ্ট হইতে দেওয়া যায়? যদি তুমি মনে কর, দেহধারী আমি তোমার জিঘাংসার পাত্র নহি, তাহা হইলে আমার যে যশোদেহ তাহার প্রতি সদয় হও। ভৌতিক দেহে আমার কোন আস্থা নাই। উপরন্তু

> সম্বন্ধমাভাষণপূর্বমাহুর্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োর্বনান্তে।
> তদ্ভূতনাথানুগ নার্হসি ত্বং সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুম্।।
> 'লোকে বলে কথাবার্তা কহিলে পরে সম্পর্ক দাঁড়ায়। বনমধ্যে আমাদের দুইজনের তা ঘটিল। অতএব হে ভূতনাথ-অনুচর, আমি তোমার সম্বন্ধী।[৩] (আমার) অনুরোধ প্রত্যাখ্যান তোমার উচিত নয়।।'

'বেশ, তাই হোক।'—সিংহ এই কথা বলিতেই রাজার হাতপায়ের জড়ত্ব ঘুচিয়া গেল। অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দিলীপ নিজ দেহকে আমিষপিণ্ডের মতো সিংহ-সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। তিনি সিংহের লম্ফগ্রাস অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় আকাশ হইতে বিদ্যাধর অধোমুখ রাজার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিল। 'ওঠ বাছা,'—এই সঞ্জীবন বাক্য শুনিয়া রাজা মুখ তুলিয়া দেখেন—কোথায় সিংহ! স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নন্দিনী তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে, তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ঝরিতেছে। নন্দিনী মানুষের মতো রাজাকে বলিল, 'ভয় নাই। আমিই মায়া করিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিলাম। আমি খুশি হইয়া তোমাকে বর দিতেছি। বর নাও তুমি।' রাজা বলিলেন, 'সুদক্ষিণার গর্ভে আমার যেন বংশকর্তা অনন্যকীর্তি পুত্র হয়।' নন্দিনী বলিল, 'বেশ। তুমি পত্রপুটে দুধ দুহিয়া খাও।' রাজা তাহাই করিলেন। তাহার পরে নন্দিনীকে লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন। সকালবেলায় বশিষ্ঠ ব্রতপারণা করাইয়া রাজদম্পতীকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। কিছুদিন পরে সুদক্ষিণার গর্ভসঞ্চার হইল। এইখানে ৭৫ শ্লোকে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত। (দিলীপ-নন্দিনী-সিংহ আখ্যানটি একটি ভালো জাতক গল্পের মতো।)

তৃতীয় সর্গে রঘুর জন্মকথা। এখানে কালিদাস গর্ভিণী নারীর ও নবজাত শিশুর যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা প্রাচীন সাহিত্যে আগে পাওয়া যায় নাই। রঘুবংশে রাজারাজড়ার কথা

১। শ্লোক ৪৬-৫০।

২। অর্থাৎ আঘাত। "ক্ষত্রাৎ কিল ত্রায়তে" (৫৩)—এইখানে কালিদাস "ক্ষত্র" (প্রাচীন পারসীক "খ্‌শস" আবেস্তা "খ্‌শথ" মানে রাজা) শব্দের বুৎপত্তি দিয়াছেন। "ক্ষত্র' শব্দ সংস্কৃতে রাজা অর্থে চলিত ছিল না।

৩। অর্থাৎ তোমার আমার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। এখানে "সম্বন্ধী" শব্দে শ্লেষ থাকিতে পারে। বাংলার রূপকথা স্মরণীয়।

বলিতে গিয়াও কালিদাস ঘরসংসারের আনন্দ ভুলিতে পারেন নাই। রঘুবংশের এখানে এবং শকুন্তলার শেষ অঙ্কে তিনি ভারতীয় সাহিত্যে শিশুরসের[১] অবতারণা করিলেন।

ক্রমে সুদক্ষিণার সাধ খাইবার সময় আসিল।[২] শরীর অবসন্ন হওয়ায় সুদক্ষিণা অলঙ্কার পরিধান ছাড়িয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল লোধ্রপুষ্পের মতো পাণ্ডুবর্ণ। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন আসন্নপ্রত্যূষে রজনীতে ক্ষীণজ্যোতিঃ চাঁদ, শুধু এক একটি তারা দেখা যাইতেছে।[৩] পত্নীকে দেখিয়া রাজার প্রীতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। রানীর প্রসবকাল আসন্ন হইলে রাজা কুমারভৃত্যদের[৪] দিয়া ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর শুভলগ্নে[৫] সুদক্ষিণা পুত্র প্রসব করিলেন। প্রাসাদে বাজনা বাজিতে লাগিল। নারীরা নৃত্য করিতে লাগিল।[৬] রাজা ভাবিয়া চিন্তিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন রঘু।[৭] সুন্দরকান্তি ও সর্বসুলক্ষণময় শিশু পিতার যত্নে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। একটিমাত্র শ্লোকে কালিদাস শিশুর পরিপূর্ণ আলেখ্য আঁকিয়া দিয়াছেন।

> উবাচ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়ামবলম্ব্য চাঙ্গুলিম্।
> অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া পিতুর্মুদং তেন ততান সোহর্ভকঃ।।
> 'ধাত্রীর অনুকরণে প্রথমে কথা বলিতে শিখিল। তাহার আঙুল ধরিয়া প্রথম চলিতে শিখিল। প্রণাম শিক্ষায় প্রথম ঘাড় হেঁট করিতে শিখিল। এইভাবে শিশুটি পিতার আনন্দবর্ধন করিতে লাগিল।।'

ছেলে কোলে করিয়া রাজার যেন আশ মিটিত না।

একটু বয়স হইলে রঘুর মাথার চুলে চূড়াবাঁধা হইল। সে সমবয়সী মন্ত্রি-পুত্রদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। যথাকালে রঘুর উপনয়ন হইল। অল্পকালেই সে পিতার সমস্ত গুণের সহিত চার বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিল। তাহার পর সে মৃগচর্ম পরিয়া পিতার কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখিল। ধনুর্বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ হইল। তাহাকে যৌবনারূঢ় দেখিয়া দিলীপ গোদান অনুষ্ঠান করিয়া বিবাহ দিলেন। বধূরা সবাই রাজকন্যা। দিলীপ রঘুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তাহার পর পরপর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। শেষ বেলায় ইন্দ্র যজ্ঞেয় অশ্ব ধরিলেন। অশ্বের রক্ষক রঘুর সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হইল।[৮] রঘুর বীরত্বে ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ঘোড়া ছাড়িয়া দিব না, আর কি চাও বল।' রঘু বলিল, 'অপূর্ণ হইলেও পূর্ণ যজ্ঞের ফল যেন আমার পিতা পান এবং আমাকে গিয়া যেন তাঁহার কাছে এই যজ্ঞভঙ্গের বার্তা জানাইতে না হয়।' 'তাই হোক', বলিয়া ইন্দ্র রঘুর গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন।

অতঃপর দিলীপ পুত্রের উপর সম্পূর্ণ রাজ্যভার দিয়া পত্নীর সহিত তপোবনে চলিয়া গেলেন। এইখানে ৭০ শ্লোকে তৃতীয় সর্গ শেষ।

চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনা। এসর্গটিকে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ভূগোল-বর্ণনা বলিতে পারি।

১। ইচ্ছা করিয়াই বাৎসল্যরস বলিলাম না। বাৎসল্যরস বলিতে গেলে কৃষ্ণলীলার ও বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রের ব্যঞ্জনা আসিয়া পড়ে।
২। "সুদক্ষিণা দৌহৃদলক্ষণং দধৌ"।
৩। "তনুপ্রকাশেন বিচেরতারকা প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী"।
৪। অর্থাৎ পুরুষ নার্স ও শিশু চিকিৎসক।
৫। শ্লোক ১৩। এখানে কালিদাসের জ্যোতিষবিদ্যার পরিচয়।
৬। এখন যেমন হিজড়ের নাচ হয়।
৭। শ্লোক ২১। এখানে কালিদাসের নিরুক্তি জ্ঞানের পরিচয়। (মানে ক্ষিপ্র)
৮। শ্লোক ৩৯-৬১।

পিতার রাজ্যভার পাইয়া রঘু ধর্মন্যায়ে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। রাজা শব্দের বুৎপত্তির ইঙ্গিত করিয়া কালিদাস বলিতেছেন যে রঘুর রাজা নাম সম্পূর্ণ সার্থক।

যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাৎ তপনো যথা।
তথৈব সোঽভুদন্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ।।
'যেমন আনন্দকর বলিয়া চন্দ্র[1], উত্তাপ (দেয়) বলিয়া তপন, তেমনি তিনিও প্রকৃতিরঞ্জনহেতু সার্থকনামা রাজা[2] হইয়াছিলেন।।'

পিতার কাছ হইতে পাওয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা করা হইতে না হইতে শরৎকাল আসিয়া গেল। রঘু রাজ্যের পরিধি বাড়াইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রজারা তাঁহার শাসনে খুব সন্তুষ্ট। তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়াছে, এমন কি দূরদূরান্ত জনপদে মেয়ে-মহলেও পৌঁছাইয়াছে।

ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্।
আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ।।
'আখক্ষেতে ছায়ায় বসিয়া, সেই রাজা রঘুর শিশুকাল হইতে গুণময় জীবনকথা বলিয়া ধানক্ষেতের পাহারাদার মেয়েরা যশোগান করিত।।'

(সে কালের মাঠে খাটা মেয়েদের গাওয়া মেয়েলি গানের এই প্রথম উল্লেখ আমরা পাইলাম।)

প্রথম শরতে যখন নদীর জল প্রসন্ন ও স্তিমিতগতি, পথের কাদা যখন শুখাইয়াছে তখন বিধিমতো অশ্বের বরণ করিয়া[3], রাজধানী ও জনপদ রক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া পিছনের পথ নিরাপদ রাখিয়া[4], ষড়্‌বিধ সৈন্যবাহিনী লইয়া রঘু দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিলেন। নগরে বর্ষীয়সী মহিলাবা রঘুর উপর লাজবৃষ্টি করিল।

প্রথমে রঘু চলিলেন পূর্ব দিকে। পূর্বসাগরাভিমুখে ধাবমান সেনাবাহিনীর পুরোভাগে রঘুকে দেখিয়া বোধ হইল যেন ভগীরথ হরজটাভ্রষ্ট গঙ্গাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। প্রাচ্য দেশগুলিকে জয় করিতে করিতে রঘু সমুদ্রোপকণ্ঠে গিয়া পৌঁছিলেন। সে সুহ্ম দেশ।[5] রঘুর বলাধিক্যে সুহ্মেরা নত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিল, যেমন নদীর বানের মুখে বেতগাছ করে। নৌবাহিনী লইয়া বঙ্গেরা বাধা দিল। তাহাদের জয় করিয়া রঘু গঙ্গাস্রোতের মাঝখানে নিজ জয়স্তম্ভ স্থাপন করিলেন:

আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইহ তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্ধয়ামাসুরুৎখাতপ্রতিমেরাপিতাঃ।।

"তাহাদের উৎখাত করিয়া আবার প্রতিষ্ঠিত করিলে পর তাহারা কল্মা ধানের মতো পা পর্যন্ত নুইয়া পড়িয়া ফল দিয়া রঘুকে সংবর্ধনা করিল।।[6]

১। "চদি" ধাতুর অর্থ স্নিগ্ধদীপ্তি দেওয়া।
২। কালিদাস রঞ্জি ধাতু হইতে রাজা শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। বেদে "সোমো রাজা", 'যমো রাজা"। যম সূর্যপুত্র। হয়ত এখানে এই ইঙ্গিতও আছে।
৩। "বাজিনীরাজনাবিধৌ" (২৫)। "নীরাজন" "শুদ্ধীকৃত" বাংলায় নিরঞ্জন মানে বিসর্জন নয়। বুৎপত্তিগত মানে—"জলে ধোওয়া।" বিদায়ের ও স্বাগত করিবার আগে যে বিধিমতে অর্ঘদান ও অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শুভ অনুষ্ঠান—এখানকার মেয়েলি 'বরন"—তাহাই সেকালের ব্যবহারিক অর্থে "নীরাজন"।
৪। এই শ্লোক (২৬) কালিদাসের নিপুণ রাজনীতিবোধের পরিচয়।
৫। রাঢ়ের (পশ্চিমবঙ্গের) পুরানো নাম।
৬। এখানে শ্লেষ আছে—(১) ধান, (২) স্থানীয় ফল—সুপারি ও নারিকেল এবং স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য—সূক্ষ্মবস্ত্র ইত্যাদি।

বঙ্গদেশ জয় করিয়া রঘু হাতিবাঁধা পুলের উপর দিয়া কপিশা[১] নদী পার হইয়া উৎকলের পথ ধরিয়া[২] কলিঙ্গের অভিমুখে চলিলেন। কলিঙ্গের রাজা হস্তিবাহিনী লইয়া যুদ্ধ করিয়া হারিয়া গেলে রঘুর প্রতাপ মহেন্দ্র পর্বতের মাথায় চড়িল। কলিঙ্গে রঘুর যোদ্ধারা পানপাতা বিছাইয়া আসর করিয়া নারিকেলআসব পান করিতে লাগিল।[৩] ধর্মবিজয়ী রঘু কলিঙ্গের রাজাকে বন্দী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং রাজ্যও প্রত্যর্পণ করিলেন।

তাহার পর রঘু সমুদ্রতট ধরিয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন। রঘুর বাহিনীর অবগাহনে কাবেরীর জল ঘোলা হইয়া গেল।[৪]

বলৈরধ্যুষিতাস্তত্র বিজিগীষোর্গতাধ্বনঃ।
মারীচোদ্‌ভ্রান্তহারীতা মলয়াদ্রেরুপত্যকাঃ।।

'দীর্ঘপথপরিশ্রান্ত বিজয়যাত্রী রঘু-বাহিনীর দ্বারা অধ্যুষিত হওয়ায় মলয়ের উপত্যকাগুলিতে টিয়াপাখিরা লঙ্কাক্ষেতে যেন হুমড়াইয়া পড়িল।।"

সেখানে অশ্বপদপিষ্ট এলা ফলের রেণু উড়িয়া হাতির গণ্ডস্থলে পড়িয়া মদগন্ধের জোর বাড়াইয়া দিল। চন্দন গাছে সাপ বেড়িয়া থাকার পেঁচানো দাগের মধ্যে পড়িয়া ক্ষেপা হাতির শৃঙ্খলও শ্লথ হইল না। দক্ষিণদিকে গেলে সূর্যেরও তেজ কমিয়া যায়, অথচ সেখানে রঘুর তেজ পাণ্ড্যদের[৫] অসহ্য হইল। তাম্রপর্ণী যেখানে সমুদ্রে মিশিয়াছে সেইখানের উৎকৃষ্ট মুক্তা তাহারা রঘুকে প্রদান করিল। মলয় ও দর্দুর পর্বত পার হইয়া তিনি সহ্য পর্বতও লঙঘন করিলেন, যে অসহ্যবিক্রম সহ্যকে সমুদ্রও দূরে রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। অপরান্ত[৬] দেশ জয় করিতে চলিতেছে যে রঘু-বাহিনীকে দেখিয়া মনে হইল যে রামের অস্ত্র দ্বারা দূরে তাড়িত হইয়াও সমুদ্র যেন সহ্যের কাছে আসিয়া ঠেকিয়াছে। রঘু-বাহিনীর ভয়ে কেরলের মেয়েরা প্রসাধন ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু সেনাপদোৎক্ষিপ্ত ধূলি তাহাদের চুলে লাগিয়া যেন প্রসাধনচূর্ণের মতো দেখাইল। কেয়াফুলের রজঃকণা মুরলা নদীর হাওয়ায় উড়িয়া যোদ্ধাদের বর্মের উপর পড়ায় যেন বস্ত্রসুবাসিত করিবার চূর্ণের মতো বোধ হইতে লাগিল। এদিকে ওদিকে চরিয়া-বেড়ানো বাহনের গায়ের বর্মের ঝনঝনি হাওয়ায় তোলা রাজতালী[৭] বনের ধ্বনিকে পরাভূত করিল।

খর্জুরীস্কন্ধনদ্ধানাং মদোদ্‌গারসুগন্ধিষু।
কটেভ্যোঃ করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ।।
'খেজুর গাছের গুঁড়িতে বাঁধা হাতিদের মদোদ্‌গার-সুগন্ধি
গণ্ডস্থলে ভ্রমর পুন্নাগ ফুল ছাড়িয়া বসিতে লাগিল।।'

অপরান্তের রাজা রঘুর বশ্যতা স্বীকার করিল।

১। সম্ভবত সুবর্ণরেখা।
২। "উৎকলাদর্শিতপথঃ" (৩৮)। মল্লিনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উৎকলের রাজার দেখানো পথে।
৩। মনে হয় নারিকেল-আসব আর কিছুই নয় ডাবের জল। তাহা হইলে ডাবের জল খাওয়ার উল্লেখ সাহিত্যে এই প্রথম পাইলাম।
৪। "কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ"।
৫। আধুনিক মাদ্রাজ ও মহীশূরের অংশ লইয়া সেকালের পাণ্ড্য দেশ।
৬। আধুনিক দক্ষিমপশ্চিম মহীশূব ও কোঙ্কণ।
৭। বড় তালগাছ, অথবা বিশেষ একরকম তালগাছ।

পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপুংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী।।

'তাহার পর (রঘু) পারসীকদের জয় করিতে স্থলপথে চলিলেন।[১]
যেমন সংযমী তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়-শত্রুদের (জয় করে)।।'

যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্‌জানামকালজলদোদয়ঃ।।

'যবনীদের মুখপদ্মের মধুগন্ধ তিনি সহ্য করিলেন না।[২]
অকালে মেঘ সকালের রৌদ্রনিবারণে যেমন পদ্মদের করে।।'

পাশ্চাত্যেরা[৩] ঘোড়ায় চাপিয়া যুদ্ধ করিল। এত ধূলা উড়িল যে যুদ্ধ দেখা গেল না, কেবল ধনুকের টঙ্কারে প্রতিযোদ্ধাদের রণচেষ্টা বোঝা গেল। রঘুসৈন্যের ভল্লে[৪] পারসীকদেব মাথা কাটা পড়িতে লাগিল। তাহাদের দাড়িওয়ালা কাটামুণ্ড দেখিয়া মনে হইল যেন রণস্থল মৌচাকে আস্তীর্ণ। তাই দেখিয়া বাকি প্রতিযোদ্ধারা মাথার টুপি খুলিয়া রঘুর কাছে আত্মসমর্পণ করিল।[৫]

বিনয়ন্তে স্ম তদ্‌যোধা মধুভির্বিজয়শ্রমম্‌।
আস্তীর্ণাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু।।

'তাঁহার যোদ্ধারা মধুর দ্বারা[৬] বিজয়শ্রম অপনোদন করিতে লাগিল, আঙুরক্ষেত বেষ্টিত ভূমিতে মূল্যবান্‌ কার্পেট (পাতিয়া)।।'

তাহার পর রঘু উত্তরদিকে বিজয়ে চলিয়া বক্ষু (অক্‌শাস্‌) হ্রদের তীরে পৌঁছিয়া হূণ-নারীদের বৈধব্যসাধন করিলেন। কাম্বোজেরা তাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া নত হইল, যেমন নত হইল সেখানকার আখ্‌রোট গাছ হাতিবাঁধার টানে পড়িয়া। ভালো ভালো ঘোড়া-সমেত রাশি রাশি উপহার তাহারা রঘুকে প্রদান করিল। তাহার পর রঘু ঘোড়ায় চড়িয়া হিমালয় প্রদেশে চড়াও হইলেন। কিরাতদের সঙ্গে রঘুর ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রঘুর জয়লাভে হিমাদ্রি যেন লজ্জিত হইলেন। তাহার পর রঘু বিজয়বাহিনী লইয়া লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) অতিক্রম করিলেন। তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি যুদ্ধ করিতে আসিলেন না। কামরূপের রাজাও রঘুকে হাতি ও বহু রত্ন উপহার দিয়া যুদ্ধ না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল।

এইরূপে দিগ্‌বিজয় সাঙ্গ করিয়া রঘু রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার পর সর্বস্ব দক্ষিণা দিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞান্তে সমবেত রাজন্যদের স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়া রঘু স্বচ্ছন্দে গৃহসুখ উপভোগে মন দিলেন। এইখানে ৮৮ শ্লোকে চতুর্থ সর্গ শেষ।

১। মনে হয় কালিদাসের সময়ে ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধরীতি প্রচলিত হইয়াছিল। আগে শ্লোক ২৫ দ্রষ্টব্য।

২। অর্থাৎ পারসীক সৈন্যদের নিহত করিয়া তাহাদের পত্নীদের বিধবা করিলেন। বিধবার পক্ষে মদ্যপান নিষিদ্ধ।

৩। অর্থাৎ পারসীক ও যবনেরা।

৪। দীর্ঘ ফলকযুক্ত বর্শা।

৫। এই পারসীক-জয় বর্ণনা হইতে মনে হয় যে ভারত-প্রত্যন্তে আখামেনীয় অধিকারের ইতিহাস কালিদাস হয়ত জানিতেন এবং সমসাময়িক সাসানীয় ইরানের কথাও তাঁহার নিশ্চয় জানা ছিল। "পারসীক" শব্দটি কালিদাস পহ্লবী হইতে পাইয়া থাকিবেন। "যবন" মানে Ionian Greek (গ্রীক)।

৬। অর্থাৎ দ্রাক্ষারস পান করিয়া।

একদিন বরতন্তু মুনির শিষ্য কৌৎস গুরুদক্ষিণা যোগাড় করিবার উদ্দেশ্যে রঘুর কাছে আসিলেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দান করা হইয়াছে, তাই রঘু মৃৎপাত্রে অর্ঘ্য লইয়া কৌৎসকে অভ্যর্থনা করিলেন। মুনির ও আশ্রমের কুশল প্রশ্নাদির[১] পর রাজা বলিলেন

অপি প্রসন্নেন মহর্ষিণা ত্বং সম্যগ্ বিনীয়ানুমতো গৃহায়।
কালো হ্যয়ং সংক্রমিতুং দ্বিতীয় সর্বোপকারক্ষমমাশ্রমং তে।।

'মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে ভালো করিয়া শিক্ষা দিয়া গৃহে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন তো? সকলের উপকার করা যায় এমন দ্বিতীয়, গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিবার কাল আপনার আসিয়াছে।।'

কুশল প্রশ্নের উত্তর দিয়া রাজার প্রশংসা করিয়া কৌৎস বলিলেন, আমি বড় অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি। যজ্ঞান্তে রিক্তবিক্ত আপনি যেন এখন

আরণ্যকোপাত্তফল প্রসূতিঃ স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ।।

'অরণ্যবাসীরা ফসল ঝাড়িয়া লইয়া গিয়াছে এমন কাণ্ড-অবশিষ্ট বুনো ধানগাছের মতো।।'

তদন্যতস্তাবদনন্যকার্যো গুর্বর্থমাহর্তুমহং যতিষ্যে।
স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নার্দতি চাতকোঽপি।।

'অতএব, অনন্যকার্য আমি, গুরুর জন্য (দক্ষিণা) আহরণ করিতে অন্যত্র চেষ্টা করিব। আপনার কল্যাণ হোক। জলকণারিক্ত শরৎমেঘকে চাতকও চাপ দেয় না।।'

এই বলিয়া মুনিশিষ্য চলিয়া যাইতে উদ্যোগ করিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুকে কী দিতে হইবে। শিষ্য বলিলেন, গুরুকে দক্ষিণা গ্রহণ করিবার জন্য জেদ করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চল্লিশ কোটি টাকা চাহিয়াছেন।

রঘু বলিলেন

গুর্বর্থমর্থী শ্রুতপারদৃশ্বা রঘোঃ সকাশাদনবাপ্য কামম্।
গতো বদান্যান্তরমিত্যয়ং মে মা ভূৎ পরীবাদনবাবতারঃ।।

'বিদ্যার পারগামী (ছাত্র) গুরুর জন্য অর্থী হইয়া রঘুর কাছে বিফলকাম হইয়া অন্য বদান্য ব্যক্তির কাছে গিয়াছে, এমন অভূতপূর্ব নিন্দা আমার যেন না ঘটে।।'

আপনি দুই তিন দিন আমার অগ্ন্যাগারে চতুর্থ অগ্নি[২] হইয়া বাস করুন, আমি তাহার মধ্যে গুরুদক্ষিণা যোগাড় করিয়া দিব।

রঘু ঠিক করিলেন, কৈলাসনাথ কুবেরের ধনভাণ্ডার লুঠ করিবেন। তাঁহার সংকল্প জানিয়া ভয় পাইয়া কুবের রাতারাতি রঘুর কোশাগার ভরাইয়া দিল। রঘু কৌৎসকে প্রার্থনার অতিবিক্ত ধন দান করিলেন। কৌৎস রঘুকে আত্মগুণানুরূপ পুত্র বর দিয়া চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে রঘুর পুত্র জন্মিল। ব্রাহ্মমুহূর্তে জন্ম বলিয়া রঘু পুত্রের নাম রাখিলেন অজ।[৩] অজ লেখাপড়া শিখিল এবং তাঁহার বিবাহের বয়স হইল। ক্রথকৈশিকদের রাজা[৪] ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভার আয়োজন করিয়াছেন। অজ সসৈন্যে চলিল। পথে গান্ধর্ব-অস্ত্র লাভ ঘটিল। এইখানে (৭৬ শ্লোকে) পঞ্চম সর্গ শেষ।[৫]

১। শ্লোক ৪-৯। কুমারসম্ভব পঞ্চম সর্গ তুলনীয়।
২। সেকালের অগ্ন্যাগার এখনকার ঠাকুরঘরের মতো। বৈদিক অগ্নির তিন রূপ। আতিথি যেন অগ্নির চতুর্থ রূপ।
৩। অজ ব্রহ্মার এক নাম।
৪। অর্থাৎ বিদর্ভের রাজা।
৫। শ্লোকসংখ্যা ৭৬।

ষষ্ঠ সর্গে স্বয়ংবর-কাহিনী। এই স্বয়ংবর-বর্ণনার বিশেষ মূল্য আছে। রঘুর দিগ্‌বিজয়ে যেমন ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ভূগোল বিবৃত ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে তেমনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের (প্রদেশের) রমণীয়তা বর্ণিত ও বিভিন্ন রাজবংশের রাজ্যাধিকারীর প্রশস্তিমালা গাঁথা। তাই স্বয়ংবর-সভায় একটু বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি।

গ্যালারি-মঞ্চের উপর রাজারা দুই সারি দিয়া শোভা করিয়া বসিয়াছেন। ইন্দুমতী দোলায় চড়িয়া দুই মঞ্চ-সারির মধ্যে আসিয়া নামিল। অমনি তাহার দিকে সকলের চোখ পড়িল এবং রাজারা সকলে সাজগোজ গুছাইয়া মনোহরণ ভাবভঙ্গি করিতে লাগিল। কালিদাস সাত শ্লোকে (১৩-১৯) রাজাদের এই বিচিত্র "শৃঙ্গারচেষ্টা"র বর্ণনা দিয়াছেন।

ততো নৃপাণাং শ্রুতবৃত্তবংশা পুংবৎপ্রগল্‌ভা প্রতিহাররক্ষী
প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য নীত্বা কুমারীমবদৎ সুনন্দা।।

'তাহার পর পুরুষের মতো প্রগল্‌ভ প্রতিহাররক্ষী[১] সুনন্দা, রাজাদের বংশ এবং কীর্তি যাহার শোনা ছিল, সে কুমারীকে প্রথমেই মগধেশ্বরের কাছে লইয়া গিয়া এই কথা বলিল।।'[২]

তিন শ্লোকে মগধরাজ পরন্তপের প্রশংসা করিয়া সে বলিল, 'যদি ইহাকে বরণ কর তবে জানালার ধারে সমাগত সমবেত পুষ্পপুরের মেয়েদের চোখের উৎসব তোমাকে ঘিরিয়া জমিয়া উঠিবে।'

এবং তয়োক্তে তমবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্‌বিস্রংসিদূর্বাঙ্কমধূকমালা।
ঋজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা।।

'সে এই কথা বলিলে, তাঁহাকে একটু দেখিয়া লইয়া দূর্বাগাঁথা মধুকমালা একটু হেলাইয়া তন্বী (ইন্দুমতী) সোজা প্রণাম করিয়া কিছু না বলিয়াই প্রত্যাখ্যান করিল।"[৩]

তাহার পরে অঙ্গদেশের[৪] রাজা। সুনন্দা অঙ্গ-রাজ্যের যৌবনকান্তির ও বীর্যের প্রশংসা করিয়া বলিল।

নিসর্গভিন্নাস্পদমেকসংস্থমস্মিন্ দ্বয়ং সরস্বতী চ।
কান্ত্যা গিরা সূনৃতয়া চ যোগ্যা ত্বমেব কল্যাণি তয়োস্তৃতীয়া।।

'লক্ষ্মী ও সরস্বতী স্বভাবগত ভিন্ন-স্থানবাসিনী হইয়াও ইঁহাতে একত্র হইয়াছে। হে কল্যাণী, কান্তি ও মধুর বচনের হেতু তুমি ইঁহাদের তৃতীয় হইবার যোগ্য।।'

অথাঙ্গরাজাদবতার্য চক্ষু র্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী।
নাসৌ ন কাম্যো ন বেদ সম্যক্ দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।।

'তখন অঙ্গ-রাজ্যের দিক হইতে চোখ নামাইয়া কুমারী পরিচারিকাকে বলিল—'চল।' তিনি যে কাম্য নহেন তাহা নয়, সেও যে সম্যক্ বিবেচনা করিতে সমর্থ নয় তাহাও নয়। আসলে লোকের রুচি বিভিন্ন।।'

১। অন্তঃপুরের রক্ষিণী, ইংরেজিতে lady-in-waiting।
২। মগধের রাজার প্রাধান্য কালিদাসের সময়ে স্বীকৃত ছিল, ইহা তাহার এক প্রমাণ। শুঙ্গ ও গুপ্ত রাজাদের মধ্যবর্তী কালে মগধের ঠিক এমনি অবস্থা ছিল।
৩। ইন্দুমতী আর কোন রাজাকে প্রণাম করে নাই।
৪। আধুনিক পূর্ব বিহার ও উত্তরপশ্চিম বঙ্গ।

তাহার পর অনূপ দেশের[১] রাজার কাছে ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়া সুনন্দা বলিল, ইনি কীর্তবীর্যের বংশধর, নাম প্রতীপ। ইনি বিদ্যাবৃদ্ধদের পছন্দ করেন।[২]

অস্যাঙ্কলক্ষ্মীর্ভব দীর্ঘবাহোর্মাহিস্মতীবপ্রনিতম্বকাঞ্চীম্।
প্রাসাদজালৈর্জলবেণীরম্যাং রেবাং যতে প্রেক্ষিতুমস্তি কামঃ।।

'এই দীর্ঘবাহুর অঙ্কলক্ষ্মী হও, যদি মাহীষ্মতীর প্রাকারশৈলের কাঞ্চীদামের মতো রেবাকে, যাহার জলধারা বেণীর গাঁথনির মতো বহিয়া যায়, তাহাকে প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে দেখিতে তোমার সাধ হয়।।'

অত্যন্ত প্রিয়দর্শন হইলেও অনূপ-রাজকে ইন্দুমতীর পছন্দ হইল না, যেমন শরতে মেঘমুক্ত চন্দ্রের উজ্জ্বলতা বাড়িলেও তাহাতে নলিনীর রুচি হয় না।

তাহার পর যাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল সদাচারে উজ্জ্বল সেই যশস্বী শূরসেন-রাজ[৩] সুষেণের কাছে লইয়া গিয়া সুনন্দা তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল[৪]

অস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং প্রক্ষালনাদ্ বারিবিহারকালে।
কলিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি গঙ্গোর্মিসংসক্তজলেব ভাতি।।

'ইঁহার অন্তঃপুরিকাদের স্তনের চন্দনলেপ জলবিহারের সময়ে ধুইয়া গেলে মনে হয় যেন কালিন্দী মথুরায় প্রবাহিত হইলেও গঙ্গাতরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।।'

এতেন তার্ক্ষাৎ কিল কালিয়েন মণিং বিসৃষ্টং যমুনৌকসা যঃ।
বক্ষঃস্থলব্যাপিরুচং দধানঃ সকৌস্তুভং হ্রেপয়তীব কৃষ্ণম্।।

'গরুড়ের ভয়ে যমুনাবাসী কালিয় যে মণি দিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়, সে মণি ইঁহার বক্ষঃস্থল উজ্জ্বল করিয়া যেন কৌস্তভধারী কৃষ্ণকে[৫] লজ্জা দেয়।।'

সংভাব্য ভর্তারমমুং যুবানং মৃদুপ্রবালোত্তরপুষ্পশয্যে।
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে নির্বিশ্যতাং সুন্দরি যৌবনশ্রীঃ।।

'যুবা ইনি, ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া, মৃদু প্রবালছড়ানো পুষ্প আস্তীর্ণ শয্যায়, চৈত্ররথ[৬] হইতে হীন নয় এমন বৃন্দাবনে, হে সুন্দরী, যৌবনশ্রী উপভোগ কর।।'

অধ্যাস্য চাম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্ধনকন্দরাসু।।

'জলকণাসিক্ত শিলাজতুর গন্ধামোদিত শিলাতলে আসীন হইয়া বর্ষাকালে রমণীয় গোবর্ধনগুহায় (তুমি) ময়ূরের নাচ দেখিও।।'

একটু দাঁড়াইয়া ইন্দুমতী সুষেণের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। পথের গতিকে পাহাড় পাইলে সাগরগামিনী নদী যেমন (বাঁক ফিরিয়া) বহিয়া যায়, তেমনি।

তাহার পর কলিঙ্গাধিপ হেমাঙ্গনাথের পালা। সুনন্দা লোভ দেখাইল।

অনেন সার্ধং বিহরাম্বুরাশেস্তীরেষু তালীবনমর্মরেষু।
'তালীবনমর্মরিত সমুদ্রের তীরে তুমি ইঁহার সহিত বিহার করিতে পারো।'

১। আধুনিক পশ্চিমদক্ষিণ মধ্যপ্রদেশ।
২। "আগমবৃদ্ধসেবী" (৪১)।
৩। শূরসেন আধুনিক মথুরা অঞ্চল।
৪। এই তিন শ্লোকে ব্রজে কৃষ্ণলীলার আভাষ আছে।
৫। অর্থাৎ বিষ্ণুকে।
৬। গন্ধর্বরাজের উপবন।

ইন্দুমতীর পছন্দ হইল না। তাহার পর নাগপুরের রাজা।[১] সুনন্দা বলিল, এই পাণ্ড্য রাজাকে বিবাহ করিলে তুমি দক্ষিণের রানী হইবে।

তাম্বূলবল্লীপরিণদ্ধপুগাস্বেলালতালিঙ্গিতচন্দনাসু।
তমালপত্রাস্তরণাসু রন্তুং প্রসীদ শশ্বন্ মলয়স্থলীষু।।

'তাম্বূললতা-বিজড়িত সুপারি গাছ এলালতালিঙ্গিত চন্দন গাছ যেখানে, সেই মলয়স্থলীতে বারোমাস তমালপত্রের শয্যায় আরাম করিতে চাও।।'

ইন্দীবরশ্যামতনুর্নৃপোঽসৌ ত্বং রোচনাগৌরশরীরযষ্টিঃ।
অন্যোন্যশোভাপরিবৃদ্ধয়ে বাং যোগস্তড়িত্তোয়দয়োরিবাস্তু।।

'ইঁহার নীলোৎপলের মতো কান্তি, তুমি উজ্জ্বল গৌরদেহ।
তড়িৎ আর মেঘের মতো তোমাদের যোগ পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করুক।।'

সুনন্দার কোন কথাই ইন্দুমতীর মনে ধরিল না। কুমারী একের পর এক রাজাকে ছাড়িয়া চলিল।

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ।।

'রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখার মতো পতিংবরা কুমারী যাহাকে যাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল সেই সেই রাজা রাজমার্গে অট্টালিকার মতো ম্লান হইল।।'

অজের পালা আসিলে তাহার আশঙ্কা হইল, যদি আমাকেও প্রত্যাখ্যান করে! কিন্তু তাহার কাছে আসিতেই ইন্দুমতীর পা যেন বসিয়া গেল। সুনন্দা অজের প্রশংসা করিল—তাহার স্তুতি করিয়া এবং তাহার পিতার কীর্তি গাহিয়া। সুনন্দা বলিল, এই কুমার পিতার অনুরূপ এবং রাজ্যভার পিতার সঙ্গে বহন করিতেছে। বংশে সৌন্দর্যে বয়সে গুণে ইনি তোমারই তুল্য। ইঁহাকে যদি বরণ কর তবে সোনার সঙ্গে মণির সংযোগ হয়।

'তাহার (সুনন্দার) কথা শেষ হইলে রাজকন্যা লজ্জা সংবরণ করিয়া প্রসন্ন অমল দৃষ্টি দিয়া যেন বরণমালা পরাইয়া কুমারকে স্বীকার করিল।।'

ইন্দুমতীর মুখে কথা সরিল না। প্রতিহাররক্ষী সখী সুনন্দা তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিল, 'রাজকন্যা, চল আগে হই।' কিছু না বলিয়া ইন্দুমতী তাহার দিকে অসূয়াকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার পর অজের গলা মালা পরাইয়া দিল।

তখন সকল লোকে বলিতে লাগিল, উপযুক্ত স্বয়ংবর হইয়াছে। কিন্তু এ কথা প্রত্যাখ্যাত রাজাদের কানে বিষ ঢালিতে লাগিল। এইখানে ৮৬ শ্লোকে, ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

বিচিত্র তোরণ ও ধ্বজা শোভিত রাজপথ দিয়া স্বয়ংবর-সভা হইতে বরবধূ রাজপ্রাসাদে শোভাযাত্রা করিয়া চলিল। পুরনারীরা দেখিবার জন্য গবাক্ষে অলিন্দে ভিড় জমাইল। এখানে কালিদাস এগার শ্লোকে পুরনারীদের বরবধূ-দর্শনের ঔৎসুক্য বর্ণনা করিয়াছেন। (কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়।) এ বর্ণনার সার কথা

তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো নার্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথা হি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা।।

'সে মেয়েরা রঘুপুত্রকে চোখ দিয়া যেন পান করিতে লাগিল। সে চোখ আর কোন দৃশ্যেই পড়িল না। যেন ইঁহাদের অন্য সব ইন্দ্রিয়ের কাজ সর্বসমেত চোখে মিলিত হইয়াছে।।'

১। "উরগাখ্যপুরস্য নাথং"। এ নাগপুর দাক্ষিণাত্যে।

মেয়েরা বলাবলি করিতে লাগিল।

পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং ন চেদিদং দ্বন্দ্বময়োজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজাণাং বিতথোঽভবিষ্যৎ।।

'কমনীয়শোভা এই যুগলকে যদি প্রজাপতি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত না করিতেন তবে এই দুইজনে যে তিনি যে পরিমাণ যত্ন করিয়া রূপ ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা বৃথা হইত।।'

বিবাহ-অনুষ্ঠানের পরেই অজ বধূকে লইয়া স্বদেশ অভিমুখে চলিলেন। প্রত্যাখ্যাত রাজারা পূর্ব হইতেই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যে অজকে আক্রমণ করিয়া ইন্দুমতীকে ছিনাইয়া লইবে।[১] যুদ্ধ হইল। অজের সঙ্গে যে সামান্য সৈন্য ছিল তাহাদের ইন্দুমতীর কাছে রাখিয়া অজ একেলা রাজাদের সঙ্গে লড়িতে লাগিবেন এবং অপারক হইয়া শেষে নিদালি বাণ[২] ছাড়িয়া বিরোধী দলকে নিদ্রাভিভূত করিয়া দিলেন।

শঙ্খস্বনাভিজ্ঞতয়া নিবৃত্তাস্তং সন্নশত্রুং দদৃশুঃ স্বযোধাঃ।
নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমাশশাঙ্কম্।।

'পরিচিত শঙ্খনিনাদ শুনিয়া (অজের) নিজ যোদ্ধারা রণস্থলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তিনি শত্রুদের অবসন্ন করিয়া দিয়া যেন নিমীলিত পদ্মফুলের রাশির মাঝে চাঁদের প্রতিবিম্বের মতো প্রদীপ্ত।।'

পুত্র-পুত্রবধূ ঘরে আসিলে পর রঘু সংসারভার তাহাদের উপর অর্পণ করিয়া শান্তিমার্গের জন্য উৎসুক হইলেন। এইখানে ৭১ শ্লোকে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অজ ও ইন্দুমতীর স্ত্রী-আচার অযোধ্যায় সম্পন্ন হইল। রঘু রাজ্যভার পুত্রের উপর আরও খানিকটা চাপাইলেন এবং অজকে রাজকার্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া কিছুকাল পরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। অজের কাতর প্রার্থনায় তিনি দূর বনে না গিয়া রাজধানীর নিকটেই আশ্রমবাসী হইলেন। সেখানে তিনি যোগীদের কাছে উপদেশ লইতে লাগিলেন। অবশেষে যোগ-সমাধিতে তাঁহার পরমাত্মদর্শন হইল। রঘু প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। অজ যথারীতি পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য করিলেন।[৩] তাহার পর অজ-ইন্দুমতীর পুত্র দশরথের জন্ম হইল।

একদিন অজ ও ইন্দমতী উপবনে বিহার করিতে গিয়াছেন। সেখানে দৈবক্রমে আকাশপথের যাত্রী নারদের বীণার মাথায় পরানো ফুলের মালাগাছি খসিয়া ইন্দুমতীর বুকে পড়িল। সেই আঘাতে ইন্দুমতীর প্রাণ বাহির হইল। এই অভাবিত আকস্মিক বিপৎপাতে পত্নীকে হারাইয়া অজ করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।[৪]

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।

'তোমার এই মুখের চারিদিকে কেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে মুখে কথা নাই, তাহা আমাকে ব্যথা দিতেছে।'

সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ।
অহমেকরসস্তথাপি তে ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ।।

'সখীরা তোমার দুঃখসুখের অংশভাগিনী। এই তোমার পুত্র যেন প্রতিপদের চাঁদ। আমার অখণ্ড প্রেয়। তবুও এই স্নেহনিষ্ঠুর জেদ তোমার!'

১। যেমন বৌদ্ধ কুশ-জাতকে।
২। "গান্ধর্বমস্ত্রং"।
৩। অষ্টম সর্গের ২৬ শ্লোকে রঘুর কাহিনী শেষ হইল। এই পর্যন্ত আসল "রঘুবংশ"।
৪। কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গে পতিহারা পত্নীর বিলাপ, রঘুবংশের অষ্টম সর্গে পত্নীহারা পতির বিলাপ।

ইন্দুমতীর সৎকার করিয়া অজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু তাঁহার শোক মিটিল না। তখন বশিষ্ঠ শিষ্যদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে ইন্দুমতী শাপভ্রষ্ট অপ্সরা ছিলেন, নারদের বীণাভ্রষ্ট মালার স্পর্শে তাঁহার শাপমোচন হইয়াছে।[১] সুতরাং অজের শোক ত্যাগ করা উচিত। বশিষ্ঠের প্রেরিত সান্ত্বনাবাণী অজকে শান্ত করিতে পারিল না। অশ্বত্থের চারা যেমন বড় হইয়া ছাদ ফাটাইয়া দেয় তেমনি ইন্দুমতীর শোক উপচিত হইয়া রাজার হৃদয় বিদীর্ণ করিল।[২] মনের কষ্টে আট বছর কাটাইয়া অজ গঙ্গাসরযূসঙ্গমে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে ইন্দুমতীর সহিত মিলিত হইলেন। এইখানে ৯৫ শ্লোকে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গে অজের পুত্র দশরথের কথা। মুনিশাপ-প্রাপ্তিতে এই সর্গ পরিসমাপ্ত। শ্লোকসংখ্যা ৮২। এই সর্গের প্রথম চুয়ান্ন শ্লোকের প্রত্যেকটির শেষ পদে কালিদাস শব্দের অথবা ধ্বনির যমক দিয়াছেন।[৩]

দশম সর্গে প্রথম ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি ঋত্বিগ্‌দের দ্বারা দশরথের "পুত্রীয়া ইষ্টি" এবং রাবণবধার্থে বিষ্ণুর কাছে দেবতাদের প্রার্থনা। বিষ্ণু সমুদ্রে শেষশয্যায় অধিষ্ঠিত।[৪] দেবতারা গিয়া তাঁহার স্তব করিলেন, সতেরো শ্লোকে। (কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে দেবতাদের ব্রহ্মা-স্তব এই সঙ্গে তুলনীয়।)

অজস্য গৃহ্ণতো জন্ম নিরীহস্য হতদ্বিষঃ।
স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদ কস্তব।।

'তুমি স্বয়ম্ভূ (অথচ অবতাররূপে) জন্মগ্রহণ কর। তুমি অচঞ্চল (তবুও) শত্রু বিনাশ কর। তুমি নিদ্রাগত (অথচ) জাগিয়া আছ। তুমি আসলে যে কী তাহা কে জানে?'

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে।।

'বহুবিধ আগমের দ্বারা নির্দেশিত সিদ্ধিলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ তোমাতেই আসিয়া মিলে, যেমন গঙ্গার স্রোতোধারা সমুদ্রে।।"

ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্মণাম্।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণামভূয়ঃসংনিবৃত্তয়ে।।[৫]

'তোমাতে যাহারা চিত্ত স্থাপিত করিয়াছে, তোমাকে যাহারা কর্মফল সমর্পণ করিয়াছে, সেই বৈরাগ্যাশ্রয়ীদের তুমিই গতি। সে গতিতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।।'

কেবলং স্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ।
অনেন বৃত্তয়ঃ শেষা নিবেদিতফলা ত্বয়ি।।

'যেহেতু স্মরণমাত্রেই তুমি পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র কব, (অতএব) ইহাতে তোমার বিষয়ে অন্য বৃত্তিগুলির ফল বিস্তারে বর্ণনীয়।।'

পুরাণস্য কবেস্তস্য বর্ণস্থানসমীরিতা।
বভূব কৃতসংস্কারা চরিতার্থৈব ভারতী।।

১। ভারতীয় সাহিত্যে আখ্যায়িকা-কাব্যে নায়ক-নায়িকার শাপভ্রষ্টতার এই প্রথম ইঙ্গিত।
২। "প্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ" (৯৪)।
৩। যেমন, "যমবতামবতাং চ ধুরি স্থিতঃ" (১), "ন ন মহীনমহীনপরাক্রমম্" (৫)।
৪। বিষ্ণুর বর্ণনা (৭-১৪) মূল্যবান্।
৫। এখানে গীতার প্রতিধ্বনি আছে।

'সেই পুরাতন কবির[১] বাণী উচ্চারণস্থান হইতে-নির্গত হইয়া যেন সংস্কারযুক্ত এবং চরিতার্থ হইল।।'

বিষ্ণু বলিলেন, আমি দশরথের পুত্র হইয়া রাবণকে বিনাশ করিব।

রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ।
অভিবৃষ্য মরুৎসস্যং কৃষ্ণমেঘস্তিরো দধে।।

'রাবণ-অনাবৃষ্টিক্লান্ত দেবতা-শস্যকে আশ্বাস-অমৃত সেচন করিয়া সেই কৃষ্ণমেঘ তিরোহিত হইলেন।[২]

দশরথের চার পুত্র জন্মিল এবং তাঁহারা বাড়িতে লাগিলেন। এইখানে ৮৬ শ্লোকে দশম সর্গ শেষ।

একাদশ সর্গে তাড়কাবধ হইতে পরশুরামের ধনুর্ভঙ্গ পর্যন্ত বর্ণিত। এই সর্গে শ্লোক সংখ্যা ৯৬। তাড়কার বর্ণনায় বিশেষত্ব আছে।

জ্যানিনাদমথ গৃহ্নতী তয়োঃ প্রাদুরাস বহুলক্ষপাছবিঃ
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী।।

'তাহাদের দুইজনেব ধনুকের টঙ্কার শুনিয়া তাড়কা প্রাদুর্ভূত হইল। বর্ণ তাহার ঘোর অন্ধকার রাত্রির মতো। কানে তাহার চঞ্চল নরাস্থিকুণ্ডল। যেন বলাকাযুক্ত নিবিড় ঘন কালো মেঘ।।'

দ্বাদশ সর্গে অভিষেক-উদ্যোগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধান্তে প্রত্যাগমন-উদ্যোগ পর্যন্ত বর্ণনা। শ্লোকসংখ্যা ১০৪।

নির্দিষ্ট বিষয়স্নেহঃ সহ দশান্তমুপেয়িবান্।
আসীদাসন্ননির্বাণঃ প্রদীপার্চিরিবোষসি।।
তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্নস্যতামিতি।
কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ পলিতছদ্মনা জরা।।

'স্নেহভোগের কালক্ষেত্র যাহার নির্দিষ্ট ("নির্দিষ্টবিষয়স্নেহঃ") এমন সাধারণ মানুষের মতো তিনি (দশরথ) জীবন প্রান্তে উপনীত হইলেন, যেন ঊষায় আসন্ন নির্বাণ প্রদীপশিখা।।'

'পক্ককেশচ্ছলে জরা আসিয়া যেন কৈকেয়ীর আশঙ্কায় তাঁহার কানের গোড়ায় বলিয়া দিল, "রামকে রাজ্য দাও"।।'

সীতাকে লইয়া বিমানে চড়িয়া রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। যে পথ তিনি বহু দুঃখে অতিক্রম করিয়াছিলেন, যে যে স্থানে দুঃখে-সুখে কাটাইয়াছিলেন আর যে যে স্থান তাঁহারা নূতন দেখিতেছেন সেই সেই পথের ও স্থানের পরিচয় রামকে সীতাকে দিয়া চলিয়াছেন। (এই বর্ণনার সঙ্গে মেঘদূতে মেঘের গতিপথ জুড়িয়া দিলে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের টানা ভৌগোলিক বর্ণনা হয়।)

প্রথম তেরো শ্লোকে (২-১৪) সমুদ্রের বর্ণনা।

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্‌বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্।।

'হে বিদেহরাজকন্যা, আমার সেতুর ধারা বিভক্ত মলয় পর্যন্ত ফেনিল জলরাশি দেখ। ও যেন ছায়াপথের দ্বারা বিভক্ত, তারার ফুল-ফোটানো, শরতের প্রসন্ন আকাশ।।'

সমুদ্রের প্রান্তে আসিয়া দূর হইতে তীরভূমির দৃশ্য।

১। অর্থাৎ ব্রহ্মার।
২। এই শ্লোকে কিছু শ্লেষ আছে। "অমৃত" মানে জলও হয়। "কৃষ্ণ" বিষ্ণুর নামান্তর।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বি তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।।

'দূর হইতে, হে তন্বী, তমালতালীবনরাজিনীল বেলাভূমিবলয় যেন লোহার চাকার মতো সমুদ্রের প্রান্তে লাগা কলঙ্করেখার মতো দেখাইতেছে।।'

কুরুষ্ব তাবৎ করভোরু পশ্চান্মার্গে মৃগপ্রেক্ষিণি দৃষ্টিপাতম্।
এষা বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ সকাননা নিষ্পততীব ভূমিঃ।।

'হে সুবলিত-উরু মৃগনয়নী, তুমি পিছন পথে দৃষ্টিপাত কর।
দূরে সরিয়া যাওয়া সমুদ্র হইতে যেন এই ভূমি ছুটিয়া বাহির হইতেছে।।'

রাম সীতাকে পরিচিত ভূখণ্ডগুলি চিনাইয়া দিতে দিতে চলিয়াছেন। এই জনস্থানের শান্ত আশ্রমপদ। ওইখানটিতে আমি তোমার একগাছি নূপুর কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। এই দেখ মাল্যবান্ পর্বতের অভ্রংলিহ শৃঙ্গ, ওখানে আমি তোমার বিরহে অনেক চোখের জল ফেলিয়াছি। ওই দেখ কেয়াবনের মধ্য দিয়া পম্পা হ্রদের জল ঝলক দিতেছে। ওই যে আকাশে বলাকাবলি চলিয়াছে, উহারা গোদাবরীতে বিচরণ করে। এই দেখ, পঞ্চবটী বন। মৃগেরা মুখ তুলিয়া রহিয়াছে। অনেককাল পরে ইহাদের দেখিয়া আমার বড় ভালো লাগিতেছে।

অত্রানুগোদং মৃগয়ানিবৃত্তস্তরঙ্গবাতেন বিনীতখেদঃ।
রহস্তদুৎসঙ্গনিষণ্ণমূর্ধা স্মরামি বানীরগৃহেষু সুপ্তঃ।।

'ওইখানে গোদাবরীর তীরে মৃগয়া করিয়া ফিরিয়া আসিয়া নদীশীকরে ক্লান্তি বিনোদন করিতে করিতে কেতকীকুঞ্জে নির্জনে তোমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইতাম।—মনে পড়িতেছে।।

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা সরিদ্ বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে মুক্তালতা কণ্ঠগতেব ভূমেঃ।।'

'ওই প্রসন্নসলিল নিঃস্পন্দপ্রবাহ, দূর হইতে কৃশকায় বলিয়া বোধ হইতেছে, ও মন্দাকিনী। পর্বতের গায়ে দেখাইতেছে যেন পৃথিবীর গলায় লাগানো মুক্তাছড়া।''

ওই দেখ সেই শ্যাম বটবৃক্ষ, যাহার কাছে তুমি প্রার্থনা জানাইয়াছিলে। ওই দেখ গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম।[১] এই দেখ সরযূ।

যাং সৈকতোৎসঙ্গসুখোচিতানাং প্রাজ্যৈঃ পয়োভিঃ পরিবর্ধিতানাম্।
সামান্যধাত্রীমিব মানসং মে সংভাবয়ত্যুত্তরকোশলানাম্।।

'যাহার সৈকতক্রোড়ে সুখে বসিয়া প্রচুর স্নিগ্ধ পানীয়ে উত্তরকোশলের লোকেরা সংবর্ধিত, সেই সকলের ধাত্রীরূপে (সরযূ) আমার মন টানিতেছে।।'

সেয়ং মদীয়া জননীব তেন মান্যেন রাজ্ঞা সরযূর্বিযুক্তা।
দূরে বসন্তং শিশিরানিলৈর্মাং তরঙ্গহস্তৈরুপগূহতীব।।

'ও যেন আমার মায়ের মতো। মাননীয় রাজার[২] বিয়োগিনী হইয়া দূরপ্রবাসী আমাকে তরঙ্গবাহুর শীতল বায়ুর দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতেছে।।'

ওই দেখ পিছনে বাহিনী লইয়া চীরবাস পরিহিত ভরত বৃদ্ধ অমাত্যদের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছে (৬৬)।

বিমান অযোধ্যায় পৌঁছিল। রাম হনুমানের হাত ধরিয়া স্ফটিকের সিঁড়ি বাহিয়া মাটিতে নামিলেন। বিভীষণ তাহার আগে আগে চলিল। ভ্রাতা ও অমাত্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া

১। চার শ্লোকে প্রয়াগসঙ্গমের বর্ণনা (৫৪-৫৭)।
২। অর্থাৎ দশরথের।

রাম পুষ্পক-রথে চড়িয়া প্রজাগণের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া অযোধ্যায় আধ ক্রোশ দূরে উপবণে শত্রুঘ্নের ব্যবস্থায় নির্মিত পটভবনে প্রবেশ করিলেন। এইখানে ৭৯ শ্লোকে ত্রয়োদশ সর্গ শেষ।

চতুর্দশ সর্গের প্রারম্ভে কৌশল্যা-সুমিত্রার সহিত রামলক্ষ্মণের মিলন। সীতা শাশুড়ীদের প্রণাম করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন, 'আমি স্বামীর ক্লেশদায়িনী অলক্ষণা সীতা।' তাঁহারা আদর করিয়া বলিলেন, 'না না, তোমার পবিত্র চরিত্রগুণেই দুই ভাই বিষম বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে।'

তাহার পর অভিষেক হইয়া গেল। রাম মহাসমারোহে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

> শ্বশ্রূজনানুষ্ঠীতচারুবেষাং কর্ণীরথস্থাং রঘুবীরপত্নীম্।
> প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবন্ধৈঃ সাকেতনার্যোঽঞ্জলিভিঃ প্রণেমুঃ।।

'শাশুড়ীস্থানীয় নারীদের দ্বারা রঘুবীর-পত্নীর প্রসাধন হইল। তিনি দোলায় চড়িলেন। অযোধ্যায় পুরনারীর প্রাসাদবাতায়নের ফাঁক দিয়া তাঁহাকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিল।।"

তাহার পর রাম সজলনেত্রে পিতার মহলে প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, 'মা, তোমারই পুণ্যে আমার পিতা সত্য হইতে ভ্রষ্ট এবং স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হন নাই',—বলিয়া ভরতের মাতার লজ্জা দূর করিলেন।

কিছুকাল রাম সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। রাজকার্যের অবসানে তিনি সীতাকে লইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন এবং অতীত দুঃখসুখের কথা তুলিয়া নূতন সুখ পান।

> তয়োর্যথাপ্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থানাসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
> প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্।।

'তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখভোগ আয়ত্ত করিয়া, ভিত্তিচিত্রময় ঘরে[১] বসিয়া দণ্ডক প্রভৃতি অরণ্যে অনুভূত বহু দুঃখ (এখন) পর্যালোচনা করিতে করিতে সুখ বলিয়া অনুভব করিলেন।।'

সীতার শরীরে গর্ভধারণের লক্ষণ আবির্ভূত দেখিয়া রাম অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি সীতার মনের সাধ জানিতে চাহিলেন।

> সা দষ্টনীবারবলীনি হিংস্রৈঃ সংনদ্ধবৈখানসকন্যকানি।
> ইয়েষ ভূয়ঃ কুশবন্তি গন্তুং ভাগীরথীতীরতপোবনানি।।

'যেখানে (মাংসভোজী) হিংস্র পশুরা নীবারবলি খাইয়া থাকে, যেখানে বৈখানস-মুনিকন্যারা জটলা করে, যেখানে প্রচুর কুশ আছে, সেই ভাগীরথীতীরে তপোবনে আবার যাইতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।"

রাম রাজি হইলেন।

একদিন রাম নগরীর অবস্থা অবলোকন করিতে পার্শ্বচরকে লইয়া তুঙ্গ প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন।

> ঋদ্ধাপণং রাজপথং স পশ্যন্ বিগাহ্যমানাং সরযূং চ নৌভিঃ।
> বিলাসিভিশ্চাধ্যুষিতানি পৌরৈঃ পুরোপকণ্ঠোপবানানি রেমে।।

'রাজপথে সমৃদ্ধ বিপণি। নৌকায় সরযূ আস্তীর্ণ। নগরোপকণ্ঠে উপবনগুলি বিলাসী পুরবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত।—দেখিয়া (রাম) আনন্দিত হইলেন।।'

১। যেমন অজন্তাগুহায়।

পার্শ্বচরকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাম জানিলেন যে প্রজারা তাঁহার অনুরক্ত। তবে কেহ কেহ সীতাকে গ্রহণ করা অনুমোদন করে না; শুনিয়া রামের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইল। তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি নির্জনে লক্ষ্মণকে বলিলেন

পৌরেষু সোঽহং বহুলীভবন্তমপাং তরঙ্গেষ্বিব তৈলবিন্দুম্।
সোঢুং ন তৎপূর্ববর্ণমীশে আলানিকং স্থাণুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ।।

'জলের স্রোতে তৈলবিন্দুর মতো, পুরবাসীদের মধ্যে প্রসাবিত হইতেছে যে সেই পূর্ব অপবাদ সেই আমি সহিতে পারিতেছি না, যেমন বলবান্ হস্তী শৃঙ্খলস্তম্ভ (সহ্য করিতে পারে না)।।'

অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে।
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ।।[১]

'আমি জানি (সীতা) নিষ্পাপ। কিন্তু আমি লোকাপবাদকে বলবান্ মনে করি। সাধারণ লোকে পৃথিবীর ছায়াকে বিশুদ্ধ[২] চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া আরোপ করে (এবং সেই ভুল বিশ্বাসের উপর সংসার চলে)।।'

লক্ষ্মণের উপর রাম ভার দিলেন ভাগীরথী-তীর্থে বাল্মীকির আশ্রমপদে সীতাকে নির্বাসন দিয়া আসিতে। ব্যথিতহৃদয়ে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালন করিলেন। তাঁহার কাছে "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া"। বাল্মীকির আশ্রম দেখিবার অছিলা করিয়া গঙ্গাপার হইলেন। তাহার পর রাজার আদেশ শুনাইলেন। সীতার বোধ হইল যেন অকস্মাৎ বিনামেঘে শিলাবৃষ্টির উৎপাত।[৩] সীতা তখনি মূর্ছিত হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে সুস্থ করিলে পর সীতা বলিতে লাগিলেন।[৪] তিনি রামের দোষ একটুও দিলেন না, কেবল "আত্মানমেব স্থিরদুঃখভাজং পুনঃ পুনর্দুষ্কৃতিনং নিনিন্দ" ('অবিচল দুঃভাগিনী ও পাপভাগিনী নিজেকেই পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিলেন')।

সীতা বলিলেন, 'শাশুড়ীদের আমার প্রণাম জানাইয়া সকলকে একে একে বলিও যে আমার দেহে সন্তানবীজ রহিয়াছে। তাঁহারা মনে মনে সেই সন্তানের মঙ্গলচিন্তা করুন।'

বাচ্যস্ত্বয়া মদ্‌বচনাৎ স রাজা বহ্নৌ বিশুদ্ধমপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য।।

'আমার কথায় সেই রাজাকে বলিও, চোখের সামনে অগ্নিতে বিশুদ্ধ দেখিয়াও আমাকে যে লোকের কথায় ত্যাগ করিলে ইহা কি (তোমার) বিখ্যাত বংশের উপযুক্ত হইল?'

আমার এই হতভাগ্য দেহ আমি ত্যাগ করিতাম যদি তোমার সন্তান তোমার সন্তানবীজ আমার দেহে রহিয়া অন্তরায় সৃষ্টি না করিত। সন্তান প্রসব হইলে পর আমি সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তপস্যা করিব যাহাতে পরজন্মে তোমাকেই পাই এবং আর বিয়োগ না হয়।[৫]

নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ স এবং ধর্মো মনুনা প্রণীতঃ।
নির্বাসিতাপ্যেবমতস্ত্বয়াহং তপস্বিসামান্যমবেক্ষণায়া।।

১। শ্লোকে কালিদাসের বিজ্ঞান-জ্ঞানের পরিচয় পাই।
২। অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক।
৩। "ঔৎপাতিকং মেঘ ইবাশ্মবর্ষং" (৬৩)।
৪। শ্লোক ৬০-৬৭।
৫। শ্লোক ৬৬। কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গে উমার তপস্যা স্মরণীয়।

'রাজার বর্ণাশ্রমপালন ধর্ম মনু বিধান করিয়া গিয়াছেন। (সুতরাং এমনভাবে নির্বাসন দিলেও আমাকে তুমি সাধারণ আশ্রমবাসিনীর মতো অবশ্য দেখিবে।।'

লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে সীতার অশ্রু বাধা মানিল না। আহার বিলাপে বনের পশুপাখী গাছপালা স্তব্ধ হইয়া রহিল।

তমভ্যগচ্ছদ্ রুদিতানুসারী কবিঃ কুশেধ্মাহরণায় যাতঃ।
নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ।।

'সেই ক্রন্দনধ্বনি অনুসরণ করিয়া আসিলেন কুশ ও ইন্ধন অন্বেষণে বহির্গত সেই কবি, নিষাদ কর্তৃক নিহত পক্ষী দেখিয়া যাঁহার শোক শ্লোক হইয়াছিল।।'

সীতাকে সান্ত্বনা দিয়া বাল্মীকি বলিলেন, আমি জানি তোমার স্বামী মিথ্যা অপবাদে তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন।

তন্মা ব্যথিষ্টা বিষয়ান্তরস্থং প্রাপ্তাসি বৈদেহি পিতুর্নিকেতম্।।

'কিন্তু তুমি কাতর হইও না। (মনে কর) তুমি দেশান্তরে বাপের বাড়িতেই পৌঁছিয়াছ।।'

তবোরুকীর্তিঃ শ্বশুরঃ সখা মে সতাং ভবচ্ছেদকরঃ পিতা তে।
ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাং কিং তন্ন যেনাসি মমানুকম্প্যা।।

'তোমার কীর্তিমান শ্বশুর আমার সখা (ছিলেন)। সৎব্যক্তির মুক্তিদাতা (গুরু) তোমার পিতা (তিনিও আমার সখা)। তুমি পতিব্রতাদের শিরোমণি। আর কি চাই, যাহাতে তোমার উপর আমার অনুকম্পা হয়।।'

নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিয়া বাল্মীকি সীতাকে তমসাতীরে আশ্রমে লইয়া গেলেন। তখন আশ্রমে সন্ধ্যা নামিয়াছে।

সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া রাম আর বিবাহ না করিয়া তাঁহারই হিরণ্ময়ী মূর্তি বামে রাখিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন,—এই বৃত্তান্ত কানাকানিতে সীতা শুনিলেন। তাহাতে তাঁহার বিরহদুঃখ কিছু কমিল। এইখানে, ৮৭ শ্লোকে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

বাকি রামকথাটুকু পঞ্চদশ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। রাবণের ভাগিনেয় লবণকে বধ করিয়া শত্রুঘ্ন যমুনার ধারে মথুরাপুরী প্রতিষ্ঠা করিলেন। মথুরাপুরীতে যেন স্বর্গপুরীর উদ্বৃত্ত ঐশ্বর্য।

এদিকে সীতা দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহাদের নাম দিলেন কুশ ও লব, যেহেতু কুশ ও লব[১] দিয়া নবজাতকদ্বয়ের গর্ভক্লেদ দূর করা হইয়াছিল।

সাঙ্গং চ বেদমধ্যাপ্য কিঞ্চিদুৎক্রান্তশৈশবৌ।
স্বকৃতিং গাপয়ামাস কবিপ্রথমপদ্ধতিম্।।

'শৈশবকাল কিঞ্চিৎ অতিক্রান্ত হইলে দুইজনকে (বাল্মীকি) অঙ্গ[২] সমেত বেদ অধ্যয়ন করাইয়া নিজের রচিত, কবিকর্মের প্রথম ফল (অর্থাৎ রামায়ণ) গান করাইলেন।।''

অপর তিন ভাইয়েরও দুইটি দুইটি করিয়া পুত্র হইল। শত্রুঘ্নের দুই পুত্র শত্রুঘাতী ও সুবাহু। তাহাদের যথাক্রমে মথুরার ও বিদিশার অধিপতি করিয়া দিয়া শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর শম্বুক-বধ। তাহার পর অশ্বমেধ। সেই উপলক্ষ্যে কুশ ও লব বাল্মীকির সঙ্গে আসিয়া রামায়ণ গাহিল। তাহাদের গানের ও অভিনয়ের মাধুর্যে চার ভাই ও আর আর সকলে মুগ্ধ হইল।

১। অর্থাৎ গোপুচ্ছলোম।

২। বেদের আনুষঙ্গিক ছয়টি বিদ্যা—শিক্ষা (phonetics), কল্প (যজ্ঞকার্য), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (etymology), ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।

তদ্‌গীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রুমুখী বভৌ।
হিমনিঃষ্যন্দিনী প্রাতর্নির্বাতেব বনস্থলী।।

'সেই গীত শ্রবণে তন্ময় সমবেত জনমণ্ডলীর চোখে জল আসিল, দেখাইল যেন প্রভাতে স্তব্ধ বনস্থলী শিশির ঝরাইতেছে।।'

রাম ছেলে দুইটির পরিচয় জানিতে চাহিলে বাল্মীকি পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং সীতাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাম বলিলেন, 'সীতা যদি নিজের চরিত্রের বিশুদ্ধতায় প্রত্যয় জন্মাইতে পারে তবেই তাহাকে গ্রহণ করিব।' মুনি শিষ্যদের দিয়া সীতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তাহার পর একদিন সীতা ও কুশ-লবকে লইয়া বাল্মীকি রামের সভায় হাজির হইলেন।

স্বরসংস্কারবত্যাসৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া
ঋচেবোদর্চিষং সূর্যং রামং মুনিরুপস্থিতঃ।

'পুত্রদ্বয় ও সীতা সহ মুনি স্বরসংস্কারযুক্ত[1] ঋক্[2] যেমন, জ্বলন্ত সূর্যের মতো দীপ্যমান রামের কাছে উপস্থিত হইলেন।।'

কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা।
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা।।

'কাষায় বস্ত্র পরিয়া, নিজের পায়ের দিকে চোখ রাখিয়া (সীতা আসিলেন)। তাঁহার শান্ত বপুতেই অনুমান করা গেল যে তিনি পবিত্র।।'

জনাস্তদালোকপথাৎ প্রতিসংহৃতচক্ষুষঃ।
তস্থুস্তেঽবাঙ্‌মুখাঃ সর্বে ফলিতা ইব শালয়ঃ।।

'সীতার দৃষ্টিপথ হইতে চোখ সরাইয়া লোক সব মুখ হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যেন ফলভরে আনত ধান গাছ।।'

তাহার পর সীতার পাতালপ্রবেশ। সীতাকে শেষবারের মতো হারাইয়া রাম পুত্রদ্বয়ের স্নেহে আত্মসংবরণ করিলেন।

তাহার পর ভরতের বীরকর্ম। ভরতের মাতুল যুধাজিতের কথামতো রাম ভরতকে সিন্ধুদেশ শাসন করিতে দিলেন। ভরত সেখানে গিয়া গন্ধর্বদের[3] দমন করিলেন এবং অস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাহাদের বাদ্যযন্ত্র ধরাইলেন তাহার পর দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে দুই রাজধানীতে[4] স্থাপন করিয়া রামের কাছে ফিরিয়া আসিলেন।

রামের আজ্ঞায় লক্ষ্মণ নিজ দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারাপথের অধিকারী করিয়া দিলেন।

তাহার পর লক্ষ্মণবর্জন। লক্ষ্মণ যোগবলে সরযূনীরে প্রাণবিসর্জন করিলেন। ধর্মপালনে রামের শৈথিল্য আসিল। কুশকে কুশাবতীতে ও লবকে শরাবতীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দুই ভাই অযোধ্যার সব লোক লইয়া অগ্নি পুরঃসর করিয়া রাম সরযূর জলে প্রবেশ করিলেন।

এইখানে, ১০৩ শ্লোকে পঞ্চদশ সর্গ এবং রামকথা সমাপ্ত।

১। অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই তিন স্বর (accent) যুক্ত।
২। অর্থাৎ বেদমন্ত্র।
৩। "গন্ধর্ব" সম্ভবত এখানে গান্ধারদেশীয় (বৈদিক "গন্ধারীণাম্") বুঝাইতেছে।
৪। তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী।

ষোড়শ সর্গে কুশের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও রাজ্যশাসন বর্ণিত। প্রথমে পরিত্যক্ত অযোধ্যা-নগরীর অত্যন্ত বাস্তব বর্ণনা। কালিদাস অবশ্যই কোন প্রাচীন পুরাকীর্তির ও নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া এই অংশ লিখিয়াছিলেন। এ অংশটুকুকে[১] কালিদাসের সময়ের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট বলিতে পারি।

রামের তিরোধানের পর রঘুবংশ আট শাখায় প্রসারিত হইল। কালিদাস প্রধান শাখা কুশের বংশই অনুসরণ করিয়াছেন।

কুশ আছেন কুশাবতীতে।

অথার্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেষামদৃষ্টপূর্বাং বনিতামপশ্যৎ।।

'একদা নিশীথে, সকলে ঘুমাইয়াছে। শয্যাগৃহে প্রদীপ অচঞ্চল। (হঠাৎ) জাগিয়া উঠিয়া কুশ প্রোষিতভর্তৃকার মতো বেশধারিণী এক অদেখা নারীকে দেখিল।।'

অথানপোঢ়ার্গলমপ্যগারং ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্।
সবিস্ময়ো দাশরথেস্তনূজঃ প্রোবাচ পূর্বাধবিসৃষ্টতল্পঃ।।

'ঘরের খিল খোলা নয়। যেন আরশিতে প্রতিবিম্বের মতো প্রবিষ্ট (নারীকে দেখিয়া) দশরথের পৌত্র বিস্মিত হইয়া শয্যা হইতে শরীরের ঊর্ধ্বভাগ তুলিয়া বলিল।।'

কুশ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নারী উত্তর দিল, 'আমি এখন অনাথিনী অযোধ্যার অধিদেবতা।[২] সূর্যবংশের উপযুক্ত বংশধর তুমি থাকিতে আমার এই অবস্থা!' এই বলিয়া নগরদেবতা জনশূন্য ভগ্ন নগরীর বর্ণনা দিল।

বিশীর্ণতল্পাট্টশতো নিবেশঃ পর্যস্তশালঃ প্রভুণা বিনা মে।
বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নসূর্যং দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্।।

'আমার প্রভুব অনুপস্থিতিতে শত শত ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সভাগৃহ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। (সে বিশীর্ণ ঐশ্বর্য) যেন দিনান্তে জোর বাতাসে ছিন্নভিন্ন মেঘে সূর্যাস্তের ভ্রম জন্মাইতেছে।।'

সোপানমার্গেষু চ যেষু রামা নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যোহতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে।।

'যে সিঁড়ির উপর দিয়া সুন্দরীরা আলতা-পরা পা ফেলিত, (এখন) আমার (সেখানে) সদ্য মৃগ বধ করিয়া আসিয়া বাঘ রক্তমাখা থাবা রাখিয়া যায়।।'

স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিমায়তনানামুৎক্রান্তবর্ণক্রমধূসরাণাম্।
স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি সঙ্গান্নির্মোকপট্টাঃ ফণিভির্বিমুক্তাঃ।।

'স্তম্ভে যে সব নারীমূর্তি অঙ্কিত আছে, বিভিন্ন রঙের জলুষ ঝরিয়া গিয়া সেগুলি ধূসর হইয়া গিয়াছে। সাপের পরিত্যক্ত খোলস লাগিয়া থাকায় যেন তাহাদের স্তনাবরণ উত্তরীয় হইয়াছে।।'

কালান্তরশ্যামসুধেষু নক্তমিতস্ততো রূঢ়তৃণাঙ্কুরেষু।
ত এব মুক্তাগুণশুদ্ধয়োঽপি হর্ম্যেষু মূর্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ।।

১। শ্লোক ১১-২১।

২। গ্রামদেবীর স্বপ্ন দেওয়া মধ্যকালের বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত নয়। এখানে তাহার প্রথম ইঙ্গিত ভারতীয় সাহিত্যে।

'কালব্যবধানে চুনকাম মলিন হইয়া গিয়াছে। এদিকে ওদিকে তৃণাঙ্কুর উঠিয়াছে। মুক্তাচূর্ণপ্রলিপ্ত হইলেও[১] সে সব হর্ম্যে রাত্রিতে চন্দ্রকিরণ (আর) প্রতিফলিত হয় না।।'

অযোধ্যার দুরবস্থা শুনিয়া কুশ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে স্বীকার করিলেন এবং কুশাবতীকে "শ্রোত্রিয়সাৎ' করিয়া[২] সৈন্যসামন্ত লইয়া অযোধ্যার অভিমুখে চলিলেন। নয় শ্লোকে (২৬-৩৪) কুশের রাজধানী-প্রয়াণ বর্ণনা। পথে পড়িল বিন্ধ্যপর্বতমালা। সেখানে "পুলিন্দ" অর্থাৎ আদিবাসীরা নানা উপহার আনিয়া দিল। তাহা দেখিয়া কুশ প্রীত হইলেন। গজসেতু বাঁধিয়া কুশ সসৈন্য গঙ্গা পার হইলেন। অনতিবিলম্বে

আধূয় শাখঃ কুসুমদ্রুমাণাং স্পৃষ্ট্বা চ শীতান্ সরযূতরঙ্গান্!
তং ক্লান্তসৈন্যং কুলরাজধান্যাঃ প্রত্যুজ্জগামোপবনান্তবায়ুঃ।।

'ফুলগাছের ডাল দুলাইয়া, শীতল সরযূতরঙ্গ ছুঁইয়া, কুলরাজধানীর বায়ু উপবনান্ত হইতে যেন কুশ ও তাঁহার ক্লান্ত বাহিনীকে অভ্যর্থনা করতে আগাইয়া আসিল।।'

অযোধ্যার উপকণ্ঠে আসিয়া কুশ শিবির নিবেশ করিলেন। তাহার পর

তাং শিল্পিসংঘাঃ প্রভূণা নিযুক্তাস্তথাগতাং সংভৃতসাধনত্বাৎ।
পুরং নবীচক্রুরপাং বিসর্গান্মেঘা নিদাঘগ্লাপিতামিবোর্বীম্।।

'প্রভুর[৩] নিযুক্ত শিল্পিসংঘ, জিনিসপত্রের জোগাড় ছিল বলিয়া, সেই দশাপাওয়া নগরীকে নূতন করিয়া তুলিল, যেমন (করে) মেঘ গ্রীষ্মদগ্ধ পৃথিবীকে জল ঢালিয়া।।'

অযোধ্যার পুনর্গঠন সম্পন্ন হইলে পর কুশ নগরদেবীর[৪] পূজা দেওয়াইলেন।

ততঃ সপর্যাং সপশূপহারাং পুরঃ পরার্ধ্যপ্রতিমাগৃহায়াঃ।
উপোষিতৈর্বাস্তুবিধানবিদ্‌ভির্নির্বর্তয়ামাস রঘুপ্রবীরঃ।।

'তাহার পর বিশাল প্রতিমা-গৃহযুক্ত নগরীর (অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার) পশু-উপহার সমেত পূজা, উপবাসে-থাকা বাস্তুবিধানজ্ঞদের দ্বারা রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ বীর (কুশ) দেওয়াইলেন।।"

অল্পকালেই অযোধ্যা-নগরী জমজমাট হইল। তাহার পর আসিল গ্রীষ্মকাল।

অথাস্য রত্নগ্রথিতোত্তরীয়মেকান্তপাণ্ডুস্তনলম্বিহারম্।
নিঃশ্বাসহার্যাংশুকমাজগাম ঘর্মঃ প্রিয়াবেশমিবোপদেষ্টুম্।।

'রত্নখচিত[৫] উত্তরীয়, অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ স্তনের উপরে দোলানো হার, নিঃশ্বাসভরে খসিয়া পড়ে এমন বসন,—এখন তাঁহার কাছে প্রিয়ার আবেশ নির্দেশ করিতে গ্রীষ্ম আসিয়া উপস্থিত হইল।।'

এখানে কালিদাস দশ শ্লোকে (৪৪-৫৩) গ্রীষ্ম বর্ণনা করিয়াছেন।[৬] কুশের জলক্রীড়ায় মন গেল। সরযূর বাঁধা-ঘাট নক্রশূন্য করাইয়া কুশ নৌবিহারে ও জলকেলিতে নামিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন তীরে উঠিলেন তখন দেখা গেল যে রাম কুশকে যে জয়মণি দিয়াছিলেন

১। অর্থাৎ পঙ্কের পালিশ থাকিলেও।
২। অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া।
৩। অর্থাৎ রাজা কুশের।
৪। ইনিই কুশকে দেখা দিয়াছিলেন। অযোধ্যায় ইঁহার মন্দির ও প্রতিমা ছিল।
৫। অর্থাৎ জরির কাজ করা।
৬। এখানে ঋতুসংহারের বর্ণনা তুলনীয়।

তাহা অজানিতে কখন জলে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ডুবুরি দিয়া নদীতল তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা হইল কিন্তু জয়মণি পাওয়া গেল না। ডুবুরিরা বলিল, রত্নলোভী নাগেরা লইয়া থাকিবে। কুশ নাগলোক আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ভয় পাইয়া নাগরাজ একটি মেয়েকে লইয়া তাঁহার কাছে আবির্ভূত হইয়া বলিল, 'এই আমার ভগিনী, সরযূর জলে খেলা করিতে গিয়া মণিটি পাইয়াছিল। আপনি মণি গ্রহণ করুন এবং অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অবিবাহিত ভগিনীটিকেও স্বীকার করুন।' কুশ খুশি হইয়া নাগরাজের ভগিনী কুমুদ্বতীকে বিবাহ করিলেন। কুশ ও নাগরাজের মধ্যে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইবাব পর দুইজনেই সুখে রাজ্য করিতে থাকিলেন। এইখানে, ৮৮ শ্লোকে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

কুমুদ্বতীর গর্ভে কুশের পুত্র জন্মিল, নাম হইল অতিথি। পিতৃকুলের গুণের ও মাতৃকুলের সৌন্দর্যের অধিকারী হইয়া অতিথি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর কয়েকটি রাজকন্যার সহিত বিবাহ হইল। দৈত্যের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের সহায় হইয়া কুশ যুদ্ধ করিতে গেলেন এবং দৈত্যকে বধ করিয়া নিজেও নিহত হইলেন। কুমুদ্বতী অনুমৃতা হইল। তাঁহারা স্বর্গে গিয়া ইন্দ্র ও শচীর সিংহাসনে অর্ধেক স্থান পাইলেন।

সপ্তদশ সর্গে নীতিজ্ঞ রাজা অতিথির কথা। মন্ত্রিবৃদ্ধেরা মহাসমারোহে অতিথিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল।[১] প্রথমে জ্ঞাতিবৃদ্ধেরা বরণ করিলেন। তাহার পর পুরোহিতেরা জয়শীল অথর্ব-মন্ত্র পাঠ করিয়া অভিষেক করিলেন। বন্দীরা স্তব গাহিতে লাগিল। অভিষেকের দিনে অতিথির আদেশে মানুষ পশু পাখী—সকল বন্দী জীবের বন্ধনমোচন হইল।

বন্ধচ্ছেদং স বদ্ধানাং বধার্হাণমবধ্যতাম্।
ধূর্ষাণাং চ ধুরো মোক্ষমদোহং চাদিশদ্ গবাম্।।

'যাহারা বন্দী তাহাদের বন্ধনদশা, যাহারা বধযোগ্য তাহাদের অবধ্যতা, যাহারা ভারবাহী তাহাদের ভারবহন হইতে মুক্তি এবং গাভীদের দোহনবিরতি,—(তিনি) আদেশ করিলেন।।"

ক্রীড়াপতত্রিণোঽপ্যস্য পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ।
লব্ধমোক্ষাস্তদাদেশাদ্ যথেষ্টগতয়োঽভবন্।।

"পিঞ্জরস্থিত শুক প্রভৃতি তাঁহার ক্রীড়াপক্ষীরাও তাঁহার আদেশে মুক্তি পাইয়া যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া গেল।।'

অযোধ্যাদেবতাশ্চৈনং প্রশস্তায়তনার্চিতাঃ।
অনুদধ্যুরনুধ্যেয়ং সান্নিধ্যৈঃ প্রতিমাগতৈঃ।।

'প্রশস্ত মন্দিরে অর্চিত অযোধ্যার দেবতারাও প্রতিমাগত সান্নিধ্যের দ্বারা অনুগ্রহ যোগ্য তাঁহাকে অনুগ্রহ করলেন।।

দিনে দিনে প্রজাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়া অল্পবয়সেই অতিথি রাজ্যপালনে নিরতিশয় দক্ষতার পরিচয় দিলেন।[২]

অক্ষোভ্যঃ স নবোহপ্যাসীদ্ দৃঢ়মূল ইব দ্রুমঃ।।
'তিনি নবীন হইলে দৃঢ়মূল দ্রুমের ন্যায় অনড় হইয়াছিলেন।।'

কাতর্যং কেবলা নীতিঃ শৌর্যং শ্বাপদচেষ্টিতম্।
অতঃ সিদ্ধিং সমেতাভ্যামুভাভ্যামন্বিয়েষ সঃ।।

১। একুশ শ্লোকে (৯-২০) অতিথির রাজ্যাভিষেক ও সভারোহণ বর্ণনা।
২। বাইশ শ্লোকে (৪৭-৬৮) অতিথির রাজনীতিজ্ঞতার বিবরণ।

'শুধু নীতি ভীরুতার পরিচায়ক, শুধু শৌর্য হিংস্রজন্তুর আচরণ।
অতএব উভয়ের সহযোগে তিনি সিদ্ধি খুঁজিয়াছিলেন।।'

এবমুদ্যন্ প্রভাবেণ শাস্ত্রনির্দিষ্টবর্ত্মনা।
বৃষেব দেবো দেবানাং রাজ্ঞাং রাজা বভূব সঃ।।

'এইরূপে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে উদ্যম করিয়া শক্তিবলে
ইন্দ্র যেমন দেবতার দেবতা তেমনি তিনি রাজা হইলেন।।'

অতিথির সুশাসন বর্ণনা করিয়া, ৮১ শ্লোকে, সপ্তদশ সর্গ শেষ।

অষ্টাদশ সর্গটিকে বলিতে পারি অতিথির পরবর্তী রঘুবংশীয় রাজাদের নামমালা। অতিথির পুত্র নিষধ।[১] নিষধের পুত্র নল।[২] তাহার পুত্র নভস্।[৩] তাহার পুত্র পুণ্ডরীক।[৪] তাহার পুত্র ক্ষেধন্বন্।[৫] তাহার পুত্র দেবানীক।[৬] তাহার পুত্র অহীনগু।[৭] তাহার পুত্র পারিযাত্র।[৮] তাহার পুত্র শিল।[৯] তাহার পুত্র উন্নাভ।[১০] তাহার পুত্র বজ্রনাভ।[১১] তাহার পুত্র শঙ্খণ।[১২] তাহার পুত্র ব্যুষিতাশ্ব।[১৩] তাহার পুত্র বিশ্বসহ।[১৪] তাহার পুত্র হিরণ্যনাভ।[১৫] তাহার পুত্র কৌশল্য।[১৬] তাহার পুত্র ব্রহ্মিষ্ঠ।[১৭] তাহার পুত্র পুত্র।[১৮] তাহার পুত্র পুষ্য।[১৯] পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি।[২০] পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া পুষ্য জৈমিনীর শিষ্য হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ধ্রুবসন্ধি মৃগয়া করিতে গিয়া সিংহের দ্বারা নিহত হইলে পর তাহার পুত্র সুদর্শন রাজা হইলেন।[২১] তখন তিনি ছয় বছরের। উপযুক্ত বয়স হইলে অমাত্যেরা ভালো বংশের একাধিক রাজকন্যা আনিয়া তাঁহার বিবাহ দিল। এইখানে, ৫৩ শ্লোকে, অষ্টাদশ সর্গ শেষ।

পুত্র অগ্নিবর্ণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সুদর্শন বৃদ্ধবয়সে নৈমিষারণ্যে চলিয়া গেলেন।

তত্র তীর্থসলিলেন দীর্ঘিকাস্তল্পমন্তরিতভূমিভিঃ কুশৈঃ।
সৌধবাসমুটজেন বিস্মৃতঃ সংচিকায় ফলনিঃস্পৃহস্তপঃ।।

'সেখানে নদীঘাটের জলে দীঘির, কুশের আস্তরণে নরম বিছানার, কুটীরবাসে প্রাসাদের সুখ ভুলিয়া নিষ্কাম তিনি তপস্যা সঞ্চয় করিলেন।।'

বনিতাবিলাসী অগ্নিবর্ণ কুলোচিত রাজকর্মে দুই এক বছর কোনরকমে কাটাইয়া তাহার পর মন্ত্রীদের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া নারী লইয়া নৃত্যগীতে ও যৌবনসুখভোগে নিরত হইলেন। উনবিংশ সর্গের প্রায় সবটাই[২২] অগ্নিবর্ণের এই বিলাসের বর্ণনা। রাজা নিজে বাদ্যবিশারদ ছিলেন।

১। শ্লোক ১-৪।
২। ঐ ৫, ৭। দময়ন্তী উল্লেখ নাই, অক্ষক্রীড়ারও নাই।
৩। ঐ ৬।
৪। ঐ ৮।
৫। ঐ ৯।
৬। ঐ ১০-১৩।
৭। ঐ ১৪-১৫।
৮। ঐ ১৬।
৯। ঐ ১৭-১৯।
১০। ঐ ২০।
১১। ঐ ২১।
১২। ঐ ২২।
১৩। ঐ ২৩।
১৪। ঐ ২৪।
১৫। ঐ ২৫-২৬।
১৬। ঐ ২৭।
১৭। ঐ ২৮-২৯।
১৮। শ্র ৩০-৩১।
১৯। ঐ ৩২-৩৩।
২০। ঐ ৩৪-৩৫।
২১। ঐ ৩৬ হইতে শেষ পর্যন্ত।
২২। শ্লোক ৫-৪৭। এই বিলাসবর্ণনা কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত কোন কোন কাশ্মীররাজের বিলাসের কথা স্মরণ করায়।

স স্বয়ং প্রহতপুষ্করং কৃতী লোলমাল্যবলয়ো হরন্ মনঃ।
নর্তকীভিরভিনয়াতিলঙ্ঘিনীঃ পার্শ্ববর্তিষু গুরুষ্বলজ্জয়ৎ।।

'কৃতী তিনি, নিজে ঢোল বাজাইয়া মাল্য ও বলয় চঞ্চল করিয়া নর্তকীদের মনোহরণ দ্বারা তাহাদের অভিনয়-শৈথিল্য ঘটাইয়া পার্শ্ববর্তী আচার্যদের কাছে লজ্জা দিতেন।।'

প্রজারা রাজার দর্শন চায়, এবং তা না পাইয়া অধৈর্য হইয়া উঠে। মন্ত্রীদের নির্বন্ধে অল্পক্ষণের জন্য রাজা প্রাসাদের গবাক্ষপথে শুধু পা দুইটি দেখাইয়া দেন।

গৌরবাদ্ যদপি জাতু মন্ত্রিণাং দর্শনং প্রকৃতিকাঙ্ক্ষিতং দদৌ।
তদ্‌গবাক্ষবিবরাবলম্বিনা কেবলেন চরণেন কল্পিতম্।।

'মন্ত্রীদের খাতিরে যদি (তিনি) কখনও প্রজাদের আকাঙ্ক্ষিত দর্শন দিতেন, তখন কেবল গবাক্ষবিবরস্থিত চরণের দ্বারাই করিতেন।।'

অত্যধিক ইন্দ্রিয়ভোগের ফলে অগ্নিবর্ণ দুরারোগ্য ব্যাধিতে পড়িলেন। মন্ত্রীরা তাঁহার সন্তানের জন্য যজ্ঞকর্ম করাইতে লাগিল। কিন্তু চিকিৎসকদের যত্ন সত্ত্বেও রাজাকে বাঁচাইয়া রাখা গেল না। রাজার মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়া মন্ত্রীরা তাঁহার দেহ চুপি চুপি গৃহোপবনে সৎকার করিল। কিছুদিন পরে যখন এক রাজমহিষীরল স্পষ্ট গর্ভলক্ষণ দেখা দিল, তখন মন্ত্রীরা রাজার মৃত্যুসংবাদ প্রজাদের জানাইয়া সেই গর্ভিণী রাজমহিষীকে সিংহাসনে বসাইল। এই গর্ভাভিযেকেই ঊনবিংশ সর্গ শেষ এবং রঘুবংশ পরিসমাপ্ত।

'তং ভাবার্থে প্রসবসময়াকাঙ্ক্ষিণীনাং প্রজানাম্
অন্তর্গূঢ়ং ক্ষিতিরিব নভোবীজমুষ্টিং দধানা।
মৌলৈঃ সার্ধং স্থবিরসচিবৈর্হেমসিংহাসনস্থা
রাজ্ঞী রাজ্যং বিধিবদশিযদ্ ভর্তুরব্যাহতাজ্ঞা।।

'প্রসব সময়ের জন্য অপেক্ষমাণ প্রজাদের মানাইবার জন্য, মাটি যেমন শ্রাবণ মাসে নিহিত বীজমুষ্টি অন্তরে ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি রানী স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া, বিশ্বস্ত বৃদ্ধ মন্ত্রীদের সহায়তায়, স্বামীর আজ্ঞা অব্যাহত রাখিয়া, নিয়ম অনুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।।'

কোন কোন সমালোচকের মতে রঘুবংশও কুমারসম্ভবের মতো অসম্পূর্ণ রচনা। কিন্তু এ ধারণা যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—অর্থাৎ বীজ-বিসর্জনে শেষ, সেই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বলা যায় যে রঘুবংশ পরিনিষ্ঠিত রচনা। বীজ হইতে শস্য এবং শস্য হইতে বীজ,—এই হইল পৃথিবীতে জীবনচক্রের আবর্তভ্রমণ। রঘুবংশে কালিদাস ভারতবর্ষের ঐতিহ্যলীন এক রাজবংশের ইতিহাসচক্র সেই আবর্তভ্রমণেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন। রঘুবংশের পরিসমাপ্তিকে প্রাচীন ভারতের রাজতান্ত্রিক নীতি-আদর্শের উত্থানপতনের রূপক বলিয়া লইতে পারি। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীর-রাজাবলীচিত্রে কালিদাসের ভাবনার প্রতিফলন লক্ষিত হয়।

ঋতুসংহার

ঋতুসংহারের কবিতায় আছে,—ছয় ঋতুতে প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপ এবং সে রূপের আভায় ভোগী মানুষের সুখ ও সৌমনস্য। 'ঋতুসংহার' মানে ঋতুসুখসংহিতা। ইহাতে প্রায় দেড়শত শ্লোক আছে। এই ছোট কাব্যটিকে কেহ কেহ কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। কালিদাসের অন্য রচনার সঙ্গে তুলনা করিলে ঋতুসংহার অবশ্যই কাঁচা লেখা। তবে কালিদাসের নয় বলিবার পক্ষে কাঁচা বলা ছাড়া আর কোন যুক্তি দেখি না।

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত—এই ছয় ঋতু। ইহার মধ্যে শরৎ বধূরূপে কল্পিত, বাকি ঋতুগুলি পুরুষরূপে। শ্লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২৮, ২৮, ২৬, ১৮, ১৬, ৬৬। কবি যেন নিজেরই প্রেয়সীর কাছে ঋতু-পরিচয় দিতেছেন। তাই শরৎ ছাড়া সব বর্ণনার আরম্ভ-শ্লোকে 'প্রিয়ে'' সম্বোধন আছে। শরৎবর্ণনায় তা নাই। তাহার কারণ বোঝা শক্ত নয়। শেষ ঋতু ছাড়া সব বর্ণনায় শেষ শ্লোকে শ্রোত্রীর (বা শ্রোতার) প্রতি আশীর্বচনেব মতো আছে। শেষ ঋতু বসন্ত যোদ্ধারূপে কল্পিত, এবং তাহার শরাঘাত এড়ানো কাম্য নয়। সুতরাং বসন্তবর্ণনের শেষে আশীর্বচন দেখি না।

গ্রীষ্মবর্ণনের মধ্যে মানুষের ভূমিকার সঙ্গে অন্য প্রাণীর ও তরুলতার ভূমিকা কবির মনোযোগ সমানভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। আরম্ভ-শ্লোক অনুবাদে এই রকম

> সূর্য প্রচণ্ড। চন্দ্রমা কমনীয়। সর্বদা অবগাহনে জলাশয় বিক্ষত। দিনাবসান রমণীয়। মনশ্চাঞ্চল্য শান্ত।—এমন নিদাঘকাল, হে প্রিয়ে, এখন উপস্থিত।।

বর্ষাবর্ণনের আরম্ভ-শ্লোক

> সজল মেঘ মত্তহস্তী। তড়িৎ পতাকা। বজ্রাপাত মাদলের ধ্বনি। হে প্রিয়ে, কামী-জনের প্রিয় ঘনাগম রাজার মতো জাঁকজমক সমাগত।।

শরৎবর্ণনের আরম্ভ-শ্লোক

> কাশ বসন। প্রস্ফুট পদ্ম সুন্দর মুখ। উন্মত্ত হংসরব মধুর নূপুরধ্বনি। আধ পাকা ধান মনোহর তনুদেহ। রূপময়ী নববধূর মতো শরৎ আসিয়াছে।।

শরতের বর্ণনা হইতে আর একটি ভালো শ্লোকের অনুবাদ দিই।

> শস্যভারনত ধানগাছগুলি মৃদুভাবে কাঁপাইয়া, ফুলভারে অবনত কুরবক গাছগুলি ঈষৎ নাচাইয়া, প্রস্ফুটিত পদ্মবনে পদ্মকে নাড়া দিয়া, বায়ু (যেন) জোর করিয়া তরুণদের মন চঞ্চল করিতেছে।।

হেমন্তবর্ণনের প্রথম শ্লোক

> অঙ্কুর উদ্‌গমে শস্যক্ষেত্র রমণীয়। লোধ্র ফুটিয়াছে। ধান পাকিয়াছে। পদ্ম মুদিয়াছে। তুষার পড়িতেছে।—হে প্রিয়ে, হেমন্তকাল সমুপস্থিত।।

শেষ শ্লোক

> অনেক গুণে রমণীয়, নারীদের মন-কাড়া, পাকা ধানের প্রাচুর্যে সর্বদা অতিশয় মনের-মতন, কোঁচের ডাকে মুখর, হিমযুক্ত এই সময় তোমাদের সুখ প্রদান করুক।।

শিশিরবর্ণনের দ্বিতীয় শ্লোক

> বাতায়ন-নিরুদ্ধ কক্ষমধ্য, অগ্নি, সূর্যের কিরণ, স্থূল বসন, যুবতী নারী—(এই সব) এই কালে লোকের সেবনীয়।।

বসন্তবর্ণনের নমুনা

কানের যোগ্য সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কর্ণিকার, চঞ্চল কালো চূর্ণকুন্তলের (যোগ্য) অশোক আর নবমল্লিকার ফোটা ফুল, নারীর শোভা করে।।

সংস্কৃত সাহিত্যে ঋতুসংহার বিশেষ কোন ছাপ রাখিতে পারে নাই। কিন্তু মনে হয় এই কাব্যের, অথবা অনুরূপ লৌকিক কবিতার, ধারা প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আধুনিক ভাষার সাহিত্যে বহিয়া আসিয়াছিল। পুরানো বাংলা অসমীয়া গুজরাটী হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যে "বারমাসিয়া" কবিতার পূর্বপুরুষ ঋতুসংহার, অথবা কালিদাস যদি তাঁহার কালের লৌকিক অর্থাৎ (প্রাকৃত) হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন তবে, তাহাই।

মেঘদূত

কালিদাসের সবচেয়ে স্বল্পকায় রচনা 'মেঘদূত'। কাব্যটির শ্লোক সবই মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত।[১] শ্লোকসংখ্যা সম্ভবত আসলে ছিল ১০৮। প্রাচীনতম টীকাকার বল্লভদেব ১১১ শ্লোক ধরিয়াছেন, সবচেয়ে প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ ১১৫ শ্লোক। মোট কথা হইল, কালে কালে মেঘদূতের মধ্যে বহু প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে। অধিকাংশ প্রক্ষেপই পরবর্তীকালে কালিদাসের কাব্যের সংস্কারের উদ্দেশ্যে অথবা কালিদাসের গহনগম্ভীর উক্তিকে সহজবোধ্য করিবার জন্য। কয়েকটি শ্লোক এতই ভালো যে সেগুলি কালিদাসের লেখনীবির্নিগত মনে করিতেই হয়। এই শেষোক্ত শ্লোকগুলি ও কিছু কিছু তুল্যমূল্য পাঠান্তর হইতে অনমুান করি যে কালিদাস নিজেই কাব্যটি একাধিকবার সংশোধন করিয়া থাকিবেন।

কালিদাস কাব্যটির নাম কী দিয়াছিলেন জানি না, তবে 'মেঘদূত' নয়। 'মেঘসন্দেশ' হইতে পারে। কেন না মেঘকে দূত করা হয় নাই। সে দূতের মতো বার্তা দিয়া জবাব লইয়া ফিরিয়া আসে নাই। "সন্দেশহর" পথিক সে, ডাকপিয়নের মতো যথাস্থানে বার্তা পৌঁছাইয়া দিয়া নিজের গন্তব্যস্থানে চলিয়া গিয়াছিল। অনেক টীকাকার কাব্যটিকে 'মেঘসন্দেশ'-ই বলিয়াছেন।

মেঘদূত কালিদাসের সবচেয়ে পরিচিত এবং সর্বাধিক সমাদৃত কাব্য। এ সমাদর আজিকার নয়, অন্তত বারো তেরো শতাব্দী আগেকার। জৈন পণ্ডিতেরা, যাঁহারা তত্ত্বকথা ও সাধুজীবনী ছাড়া আর কিছুকে সাহিত্যের বস্তুরূপে গ্রহণ করেন নাই তাঁহারাও মেঘদূতের শ্লোকের চরণ গাঁথিয়া মহাপুরুষজীবনী নির্মাণ করিয়াছিলেন। এমন দুইটি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। একটির নাম 'নেমিদূত'। তাহাতে প্রত্যেক শ্লোকের শেষ চরণ ধারাবাহিকভাবে মেঘদূতের শ্লোকের শেষ চরণ। দ্বিতীয়টির নাম 'পার্শ্বাভ্যুদয়'। তাহাতে প্রত্যেক শ্লোকের শেষ চরণ ধারাবাহিকভাবে মেঘদূতের শ্লোকের এক একটি চরণ। এইরূপে পার্শ্বাভ্যুদয়ে মেঘদূত সবটাই উদ্ধৃত হইয়া রহিয়াছে।[২] ইহার অপেক্ষাও উচ্চতর মেঘদূতের গৌরবস্বীকৃতি আছে। মেঘদূত হইতেছে একমাত্র ধর্ম-অসম্পৃক্ত, বিশুদ্ধ আদি-রসাত্মক কাব্য যা তিব্বতের বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা অনুবাদ করিয়াছিলেন।

১। মন্দাক্রান্তা ছন্দ কালিদাসের উদ্ভাবন বলিয়া অনুমান করি। এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে (১৯৩১) অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ বিষয়ে মদীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। পার্শ্বাভ্যুদয় অষ্টম শতাব্দীর রচনা। সুতরাং ইহার মধ্যেই ধৃত মেঘদূতের সবচেয়ে পুরানো পাঠ।

কালিদাসের রঘুবংশে ও কুমারসম্ভবে হিমালয়ের তুঙ্গ অংশের ভূপরিচয় নাই। সে অভাব মেঘদূতে মিটিয়াছে।

কাব্যের আরম্ভ এই শ্লোকে

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।।

'নিজের কাজে[১] গাফিলতি করায়, প্রভুর দেওয়া এক বছর প্রিয়াবিরহের কঠিন শাপে যাহার মহিমা অস্তগত,[২] এমন কোন এক যক্ষ তরুছায়াস্নিগ্ধ রামগিরি-আশ্রমপদে, যেখানের জল জনকতনয়ার স্নানে পবিত্র,[৩] সেখানে বসতি করিল।।'

প্রিয়ার কাছ-ছাড়া হইয়া প্রেমাসক্ত যক্ষ সেই রামগিরি পাহাড়ে কিছুকাল (অর্থাৎ মাস আষ্টেক) কাটাইল। বিরহে তনু ক্ষীণ হওয়ায় তাহার হাতের বালা বসিয়া গিয়াছে।[৪] এমন সময় আষাঢ়ের শেষের দিকে সে দেখিল,* (দক্ষিণ হইতে আসিয়া) একখণ্ড মেঘ পাহাড়ের গায়ে লগ্ন। তাহাতে চমৎকার দেখাইতেছে, যেন বপ্রক্রীড়া[৫] করিতে হাতি মাথা নোয়াইয়াছে।

মেঘ দেখিয়া যক্ষের মনে ভাবান্তর হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।।

'মেঘ দেখিয়া সুখীর চিত্তও অন্যরকম হয়। যাহার গলা জড়াইয়া ধরিতে মন চায় এমন ব্যক্তি দূরে থাকিলে তো কথাই নাই।'

কুড়চি ফুল তুলিয়া যক্ষ মেঘের দিকে ছুঁড়িয়া উপহার দিল এবং স্বাগত জানাইল। বিরহের ব্যাকুলতায় সে তখন প্রায় বাহ্যজ্ঞানবিরহিত। তাই মেঘকে উদ্দেশ করিয়া সে বকিয়াই চলিল। এই পর্যন্ত মেঘদূতের উপক্রমণিকা। অতঃপর সবটাই যক্ষের বার্তা ("সন্দেশ")।

প্রথমে যক্ষ মেঘের প্রশংসা করিল। বড় ঘরে তোমার জন্ম। যথেচ্ছ রূপ তুমি ধরিতে পার। ইন্দ্র তোমাকে প্রজাদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই কারণেই আমি, যার আত্মীয়স্বজন কাছে নাই, মনের কামনা জানাইতেছি। সে প্রার্থনা তুমি গ্রাহ্য না করিলেও ক্ষতি নাই, কেননা "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।" ('গুণাধিকের কাছে প্রার্থনা ব্যর্থ হইলেও ভালো, গুণাধমের কাছে প্রার্থনা সিদ্ধ হইলেও গৌরব নাই।')

১। "স্বাধিকার" অর্থাৎ নিজের ডিউটি।
২। "অস্তংগমিতমহিমা" অর্থাৎ যাহার (যক্ষের) যথেচ্ছ গমনাগমন প্রভৃতি শক্তি প্রভুদত্ত শাস্তির ফলে লুপ্ত।
৩। অর্থাৎ রামের সঙ্গে বনবাস কালে সীতা এখানে কিছুকাল ছিলেন। তিনি ঝরনার অথবা হ্রদের জলে স্নান করিতেন। তাই সে জল পবিত্র হইয়াছিল।
৪। তখন পুরুষেরাও গহনা পরিত।
* উক্ত পাঠ "আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে" প্রচলিত বা "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে", অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পয়লা তারিখে।
৫। "বপ্র" মানে উঁচু হিমের অথবা মাটির স্তূপ কিংবা দুর্গের প্রাকার ইত্যাদি। হাতি, ষাঁড় প্রভৃতি দাঁতালো ও শিংওয়ালা জন্তুর এইরূপ স্তূপ ঢুসানোই "বপ্রক্রীড়া"। হাতির বেলায় তাহা দন্তোৎখাত, ষাড়ের বেলায় শৃঙ্গোৎখাত ("ত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্")।

তোমায় হাওয়ায় ভাসিতে দেখিলে কপালের চুল সরাইয়া প্রবাসী পথিকের বণিতারা তোমাকে দেখে ও আশ্বাস পায়।[১] তুমি সাজিয়া দেখা দিলে, আমার মতো পরাধীনবৃত্তি ছাড়া কে আর আছে যে বিরহবিধুর জায়াকে উপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে।

তুমি নির্বাধে গিয়া তোমার ভ্রাতৃজায়াকে, আমার পত্নীকে, নিশ্চয় দেখিতে পাইবে যে সুস্থ আছে এবং (আমার প্রত্যাগমনের আশায়) দিন গণিতেছে। প্রায়ই (দেখা যায় যে) খসিয়া-পড়োপড়ো[২] ফুলের মতো মেয়েদের হৃদয়কে বিরহে আশা-বৃন্তই ধরিয়া রাখে।

তোমার শ্রবণসুখ যে ধ্বনি শুনিয়া মাটির তলা হইতে বীজাঙ্কুর মাথা তোলে সে ধ্বনি শুনিয়া মানসহ্রদের তরে উৎকণ্ঠিত হইয়া রাজহংসেরা মৃণালখণ্ড সম্বল লইয়া কৈলাস পর্যন্ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

(আর দেরি করিও না।) তোমার প্রিয় সখা এই যে শৈল, ইহার মেখলায় ভগবান্ রঘুপতির চরণরেখা আঁকা পড়িয়াছিল, ইহাকে বিদায়-সম্ভাষণ করো। ইহার সহিত তোমার মিলন কালে কালে ঘটিবেই।

এখন শুন, আমি তোমার উপযুক্ত পথের নির্দেশ দিই। তাহার পর আমার বার্তা ভালো করিয়া বুঝিয়া লইও। ক্লান্ত হইয়া যেমন যেমন পর্বতশিখরে পৌঁছিবে অমনি অমনি (জলমোচনে) ক্ষীণকায় তুমি (গিরি-) নির্ঝরের অত্যন্ত লঘু বারি আহার করিবে। এইখান হইতে তুমি যখন প্রস্থান করিবে তখন সিদ্ধদের অচতুর মেয়েরা চকিত হইয়া তোমার দিকে তাকাইয়া বলিবে, "মাগো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি।" এই অঞ্চল সরস এবং নিচুল[৩] পরিপূর্ণ। তুমি দিগ্‌গজদের মোটা শুঁড়ের নিষ্ঠীবন এড়াইয়া[৪] উত্তরমুখ হইয়া উপরে লাফ দিও। কৃষির ফলদাতা তুমিই। তাই গ্রামের বধূ, যাহারা কুটিল চোখে চাহিতে শিখে নাই, তোমার প্রতি প্রীতিপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টি হানিবে। তুমি একটু ঘুরিয়া মালক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইও। সেখানে সদ্য চষা মাটি হইতে সুগন্ধ উঠিতেছে। (বারি-বর্ষণে) হালকা হইয়া আবার তুমি দ্রুতগতি উত্তরের পথ ধরিও। তাহার পর তুমি আম্রকূটে পৌঁছিবে। জল ঢালিয়া তাহার বনের আগুন নিভাইয়া দিও। সে তোমাকে সাদরে বিশ্রামস্থান দিবে।

> ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈস্
> ত্বয়্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
> নূনং যাস্যত্যমরিমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
> মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ।।

১। অর্থাৎ সত্যই বর্ষা আসিতেছে। বর্ষা জমিবার পূর্বে প্রবাসী পথিক ঘরে ফিরিয়া আসে। এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করি।

২। "সদ্যঃপাতপ্রণয়ি"। ইহাই সঙ্গত পাঠ। "সদ্যঃপাতি প্রণয়ি" সাধারণত স্বীকৃত পাঠ হইলেও সঙ্গত নয়।

৩। "নিচুল' একরকম গাছ।

৪। "দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্"। মল্লিনাথ এখানে বৌদ্ধ তর্কাচার্য দিঙ্‌নাগের ইঙ্গিত দিয়াছেন এবং "নিচুল" একসবস কবির নাম বলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার মতে, নিচুল ও দিঙ্‌নাগ যথাক্রমে কালিদাসের পক্ষে ও বিপক্ষে ছিল। আসলে এখানে দিঙ্‌নাগ মানে বড় বড় হাতি যাহারা সরস নিচুল বনে বিচরণ করিত। ইহাদেরই শুঁড়ে ছোঁড়া কাদার ভয় যক্ষ মেঘকে দেখাইতেছে। আসল দিঙ্‌নাগেরা "অবলেপ" পাইবে কোথায়?

'বুনো আমের গাছ পাকা ফলের রঙে সে পর্বতের চারধার ছাইয়াছে। তাহাতে স্নিগ্ধবেণীর কান্তিময় তুমি আরূঢ় হইলে তোমার যে অবস্থা হইবে তাহা অবশ্যই দেব-দম্পতীর দেখিবার যোগ্য।—যেন পৃথিবীর (বক্ষের) মধ্যে শ্যাম স্তনবৃন্ত, আর সবটা ঢালা গৌরবর্ণ।।'

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং
তোয়োৎসর্গাদ্ দ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্মতীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিববিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য।।

'সেখানে বন্যনারীর বিলসিত কুঞ্জে ক্ষণকাল থাকিয়া জলমোচন করিয়া তাহার পর (তুমি) দ্রুতগতিতে পথ বাহিয়া "বিন্ধ্যপাদমূলে" "উপলব্যথিতগতি" বিশীর্ণ[১] রেবা নদীকে দেখিতে পাইবে, যেন হাতির গায়ে ভক্তি[২]-চিত্রণের বিভূতি[৩]-রেখা।

বিন্ধ্যের অরণ্যপর্বতের আতিথ্য উপভোগ করিতে করিতে তোমার পথে কিছু বিলম্ব হইবে, আমি বুঝিতেছি। তুমি কিন্তু চেষ্টা করিও যাহাতে তাড়াতাড়ি আগাইতে পার।

পাণ্ডুচ্ছায়োপববৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈর্
নীড়ারম্ভৈর্গৃহিবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ
সংপৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ।।

'কেয়াফুলের আগা বাহির হওয়ায় উপবনের বেড়া পাণ্ডুর ও ছায়াচ্ছন্ন। গৃহ-উপজীবী[৪] পাখির নীড় বাঁধিবার ব্যস্ততায় গ্রামের সব চৈত্য[৫] আকুল। তুমি আসন্ন হইলে বনপ্রদেশে জাম পাকিয়া শ্যামবর্ণ হইবে। (তাহাতে) দশার্ণ দেশে কিছু দিনের জন্য হাঁসেরা[৬] থাকিয়া যাইবে।।'

দশার্ণ দেশের রাজধানী বিখ্যাত বিদিশায় গিয়া তুমি সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের প্রতিদান পাইবে।

তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি।।

'যেহেতু (তুমি) তীরের কাছে মধুর ডাক দিয়া পান করিতে পারিবে—ভ্রূভঙ্গি-করা মুখের মতো উর্মিচঞ্চল বেত্রবতীর বারি।।

সেখানে তুমি নিচল পাহাড়ে[৭] বিশ্রাম করিও। তোমার সঙ্গ পাইয়া কদম পুলকিত হইবে। সেই পাহাড়ের গুহায় বিদিশার বিলাসীরা গণিকাদের লইয়া উদ্দাম যৌবন যাপন করে। বিদিশা হইতে পথ বাঁকা হইলেও উজ্জয়িনীর সৌধক্রোড়ের অভ্যর্থনা উপেক্ষা করিও না।

১। অর্থাৎ বহুধারায় ছড়াইয়া পড়া।
২। রাজহস্তীর ও রণহস্তীর গায়ে যে বিশেষ চিহ্ন ও চিত্রবিচিত্র রেখা আঁকা হইত তাহাই "ভক্তিচ্ছেদ"।
৩। অর্থাৎ ছাই কিংবা সাদাগুঁড়া।
৪। "গৃহবলিভূজাম্", অর্থাৎ গৃহস্থের দেওয়া খাদ্য ও উচ্ছিষ্ট যেসব পাখি খায়। য়েমন চড়াই শালিক পায়রা কাক।
৫। বৌদ্ধস্তূপ অথবা সাধারণ সমাধিমন্দির।
৬। মেঘের সঙ্গী মানসযাত্রী রাজহংসগণ।
৭। "নীচৈরাখ্যং গিরিম্" অর্থাৎ যে পাহাড়ের নাম "নীচল"।

বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি।।

'সেখানে তোমার বিদ্যুৎছটায় চকিত পুরনারীদের লোচনের বিলোল কটাক্ষের রস যদি না পাও তো তুমি ঠকিবে।।'

উজ্জয়িনীর পথে তুমি আনন্দে নির্বিন্ধ্যা ও সিন্ধু পার হইবে। তাহার পর

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্।।

'অবন্তী দেশে যেখানে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়নের গল্পকথায় নিপুণ, সেখানে পৌঁছিয়া পূর্বকথিত শ্রীবহুল বিশাল[১] পুরীর দিকে। স্বর্গের অধিবাসী ছিল তাহারা, পুণ্যের ফল কমিয়া আসিলে (পৃথিবীতে আসিবার কালে) অবশিষ্ট পুণ্যের বদলে যেন দ্যুলোকের এক উজ্জ্বল টুকরা আহরণ করিয়া আনিয়াছে।।'

উজ্জয়িনীতে রাত কাটাইয়া তুমি প্রভাতে শিবের মন্দিরে প্রণাম করিতে যাইও।

ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরো র্ধাম চণ্ডেশ্বরস্য।
ধুতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যাস্
তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্‌ভিঃ।।

'ঠাকুরের কণ্ঠের রঙ বলিয়া সেবকেরা সাদরে (তোমাকে) দেখিবে (যখন) তুমি ত্রিভুবন গুরু চণ্ডেশ্বরের পুণ্যধামে যাইবে। (সেখানে) কুবলয়ের কেশরগন্ধযুক্ত, জলক্রীড়ানিরত তরুণীদের স্নান-সুরভিত, গন্ধবতীর বায়ু, উদ্যান কাঁপাইয়া যায়।।''

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়াম্।
আমন্দ্রাণাং ফলমবিকলঃ লপ্স্যসে গর্জিতানাম্।।

'হে জলধর, অবশ্যই অন্য সময়ে[২] (তুমি) মহাকালের (মন্দিরে) আসিয়া যতক্ষণ সূর্য চোখের আড়ালে না যায় (ততক্ষণ) থাকিও। শিবের শ্লাঘনীয় সন্ধ্যাপূজার বাদ্যধ্বনি করিয়া (তুমি তোমাব) মন্দ্রমধুর গর্জনের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারিবে।।'

পাদন্যাসক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দুন্
আমোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণীদীর্ঘান্ কটাক্ষান্।।

'সেখানে, পাদন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের রশনা ক্বণিত হয়, লীলায় দুলানো রত্ন-আস্তরণে খচিত চামর-বৃন্ত ধরিয়া যাহাদের হাত ব্যথা করে (সেই দেবদাসী) বেশ্যারা তোমার দেওয়া, নখক্ষতের আরামজনক বর্ষাব প্রথম বারিবিন্দু পাইয়া তোমার পানে ভ্রমরপংক্তির মতো দীর্ঘ কটাক্ষ হানিবে।

১। ''বিশালা'' উজ্জয়িনীর নামান্তর।
২। অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায়।

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা।।

"পিছনে উঁচুতে ভুজতরুর[1] বন বেড়িয়া লাগিয়া থাকিয়া এবং জবা ফুলের গাঢ় রঙের মতো সন্ধ্যারাগ ধারণ করিয়া পশুপতির নৃত্য আয়োজনে (তুমি তাঁহার) আর্দ্র গজাজিন ধারণের ইচ্ছা মিটাইও। উদ্বেগশান্ত ভবানী স্থিরনেত্রে তোমার ভক্তি লক্ষ্য করিবেন।।'

উজ্জয়িনীর সুপ্তপারাবত ভবনশিখরে আর এক রাত কাটাইয়া তুমি সকাল সকাল বাহির হইয়া পড়িও। পথে পড়িবে গম্ভীরা।

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসঙ্গে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্যান্
মোঘীকর্তুং চটুলশফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি।।

"গম্ভীরা নদীর জল, প্রসন্ন চিত্তের মতো। তুমি ছায়ারূপ হইলেও স্বভাবসুন্দর তাহাতে প্রবেশ লাভ করিবে। অতএব ধৈর্য না ধরিয়া, ইহার কুমুদবিশদ, চঞ্চল শফরীর উদ্বর্তনরূপ কটাক্ষবিফল করা তোমার উচিত হইবে না।।"

তাহার পর তুমি যখন দেবগিরির নিকটবর্তী হইবে, বনডুমুর-পাকানো সুশীতল বায়ু তোমাকে নিচের দিকে ঠেলিয়া দিবে। সেখানে স্কন্দের[2] নিয়ত বাস। তুমি আকাশগঙ্গার জল আর পুষ্পসার মিশাইয়া আপনাকে পুষ্পমেঘ করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইও। তাহার পর তুমি রন্তিদেবের কীর্তিবাহিনী (চর্মন্বতী) নদীতে লম্বমান হইও, অতি সুন্দর দেখাইবে।

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টীর্
একং মুক্তাগুণমিব ভুবং স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্।।

'কৃষ্ণের বর্ণচোরা তুমি যখন জলপান করিতে অবনত হইবে, সেই নদীর আকাশযাত্রীরা বিস্তীর্ণ (অথচ) দূর হইতে সঙ্কীর্ণ প্রতীয়মান প্রবাহ নিশ্চয়ই চোখ ফিরাইয়া তাকাইয়া দেখিবে—(যেন) একটি মুক্তাহার, মাঝখানে একটি বড় ইন্দ্রনীলমণি।।'

তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্।।

১। ভুজতরু ইংরেজী beech গাছ।

২। অর্থাৎ কার্তিকেয়ের। এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে স্কন্দের জন্মকথার ইঙ্গিত আছে। "রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনাম্ অত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ"।

'সে (নদী) উত্তীর্ণ হইয়া তুমি যাইও, ভ্রূবিলাসে যাহারা অভিজ্ঞ, চোখের পাতার বিক্ষেপে যাহারা কৃষ্ণসারের সৌন্দর্য জাগায়, যাহারা বিক্ষিপ্ত কুন্দফুলের পিছে পিছে ধাবমান ভ্রমরের শোভা হরণ করে, সেই দশপুর-বধূদের নেত্রকৌতূহলের পাত্র নিজেকে করিয়া।।''

তাহার পর তুমি ব্রহ্মাবর্তে পৌঁছিবে। যেখানে গাণ্ডীবী অর্জুন কুরুক্ষেত্রে শত শত রাজন্য বধ করিয়াছিলেন।

তস্যাদ্ গচ্ছেরনু কনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিং।
গৌরীবক্ত্রভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদ্ ইন্দুলগ্নোর্মিহস্তা।।

''তাহার পর তুমি কনখল ধরিয়া যাইবে। সেখান দিয়া জাহ্নবী হিমালয় হইতে অবতীর্ণ, যেন সগরতনয়দের স্বর্গে যাইবার সোপান। (সেখানে যেন ''সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল), গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গি করি অবহেলা, ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা, লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্র করোজ্জ্বল''।।

হিমালয় ধরিয়া চলিলে তোমার পথে পথে কৌতুকের ভাগে কম পড়িবে না। কিছুদূর গিয়াই তুমি শিবস্থান পাইবে। সেখানে পাথরের উপর তাঁহার পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। সিদ্ধেরা তাহার সেবা করে। তুমি তাহা ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইও। সে চিহ্ন দেখিলে ভক্তিমানের পাপ বিমোচন হয় এবং দেহত্যাগের পরে স্থায়িভাবে শিবের অনুচরদের মধ্যে স্থান পায়।

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎসিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমার্দূর্ধ্বমুদ্ধূতপাপাঃ
কল্পন্তেহস্য স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ।।[১]

সেখানে তুমি শিবের পূজা-আরতির সময় বন্দনা গানেও যোগ দিও।

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্যমাণাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদী তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ।।

'ফাঁপা বাঁশে হাওয়ার খেলায় মধুর শব্দ উঠে। (দেবদাসী) কিন্নরীরা ত্রিপুরবিজয়-কাহিনী গান করে। তখন গম্ভীর নিনাদে যদি গুহায় মাদলের আওয়াজ তোল তবে পশুপতির গান-বন্দনার আয়োজন সম্পূর্ণ হইবে।।'

আর কিছু দূর উপরে উঠিয়া তুমি বিষ্ণুর প্রগাঢ় পদক্ষেপ চিহ্ন দেখিতে পাইবে।

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাং স্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরে স্তির্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ।।

১। কালিদাস ভক্তি-উপাসনাকে যে কতটা মূল্য দিতেন তাহার পরিচয় এখানে।

'হিমালয়ের উপতট[১] ধরিয়া তুমি অমুক স্থানে পার হইয়া হংসদ্বার[২] (পাইবে), যাহা বিষ্ণুর যশের পথ,[৩] (হিমালয়ের যে) রন্ধ্র[৪] দিয়া ক্রৌঞ্চেরা পারাপার করে।[৫] তাহার পর তুমি উত্তর দিক ধরিবে। সে যেন তেরছাভাবে চওড়া টানা শ্যাম বিষ্ণুপাদ—যখন তিনি বলিকে দমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।।'

হংসদ্বার পার হইয়া উপরে উঠিয়া তুমি কৈলাস পাইবে।

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতং প্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিশমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ।।

"উপরে উঠিয়া তুমি, রাবণের বাহু দ্বারা যাহাব জোড় ফাটিয়া গিয়াছিল, যাহা দেবনারীদের দর্পণের কাজ করে, সেই কৈলাসের অতিথি হইও। কুমুদশুভ্র উচ্ছ্রিত শৃঙ্গাবলীতে আকাশ ব্যাপিয়া আছে, যেন চারিদিকে শিবের অট্টহাসি রাশীকৃত।।"

সেই কৈলাসেরই কোলে গঙ্গা হইতে কিছু তফাতে তুমি অলকা[৬] দেখিতে পাইবে। তাহা চিনিতে তোমার দেরি হইবে না।

বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং তত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ।।

'(তুমি) বিদ্যুৎগর্ভ, (তাহাদের অন্দবে) সুন্দরী নারী। (তোমার) ইন্দ্রধনু, (তাহাদের) বর্ণসজ্জা। (তাহাদের অন্তঃপুরে) সঙ্গীতে মাদল বাজে, (তোমারও) নির্ঘোষ স্নিগ্ধগম্ভীর। (তোমার) অন্তরে জল, (তাহাদের অন্দরে) মণিকুট্টিম।—(এইভাবে অলকার) আকাশছোঁয়া প্রাসাদসমূহ তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমর্থ।।'

তাহার পর অলকার নরনারীর সুখজীবনের প্রসঙ্গ করিয়া যক্ষ নিজের ঘরের ঠিক ঠিকানা বলিয়া দিল।

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ।।

১। ইংরেজীতে flank, সংস্কৃতে "বপ্র'ও বলা যায়।

২। স্থাননাম।

৩। বলিবন্ধন বিষ্ণুর এক প্রধান কীর্তি।

৪। সংস্কৃতে "সংকট" ও বলা যায়, ইংরেজীতে pass।

৫। এসিয়ার উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশে সারস প্রভৃতি পাখিদের বার্ষিক গমনাগমনের পথ। কালিদাস এখানে তাঁহার পক্ষিবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহার 'কালিদাসের পাখী' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৬। অলকার উল্লেখ কুমারসম্ভবেও আছে। অলকা মৌলিক অর্থে "নাস্তি-নগরী"।

'যেখানে ধনপতির[১] গৃহের উত্তর পানে আমাদের গৃহ, ইন্দ্রধনুর মতো[২] তোরণ দূর হইতে নজর পড়িবে। তাহার একধারে আমার প্রিয়ার পোষ্যপুত্র ছোট মাদার গাছ[৩], সে নুইয়া আছে—(তাহার) পুষ্পগুচ্ছ হাতে (তোলা যায়)।।'

তাহার পর গৃহবাটিকার বর্ণনা।—পুকুর, ক্রীড়াশৈল, উদ্যান, পোষা ময়ূর ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া যক্ষ বলিল, এইগুলি সব মনে রাখিলেই আমার বাড়ি চিনিতে ভুল হইবে না, বিশেষত যদি লক্ষ্য রাখ যে ভবনদ্বারের দুই পাশে শঙ্খপুরুষ ও পদ্মপুরুষের মূর্তি অঙ্কিত আছে। তবে আমি সেখানে নাই বলিয়া আমার বাড়ির জৌলুস নিশ্চয়ই তেমন নাই। সূর্য অস্ত গেলে পদ্ম কি তাহার সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারে?

তুমি নিজের শরীর খাট করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া, যে ক্রীড়াশৈলের কথা বলিয়াছি তাহার উপর বসিও আর জোনাকির আলোর মতো ক্ষীণ বিদ্যুৎদীপ্তি দিয়া একটু একটু করিয়া গৃহ-অভ্যন্তর দেখিয়া লইও। আমার প্রিয়াকে দেখিলেই তুমি চিনিবে।

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।।

'(সে) তন্বী, শ্যামা,[৪] কুন্দদন্তা, পাকা তেলকুচার মতো রক্তাধর, মাঝা ক্ষীণ, চকিত হরিণদৃষ্টি, নিম্নোদর, নিতম্বভারে মন্দগতি এবং স্তনভারে আনত। সেখানে তাহাকে (দেখিলেই মনে) হইবে যেন সে তরুণীদের মধ্যে বিধাতার প্রথম সৃষ্টি।।'

তাহার পর প্রিয়ার বিরহদশার বর্ণনা করিয়া যক্ষ বলিতেছে, তুমি দেখিবে যে সে আমার ভাবনাতেই ভোর হইয়া আছে। হয়তো সে আমার কল্পনাছবি আঁকিতেছে, নয়তো পোষা শারীকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। অথবা

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথংচিৎ
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্ছনাং বিস্মরন্তী।

'হে প্রিয়দর্শন, হয়ত মলিনবসনে সে কোলের উপর বীণাখানি টানিয়া লইয়া আমার ভনিতা-দেওয়া কথায় গাঁথা গান[৫] গাহিতে গিয়া চোখের জলে ভিজা তন্ত্রী কোনো রকমে বাঁধিয়া লইয়া নিজের উদ্‌ভাবিত মূর্চ্ছনা বারবার নিজেই ভুলিয়া যাইতেছে।।'

১। ধনপতি মানে কুবের। মধ্য বাংলা সাহিত্যে ইহা ধনী বণিকের বিশিষ্ট নামে পরিণত।
২। সম্ভবত ইন্দ্রধনুর আকৃতি, ইন্দ্রধনুর মতো বহুবর্ণ নয়। প্রাচীন ভাস্কর্যে চাপ-আকৃতি তোরণ দেখা যায়।
৩। "বালমন্দার" সম্ভবত বৃক্ষনাম। বাংলা পালিতামাদার হইতে পারে।
৪। শ্যামার মুখ্য অর্থ শ্যামবর্ণ নারী। একটি সংজ্ঞা-অর্থও দাঁড়াইয়া যায়।—যাহার সর্বাঙ্গ শীতকালে সুখোষ্ণ আর গ্রীষ্মকালে সুখশীতল এবং যাহার দেহবর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মতো। এই সংজ্ঞা এখানে অর্থ অসঙ্গত নয়।
৫। "মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়ম্"। গোত্র হইল বংশনাম। পতির নাম উচ্চারণ করা অসভ্যতা গণ্য হইত। কালিদাসের সময়ে তাহা হইলে ভনিতা দেওয়ার রেওয়াজ হইয়াছিল। "পদ" এখানে word; বিরচিতপদ গেয় মানে কথাগাঁথা গান, তেলেনা গৎ নয়।

কিংবা সে দেহলীতে সাজানো, বিরহাবস্থা হইতে মাটিতে ফেলা, দিন-গোনা ফুলগুলি একটি একটি করিয়া গুণিতে তৎপর আছে। দিনের বেলায় প্রিয়া অনেক কাজে মন ফিরাইবার অবকাশ পায়, সুতরাং তুমি দিনে দেখা দিও না। গভীর রাত্রিতে যখন মন ভোলাবার কোনো পথ থাকে না তখনই তুমি সৌধবাতায়নে সন্নিহিত হইয়া ঘরের মেঝেতে শোয়া তোমার সখীকে আমার বার্তা কহিও।

শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবর্ধেবা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীমুক্তপুষ্পৈঃ।
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ।।

চার শ্লোকে বিরহিণীর ম্লানক্ষীণ অবস্থার পরিচয় যক্ষ এক কথায় বুঝাইয়া দিল। তুমি আমার প্রিয়াকে দেখিবে যেন

সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্।।
'মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলপদ্মিনী, ফুটিয়াও নাই মুদিয়াও নাই।।'

যক্ষের আশঙ্কা হইল, মেঘ হয়ত তাহার প্রিয়ার বিরহদশায় বর্ণনা বাড়াবাড়ি মনে করিতেছে। তাই সে বলিল, আমি নিজেকে প্রিয়ার প্রেমে ধন্য ভাবিয়াই এই বাচালতা করিতেছি না। ভাই, আমি যাহা যাহা বলিলাম তাহা তুমি সব নিজেই প্রত্যক্ষ করিবে।

বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষং যে নিখিলমচিরাদ্ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ।।

সৌধবাতায়ন হইতে তুমি প্রিয়াকে কেমন দেখিবে, তাহা বলিতেছি।

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈ রঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মনীক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি।।

'চূর্ণকুন্তল নয়নপ্রান্ত ঢাকিয়াছে। অঙ্গরাগ নাই, কাজল নাই। মধুপান ত্যাগ করায় ভ্রূযুগলের চঞ্চলতা নাই। আমি কল্পনা করি, তুমি আসন্ন হইলে, মৃগাক্ষীর নয়ন, মৎস্যের উৎক্ষেপে চঞ্চলিত নীলপদ্মের শোভার সঙ্গে তুলনীয় হইবে।।'

তখন আমার প্রিয়া যদি নিদ্রাগত থাকে তাহা হইলে হঠাৎ যেন জাগাইও না। হয়ত স্বপ্নে সে তখন আমার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তাহার পর যখন গবাক্ষে অবস্থিত বিদ্যুদ্‌গর্ভ তোমার দিকে সে স্থিরনয়নে তাকাইয়া থাকিবে তখন, হে বিজ্ঞ, তোমার মন্দ্ররবে সেই মনস্বিনীকে আমার এই বাণী কহিও।

ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈ র্হৃদয়নিহিতৈরাগতঃ ত্বৎসমীপম্।

'ওগো সধবা মেয়ে, আমাকে (তোমার) স্বামীর প্রিয় বন্ধু বলিয়া জানিবে। তাঁহারই বার্তা হৃদয়ে ধরিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।'

এইটুকু শুনিলেই, সীতা যেমন হনুমানকে দেখিয়া হইয়াছিলেন, সেও তোমাকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে এবং তোমাকে খাতির করিয়া অত্যন্ত অবহিত হইয়া শুনিতে থাকিবে। প্রিয়ের বার্তা প্রিয়মিলনের প্রায় সমানই। আমার কথায় এবং তোমার নিজের পুণ্যের জন্যও তুমি তাহাকে প্রথমেই আশ্বাস দিয়া বলিও, 'তোমার স্বামী রামগিরিতে আছে, শারীরিক কুশলে আছে, কিন্তু তোমার থেকে দূরে রহিয়া বিরহের ক্লেশভোগ করিতেছে। যখন সে কাছে ছিল

তখন তোমার মুখের ছোঁয়াটুকু পাইবার জন্য যে কথা সখীদের সামনে স্বচ্ছন্দে বলা যাইত তাহাও সে কানে কানে কহিত। সে মানুষ এখন কর্ণপথের বাহিরে, দৃষ্টির অগোচরে। তাই সে উৎকণ্ঠায় কথা গাঁথিয়া আমার মুখে তোমাকে জানাইতেছে।'

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথায়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্যস্
ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ।।

প্রিয়ার প্রতি যক্ষের "সন্দেশ" নয়টি শ্লোকে। যক্ষ বলিতেছে, "প্রিয়ে, তোমার রূপ যেন আমার চারিদিকের সুন্দর প্রাণী ও বস্তুতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোনো একটি আধারে তো সবটা তোমাকে পাই না। তোমার ছবি আঁকিয়া তাহা দেখিয়া যে সান্ত্বনা পাইব তাহারও যো নাই, চোখে জল আসিয়া পড়ে। স্বপ্নে তোমাকে যদি পাই তো সে চকিতের জন্য, তোমাকে ধরিতে গিয়া জাগিয়া উঠি। উত্তর দিক হইতে বায়ু বহিলে, তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে ভাবিয়া আমি আলিঙ্গন করিতে প্রয়াস করি। দিনরাত্রি কি করিয়া সহজে কাটিবে, এই চিন্তায় ও তোমার বিয়োগব্যথায় আমি অত্যন্ত অসহায়।

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মবৈবাবলম্বে
তৎ কল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।।

'আমিও অনেক ভাবিয়া নিজেকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছি। অতএব, হে কল্যাণময়ী নারী, তুমিও অত্যন্ত কাতর হইও না। কবে কাহার সর্বদা সুখ আসিয়াছে, একটানা দুঃখই বা কাহার আসিয়াছে? (মানুষের) দশা নীচে হইতে উপরে যায়, চাকা ঘোরার মতো।।'

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
মাসানন্যান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু।।

'শেষশয্যা হইতে বিষ্ণু উঠিলে[১] আমার শাপান্ত হইবে। চোখ বুজিয়া আর চারমাস কাটাইয়া দাও। পরে আমাদের অন্তরের যে যে অভিলাষ বিরহে প্রবর্ধিত হইয়া আছে, তাহা প্রৌঢ় শরতের জ্যোৎস্না রজনীতে দুইজনে উপভোগ করিব।।'

পাছে মেঘের মুখে তাহার এই আকাশবাণী মিছা স্তোকবাক্য বলিয়া মনে করে, সে আশঙ্কা করিয়া যক্ষ প্রিয়ার প্রতি তাহার বার্তায় পরবর্তী শ্লোকে একদা রাত্রিকালের একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা বলিয়া দিল। সে ঘটনা তাহারা দুইজন ছাড়া আর কেহ জানিতে পারে না। এই হইল দূত-মেঘের অভিজ্ঞান (অর্থাৎ credentials)।

এতস্মানং মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্ বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিতনয়নে ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগাদ্
ইষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি।।

১। অর্থাৎ উত্থান-একাদশীর পর।

'এই অভিজ্ঞান-দান হইতে তুমি জানিও আমি কুশলে আছি। ওগো কালোচোখ মেয়ে, তুমি লোকের কথায় আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইও না। লোকে যদি বলে মিলনের অভাবে ভালোবাসা বিনষ্ট হইয়া যায়, (সে কথায় কান দিয়ো না, বরং) স্নেহ-পাত্রে রস উপচিত হইয়া (তাহা) প্রেমরাশিতে জমিয়া ওঠে।।'

প্রিয়ার প্রতি যক্ষের বার্তা এইখানেই শেষ। তাহার পর মেঘদূতে আর দুইটি মাত্র শ্লোক আছে। তাহাতে মেঘের প্রতি যক্ষের অনুনয় ও এপোলজি এবং সাধুবাদ।

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্ সিতার্থক্রিয়ৈব।।

'হে সৌম্য, আমার চাপানো এই বন্ধুকৃত্য যদি তোমার (নীরবতায়) অস্বীকার মনে হয় তবুও আমি তোমার বিজ্ঞতায় সংশয় করিব না। যাচিত হইয়া তুমি চাতকদের জল দাও নিঃশব্দে। বাঞ্ছিত কাজ করিয়া দিয়াই সৎব্যক্তিরা স্নেহভাজনদের অনুরোধের উত্তর দেন।

এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিত প্রার্থনাবর্তিনো মে
সৌহার্দাদ্ বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচার প্রাবৃষা সংভৃতশ্রীর্
মা ভূদেবং ক্ষণমপি চা তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।।

'অনুচিত প্রার্থনাকারী আমার এই প্রিয় কাজটুকু সৌহার্দ্যের জন্য হোক আর বিরহী বলিয়া অনুকম্পার বশেই হোক, করিয়া দিয়া, হে মেঘ, তুমি বর্ষা-শ্রীসম্ভার লইয়া, ইচ্ছামতো দেশে বিচরণ কর। এইমতো যেন বিদ্যুতের সহিত মুহূর্তের তরেও তোমার বিরহ না ঘটে।।'

ফর্মের দিক দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত অত্যন্ত অভিনব কাব্য-রচনা। পালি থেরগাথায় ও থেরীগাথায় সঙ্কলিত কয়েকটি গাথা ছাড়া বস্তুভারহীন, আত্মভাবনাময়, অনধ্যাত্মবিষয়ক দীর্ঘ কবিতা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে মেঘদূতের আগে কিছু মিলে না। মেঘদূত ভারতীয় সাহিত্যে এবং কালিদাসের রচনামধ্যে সবচেয়ে মৌলিক সৃষ্টি। মেঘদূতের বিশিষ্ট কল্পনা-ছাঁদটি—মেঘকে দূত করিয়া দূর-বিদেশবাসী প্রেমপাত্রের কাছে বার্তা প্রেরণ—প্রাচীন চীনা কবিতায় আছে, এই কথা হরিনাথ দে প্রথম বলিয়াছিলেন।[১] সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন[২] এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[৩] এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। পুরানো চীনা কবিতা হইতে কালিদাস মেঘ-দূত কল্পনা পাইয়াছিলেন, এ অনুমানের সমর্থনে এ প্রমাণ যথেষ্ট নয়। কেন না আকাশে দিক হইতে দিগন্তরে ভাসিয়া বেড়ানো মেঘকে ঘুড়ি অথবা ভেলা ভাবা অত্যন্ত স্বাভাবিক কল্পনা। সব দেশের শিশুর পক্ষে তা আরও স্বাভাবিক। এ কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য যুক্তি আছে। ঋগ্‌বেদের একটি পর্জন্য-সূক্তের এক শ্লোকে মেঘকে স্পষ্টভাবে বর্ষার দূত বলা

১। হরিনাথ দে কালিদাস সম্বন্ধে আরও কিছু নূতন কথা বলিয়াছিলেন। যেমন রঘুবংশের আরম্ভে "আসমুদ্রক্ষিতীশানাং", এই পদে সমুদ্রগুপ্তের প্রতি এবং কুমারসম্ভব-নামে সমুদ্রগুপ্তের জন্মের প্রতি ইঙ্গিত।

২। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত মেঘদূতের ভূমিকা (পৃষ্ঠা ৯ পাদটীকা) দ্রষ্টব্য।

৩। এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে, অবশ্য কোন মানুষের অথবা যক্ষের প্রেমবার্তাবাহক নয় পর্জন্যের জলধারাবাহক রূপে (তবে কাজ দুইটি প্রায় একই, প্রত্যাসন্ন আশ্বাস বহন।)

> রথীব কশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্
> আবির্দুতান্ কৃণুতে বর্ষিআঁ অহ।
> দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে
> যৎ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষিঅং নভঃ।।

'রথচালকের মতো, কশার দ্বারা ঘোড়া ছুটাইয়া (পর্জন্য) বর্ষার দূতদের বাহিরে পাঠাইয়া দেন। দূর হইতে (যেন) সিংহগর্জন উঠে, যখন পর্জন্য নভস্তল বর্ষার উপযোগী করেন।।'

কালিদাসের মেঘদূত-কল্পনার বীজ হয়ত অণুরূপে এই ঋগ্‌বেদের কবিতায় আছে, মনে করি।[1]

ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের মৌলিকত্বের একটা দিক হইতেছে ভদ্র-সাহিত্যের ভোজে লোকসাহিত্য হইতে আনন্দের পরিবেশন। মেঘদূতের পরিকল্পনায় সেকালের লোকগাথার মালমশলা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আধুনিক কালের বাংলাদেশের ছেলেভুলানো ছড়ায় যখন শুনি

> আমি কাঁঠালের বাগান দিলুম ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
> উড়কি ধানের মুড়কি দিলুম পথে জল খেতে।।

তখন যেন ইহারই দূরকালাহত প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই মেঘদূতে যক্ষ কর্তৃক মেঘের লোভনীয় পথনির্দেশে।

ভারতীয় সাহিত্যে প্রেমকবিতার (অথবা গীতকবিতার) ইতিহাসে মেঘদূতের আরও একটু বিশেষ মূল্য আছে। নরনারীর প্রেম সম্পর্কে শুধু বিরহ লইয়া বিরচিত ইহাই প্রথম কাব্য, এমন কি মূল কবিতা। (মেঘদূতের এই মূল্য রবীন্দ্রনাথই নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।) মেঘদূতে যাহার প্রথম পদবী ভারতীয় সাহিত্যের সেই প্রেম-কবিতা বৈষ্ণব-পদাবলীতে বিচরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। মেঘদূতে প্রিয়াবিরহ, বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রিয়বিরহ, আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায়-গানে নিখিলবিরহ—আমাদের সাহিত্যে-প্রেমের এই ত্রিবিক্রিম বর্ষাকে ঘিরিয়া।

বৈষ্ণব-পদাবলী শুধু বিরহের সুরেই নয়, কথাবস্তুতেও যেন কিছু কিছু মেঘদূত পূর্বাভাসিত (যেমন, অভিসার, সঙ্কেত স্থানে মিলন, মান, স্বপ্নসমাগম ইত্যাদি)।[2]

এখন প্রক্ষেপের ও পাঠান্তরের সম্বন্ধে দুই চার কথা বলিয়া মেঘদূতের প্রসঙ্গ শেষ করি। মেঘদূতে প্রক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত শ্লোক অনেক আছে। সেগুলির মধ্যে যেগুলি নিরেস এবং প্রাচীন টীকাকারদের উপেক্ষিত সেগুলি সরাসরি অগ্রাহ্য। যেগুলির রচনা নিক্ষিপ্ত এবং প্রাচীন টীকাকারদের দ্বারা ব্যাখ্যাত সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা রসজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য দুই দিক দিয়াই কর্তব্য। এই ভাবে বিচার করিলে মেঘদূতের শ্লোকসংখ্যা যাহা দাঁড়ায় তাহাতে কিন্তু পণ্ডিতেরা একমত নন। উপস্থিত আলোচনায় আমি মেঘদূতের শ্লোকসংখ্যা ধরিয়াছি ১০৮, বিদ্যাসাগর ধরিয়াছিলেন, ১১০, বল্লভদেবের টীকার প্রামাণ্য পুথিতে ১১১। যে সব শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কালিদাসের রচনা অবশ্যই কিছু আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমি কল্পনা করি যে কালিদাস নিজে মেঘদূত কাব্যখানিকে

১। ১৩৬৭ সালের 'শারদীয় জনসেবক'-এ প্রকাশিত 'বর্ষার কবিতা ও মেঘদূত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
২। 'বর্ষার কবিতা ও মেঘদূত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

একাধিকবার মাজিয়া ঘষিয়াছিলেন। মেঘদূতের অধিকাংশ টীকাকারের ও প্রায় সব সম্পাদকের মতে প্রক্ষিপ্ত বিবেচিত নীচের শ্লোকটিকে কালিদাস ছাড়া আর কোন কবির রচনা মনে করিতে ইচ্ছা হয় না।

ধারাসিক্তস্থলসুরভিণস্ত্বন্মুখস্যাস্য বালে
দূরীভূতং প্রতনুমপি মাং পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
ঘর্মান্তেঽস্মিন্ বিগণয় কথং বাসরাণি ব্রজেয়ুর্
দিক্‌সংসক্তপ্রবিততঘনব্যস্তসূর্যাতপানি।।

'হে বালা, ধারাবর্ষণে ভিজা মাটির সুগন্ধ[১] তোমার মুখে। সে মুখ হইতে দূরে পড়িয়া আমি ক্ষীণ তবুও প্রেমের পীড়ন চলিতেছে। গ্রীষ্মের দিন তো চুকিয়া গেল। এখন বল, কেমন করিয়া কাটে আদিগন্ত প্রসারিত মেঘাচ্ছাদনে সূর্যালোক নিরুদ্ধ দিনগুলি।।'

পাঠান্তর সম্বন্ধেও সেই কথা। ছোট বড় এমন অনেক বিভিন্ন পাঠ মেঘদূতে আছে সেগুলি যদি প্রত্যাখ্যান করি তবে কালিদাসের মতো প্রচণ্ড বড় কোন কবির লেখনীবিনির্গত বলিতে হয়।[২] এমন পাঠান্তর কালিদাসেরই পরিবর্জন বলিয়া অনুমান সঙ্গত।

"লোকে বলে, কেন জানিনা, ভালোবাসা বিরহে উঠিয়া যায়।
(আসলে কিন্তু) প্রিয়বিস্ময়ে সঞ্চিত হইয়া প্রেমরাশিতে পরিণীত হয়।।"

মালবিকাগ্নিমিত্র

কালিদাসের তিনখানি নাটক আছে এবং তিনটিই প্রণয়মূলক ও রোমান্টিক। রচনাকালক্রমে নাটক তিনটি হইল—'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশীয়' এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'। নাটক তিনটি তিন ধরনের দর্শক-শ্রোতার উপযোগী করিয়া লেখা। মালবিকাগ্নিমিত্র রাজসভার জন্য, বিক্রমোর্বশী লোকসভার জন্য, অভিজ্ঞানশকুন্তল বিদগ্ধসভার জন্য।[৩]

পঞ্চাঙ্ক মালবিকাগ্নিমিত্রের কাহিনী কালিদাসের স্বকল্পিত বলিয়া মনে হয়। উপস্থাপনে ঐতিহাসিক রূপ দেবার চেষ্টা আছে। মগধের রাজা সেনাপতি[৪] পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র বিদিশায় থাকিয়া সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ শাসন করিতেছেন। তিনিই নায়ক। তাঁহার বয়স কম নয়। মহিষী দুই জন, মহাদেবী (পাটরানী) ধারিণী আর দ্বিতীয় দেবী (সুয়োরানী) ইরাবতী, পুত্র বসুমিত্র যৌবনস্থ, কন্যা বসুলক্ষ্মী তখন বিবাহের যোগ্য নয়। মহাদেবীর অসবর্ণ ভাই বীরসেন নর্মদাতীরে এক সীমান্ত দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি শবর-সৈন্যদের অপহৃত একটি সুন্দরী ও শিক্ষিত মেয়েকে পাইয়া ভগিনীর কাছে পাঠাইয়া দেন। মেয়েটির নাম মালবিকা। ইনিই নায়িকা। মালবিকার শিল্পযোগ্যতা দেখিয়া মহাদেবী নাট্যাচার্য গণদাসকে দিয়া মালবিকার অভিনয়শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। রাজবাড়ীর চিত্রশিল্পী মহাদেবী ও তাঁহার পার্শ্বচারিণীদের একটি ছবি আঁকিয়াছিলেন। অগ্নিমিত্র সেই চিত্রে মালবিকাকে দেখিয়া মহাদেবী ধারিণীকে তাহার নাম

১। তুলনীয় রঘুবংশ দ্বিতীয় সর্গে "তদাননং মৃৎসুরভি"।
২। 'মেঘদূতের সমস্যা' প্রবন্ধ ('বিংশ শতাব্দী' শারদীয় সংখ্যা ১৩৬৭) দ্রষ্টব্য।
৩। 'নট নাট্য নাটক' দ্রষ্টব্য।
৪। পাটলীপুত্রের শুঙ্গ রাজাদের বংশকর্তা মৌর্যদের সেনাপতি ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা রাজা হইয়াও "সেনাপতি" অভিধান ছাড়েন নাই। কালিদাস পুষ্যমিত্রকে সেনাপতি বলিয়া ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ অনুগতি দেখাইয়াছেন।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ধারিণী কোন উত্তর দেন নাই। সেখানে কন্যা বসুলক্ষ্মী উপস্থিত ছিল। সে মালবিকার নাম করিয়া ফেলিল। রাজা তখন হইতে মালবিকাকে চোখে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু ধারিণী তাহাকে সযত্নে রাজার দৃষ্টিপথ হইতে দূরে দূরে রাখেন। রাজা বাল্যসখা বিদূষককে ধরিয়া বসিলেন। বিদূষকের পরামর্শে মহাদেবীর নাট্যাচার্য গণদাস ও রাজার নাট্যাচার্য হরদাস দুইজনের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরীক্ষা লইবার আয়োজন হইল। ধারিণী আর বাধা দিতে পারিলেন না। গণদাসের শিষ্য মালবিকা শর্মিষ্ঠা-বিরচিত চতুষ্পদী গাহিয়া "ছলিক" নাট্য দেখাইলে পর তখনকার মতো নাট্যপরীক্ষা স্থগিত রহিল। রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ধারিণীর সাবধানতা সত্ত্বেও একদিন প্রমোদবনে রাজা ও মালবিকার সাক্ষাৎ ঘটিল কিন্তু ইরাবতী সেইখানে আসিয়া পড়াতে রাজা ধরা পড়িয়া গেলেন। রাজা ইরাবতীর মানভঞ্জনের বৃথা চেষ্টা করিলেন। ইরাবতী ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। তাহার আদেশে মালবিকা অন্তঃপুরের কারাগারে বন্দিনী হইল।

তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য বিদূষক এক চাল চালিল। ধারিণী পা ভাঙিয়া অচল হইয়াছেন। রাজার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিদূষক ভান করিল যেন তাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে। তাহাকে বিষবৈদ্যের কাছে পাঠানো হইলে বিষ ঝাড়িবার জন্য সর্পমুদ্রা-আংটির আবশ্যক হইল। ধারিণীর সেই আংটি ছিল। তিনি সেই আংটি দিয়া বলিলেন, কাজ হইলে আনিয়া দিও। বিদূষক সেই আংটি দেখাইয়া মালবিকাকে কারামুক্ত করিল। রাজার সহিত মালবিকার দেখা হইল, কিন্তু এবারেও ইরাবতী আসিয়া পড়িল। তবে এখন ব্যাপার বেশি দূর গড়াইতে পারে নাই। এক পরিচারিকা ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া খবর দিল, কুমারী বসুলক্ষ্মী গেঁড়ু খেলিতেছে কিন্তু এক বানর আসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেছে। শুনিয়াই রাজা কন্যাকে রক্ষা করিবার ছল করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

'আমি আর্যপুত্রের সহিত রক্তাশোকের নব পুষ্পসম্ভার দেখিতে চাই', এই বলিয়া ধারিণী রাজাকে প্রমোদ-উদ্যানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিদূষকের সহিত রাজা আসিয়া দেখিলেন যে সেখানে ধারিণীর সঙ্গে পরিব্রাজিকা কৌশিকী এবং সুসজ্জিত মালবিকাও রহিয়াছে। সকলে উপবিষ্ট হইয়া অশোক গাছের শোভা দেখিতেছে এমন সময় কঞ্চুকী দুইটি মেয়েকে আনিয়া উপস্থিত করিয়া বলিল যে মেয়ে দুইটি কলাবিদ্যানিপুণ বলিয়া বিদর্ভরাজ উপঢৌকনরূপে পাঠাইয়াছেন। তাহাদের কলাকুশল শুনিয়া ধারিণী মালবিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ইহাদের একজনকে তুমি সঙ্গীতসহকারিণী করিতে পারো।' সম্মুখে আসিতেই মালবিকা ও মেয়ে দুইটি পরস্পরকে চিনিতে পারিল। তখন জানা গেল যে মালবিকা বিদর্ভ-রাজকন্যা। পরিব্রাজিকারও পরিচয় পাওয়া গেল। সে মাধবসেনের অমাত্যের ভগিনী। অগ্নিমিত্রের হাতে দিবার জন্য মালবিকাকে লইয়া কৌশিকী এক সার্থবাহের সঙ্গে বিদিশা আসিতেছিলেন। বনের মধ্যে দস্যুসৈন্য বণিক-সার্থকে লুট করে এবং মালবিকা ও কৌশিকীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বীরসেনকে দেয়। বীরসেন তাহাদের বিদিশার রাজান্তঃপুরে পাঠাইয়া দেন।

এই কথাশুনিয়া ধারিণী কৌশিকীকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, রাজকন্যা মালবিকার পরিচয় আপনি এতদিন গোপন রাখিয়া ভালো করেন নাই। কৌশিকী বলিলেন, তাহার কারণ আছে। এক সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন যে মালবিকা যদি এক বছর দাস্যবৃত্তি করে তবে তাহার ভাগ্যের দোষ কাটিয়া যাইবে এবং সে যোগ্য পতি লাভ করিবে।[১]

১। নায়িকার পক্ষে এক বছর বিবাহ না করিয়া সংযমে থাকা বাংলা রূপকথার একটি বিশিষ্ট মোটিফ। নাটকটির মধ্যে মহাভারতের যযাতি উপাখ্যানের ছাপ পরিলক্ষিত।

এমন সময়ে কঞ্চুকী আবার আসিয়া খবর দিল যে সেনাপতি পুষ্যমিত্র পত্র পাঠাইয়াছেন। সেই পত্রে জানা গেল যে অগ্নিমিত্রের পুত্র, পুষ্যমিত্রের পৌত্র, বসুমিত্র সিন্ধুতীরে যবনদের পরাজিত করিয়া পিতামহের অশ্বমেধের ঘোড়া উদ্ধার করিয়াছে। এখন যজ্ঞসমাপন হইবে। অতএব পুত্র ও পুত্রবধূ পরিজন সহ যেন চলিয়া আসে। পুত্রের বিজয়বার্তায় ধারিণী খুশি হইলেন এবং ইরাবতীকে বলিয়া পাঠাইয়া তাহার সম্মতি লইয়া মালবিকাকে স্বামীর হাতে সমর্পণ করিলেন।

মালবিকাগ্নিমিত্রের এই কাহিনী পরবর্তীকালের কয়েকটি সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাটকের[১] কাহিনীর বস্তু ও আদর্শ যোগাইয়াছে।

মালবিকাগ্নিমিত্র-নাটকের প্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে এক বসন্ত-উৎসব উপলক্ষ্যে নাটকটি রচিত ও প্রথম প্রযুক্ত হইয়াছিল। সূত্রধার সহকারীকে[২] ডাকিয়া বলিতেছে, "আদিষ্টোঽস্মি পরিষদা শ্রীকালিদাসগ্রথিতবস্তুনা মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকমস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রয়োক্তব্যম্।" ('পরিষদ্ আজ্ঞা করিয়াছে যে এই বসন্তোৎসবে শ্রীকালিদাস যাহার কাহিনী রচিয়াছেন সেই মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটক অভিনয় করিতে হইবে।') "কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা" পদের মর্ম—কাহিনী কালিদাসের নিজস্ব কল্পনা।

তাহার পর কয়েকজন প্রসিদ্ধ নাটকরচয়িতার নাম করিয়া কালিদাস সাহিত্য বিচারের সম্পর্কে একটি বেশ মূল্যবান্ উক্তি করিয়াছেন। সূত্রধার কালিদাসের নাটক অভিনয় করিবার আদেশ দিলে সহকারী আপত্তি তুলিল।

প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য
বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং বহুমানঃ।

'যাঁহাদের যশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এমন ভাস সৌমিল্ল প্রভৃতি ভালো কবিদের রচনা বাদ দিয়া এখনকার কবি কালিদাসের রচনাকে এত মর্যাদা হইতেছে কেন?'

সূত্রধার উত্তর দিল।

অয়ে বিবেকবিশ্রান্তমভিহিতম্। পশ্য
পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।।

'ওহে, বিবেচনাহীন কথা বলা হইল যে। দেখ, পুরানো বলিয়াই সব কিছু ভালো নয়, এবং নতুন বলিয়াই কোন কাব্য প্রশংসার অযোগ্য নয়। বিবেচকেরা পরীক্ষা করিয়া ভালোটিকে বাছিয়া নেন। বোকার বুদ্ধি অপরের মতে চলে।।'

কালিদাসের সময়ে নাট্যরীতি কেমন ছিল সে বিষয়ে মালবিকাগ্নিমিত্রে কিছু কিছু মূল্যবান্ তথ্য ছড়াইয়া আছে। কালিদাস নিজে যে নাট্যব্যাপারে অনিপুণ ছিলেন না সে অনুমানও এই নাটক ও পরবর্তী বিক্রমোর্বশীয় নাটক হইতে অনুমান করিতে পারি।

নাট্যাচার্য গণদাসের মুখে কালিদাস যে নাট্যপ্রশংসা শ্লোকটি দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃতির যোগ্য।

দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ শান্তং ক্রতুং চাক্ষুষং
রুদ্রেণেদমুমাকৃতব্যতিকরে স্বাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা।

১। যেমন 'রত্নাবলী', 'কর্পূরমঞ্জরী' ইত্যাদি।

২। পারিপার্শ্বিক।

ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানা রসং দৃশ্যতে
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্।।

'মুনিরা ইহাকে দেবতাদের, শান্ত চক্ষুঃকৃত্য যজ্ঞ মনে করেন। উমার আলিঙ্গনে রুদ্র ইহা নিজের অঙ্গে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছেন। ইহাতে ত্রিগুণাশ্রিত, নানা রসময়, দৃষ্ট লোকচরিত্র দেখা যায়। বহুধা ভিন্নরুচি লোকের এক সঙ্গে মনোরঞ্জন নাট্যই করিতে পারে।।'

বিক্রমোর্বশীয়

'বিক্রমোর্বশীয়'ও 'পঞ্চাঙ্ক' নাটক।[১] ইহা কালিদাসের দ্বিতীয় নাট্য-রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। এই অনুমানের পক্ষে একটি বড় যুক্তি—আরম্ভশ্লোকের ভাব। কালিদাসের তিনটি নাটকই শিববন্দনায় শুরু। কিন্তু তিনটি নান্দী-শ্লোকের ভাব বিভিন্ন। মালবিকাগ্নিমিত্রে কবি চাহিয়াছেন, অষ্টমূর্তি শিব যেন দর্শকমণ্ডলীর অজ্ঞানদৃষ্টি ঘুচাইয়া সৎপথে চলিবার প্রবৃত্তি দেন।

সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ।।

বিক্রমোর্বশীয়ের নান্দী-শ্লোকে বেদান্তের ঈশ্বরের রূপে শিবের বন্দনা। কবি চাহিয়াছেন দর্শকেরা যেন স্থির ভক্তিযোগ অবলম্বনে চরমকল্যাণ ("নিঃশ্রেয়স") প্রাপ্ত হয়।

স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ।।

বিক্রমোর্বশীয় নাটকের বিষয় ভারতীয় সাহিত্যের একটি গোড়াকার কাহিনী। পুরুরবস্-উর্বশীর প্রেমগাথা ঋগ্‌বেদে আছে। সে কাহিনী ব্রাহ্মণেও আছে। (আগে আলোচনা করিয়াছি।) পদ্য ও গদ্যের পর এখন নাটকে তা দেখা গেল। তবে কালিদাসের নাটকের গল্প আগাগোড়া বৈদিক (ও পৌরাণিক) সাহিত্যে পরিচিত আখ্যানের মতো নয়। ইহাতে উর্বশীপুরূরবার যে বিরহ-মিলনের কথা আছে তাহা কালিদাসেরই কল্পনা। আমার মনে হয় এখানেও কালিদাসের কল্পনা যেন সেকালের রূপকথার ধারা অনুসরণ করিয়াছে। কাহিনীর আলোচনায় তাহা ধরাইয়া দিব।

মালবিকাগ্নিমিত্রের মতো এ নাটকের প্রস্তাবনাতেও কবি আপনার নামটি বলিয়া দিয়াছেন, যথেষ্ট বিনয়ে।

প্রণয়িষু বা দাক্ষিণ্যাদথবা যদ্বস্তুপুরুষবহুমানাৎ
শৃণুত মনোভিরবহিতৈঃ ক্রিয়ামিমাং কালিদাসস্য।।

'প্রীতিপাত্রের প্রতি দাক্ষিণ্যবশেই হোক অথবা কাহিনীর নায়কের মর্যাদার জন্যেই হোক, (তোমরা) অবহিত হইয়া শোন কালিদাসের এই রচনাটি।।"

শিবপূজা করিতে উর্বশী কৈলাসে গিয়াছিল। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের মাঝপথে সে দেবশত্রুর কবলে পড়িয়া কাঁদিতেছে আর তাহার সখীরা 'কে আছ বাঁচাও' বলিয়া ডাক ছাড়িতেছে।—এই দৃশ্যে নাটক শুরু। সেই সময় রাজা পুরূরবা সূর্যপূজা করিয়া

১। কোন কোন পুথিতে বিক্রমোর্বশীয় "ত্রোটক" নামে উল্লিখিত। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে ও নাট্যলক্ষণগ্রন্থে ত্রোটকের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাহা কালিদাসের রচনাটি ধরিয়াই তৈয়ারি। "তোটক" ছন্দের সঙ্গে ত্রোটকের নামের তুলনা করা যায়। "ত্রুট্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইলে "কাটা কাটা তাল" এই অর্থে ত্রোটক-তোটক পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থ অঙ্কের নাচগানের জন্যই এই নাম।

ফিরিতেছিলেন। তিনি এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিয়া অসুরের হাত হইতে উর্বশীকে মুক্ত করিলেন। ভয়মূর্ছিত উর্বশী জ্ঞান পাইয়া রাজাকে দেখিল এবং প্রেমে পড়িল। রাজাও তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। রাজা উর্বশীকে নিজের রথে তুলিয়া লইয়া সখীদের কাছে পৌঁছাইয়া দিলেন। গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ আসিয়া রাজাকে তাঁহার বিক্রমের জন্য সাধুবাদ দিলেন।[১] তাহার পর গন্ধর্ব-অপ্সরারা রাজার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় লতাগুল্মে বস্ত্র আটকাইয়া গিয়াছে, এই ছলে উর্বশী রাজাকে যতক্ষণ পারে দেখিয়া লইল। তাহাতে রাজা উর্বশীর প্রেমফাঁদে আরও জড়াইয়া পড়িলেন। এইখানে প্রথম অঙ্ক শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্কে রাজার প্রেম-পরিপাক। উদ্যানে বৃক্ষলতার শোভা দেখিয়া ও বিদূষকের সহিত মনের কথা কহিয়া রাজা চিত্তের শান্তি খুঁজিতেছেন। উর্বশী আড়াল হইতে রাজার ভাব বুঝিয়া লইলেন। দুই জনের দেখা হইয়াছে, অমনি দেবদূত আসিয়া উর্বশীকে ডাকিয়া লইয়া গেল। তাহাকে দেবসভায় অবিলম্বে ললিত-অভিনয়[২] করিতে হইবে। উর্বশী চলিয়া গেলে রাজা বিদূষকের সহিত লতাগৃহে আসিলেন। রাজাকে লেখা উর্বশীর প্রেমপত্র যাহা একটু আগে হারাইয়া গিয়াছে তাহা বিদূষক ব্যাকুল হইয়া খুঁজিতেছে এমন সময়ে পরিচারিকার সঙ্গে দেবী কাশীরাজকন্যা সেখানে হাজির হইলেন। লতাগৃহে প্রবেশ করিবার আগেই ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোর মতো চিঠিখানি নিপুণিকা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, 'এ তো লেখ-সমন্বিত ভূর্জপত্র। পড়িব কি ?' দেবী বলিলেন, 'পড়িয়া দেখ। যদি অন্যায় কিছু লেখা না থাকে শুনিব।' নিপুণিকা পড়িয়া বলিল, 'এ তো মনে হইতেছে কলঙ্ককথা।[৩] মহারাজকে উদ্দেশ করিয়া উর্বশীর কাব্যরচনা বলিয়া বোধ হইতেছে।' চিঠি শুনিয়া দেবী বলিলেন, 'এই উপহার লইয়াই আমি অপ্সরা-প্রেমিককে দেখি গিয়া।' দেবীকে পত্রহস্তে লতাগৃহে ঢুকিতে দেখিয়া রাজা ও বিদূষক দুইজনেই মুশকিলে পড়িয়া গেল। রাজা ভাবিলেন, "সর্বথাহতোঽস্মি।" দেবী রাজার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'আর্যপুত্র, উদ্বেগ সংবরণ কর। এই তোমার ভূর্জপত্র।' রাজা বিদূষকের কানে কানে বলিলেন, 'ভাই এখন করি কি।'[৪] বিদূষক চুপি চুপি বলিল, 'হাতে নাতে ধরা-পড়া চোরের কৈফিয়ৎ নাই।[৫] বিদূষকের উপহাসে রাজা চটিয়া গেলেন। তিনি দেবীকে বলিলেন, 'দেবী, আমি তো ওটা খুঁজিতেছি না। যাহা আমি খুঁজিতেছি, সে গোপনীয় ফাইলের কাগজ।[৬] ক্রুদ্ধ হইয়া দেবী চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া রাজা তাহার পায়ে পড়িলেন। দেবী এই ভাবিয়া মনকে শক্ত করিয়া রাখিলেন।

> মা খু লহুহিঅআ অহং অণুণঅং বহু মণ্ণে। কিংতু দক্‌খিণ্ণকিদস্‌স পচ্ছাদাবসস্‌ ভাএমি।
> 'আমার হালকা মন। এই অনুনয়কে আমি যেন বড় করিয়া না দেখি। উদারতা দেখাইয়া পরে অনুতাপ জন্মিবে,—এমন কাজে আমার ভয় হয়।'
> ক্রোধমুখী হইয়া দেবী চলিয়া গেলে পর বিদূষক রাজাকে বলিল
> পাউসণদী বিঅ অপ্রসণ্ণা গদা দেবী।
> 'বর্ষার নদীর মতো অপ্রসন্ন হইয়া দেবী (বেগে) চলিয়া গেলেন।'

১। "দিষ্ট্যা মহেন্দ্রোপকারপর্যাপ্তেন বিক্রমমহিম্না বর্ধতে ভবান্।" এইখানে নাটক-নামে "বিক্রম"-অংশের ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

২। অর্থাৎ নটীনৃত্য।

৩। "তং এব্ব কোলীণং বিঅ পড়িহাদি।"

৪। "সখে কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্।"

৫। "লোত্তেণ গহিদস্স কুম্ভীলঅস্‌স অত্থি বা পডিবঅণং।"

৬। "তৎ খলু মন্ত্রপদং যদন্বেষণায় মমায়মারম্ভঃ।"

উর্বশী মন কাড়িয়া লইলেও দেবীর প্রতি রাজার সশ্রদ্ধ অনুরাগ অপগত হয় নাই। কিন্তু পায়ে ধরা উপেক্ষা করিলেন বলিয়া রাজা দেবীর সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করিলেন।[১] তখন বেলা দ্বিপ্রহর। এখানে দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

ইন্দ্রসভায় সরস্বতী-বিরচিত লক্ষ্মীস্বয়ংবর নাটে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করিতে গিয়া পুরূরবার প্রেমতন্ময় উর্বশী ভুল করিয়া "পুরুষোত্তম" (বিষ্ণু) বলিতে "পুরূরবা" বলিয়া ফেলিয়াছে। আচার্য ক্রুদ্ধ হইয়া তখনি তাহাকে অভিশাপ দিলেন, 'তোমার এখানে স্থান হইবে না।' লজ্জাবনতমুখী উর্বশীর অবস্থা বুঝিয়া ইন্দ্র অনুকম্পা করিয়া সে শাপকে ঘুরাইয়া বর করিয়া দিলেন, 'যাহার প্রতি তুমি অনুরাগিণী সেই রাজর্ষি রণে আমার সহায়তা করেন। তাঁহার মনোরঞ্জন করা তোমার কর্তব্য। যতদিন তিনি সন্তানের মুখ না দেখেন ততদিন তুমি যথেচ্ছ পুরূরবার পরিচর্যা কর।"[২] এই পর্যন্ত বিষ্কম্ভক[৩]। তাহার পর তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভ।

সন্ধ্যা নামিয়াছে। কঞ্চুকী চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া তদারক করিতেছে। রাজ-বাড়িতে সায়ংসন্ধ্যায় আয়োজন চমৎকার।[৪]

উৎকীর্ণা ইব বাসযষ্টিষু নিশানিদ্রালসা বর্হিণো
ধূপৈ র্জালবিনিঃসৃতৈর্বলভয়ঃ সংদিগ্ধপারাবতাঃ।
আচারপ্রযতঃ সপুষ্পবলিষু স্থানেষু চার্চিষ্মতীঃ।
সন্ধ্যামঙ্গলদীপিকা বিভজতে শুদ্ধান্তবৃদ্ধো জনঃ।।

'বসিবার দাঁড়ে ময়ূরগুলি নিশানিদ্রালস, যেন উৎকীর্ণ মূর্তি। গবাক্ষপথে নির্গত ধূমে কার্নিশে পায়রাগুলি দেখা যায় কি না যায়। যেসব স্থানে ফল ও নৈবেদ্য দেওয়া আছে সেখানে শুদ্ধ আচারে অন্তঃপুরের বৃদ্ধ পরিচারক সন্ধ্যার মঙ্গলদীপ জ্বালিয়া বসাইয়া দিয়া যাইতেছে।।'

রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রাজা দিন গোঁয়াইয়াছেন। এখন তাঁহার চিন্তা—বিনোদবিহীন দীর্ঘরাত্রি কাটে কিসে। কঞ্চুকী আসিয়া বলিল, দেবী জানাইতেছেন যে "মণিহর্ম্যপৃষ্ঠে সুদর্শনশ্চন্দ্রঃ", যদি রাজা আসেন তবে দুইজনে চন্দ্ররোহিণীযোগ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারা যাইবে। রাজা বিদূষককে লইয়া মণিহর্ম্যের ছাদে আসিলেন। অভিসারিকার বেশে উর্বশীও সহচরী চিত্রলেখার সহিত আকাশযানে করিয়া সেখানে আসিল এবং অন্তরালে থাকিয়া রাজার বিরহকথা শুনিতে লাগিল। এমন সময় দেখা গেল দেবী আসিতেছেন। দেবীর পরনে শাদা কাপড়, কল্যাণের জন্য সামান্য কিছু অলঙ্কার অঙ্গে। অলকে পবিত্র দূর্বাঙ্কুর লাগিয়া আছে। ব্রতপালনের ভক্তিতে তাঁহার নম্র মূর্তি। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা মনে করিলেন যেন বসুন্ধরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আগাইয়া আসিতেছেন।

সিতাংশুকা মঙ্গলমাত্রভূষণা
পবিত্রদূর্বাঙ্কুরলাঞ্ছিতালকা।
ব্রতোপদেশোজ্ঝিতগর্ববৃত্তিনা
ময়ি প্রসন্না বসুধেব লক্ষ্যতে।।

১। "উর্বশীগতমনসোঽপি মে স এব দেব্যাং বহুমানঃ। কিং নু প্রণিপাতলঙ্ঘনাদহমস্যাং ধৈর্যমবলম্বয়িষ্যে।
২। মধ্য বাংলা সাহিত্যেও নায়কনায়িকার এইভাবেই স্বর্গচ্যুতি ও মর্ত্যাবতরণ কল্পিত হইয়াছে।
৩। অঙ্কের গোড়ায় (অথবা মধ্যে) অন্য স্থানের ঘটনার—যাহার সহিত মূল কাহিনীর সাক্ষাৎ যোগ নাই—দৃশ্য সংস্কৃত নাটকে "বিষ্কম্ভক" নামে পরিচিত। বিস্কম্ভক মানে রঙ্গশালার বহির্দেশ।
৪। "রমণীয়ঃ খলু দিবসাবসানবৃত্তান্তো রাজবেশ্মনি।"

রাজা হাত ধরিয়া দেবীকে স্বাগত করিলেন। আড়াল হইতে লক্ষ্য করিয়া উর্বশী সপত্নীর সম্বন্ধে সখীর কাছে মন্তব্য করিল।

ণ কিংপি পরিহীঅদি সচীদো ওজস্‌সিদাএ।

'মহিমায় (ইনি) শচীর তুলনায় কোন অংশে কম যান না।'

দেবী রাজাকে পূজা করিয়া চন্দ্ররোহিণীকে সাক্ষী রাখিয়া বলিলেন, 'আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে নারীকে আর্যপুত্র কামনা করিবেন সে নারী যদি আর্যপুত্রকে কামনা করে, তবে আমি তাহার সহিত সদ্‌ভাবে থাকিব।' অন্তরাল হইতে এই কথা শুনিয়া উর্বশীর মন আশ্বস্ত হইল।

দেবী চলিয়া গেলে উর্বশী পিছন হইতে চুপি চুপি আসিয়া রাজার চোখ টিপিয়া ধরিল। তাহার ছোঁয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন। উর্বশী রাজ-অবরোধে ধরা দিল। এইখানে তৃতীয় অঙ্ক শেষ।

তৃতীয় অঙ্কের পর অনেক কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের মধ্যবর্তী ঘটনার বিবরণ দিবার জন্য চতুর্থ অঙ্কের গোড়াতেই একটি "প্রবেশক"[১] আছে। উর্বশীর দুই সখী চিত্রলেখা ও সহজন্যার সংলাপে বিবরণ ব্যক্ত।

অমাত্যদের উপর রাজকার্যভার ন্যস্ত করিয়া রাজা উর্বশীকে লইয়া, তাহার কথায় কৈলাসশিখরে গন্ধমাদন বনে বিহার করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে মন্দাকিনীর তীরে উদয়বতী নামে এক বিদ্যাধর-কন্যা বালির গাদা করিয়া খেলিতেছিল।[২] তাহার দিকে রাজা অনেকক্ষণ তাকাইয়া আছেন, এই ভাবিয়া উর্বশী অভিমানিনী হয়। রাজার অনুনয় না মানিয়া সে রাজাকে এড়াইয়া এদিকে ওদিকে ছুটিতে ছুটিতে ভুল করিয়া কুমার-বনে ঢুকিয়া পড়ে। পার্বতীপুত্রের এই সংরক্ষিত উদ্যানে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কুমার-বনের উপান্তে প্রবেশ করিবামাত্র উর্বশী লতা হইয়া গেল। তাহাকে না দেখিয়া রাজা সেই হইতে পাগলের মতো হইয়া সেই বনে ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই পর্যন্ত প্রবেশক।

উন্মত্ত অবস্থায় রাজার নাচ গান অঙ্গভঙ্গি[৩] ও বিলাস চতুর্থ অঙ্কের বিষয়। প্রবেশকের গোড়ায় ও শেষে কয়েকটি গান আছে। (বিক্রমোর্বশীয় নাটকের চতুর্থ অঙ্কের এই গানগুলি প্রায় সবই অপভ্রংশে রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে অপভ্রংশ ভাষা এই প্রথম দেখা গেল। গানগুলি তখনকার জনসাধারণের ব্যবহার্য ভাষায় লোক-সাহিত্যের ছাঁদে বিরচিত। অপভ্রংশ গানের এই ধারাই বহিয়া আসিয়া অবশেষে জয়দেবের গানে ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।)

বৈদিক আখ্যায়িকায় উর্বশীর ও তাহার অপ্সরা-সহচরীদের হংসীরূপ ধারণের উল্লেখ আছে। কালিদাসের নাট্যকাহিনীতে তাহা নাই। তবে চতুর্থ অঙ্কের কোন কোন গানে একটু ইঙ্গিত আছে।

১। "প্রবেশক" বিষ্কম্ভকেরই মতো। শুধু তফাৎ এই যে প্রবেশকের ও মূল অঙ্কের ঘটনা একই স্থানে, বিষ্কম্ভকে ভিন্ন স্থানে। এখানে 'প্রবেশক' মানে অঙ্ক আরম্ভের পূর্বে অভিনয় অথবা বক্তৃতা।

২। তুলনীয় মেঘদূতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক, "মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ ..."।

৩। রাগরাগিণী নৃত্যমুদ্রা অভিনয়ভঙ্গি ও নাচগানের তালজ্ঞাপক অনেকগুলি অপরিচিত সংজ্ঞা-শব্দ চতুর্থ অঙ্কে আছে। যেমন, দ্বিপদিকা, খণ্ডধারা, চর্চরী, জম্ভলিকা, খণ্ডক, খুরক, বলন্তিকা, ভিন্নক, ককুভ, কুটিলিকা, মল্লঘটী, চতুরক, অর্ধ-দ্বিচতুরক, স্থানক, খণ্ডিকা, গলিতক ইত্যাদি। ইহার মধ্যে তিনটি শব্দ কালোচিত রূপান্তরে পরবর্তীকালে—চাঁচরি, চাচর (< চর্চরী); কহু, কউ (< ককুভ); ঝুমুর, ঝুমুল (< জম্ভলিকা)।

সহঅরিদুক্‌খালিদ্ধঅং
সরবরঅম্মি সিনিদ্ধঅং।
বাহোবগি্ গঅণঅণঅং
তম্মই হংসীজুঅলঅং।।

'সহচরীর দুঃখে পীড়িত হইয়া, স্নেহশীল হংসীযুগল অশ্রু-আবিল নয়নে, সরোবরে দুঃখ পাইতেছে।।'

এখানে হংসীযুগল হইতেছে উর্বশীর দুই সখী—চিত্রলেখা ও সহজন্যা।

চিন্তাদুম্মিঅমাণসিআ
সহচরিদংসণলালসিআং।
বিঅসিঅকমলমণোহরএ
বিহরই হংসী সরোবরএ।।

'চিন্তা-আকুলিতমনে হংসী সহচরীর দর্শনলালসা লইয়া কমলবিকশিত মনোহর সরোবরে চরিয়া বেড়াইতেছে।।'

এখানে হংসী উর্বশীকে বুঝাইতেছে।

হিঅআহিঅপিঅদুক্‌খও
সরবরএ ধুঅপক্‌খও।
বাহোবগ্ গিঅণঅণও
তম্মই হংসজুআণও।।

'হৃদয়ে প্রিয়া (-বিরহ) দুঃখভার লইয়া অশ্রু-আকুল নয়নে হংসযুবা সরোবরে পক্ষবিধুনন করিয়া খেদ করিতেছে।।'

এখানে হংসযুবা হইল পুরূরবা।

ঋগ্‌বেদের কবিতায় পুরূরবা উর্বশীকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি আমাকে গ্রহণ না করিলে আমি পাগল হইয়া যে দিকে দুই চোখ যায় চলিয়া যাইব।' সেই ভাবটুকু লইয়া কালিদাস তাঁহার নাটকের চতুর্থ অঙ্ক রচনা করিয়াছিলেন। কালিদাস রাজাকে সত্যসত্যই পাগল করিয়াছেন এবং রাজার পাগলামির সুযোগে তাঁহার কালের নাটুয়ার একক (solo) নাচগানের পরিচয় দিয়াছেন। গানগুলির আরও কিছু উদাহরণ দিই।

রাজা ভাবিতেছেন, 'আমার মনে হইতেছে নিশ্চয়ই কোন নিশাচর মৃগলোচনা উর্বশীকে ধরিয়া রাখিয়াছে। যতক্ষণ নবতড়িৎবান্ শ্যামল মেঘ বর্ষণ না করে (ততক্ষণ তাহাকে সে ছাড়িবে না)।'[১]

মই জাণিঅ মিঅলোঅণি নিসিঅরু কোই হরেই।
জাব ন নভতলি সামল ধারাহরু বরিসেই।।

কহু ("ককুভ") রাগে (?) গাওয়া এই ষট্‌পদী ("ষড়ুপভঙ্গা")[২] পদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পিঅঅমবিরহকিলামিঅবঅণও
অবিরলবাহজলাউলণঅণও।

১। এই প্রসঙ্গে আধুনিককালের লোকবিশ্বাস—মেঘ ডাকিলে তবে কোন কোন আপদ ছাড়িয়া যায়—স্মরণীয়।

২। "ককুভেন ষড়ুপভঙ্গা"।

দুসহদুক্খবিসংঠুলগমণও
পসরিঅগুরুতাবদীপিঅঅংগও।
অহিঅং দুম্মিঅমাণসও
কাণণে ভমই গইদংও।।

'প্রিয়তমার বিরহে ক্লান্তবদন, অবিরল অশ্রুধারায় আকুলনয়ন, দুঃসহ দুঃখে উদ্‌ভ্রান্তগমন, প্রসারিত গুরুতাপে দীপ্ত-অঙ্গ, গজেন্দ্র অতিশয় ব্যাকুল মনে কাননে ভ্রমণ করিতেছে।।'

অকস্মাৎ রাজার মনে হইল, ওই বুঝি নূপুরধ্বনি শোনা যায়। কান পাতিয়া ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

মেঘশ্যামা দিশো দৃষ্টা মানসোৎসুকচেতসা।
কূজিতং রাজহংসেন নেদং নূপুরশিঞ্জিতম্।।

'দিগন্তরাল মেঘশ্যাম দেখিয়া মানসসরোবরে গমনের সময় আসিয়াছে জানিয়া উৎসুক চিত্তে রাজহংস কূজন করিতেছে। নূপুরশিঞ্জন এ নয়।।'

উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রাজা হরিণীসঙ্গপ্রার্থী হরিণকে দেখিয়া আগাইয়া যাইতেছেন। তখন সে কাননে এক ঐরাবত প্রবেশ করিতেছে। এইখানে যে পদটি আছে তাহার ভাষা সংস্কৃত কিন্তু ছন্দ পরিচিত নয়,—মিল নাই, তাল গদ্যের।

অভিনবকুসুমস্তবকিততরুবরস্য পরিসরে
মদকলকোকিলকূজিতরবঝঙ্কারমনোহরে।
নন্দনবিপিনে নিজকারিণী-বিরহানলসন্তপ্তো
বিচরতি গজাধিপ ঐরাবতনামা।।

'দণ্ডক' ছন্দে লেখা সংস্কৃত পদ (গান) এই প্রথম পাইলাম।

অরণ্যপ্রাণীদের দেখিয়া রাজা প্রিয়ার কথাই ভাবিতেছেন এবং তাহাদের কাছে প্রিয়ার সন্ধান মাগিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল, উন্নত শিলার গায়ে যেন রক্তকদম্ব অথবা রক্তাশোকগুচ্ছের মতো ফুল ফুটিয়া আছে। প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া তিনি হাত বাড়াইলেন। কিন্তু সে তো ফুল নয় দুর্লভ মণি। মণিটি হাতে করিয়া রাজা ঘুরিতেছেন এমন সময় দৈববাণী হইল,—'এই মণির দ্বারা তুমি হারানো প্রিয়াকে পাইবে।' সেই মণি লইয়া রাজা কৌতূহলবশে একটি কুসুমহীন লতাকে স্পর্শ করিলেন। অমনি লতা উর্বশী হইয়া গেল। প্রিয়াকে পাইয়া বিরহী রাজা সুস্থ হইলেন। চতুর্থ অঙ্ক এইখানে শেষ।

উর্বশীকে লইয়া রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সকলে খুশি। হঠাৎ রাজান্তঃপুরে হাহাকার উঠিল—আমিষভ্রমে এক গৃধ্র মণিটি ছোঁ মারিয়া লইয়া গিয়াছে। রাজা ধনুর্বাণ লইয়া ছুটিলেন কিন্তু পাখির লাগ পাওয়া গেল না। পাখি অবশ্যই তাহার নীড়ে ফিরিবে এবং তখন মণি পাওয়া যাইবে, এই ভাবিয়া রাজা নাগরিকদের ক্ষান্ত করিলেন। একটু পরেই কঞ্চুকী মণি ও একটি বান লইয়া আসিল। সেই বাণে পাখি বিদ্ধ হইয়াছিল। রাজা বলিলেন, মণি অগ্নিশুদ্ধ করিয়া সিন্দুকে রাখ। তাহার পর রাজা বাণটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহাতে শিকারীর নাম-লেখা শ্লোক আছে।

উর্বশীসম্ভবস্যায়মৈলসূনোর্ধর্সুর্ভৃতঃ।
কুমারস্যায়ুষো বাণঃ প্রহর্তু দ্বিষদায়ুষাম্।।

'উর্বশী-জাত, ঐল-পুত্র, ধনুর্ধারী, শত্রুর জীবননাশক কুমার আয়ুর বাণ।।'

বিদূষক রাজাকে অভিনন্দিত করিল। রাজা কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'নৈমিষীয় সত্রের পর হইতে উর্বশীর সহিত আমি সব সময়েই আছি। তাহার গর্ভলক্ষণ তো দেখি নাই। সুতরাং সন্তান হইল কখন? তবে সে সময়ে দিন কতক তাহার পয়োধরাগ্র শ্যামবর্ণ, বদন পাণ্ডুরচ্ছবি আর চক্ষু অলসদৃষ্টি হইয়াছিল বটে।' বিদূষক বলিল, 'অপ্‌সরাদের কাণ্ড মানুষের মেয়েদের মতো নয়। তাহাদের চরিত্রপ্রভাব বড় গূঢ়।' রাজা বলিলেন, 'তা না হয় হইল। কিন্তু পুত্রকে লুকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য কী?' বিদূষক পরিহাস করিয়া উত্তর দিল, "বুড়ী হইয়াছি মনে করিয়া রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিবে,"[১] এই ভয়ে।' রাজা বলিলেন, 'ঠাট্টা রাখ। ভাবিয়া বল।'

এমন সময় কঞ্চুকী আসিয়া বলিল, একটি বালককে লইয়া এক তাপসী দেখা করিতে আসিয়াছেন। রাজা তাহাদের আনিতে বলিলেন।

দূর হইতে ছেলেটিকে দেখিয়া রাজার মনে স্নেহ জাগিল।

বাষ্পায়তে নিপতিতা মম দৃষ্টিরস্মিন্
বাৎসল্যবন্ধি হৃদয়ং মনসঃ প্রসাদঃ।
সংজাতবেপথুভিরুজ্ঝিতধৈর্যবৃত্তির্
ইচ্ছামি চৈনমদয়ং পরিরব্ধুমঙ্গৈঃ।।

'আমার চোখ ইহার উপর পড়িয়া জলে ভরিয়া উঠিতেছে। হৃদয়ে যেন বাৎসল্যে টান পড়িতেছে। মনে প্রসন্নতা জন্মিতেছে। কাঁপন জাগিতেছে। আমার ধৈর্য লুপ্ত হইতেছে। ইচ্ছা হইতেছে উহাকে অঙ্গে দৃঢ় জড়াইয়া ধরি।।'

তাপসী পিতাপুত্রের পরিচয় করাইয়া দিল। তাপসীর আদেশে কুমার পিতার পাদবন্দন করিল। পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া রাজা তাহাকে পাদপীঠে বসাইলেন। বলিলেন, 'বৎস এই তোমার পিতার প্রিয়সখা ব্রাহ্মণ। ভয় করিও না, ইঁহাকে প্রণাম কর।' বিদূষক বলিল, 'ভয় করিবে কেন? আশ্রম বাসকালে তো শাখামৃগ দেখিয়াছে।'[২]

তাহার পর সভায় উর্বশীকে আনা হইল। কুমারের মাতৃপরিচয় হইল।

তাপসী চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কুমারও তাহার সঙ্গে যাইতে চায়। রাজা তাহাকে নিষেধ করিলেন। তাপসী বলিল, বৎস, পিতার কথা মানো।' তখন কুমার তাহাকে বলিয়া দিল।

যঃ সুপ্তবান্ মদঙ্গে শিখণ্ডকণ্ডুয়নোপলব্ধসুখং।
তৎ মে জাতকলাপং প্রেষয় মণিকণ্ঠকং শিখিনম্।।

'যে শিখণ্ডককণ্ডুয়নসুখ অনুভব করিতে করিতে আমার কোলে ঘুমাইত সেই মণিকণ্ঠ ময়ূরটি, তাহার পুচ্ছ উদ্‌গত হইলে, আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।।'

পুত্রলাভ হইয়াছে, এখন উর্বশীকে ছাড়িতে হইবে। দুজনেই ব্যাকুল। রাজার অবস্থা দেখিয়া বিদূষক বলিল, 'এখন মনে হইতেছে আপনাকে বল্কল ধারণ করিয়া তপোবনে যাইতে হইবে।'[৩]

রাজা সেই ভাবিয়া আয়ুকে তখনি রাজ্যাভিষিক্ত করিবার হুকুম দিলেন। অমনি

১। "মা বুড়্‌চিং মং রাজা পরিহরিস্ সর্দি ত্তি"।
২। "কিংত্তি সংকিস্‌সদি। অস্‌সমবাসপরিচিদো এব্ব সাহামিও।'
৩। "সংপদং তক্কেমি তত্থভবদা বক্কলং গেস্থিঅ তবোবণং গন্তব্বং ত্তি।"

বিদ্যুৎপাতের মতো রাজসভায় নারদের আবির্ভাব ঘটিল। নারদ জানাইলেন যে ইন্দ্র তাঁহাকে অস্ত্রত্যাগ করিয়া বনে যাইতে নিষেধ করিতেছেন এবং আদেশ দিতেছেন যে উর্বশী তাঁহার সহধর্মিণী হইয়া থাকিবে।

একটু পরে কুমার আয়ুর যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য ইন্দ্রপ্রেরিত উপচার লইয়া রম্ভা আসিল। রম্ভার সহিত উর্বশীর মিলন হইল। উর্বশী পুত্রকে বলিল, 'এস, বৎস, বড়মাকে প্রণাম কর।'[১] আয়ু রম্ভাকে প্রণাম করিল। আয়ুর অভিষেক হইয়া গেল। রাজা নারদের দ্বারা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানাইলেন

পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়দুর্লভম্।
সংগতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূতয়েঽস্তু সদা সত্যম্।।

'পরস্পরবিরোধিনী শ্রী ও সরস্বতীর একত্রস্থিতিরূপ দুর্লভ মিলন সৎলোকের কল্যাণের নিমিত্ত সর্বদা ঘটুক।।'

কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকের কাহিনী বেদের অনুসারী নয় পুরাণের অনুসারীও নয়। বরং রূপকথার অনুযায়ী বলা চলে। তবে বেদের কাহিনীর সঙ্গে ক্ষীণ একটু যোগসূত্র আছে। সে হইল চতুর্থ অঙ্কের গানে হংসীবিলাসের উল্লেখ আর সেই সঙ্গেই উর্বশী-বিরহিত পুরূরবার উন্মত্তবৎ আচরণ। কালিদাস যেভাবে উর্বশীর মর্ত্যে আগমন ঘটাইয়াছেন তাহা বহুকাল পরে মধ্য বাংলার "মঙ্গল"-কাব্যে নায়ক-নায়িকার বেলায় পাইতেছি। উর্বশীর লতা-রূপধারণ ও মণিস্পর্শে মানবত্বপ্রাপ্তি আর পাখির মণিহরণ—ইহাও রূপকথার মোটিফ।

বিক্রমোর্বশীয় কালিদাসের (এবং সমগ্র প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের) একমাত্র গীতিনাট্য (—অবশ্য একালের সংজ্ঞা অনুসারে নয়, একালের গীতিনাট্যের নিকটতম প্রাচীন নাট্যনিবন্ধ হিসাবেই)। সেকালের কথ্যভাষায় গানের সবচেয়ে পুরাতন এবং খাঁটি নিদর্শন বিক্রমোর্বশীয়ের চতুর্থ অঙ্কে পাইতেছি। এই গানগুলি অপভ্রংশ ভাষার সবচেয়ে পুরানো নিদর্শনও বটে।

কালিদাসের তিনটি নাটকেই প্রেমের কাহিনী এবং তিনটি কাহিনীতেই নায়ক বিদগ্ধ, অতরুণ এবং বিবাহিত। দুইটি নাটকে নায়িকা অবিদগ্ধা বিবাহযোগ্য তরুণী। বিক্রমোর্বশীয়ে নায়কের মতো নায়িকাও বিদগ্ধ এবং যাহাকে ইংরেজীতে বলে, এক্স্পীরিয়েন্স্ড্, অর্থাৎ অভিজ্ঞ। এখানে মৃচ্ছকটিকের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে দুই পক্ষের প্রেমচেষ্টা সমানভাবে উপস্থাপিত নয়। বিক্রমোর্বশীয়ে তাহা সমভাবে উপস্থাপিত।

বিক্রমোর্বশীয়ের প্রস্তাবনায় নাটকটির নাম উল্লিখিত নাই। কালিদাসের অপর দুইটি নাটকে নাম দেওয়া আছে।

১। "এহি যচ্ছ জেট্ঠমাদরং অভিবন্দেহি।"

অভিজ্ঞানশকুন্তল

কালিদাসের নাটক তিনটির মধ্যে 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' (সংক্ষেপে 'শাকুন্তল') শেষ রচনা বলিয়া মনে হয়। নাটকটির অন্তিম শ্লোক হইতে জানা যায় যে কবির তখন বয়স পরিণত এবং তাঁহার মন পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতাং[১] মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ।।

'রাজা প্রজার হিতে প্রবৃত্ত থাকুন। জ্ঞানগুরুদের বাণী জয়লাভ করুক।
আর শক্তি-আলিঙ্গিত স্বয়ম্ভু নীললোহিত আমার পুনর্জন্ম ছিন্ন করুন।।'

শাকুন্তলে সাত অঙ্ক। নাটকটির দুইটি পাঠ প্রচলিত আছে। একটি পাঠ পাওয়া যায় বাংলা অক্ষরে লেখা পুথিতে। দ্বিতীয় পাঠ পাওয়া যায় নাগরী ও দক্ষিণ ভারতের অক্ষরে লেখা পুথিতে। দ্বিতীয় পাঠ প্রথম পাঠের চেয়ে ছোট। (সুতরাং কালিদাসের নিজ কৃত সংস্করণ হওয়া অসম্ভব নয়।) অনেক বিষয়ে, বিশেষ করিয়া প্রাকৃত অংশে প্রথম পাঠ অনেক ভালো। প্রথম অর্থাৎ বাংলা পাঠে[২] অতিরিক্ত যে সব শ্লোক আছে তাহার মধ্যে দুই একটির রচনা খুব উজ্জ্বল নয়। এগুলি বাঙালী পাঠক-লিপিকরের ভালো লাগার উৎসাহেরই ফল হওয়া সম্ভব। (বাংলা দেশে কালিদাসের রচনার ভক্ত পাঠকের অভাব কখনই ছিল না এবং সাহিত্যরসের দিক দিয়া সংস্কৃত কাব্যের সমাদর ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম ছিল না।) এই আলোচনায় আমি শাকুন্তলের বাংলা পাঠই অবলম্বন করিয়াছি।[৩] বাংলা পাঠের অধিকাংশ পুথিতে শেষ অঙ্ক ছাড়া সব অঙ্কের নাম দেওয়া আছে। যেমন প্রথম অঙ্ক—"আখেটক", দ্বিতীয় অঙ্ক—"আখ্যান-গুপ্তি", তৃতীয় অঙ্ক—"শৃঙ্গারভোগ", চতুর্থ অঙ্ক—"শকুন্তলাপ্রস্থান", পঞ্চম অঙ্ক—"শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যান", ষষ্ঠ অঙ্ক—"শকুন্তলাবিরহ"।

শাকুন্তল কালিদাসের লেখনীর পবিণামরমণীয় সৃষ্টি। তাহার মধ্যে চতুর্থ অঙ্কে কবি যে নব রস ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা ভারতীয় সাহিত্যে তুলনাবিহীন। সেকালের কোন এক অজ্ঞাত বাঙালী বিদগ্ধ সমালোচকের এই যে শ্লোকটি শাকুন্তলের পুথিবাহিত হইয়া আমাদের কাছে আসিয়াছে তাহার রচনায় চাতুর্য নাই কিন্তু ভাবে মর্মজ্ঞতা আছে:

কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা।।

কোন এক আরও সারার্থদর্শী সমালোচক (—তিনি নিতান্ত আধুনিক কালের মানুষ বলিয়া সন্দেহ করি, ইম্পর্টেন্ট দাগ দেওয়া বই-পড়া পরীক্ষার্থী কোন পণ্ডিত হওয়াও অসম্ভব নয়—) শ্লোকটির শেষ অংশ বদল করিয়াছেন।

তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্ক স্তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্।।

১। পাঠান্তরে "শ্রুতিমহতী"—'বেদবিদ্যাময়ী বলিয়া মহত্ত্ব'।
২। ইংরেজী অনুসারে Bengali recension
৩। পিশেল (Richard Pischel) সম্পাদিত (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২২)।

কী এই চতুষ্টয় শ্লোক, তাহা চতুর্থ অঙ্কের আলোচনায় দেখাইব।

অষ্টমূর্তি শিবের বন্দনায় শাকুন্তলের আরম্ভ। সূত্রধার নটীকে আদেশ দিল, 'এই পরিষদে বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হইয়াছে। এখানে আমরা শ্রীকালিদাস যাহার কাহিনী গাঁথিয়াছেন সেই নূতন অভিজ্ঞানশকুন্তল নামক নাটক দিয়া আনন্দ বিধান করিব।[১] অতএব প্রত্যেক ভূমিকায় যত্ন লওয়া হোক।' নটী বলিল, 'আপনার সুবিহিত নাট্যনৈপুণ্যের জন্য কিছুতেই ত্রুটি হইবে না।' সূত্রধার হাসিয়া বলিল, 'মহাশয়া, আপনাকে তবে সত্যকথা বলি।

আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।।

'বিদ্বদ্‌মণ্ডলীর পরিতোষ না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োগ-বিজ্ঞানের[২] প্রশংসা করিতে পারি না। শিক্ষিতদের চিত্তও নিজের বিষয়ে অত্যন্ত সংশয়যুক্ত হয়।।'

নটী বলিল, 'তা বটে। এখন কি করিতে হইবে মহাশয় আজ্ঞা করুন।'

সূত্রধার বলিল, 'পরিষদ্‌মণ্ডলীর কর্ণরসায়ন গান ছাড়া আর কি অব্যবহিত করণীয় আছে।'

নটী বলিল, 'কি ঋতু আশ্রয় করিয়া গাহিব?'

সূত্রধার বলিল, 'অচিরপ্রবৃত্ত, উপভোক্ষম এই গ্রীষ্ম-ঋতু[৩] আশ্রয় করিয়া গান করা হোক। এখন

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলিসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।

সলিলে অবগাহন সুখকর। বনের হাওয়া পারুল ফুলের গন্ধ-মাখা।'
ছায়াতলে ঘুমে ঢুলায়। দিনগুলির অবসান মধুর।।'

তাহার পর নটী গান ধরিল।

ঋণচুম্বিআইঁ ভমরেহি উঅহ সুউমারকেসরসিহাই।
অবঅংসঅন্তি সদঅং সিরীসকুসুমমাইঁ পমআও।।

'দেখ ভ্রমরের দ্বারা মুহূর্তকালমাত্র চুম্বিত পেলব-কেশরশিখাবিশিষ্ট শিরীষ ফুলগুলি মেয়েরা সন্তর্পণে কানে পরিতেছে।'

গানের প্রশংসার সঙ্গে নাট্যকাহিনীর আরম্ভ জ্ঞাপন করিয়া সূত্রধার প্রস্তাবনা শেষ করিয়া দিল।

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা।।

প্রথম অঙ্কে মৃগয়ারত রাজা দুষ্যন্তের আশ্রমমৃগের অনুসরণক্রমে মালিনীতীরে কণ্বের আশ্রমে আগমন এবং শকুন্তলা ও তাহার দুই সখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। দ্বিতীয় অঙ্কে শকুন্তলার প্রেমাসক্ত রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক হইয়া সখা বিদূষককে প্রতিনিধি করিয়া রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। তৃতীয় অঙ্কে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমবিলাস। রাজা শকুন্তলার প্রেমে আতুর, শকুন্তলাও রাজার প্রেমে কাতর। শকুন্তলা সখীদের সঙ্গে মনের কথা কহিতেছে,

---

১। "অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ। তস্যাং চ শ্রীকালিদাসগ্রথিতবস্তুনা নবেনাভিজ্ঞানশকুন্তলনাম্না নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ। তৎ প্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ।"

২। "প্রয়োগবিজ্ঞান" মানে ব্যবহারিক বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি (skill in practical science)। এখানে "প্রয়োগ" মানে নাট্যপ্রয়োগ (dramatic performance)।

৩। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় বসন্ত-উৎসবের উল্লেখ স্মরণীয়।

রাজা আড়ালে তাহা শুনিলেন। শকুন্তলা মনোভাব রাজাকে জানানোর উপায় রূপে সখী প্রিয়ংবদা ঠাওরাইল, শকুন্তলা রাজাকে প্রেমপত্র লিখুক। সে চিঠি সে ফুলের মধ্যে লুকাইয়া দেবতার নির্মাল্য ছলে রাজার হাতে দিয়া আসিবে।[১] সখী অনসূয়াও মত দিল। শকুন্তলার ভয় হইল, যদি সে চিঠি অন্য কাহারও হাতে পড়ে।[২] প্রিয়ংবদা বলিল, তাহা হইলে নিজের ভাবের উপস্থাপনের উপযোগী গান রচনার কথা ভাবো।[৩] শকুন্তলা বলিল, ভাবিতে পারি কিন্তু ভয় হইতেছে যদি সে প্রত্যাখ্যান করে। সখীরা একবাক্যে বলিল, কোন ভয় নাই। এমন কে আছে যে সন্তাপনিবর্তক শারদ জ্যোৎস্নায় ছাতা আড়াল দেয়? তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া শকুন্তলা এক গান রচনা করিল। কিন্তু লেখা যায় কিসে? এবারেও প্রিয়ংবদা বুদ্ধি যোগাইল,—পদ্মপাতার নরমপিঠ কাগজ, নখ কলম। গান লিখিয়া শকুন্তলা সখীদের শুনাইল।

তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা অ রত্তিং অ।
নিক্কিব দাবই বলিঅং তুহ হুত্তমণোরহাইঁ অঙ্গাইঁ।।

'তোমার মন তো জানি না। তবে, হে নিষ্ঠুর, তোমার অভিমুখ আমার দেহকে মদন কি দিবা কি রাত্রি সবলে দহন করিতেছে।।'

চিঠি পাঠাইতে হইল না। আড়াল হইতে শুনিয়া রাজা তখনি দেখা দিলেন। শকুন্তলাকে মদনের কবল হইতে বাঁচাইবার জন্যই যেন প্রিয়ংবদা রাজার হাতে তাহাকে অর্পণ করিল।[৩]

শকুন্তলা কটাক্ষ করিয়া বলিল, 'কেন তোমরা অন্তঃপুরবিরহপর্যুৎসুক রাজর্ষিকে উপরোধ করিতেছ?' শকুন্তলার কথায় অনসূয়া চকিত হইয়া রাজাকে অনুরোধ করিল, 'মহারাজ, শোনা যায় রাজারা বহুবল্লভ। তাই যাহাতে আমাদের এই প্রিয়সখী বন্ধুজনের শোচনীয়া না হয় তেমন করিবেন।'[৪] রাজা বলিলেন, 'বেশি আর কি বলিব। একদিকে আমার সসাগরা বসুন্ধরা রাজ্য আর এক দিকে আপনাদের এই সখী।'

চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া শকুন্তলা রাজাকে বলিল, 'হে পুরুবংশীয় বীর, শুধু কথার সূত্রে পরিচিত এই মানুষটি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিলেও তাহাকে তুমি ভুলিও না।' ("অনিচ্ছাপুরও বি সংভাসণমেত্তএণ পরিচিদো অঅং জনো ণ বিসুমরিদব্বো।")

রাজা উত্তর দিলেন, 'সুন্দরি

ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিনাবসানচ্ছায়েব পুরোমূলং বনস্পতেঃ।।

'তুমি দূরে চলিয়া গেলেও আমার হৃদয় ছাড়ো না,
যেমন দিনাবসানের ছায়া বনস্পতির মূলাগ্র (হইতে সরে না)।'

অন্তরালে থাকিয়া শকুন্তলা রাজার প্রণয়বেদনার পরিচয় পাইল। তাহার পর দুইজনের বিশ্রদ্ধ মিলন ঘটিল। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পিসী গৌতমী আশ্রমবাটিকার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া সখীরা ইঙ্গিতে শকুন্তলাকে সাবধান করিয়া দিল।

"নেপথ্যে। চক্কবাঅবহু আমন্তেহি সহঅরং। উবট্ঠিদা রঅণা।'[৫]

১। "মদণলেহা দাণিং সে করীঅদু। তং অহং সমণো-গোবিদং কদুঅ দেবদাসেসাদদেসেণ অস্স রণ্ণে হত্থং পাবইস্সং।'
২। "নিওও বি বিঅপ্পীঅদি।"
৩। "তেণ হি অত্তণো উবণ্ণাসানুরুবং চিন্তেহি কিংপি...গীদঅং।"
৪। "ইঅং ণো পিঅসহী তুমং উদ্দিসিঅ ভঅবদা মঅণেণ ইমং অবত্থন্তরং কারিদা। তা অরিহসি অব্ভুববত্তীএ জীবিদং সে অবলম্বিদুং।"
৫। 'চক্রবাকবধূ, সহচরের কাছে বিদায় লও। রাত্রি সমাগত।'

রাজা সরিয়া পড়িলেন। গৌতমী আসিয়া শকুন্তলাকে কুটীরে লইয়া গেলেন। রাজা শকুন্তলার কথাই ভাবিতেছেন এমন সময় দূর হইতে তাঁহার ডাক পড়িল। সন্ধ্যাহোম আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, অমনি রাক্ষসেরা যজ্ঞবিঘ্নের জন্য সমাগত হইয়া ছায়ারূপে বিচরণ করিয়া আশ্রমবাসীদের ভয় দেখাইতেছে। আশ্রমে দুই চারি দিন থাকিয়া যাইবার এই সুযোগ দেখিয়া রাজা সাগ্রহে রাক্ষস মারিতে চলিলেন। এইখানে তৃতীয় অঙ্ক শেষ।

রাজা রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছেন। কুটীরদ্বারে উপবিষ্ট, রাজার আহ্বানের প্রতীক্ষারত, আনমনা শকুন্তলার সাড়া না পাইয়া সমাগত অতিথি কোপন দুর্বাসা প্রত্যাখ্যাত হইয়া শকুন্তলাকে শাপ দিয়াছেন, যাহার ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলে একদা সে তোমাকে ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু সখীদের অনুনয়ে নরম হইয়া দুর্বাসা শাপমোচনের উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন। এই অন্তর্বর্তী ঘটনাটুকু চতুর্থ অঙ্কের প্রবেশকে দুই সখীর সংলাপে বিবৃত আছে।

শকুন্তলার দৈববিঘ্ন কাটাইবার কাজে তাহার পুষনিয়া পিতা কণ্ব এতদিন আশ্রমের বাহিরে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শকুন্তলার ব্যাপার অবগত হইলেন, সখীদের মুখে নয়—তাহারা তো এ কথা বলিতেই পারে না, অগ্নিগৃহে এই অশরীরী বাণী হইতে

দুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানা ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব।।

'দুষ্যন্তের দ্বারা আধান করা তেজ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য (তোমার) কন্যা ধারণ করিতেছে। হে ব্রহ্মন্, তাহাকে অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের মতো জ্ঞান করিও।।'

শুনিয়াই কণ্ব স্থির করিলেন, আর শকুন্তলাকে আশ্রমে রাখা ঠিক নয়। তাহাকে রাজধানীতে রাজার কাছে অবিলম্বে পৌঁছিয়া দিয়া আসিবার জন্য তিনি ভগিনী গৌতমী ও দুই শিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতকে[১] প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। সখীরা শকুন্তলাকে সাজাইতে বসিল। পাড়াগাঁয়ের সাধারণ ঘরের মেয়ে যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি যায় তখন যেমন আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী যথাসাধ্য বসনভূষণ সাজসজ্জা আনিয়া যোগায় তেমনি সমগ্র আশ্রমপ্রকৃতি যেন শকুন্তলার সাজের ডালি ভরাইয়া দিল। সাজাইবার বেলায় মুশকিল হইল। আশ্রমের মেয়েরা বাকলপরা, তাহারা সাজসজ্জার ধার ধারে না। তখন অনসূয়ার বুদ্ধি যোগাইল। সে শকুন্তলাকে বলিল

চিত্তপরিচত্রণ দানিং দে অঙ্গেসুং আহরণবিনিওঅং করেম্‌হ।
'ছবি মিলাইয়া তোমার অঙ্গে আভরণ বিনিয়োগ করিব।'

শকুন্তলা বলিল, তোমাদের নিপুণতা তো জানি।

শকুন্তলার শুভযাত্রার সময় হইয়াছে। কণ্ব ব্যাকুল মনে পায়চারি করিতেছেন আর ভাবিতেছেন।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং স্পৃষ্টং সমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।।[২]

১। শিষ্য দুইটি সরল আশ্রম বালক এবং ঠিক গোঁয়ারগোবিন্দ না হইলেও একটু রগচটা গোছের এবং অভিজ্ঞতাহীন বলিয়া কিছু উন্নাসিক। চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই কালিদাস নাম দুইটি বাছিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আশ্রমবালিকা দুইটির নামেরও সার্থকতা লক্ষ্যে পড়ে। প্রিয়ংবদা চালাক, এবং চটপটে, অনসূয়া মৃদু এবং দূরদর্শিনী।

২। এইটি চতুঃশ্লোকীর প্রথম।

'শকুন্তলা আজ যাইবে—ইহা মনে করিতেই হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নিরুদ্ধ ক্রন্দনের চাপে কথা বাধিয়া যায়, চিন্তায় চোখ ঘোর লাগিতেছে। স্নেহের বশে যদি অরণ্যবাসী আমারই এমন অবসন্নতা আসে আহা না জানি গৃহীরা আসন্ন কন্যাবিচ্ছেদদুঃখে কতখানি পীড়িত হয়।।'

অবাঞ্ছিত সদ্যোজাত পরিত্যক্ত শিশুকে কণ্ব বাপ ও মা হইয়া মানুষ করিয়াছেন।—এ কথা স্মরণে রাখিতে হইবে।

শকুন্তলা কণ্বকে প্রণাম করিল। কণ্ব আশীর্বাদ করিলেন, সে চিরদিনের মাতা-পিতার আশীর্বাদ—স্বামীসোহাগ ও পুত্ররত্নলাভ।

যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা পত্যুর্বহুমতা ভব।
পুত্রং ত্বমপি সম্রাজ্যং সেব পুরুমবাপ্নুহি।।

'শর্মিষ্ঠা যেমন যযাতির হইয়াছিল, তেমনি স্বামীসোহাগিনী হও।
সে যেমন পুরুকে পাইয়াছিল তুমিও সেইমত সম্রাট্‌পুত্র লাভ কর।।'

পিসী গৌতমী শকুন্তলার কৃতকার্য সমঝাইয়া দিতে মন্তব্য করিলেন, বৎসে এ তোমাকে বর। আশীর্বাদ নয়।

তাহার পর যাত্রা করিবার পূর্বক্ষণে শকুন্তলার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিবার সময় কণ্ব বেদমন্ত্রের রীতিতে (''ঋক্‌ছন্দসা'') শ্লোক পড়িয়া আবার আশীর্বাদ করিলেন। এ পুণ্য আশীর্বাদ, গুরুর।

অমীং বেদীং, পরিতঃ ক্লিপ্তধিষ্ণ্যাঃ
সমদ্বিন্তঃ প্রান্তবিস্তীর্ণদর্ভাঃ।
অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্যগন্ধৈর্
বৈতানাস্তা বহ্নয়ঃ পালয়ন্তু।।[১]

'এই বেদির চারিদিকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সমিধযুক্ত, প্রান্ত পর্যন্ত কুশ বিছানো, যজ্ঞীয় অগ্নিগণ হোমগন্ধে অকল্যাণ বিনাশ করিয়া তোমাকে পালন করুন।।'

কণ্ব। বাছা এখন অগ্রসর হও। (দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) এই সে শার্ঙ্গরব শারদ্বত পণ্ডিতেরা।
শিষ্যদ্বয়। (প্রবেশ করিয়া) ভগবন্, এই যে আমরা।
কণ্ব। বৎস শার্ঙ্গরব, ভগিনীকে পথ দেখাইয়া চল।
শিষ্য। এই দিকে এই দিকে দিদি। (সকলের পরিক্রমণ।)
কণ্ব। ওগো ওগো বনদেবতা-অধিষ্ঠিত তপোবন তরুগণ,

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুস্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্।।[২]

'তোমাদের জলসেক না হইলে যে কখনই আগে জল খাইতে চায়ে না, সাজ করিতে ভালো বাসিলেও যে স্নেহবশে তোমাদের পাতা কখনো ছিঁড়ে না, তোমাদের প্রথম ফুল ধরার সময়ে যাহার উৎসব লাগিয়া যায়, সেই এই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছে। সকলে অনুমতি দাও।।'

কোকিলের রব অনুমোদন জানাইল। নেপথ্যে বনদেবতার স্বস্তিবাচন শোনা গেল।

১। এই শ্লোকটিকে কালিদাসের ''ব্রজবুলি'' রচনা বলিতে পারি।
২। চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় এইটি।

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিস্
ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কমরীচিতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ।।

'পদ্মবনে সবুজ-হওয়া সরোবরপরম্পরায় যে পথের দূরত্ব অবচ্ছিন্ন ও মনোরম, প্রচ্ছায় বৃক্ষের দ্বারা যে পথে সূর্যের তাপ প্রশমিত, যে পথের ধূলি পদ্মরেণুর মতো সুখস্পর্শ, যে পথে বায়ু শান্ত ও অনুকূল, যে পথ কল্যাণগামী—সে পথ ইহার হোক।।'

প্রিয়সমাগমের উৎসুকতা সত্ত্বেও আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে শকুন্তলার পা যেন উঠিতেছে না।

শকুন্তলা। (স্মরণ করিয়া) বাবা, ছোট বোন মাধবীর কাছে বিদায় নিই।

কণ্ব। বৎসে, উহার উপর তোমার প্রীতি জানি। এই তো ও ডান দিকে, দেখ।

শকুন্তলা। (আগাইয়া লতাকে আলিঙ্গন করিয়া) ছোট লতা-বোন, তোমার শাখাবাহু দিয়া আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর। আজ হইতে আমি তোমার দূরবর্তিনী হইব। বাবা, আমার মতো ইহার কল্যাণও তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে।

কণ্ব বলিলেন, প্রথম হইতে আমি তোমাকে যেমন পাত্রে সম্প্রদান করিব ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম তুমি নিজগুণেই তেমন বরের সহিত মিলিত হইয়াছ। তোমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছি। এখন এই সমীপবর্তী সহকারের সহিত ইহার বিবাহ দিব। এস এইদিকে, যাত্রাপথে পা বাড়াও।

শকুন্তলা। (সখীদের কাছে গিয়া) ওলো, এ দুটিকে তোমাদের দুজনের হাতে দিলাম।

সখীরা। আমাদের দুজনকে কাহার হাতে দিলে? (কাঁদিতে লাগিল।)

কণ্ব। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, কাঁদিও না। তোমাদেরই কর্তব্য শকুন্তলাকে প্রবোধ দেওয়া।

শকুন্তলা। বাবা, কুটীরের সীমানা অবধি আসিয়াছে এই গর্ভভারমন্থর মৃগবধূ। এ যখন সুখে প্রসব করিবে তখন সুখবর দিয়া লোক পাঠাইও। ভুলিও না যেন।

কণ্ব। বৎসে, এ আমি ভুলিব না।

শকুন্তলা। (গমনবাধা দেখাইয়া) ওমা, কে ও পায়ে পায়ে আসিয়া বারবার আমার আঁচল টানিতেছে। (ফিরিয়া দেখিল।)

কণ্ব। যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোহণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে।।[১]

'কুশের কাঁটায় ক্ষত হইতে যাহার মুখে তুমি ক্ষতনাশন ইঙ্গুদী তৈল লাগাইয়া দিতে, যাহাকে তুমি মুঠা মুঠা শামা ধান খাওয়াইয়া পোষণ করিয়াছিলে সেই তোমার পালিত পুত্র মৃগ তোমার পদাঙ্ক ছাড়িতেছে না।।

শকুন্তলা। বাছা তোমাদের সঙ্গবাস যে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে এমন আমাকে কেন অনুসরণ করিতেছ। তোমার জননী প্রসব করিয়াই গত হয়। তাহাকে ছাড়া তুমি যেমন আমার হাতে পুষ্ট হইয়াছিলে তেমনি এখন আমাকে ছাড়া তোমাকে বাবা দেখিবেন। তাই ফিরিয়া যাও বাছা ফিরিয়া যাও। (কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল।)

১। চতুঃশ্লোকীর এইটি তৃতীয়।

কণ্ব। বৎসে কাঁদিয়ো না। স্থির হও। এই দিকে পথের পানে নজর দাও।
'চোখের পাতার লোম উৎক্ষিপ্ত করিয়া দৃষ্টির বাধা দেয় অশ্রুবিন্দু, তুমি স্থৈর্য অবলম্বন করিয়া তাহার পতন রুদ্ধ কর। এখানকার মাটি উঁচুনীচু সেদিকে না তাকাইলে পথে তুমি উছট খাইবে।।'

বিদায় নেওয়ার ব্যাপারে অযথা বিলম্ব হইতেছে মনে করিয়া অসহিষ্ণু শার্ঙ্গরব গুরুকে লোকাচার বিধি স্মরণ করাইয়া বলিল

ভগবন, জলাশয়প্রান্ত পর্যন্ত স্নেহভাজন ব্যক্তিকে আগাইয়া দিতে হয়,—এই কথা স্মরণ করুন।[১] এই তো হ্রদের তীর। এইখানে আমাদের সন্দেশ[২] দিয়া আপনাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

কণ্ব। তাহা হইলে আমরা এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াই। (সকলে তাহাই করিল।) দুষ্যন্ত মহাশয়কে বলিবার উপযুক্ত কী বার্তা হইতে পারে। (চিন্তা করিতে লাগিলেন।)....
বৎস শার্ঙ্গরব, আমার কথামতো তুমি শকুন্তলাকে সামনে রাখিয়া এই কথা বলিবে

অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলং চাত্মনস্
ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ তাম্।
সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
দৈবাধীনমতঃ পরং ন খলু তৎস্ত্রীবন্ধুভির্যাচ্যতে।।

'আমাদের সম্বল তপস্যা, তোমার নিজের বংশ উচ্চ, এবং তোমার উপর ইহার যে ভালোবাসা তাহা কোনক্রমেই আত্মীয়বন্ধুর দ্বারা ঘটানো নয়।—এই কথা ভালো করিয়া মনে রাখিয়া তুমি ইহাকে অন্তঃপুরবাসিনীদের প্রাপ্য সাধারণ সম্মান দিয়া অবেক্ষণ করিবে। ইহার অতিরিক্ত দৈবের অধীন, মেয়ের আত্মীয়স্বজনেরা তাহা মুখ ফুটিয়া চায় না।''

শার্ঙ্গরব। ভগবন্, আপনার সন্দেশ গ্রহণ করিলাম।

কণ্ব। (শকুন্তলার দিকে চাহিয়া) বৎসে, এইবার তোমাকে কিছু উপদেশ দিই। বনবাসী হইলেও আমরা সংসারব্যবহার জানি।

শার্ঙ্গরব। ভগবন, ধীমান্ ব্যক্তিদের অজানা কিই বা আছে।

কণ্ব। বৎসে, এখান থেকে পতিগৃহে পৌঁছিয়া

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তৃবিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী।
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামা কুলস্যাধয়ঃ।।

'গুরুজনদের সেবা করিও। সপত্নীদের সহিত প্রিয়সখীর মতো আচরণ করিও। খারাপ ব্যবহার পাইলেও ক্রোধবশে স্বামীর প্রতিকূল আচরণ করিও না। পরিজনের প্রতি অত্যন্ত মুক্তহস্ত হইও। নানাবিধ ভোগের মধ্যে থাকিলেও গর্ববোধ করিও না। এইভাবে চলিলে অল্পবয়সী মেয়েরাও গৃহিণী-

১। তুলনীয়, ''আবনান্তং ওদকান্তং স্নিগ্ধং পান্থমনুব্রজেৎ''।
২। অর্থাৎ রাজাকে যাহা বলিতে হইবে।

গৌরব লাভ করে। যাহারা বিপরীত আচরণ করে তাহারা সংসারের ব্যাধি।।' গৌতমী কি বলেন?

গৌতমী। এইই তো নববধূদের উপদেশ। (শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া) বাছা, ভুলিও না।

কণ্ব। এস বৎসে। আলিঙ্গন কর আমাকে আর সখীজনকে।

শকুন্তলা। বাবা, প্রিয়সখীরা কি এইখান হইতেই ফিরিয়া যাইবে।[১]

কণ্ব। বৎসে, ইহাদেরও বিবাহ দিতে হইবে। তাই ইহাদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। তোমার সঙ্গে গৌতমী যাইবেন।

শকুন্তলা। (পিতার বক্ষ চাপিয়া) কি করিয়া আমি এখন বাবার কোলছাড়া হইয়া মলয় পর্বত হইতে উন্মূলিত চন্দনলতার মতো দেশান্তরে প্রাণ ধারণ করিব। (কাঁদিতে লাগিল।)

কণ্ব। বৎসে, কেন এত কাতর হইতেছ?

অভিজনবতো ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে
বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈরস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি।[২]

'স্বামীর মান্য সংসারের গৃহিণীর শ্লাঘনীয় পদে থাকিয়া, ক্ষণে ক্ষণে সেই ধনী বৃহৎ সংসারের কাজকর্মে হাবুডুবু খাইয়া, পূর্বদিশা যেমন (জগৎ-) পাবন সূর্যকে (প্রসব করে) তেমনি পুত্রকে অচিরে প্রসব করিয়া, বৎসে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাওয়ার দুঃখ ভুলিয়া যাইবে।।'

শকুন্তলা। (পায়ে পড়িয়া) বাবা, প্রণাম করিতেছি।

কণ্ব। বৎসে, আমি যা চাই তা তোমার হোক ("যদিচ্ছামি তে তদস্তু")।

শকুন্তলা। (সখীদের কাছে গিয়া) সখীরা এস। তোমরা দুজনে এক সঙ্গে আমাকে কোল দাও।

সখীরা। (তাই করিয়া) সখী, যদি রাজর্ষি তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনিতে না পারেন তখন তাঁহার নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও।

শকুন্তলা। তোমাদের এই সংশয়ে আমার মন যে কাঁপিয়া উঠিল।

সখীরা। সখী, ভয় করিও না। স্নেহ স্বভাবতই বিপত্তি আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গরব। (তাকাইয়া) ভগবন্, সূর্যদেব শিখরান্তরে চড়িয়াছেন। ইনি ত্বরা করুন।

শকুন্তলা। (পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) বাবা, কবে আবার তপোবন দেখিতে পাইব।

কণ্ব। বৎসে

ভূত্বা চিরায় সদিগন্তমহীসপত্নী-
দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং প্রসূয়।
তৎসন্নিবেশিতধূরেণ সহৈব ভর্ত্রা
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্।।

১। শকুন্তলা ভাবিয়াছিল সখীরা তাহার সঙ্গে শহর পর্যন্ত যাইবে।
২। এই শ্লোকে কণ্বের কন্যাবিরহবেদনা গুঞ্জরিত।

'দীর্ঘকাল ধরিয়া সমগ্র পৃথিবীর সপত্নী হইয়া,
অদ্বিতীয় রথযোদ্ধা দুষ্যন্ত পুত্রকে প্রসব করিয়া,
তাহার উপর রাজ্য ভার দিয়া স্বামীর সহিত
শেষ বয়সে আবার এই আশ্রমে তুমি স্থান লইবে।।'

গৌতমী। বাছা, যাইবার কাল উত্তীর্ণ হইতেছে। অতএব পিতাকে ফিরাও। তাই তো, এ যত দেরিই হোক (পিতাকে) ফিরিয়া যাইতে বলিবে না। অতএব আপনিই নিবৃত্ত হোন।

কণ্ব। বৎসে, তপোবনের কাজকর্মে দেরি পড়িতেছে।[১]

শকুন্তলা। তপোবনের কাজে বাবার উৎকণ্ঠা চাপা পড়িয়া যাইবে। আমি উৎকণ্ঠাভাগিনী রহিলাম।

[পাঠান্তরে—(আবার পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া) তপশ্চরণে বাবার শরীর কৃশ হইয়াছে। সুতরাং আমার জন্য উৎকণ্ঠা করিও না।]

কণ্ব। ওগো, কেন আমাকে এমন করিয়া জড়াইতেছ। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া)
অপযাস্যতি মে শোকঃ কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্বম্।
উটজদ্বারি বিরূঢ়ং নীবারবলিম্ অবলোকয়তঃ।।[২]
'বৎসে, কেমন করিয়া আমার শোক দূর হইবে? কুটীরের প্রান্তভাগে তোমার দেওয়া নীবার অঞ্জলি অঙ্কুরিত ও উদ্ভিন্ন (হইয়া বারবার) আমার চোখে পড়িবে।।'

যাও। তোমার (জীবনের পথ) মঙ্গলময় হোক।

(শকুন্তলার সহিত গৌতমী ও শার্ঙ্গরব-শারদ্বত পণ্ডিত চলিয়া গেল।)

সখীরা। আহা, আহা। শকুন্তলা গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়িল।

কণ্ব। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, তোমাদের সহচরী চলিয়া গেল।
শোকাবেশ দমন করিয়া আমাকে অনুসরণ কর। (সকলে চলিয়া গেল।)

সখীরা। বাবা, শকুন্তলা নাই। আমরা যেন শূন্য তপোবনে প্রবেশ করিতেছি।

কণ্ব নিজের মনকে এই ভাবিয়া বুঝাইলেন

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতোঽস্মি সদ্যো বিশদান্তরাত্মা
চিরস্য নিক্ষেপমিবার্পয়িত্বা।।[৩]

কন্যা তো অপরের সম্পত্তি। তাহাকে আজ স্বামীর কাছে পাঠাইয়া আমি মনে প্রসন্নতা লাভ করিলাম, যেন অনেক কালের পরে গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ করিয়াছি।।'

এইখানে চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

কালিদাস এখানে হৃদয়বৃত্তির তথা মানবসংসারের মূলীভূত, নিগূঢ় স্নেহসম্পর্ক যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা ইতিপূর্বে কোথাও আর কোন কবি করেন নাই এবং কালিদাস

১। তবুও কণ্ব মুখ ফুটিয়া "যাও" অথবা "যাই" বলিতে পারিতেছেন না।

২। এইটি চতুঃশ্লোকীর চতুর্থ।

৩। শেষ দুই ছত্রের পাঠান্তর
"জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।"

যেটুকু বলিয়াছেন সেটুকুর উপরেও আর কেহ কিছু বলেন নাই। শকুন্তলাকে মাঝে রাখিয়া কালিদাস তৃণলতা ও পশুপক্ষী হইতে সাধারণ মেয়ে ও অসাধারণ পুরুষ পর্যন্ত প্রাণী-জগৎকে স্নেহরজ্জুতে বাঁধিয়া এক করিয়া দিয়াছেন।

দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে কথা দিয়া আসিয়াছিলেন শীঘ্রই তাহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন। এদিকে দুর্বাসার শাপে রাজা শকুন্তলার নাম পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া রাজকার্যে ব্যাপৃত। একদিন রাজকার্যের পর রাজা বিদূষকের সহিত বসিয়া আছেন এমন সময় সঙ্গীতশালা হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিল। বিদূষককে চুপ করতে বলিয়া রাজা গান শুনিতে লাগিলেন।

অহিনবমহুলোহভাবিও তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুও মহুঅর বীসরিও সি ণং কহং।।

'ওগো অভিনব মধুলোভ-ভাবনামগ্ন মধুকর, তেমন করিয়া আম্রমঞ্জরী চুম্বন করিয়া আসিয়া এখন পদ্মবনে বসিবামাত্রই খুশি হইয়া তাহাকে কেন ভুলিয়া গেলে।।"

শকুন্তলাকে ভুলিলেও যে সে স্মৃতির মর্মে লাগিয়া আছে। তাই গান শুনিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন।

কেন আমি এই গান শুনিয়া ইষ্টজনবিরহ না থাকিলেও অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছি। হয়ত

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।।

'রম্য দৃশ্য দেখিয়া মধুর শব্দ শুনিয়া সুখে থাকিয়াও প্রাণী যে উৎকণ্ঠা বোধ করে, তাহার কারণ নিশ্চয়ই তাহার চিত্তে ভাবে স্থিরত্বপ্রাপ্ত গত জন্মের ভালোবাসার স্মৃতি অজ্ঞাতসারে জাগিয়া উঠে।।'

অতঃপর রাজসভায় শকুন্তলা প্রভৃতির আগমন। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি সসত্ত্ব পরস্ত্রীকে অন্তঃপুরে স্থান দিতে রাজি হইলেন না। শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইতে গিয়া আঁচলে হাত দিয়া দেখিল, রাজার দেওয়া নামলেখা আংটিটি নাই। গৌতমী বলিল, 'বোধ হয় শক্রাবতারে শচীঘাটে জলস্পর্শ করিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে।' শুনিয়া রাজা উপহাস করিয়া বলিলেন, 'লোকে যাহাকে বলে স্ত্রীলোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এ দেখি তাই।'[১]

শকুন্তলা। এখানে দৈবই প্রভুত্ব দেখাইল। তোমাকে আর একটি (অভিজ্ঞান) বলিতেছি।

রাজা। এইবার শুনিবার পালা আসিল।[২]

শকুন্তলা। একদিন বেতসলতামণ্ডপে তোমার হাতে পদ্মপত্রের আধারে জল ধরা ছিল।

রাজা। শুনিতেছি সব।

শকুন্তলা। সেইক্ষণে আমার পালিতপুত্র মৃগশাবক সেখানে আসিল। তখন তুমি, এ-ই আগে পান করুক বলিয়া, অনুকম্পা করিয়া তাহাকে সাধিলে। কিন্তু অপরিচিত তুমি, তোমার হাতে জল খাইতে সে গেল না। পরে সেই জল

১। "ইদং তৎ প্রত্যুৎপরমতিত্বং স্ত্রীণাম্"।
২। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নাই। এখন মিথ্যা কথার বাগ্‌জাল প্রমাণরূপে উপস্থাপিত হইবে।

আমি লইলে সে আগাইয়া আসিল।[১] এই ব্যাপারে তুমি হাসিয়া বলিয়াছিলে, 'সত্যই সকলে সমান গন্ধে[২] বিশ্বাস করে, যেহেতু তোমরা দুজনেই অরণ্যবাসী।'

রাজা নিষ্ঠুর মন্তব্য করিলেন, 'ইহাদের এইরূপ আত্মকার্যসাধক মধুর ও মিথ্যা বাক্যেই সংসারী লোক আকৃষ্ট হয়।'

শকুন্তলা ও শার্ঙ্গরবের সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটির পর শকুন্তলাকে রাজসভায় পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমিকেরা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে রাজা নিজের অসহায়তা জানাইয়া কি কর্তব্য সে বিষয়ে পরামর্শ চাহিলেন। রাজার সংশয়, তাঁহার নিজের বিস্মৃতি হইতে পারে অথবা শকুন্তলা মিথ্যা বলিতে পারে। অতএব শকুন্তলাকে তিনি বর্জন করিতে পারেন না (তাহা হইলে তিনি দারত্যাগী হইবেন), গ্রহণ করিতেও পারেন না (তাহা হইলে তিনি পরদারগামী হইবেন)। এই উভয়সংকটে সাময়িক সমাধান করিয়া দিলেন রাজার পুরোহিত। যতদিন শকুন্তলা সন্তান প্রসব না করে ততদিন সে তাঁহার ঘরে বাস করুক। পুত্রসন্তান হইলে পর সে সন্তানের দেহে যদি রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ থাকে তবে শকুন্তলাকে গ্রহণ করা চলিবে। (দুষ্যন্তের পুত্র রাজচক্রবর্তী হইবে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী ভালো জ্যোতিষীরা করিয়াছিলেন।) যদি পুত্রসন্তান না হয় অথবা পুত্রসন্তানের রাজচক্রবর্তী-লক্ষণ না থাকে তবে শকুন্তলাকে কণ্বের আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

পুরোহিত। (উঠিয়া) বৎসে, এইদিকে এইদিকে। আমাকে অনুসরণ কর।

শকুন্তলা। ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে কোল দাও।

(পুরোহিত, তপস্বিদ্বয় ও গৌতমীর সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান। শাপচ্ছন্নস্মৃতি রাজা শকুন্তলার কথাই ভাবিতে থাকিলেন।)

একটু পরেই বিস্ময়বিমূঢ় পুরোহিত আসিয়া খবর দিলেন যে কণ্বশিষ্যেরা ও গৌতমী চলিয়া গেলে পর

সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহূৎক্ষেপং রোদিতুং চ প্রবৃত্তা।

'সে মেয়েটি নিজ ভাগ্যকে নিন্দা করিয়া হাত ছুঁড়িয়া কান্না জুড়িল।'

রাজা। কি (ঘটিল) তাহার পর?

পুরোহিত। স্ত্রীসংস্থানং চাপ্‌ সরস্তীর্থমারাৎ
ক্ষিপ্ত্বৈবাশু জ্যোতিরেনাং তিরোঽভূৎ।।

'অপ্‌সরা-ঘাটের কাছে স্ত্রী-অবয়ব জ্যোতি যেন তাহাকে ছিনিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তিরোধন করিল।।'

রাজার মনে সংশয় বেশি করিয়া দংশন করিতে লাগিল। এইখানে পঞ্চম অঙ্ক শেষ।

ষষ্ঠ অঙ্কে মাছের পেটে আংটি পাওয়ার ব্যাপার। জেলের কাছ হইতে আংটি পাইবামাত্র রাজার মনে শকুন্তলার স্মৃতি পরিপূর্ণ হইয়া জাগিয়া উঠিল।

১। মূলে "কিদো তেন পণও"।

২। এখানে জন্তুর ইঙ্গিত আছে। ইতর প্রাণী মুখ শুঁকিয়া শত্রুমিত্র নির্ণয় করে। শকুন্তলা ও মৃগশাবক অরণ্যবাসী বলিয়া দুজনেরই গায়ে যেন বুনো গন্ধ।

প্রবেশকে জেলে-পুলিসের দৃশ্যে চিরন্তন চোর-পুলিসের অম্লমধুর সম্পর্কের কৌতুকবাহ ইঙ্গিত আছে। পুলিস-প্রহরী দুইজনের নামকবণে কালিদাস বেশ বুদ্ধি খাটাইয়াছেন। একজনের নাম সূচক, মানে সন্ধানিয়া (অর্থাৎ spy) আব একজনর নাম জানুক, মানে জানানদার (অর্থাৎ informer)।

নাগরক (অর্থাৎ রাজ-নগরেব প্রহরীদেব কর্তা) আংটি লইয়া রাজাব কাছে গিয়াছে। প্রহরী দুইজন অধৈর্য হইয়া ধীবরেব মৃত্যুদণ্ডাদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে। দূর হইতে কর্তাকে আসিতে দেখিয়াই তাহারা জেলেকে জিজ্ঞাসা কবিল, সে কিরকমে বধদণ্ড গ্রহণ করিতে চায়—মাটিতে আধপোতা হইয়া কুকুর-কামড়ে না শূলে। কিন্তু নাগরক আসিয়া বলিল যে বাজা খুশি হইয়া জেলেকে বহুমূল্য পারিতোষিক দিয়াছেন। সূচক কর্তাকে অভিনন্দিত করিল[১], জানুক ঈর্ষা উক্তি করিল।[২] ব্যাপার অন্যদিকে গড়াইতে পারে আশঙ্কা কবিয়া জেলে তাড়াতাড়ি মিটমাট করিবার জন্য বলিল, 'কর্তারা, ইহাব অর্ধেক তোমাদেবও সুবামূল্য হোক।'

জানুক। ধীবর, এখন তুমি আমার বড় প্রিয় বয়স্য হইলে। কাদম্বরীকে[৩] শ্রদ্ধা জানাইয়াই আমাদের বন্ধুত্ব পাতাইতে হয়। তাই শুঁড়িঘরে যাই চল।

শকুন্তলাবিরহে রাজা কাতর। তাঁহার হুকুমে রাজবাড়িতে বসন্তোৎসব বন্ধ। বিদূষকের সঙ্গে বসিয়া বাজা সর্বদা শকুন্তলার কথাই বলেন। চলিয়া যাইবার সময়ে শকুন্তলা রাজার মুখের দিকে কেমন করিয়া চাহিয়াছিল তাহা মনে পড়িলে রাজার অস্থিরতা বাড়ে।

ইতঃ প্রত্যাদিষ্টা স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা
স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈবদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রসরকলুষামর্পিতবতী
ময়ি ক্রূরে যৎ তৎ সবিষমিব শলং দহতি মাম্।।

'এ ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে স্বজনের অনুগমন করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল। গুরুতুল্য গুরুশিষ্য চীৎকার করিয়া 'থামো' বলিতে সে দাঁড়াইয়া রহিল। আর সেই যে অশ্রুধারাবরুদ্ধ দৃষ্টি নিষ্ঠুর আমার উপর সে দিয়াছিল তাহা বিষময় শেলের মতো আমাকে দগ্ধ করিতেছে।।'

সান্ত্বনা দিয়া বিদূষক বলিল, 'আশ্বস্ত হও। তাহার সহিত সমাগম হইবে।'

রাজা। কি করিয়া?

বিদূষক। ওগো, বাপ-মা কখনই কন্যাকে দীর্ঘকাল স্বামিবিরহিত দেখিতে পারে না।

রাজা। বয়স্য

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু কপ্তং ন তাবৎফলমেব পুণ্যৈঃ।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীব মন্যে মনোরথানামতটে প্রপাতম্।।

'সেকি স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম? না সেইটুকুতেই নিঃশেষিত পুণ্য? তা আর কিছুতেই ফিরিয়া আসিবার নহে। মনে হয় যেন (মিলন-) কামনা অতলপতনে পড়িয়াছে।।'

১। "তোশিদে দাণিং ভস্টা লাউত্তেণ"।
২। "ণং ভণামি ইমশ্শ মশ্চলীশত্তুণো কিদোত্তি"।
৩। শৌণ্ডিকাগারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

রাজা শকুন্তলার ছবি আঁকিয়া সান্ত্বনার পথ খুঁজিতেছেন। কিন্তু খেদ তো যায় না। নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাজা ভাবেন

সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতাং পরিহায় পূর্বং
চিত্রার্পিতামহমিমাং বহু মন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্।।

'পূর্বে সম্মুখে সমাগত প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া আমি এখন তাহাকে ছবিতে তুলিয়া প্রচুর তারিফ করিতেছি। সখা, আমি যেন পথে জলভরা নদী ছাড়িয়া আসিয়া মৃগতৃষ্ণিকার ভরসায় রহিয়াছি।।'

আশ্রমের পরিবেশ আঁকিয়া রাজা শকুন্তলার ছবিকে সম্পূর্ণতা দিতে চান। সেজন্য আরও কি কি আঁকিতে হইবে তাহা বিদূষককে বলিতেছেন। (এই শ্লোকে কালিদাসের চিত্রকল্পনা পরিপূর্ণ ছবির মতোই ফুটিয়া উঠিয়াছে।)

কার্যা সৈককতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদস্তামভিতো নিষণ্ণচমরো গৌরীগুরোঃ পাবনঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্।।

'আঁকিতে হইবে—মালিনী নদী। তাহার বালুচরে হংসমিথুন বসিয়া। তাহার দুই দিকে হিমালয়েব পাদদেশ। সেখানে চমর শুইয়া। আর আঁকিতে চাই—একটি গাছ। তাহার ডাল হইতে বল্কল ঝুলিতেছে, তাহাব তলায় কৃষ্ণসাবের শৃঙ্গে মৃগী তাহার বাঁ চোখ ঘষিতেছে।।'

রাজকার্যে রাজার মন নাই। অমাত্যরাই কাজ চালায়। গুরুতর কিছু ব্যাপাব থাকিলে অন্তঃপুরে রাজার কাছে ফাইল পাঠানো হয়। রাজা শকুন্তলার ছবি আঁকিতেছেন, কঞ্চুকী আসিয়া মন্ত্রীপ্রেরিত জরুরি কাজের রিপোর্ট ধরিয়া দিল। রাজা তাহা পড়িতে লাগিলেন।

বিদিতমস্তু দেবপাদানাম্। ধনবৃদ্ধি[1]-নামা বণিগ্বারিপথোপজীবী
নৌব্যসনেন বিপন্নঃ। স চানপত্যস্তস্যানেককোটিসংখ্যাং বসু। তদিদানীং
রাজার্থতামাপদ্যতে। ইতি শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণমিতি।।[2]

রাজার মন এখন অত্যন্ত নরম। নিজে অনপত্য, শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা ছিল। তাই হুকুম দিলেন, খুঁজিয়া দেখা হোক ধনবৃদ্ধির পত্নীদের মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা আছে কিনা। থাকিলে সেই গর্ভের সন্তান সম্পত্তি পাইবে। প্রতীহার চলিয়া যাইতে না যাইতেই তাহাকে ডাকিয়া রাজা এই ঢালাও হুকুম জারি করিতে আদেশ দিলেন।

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুঃষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্।।

'যে যে প্রিয় আত্মীয়ের বিযোগ হইবে প্রজাদের, সে যদি পাপী না হয়, তবে দুঃষ্যন্ত তাহাদের সেই সেই আত্মীয় হইবে।—এই আদেশ ঘোষণা করা হোক।।'

১। পাঠান্তরে "ধনমিত্র"।

২। 'জানিতে আজ্ঞা হোক মহারাজের। ধনবৃদ্ধি নামে বণিক, জলপথে ব্যবসা করিয়া খায়, জাহাজডুবিতে মারা পড়িয়াছে। তাহার সন্তান নাই। তাহার অনেক কোটি টাকার সম্পত্তি। সেসব এখন রাজসম্পত্তি হইতেছে। শুনিয়া মহারাজ যা আজ্ঞা করেন ইতি।'

সন্তানহীনতার জন্য রাজার মনে কাতরতা বাড়িল। ইতিমধ্যে বিদূষক মাধব্য রাজার কাছ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে।

অকস্মাৎ নেপথ্যে ভীতিশব্দ উঠিল। রাজা কঞ্চুকীকে পাঠাইয়া খোঁজ আনিলেন। চারিদিক দেখিবার জন্য রাজপুরীতে যে উত্তুঙ্গ প্রাসাদ ছিল, নাম মেঘচ্ছন্ন,[১] কি যেন এক ছায়ামূর্তি মাধব্যকে ধরিয়া সেই প্রাসাদের শিখরে লইয়া গিয়াছে। শুনিয়াই রাজা উঠিয়া অস্ত্র খুঁজিলেন। অস্ত্ররক্ষিণী যবনী[২] ধনুর্বাণ ও হস্তত্রাণ আনিয়া দিল। রাজা গিয়া মাধব্যের কাতরোক্তি শুনিলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। একটু পরেই মাধব্যকে লইয়া ইন্দ্রসারথী মাতলি প্রবেশ করিল। মাতলি বলিল যে ইন্দ্রের প্রয়োজন হইয়াছে, রাজাকে দুর্জয় নামক কালনেমি-পুত্র দানবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। রাজাকে অবসাদ হইতে উত্তেজিত করিবার জন্যই সে মাধব্যকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। রাজা তখনি মাতলির রথে চড়িলেন। এইখানে ষষ্ঠ অঙ্কের অবসান।

দানববিজয় করিয়া রাজা ইন্দ্ররথে চাপিয়া মর্ত্যলোকে আসিতেছেন। মাতলিচালিত রথ উর্ধ্বাকাশ হইতে মেঘপদবীতে নামিতেছে। সেখান হইতে নামিবার সময়ে ভূপৃষ্ঠ কেমন দেখাইতেছে তাহা রাজা মাতলিকে বলিতেছেন।[৩]

> শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
> পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
> সন্ধানং তনুভাগনষ্টসলিলব্যক্ত্যা ব্রজন্ত্যাপগাঃ
> কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে।।

মাথা তুলিয়া উঠিতেছে শৈল সকল' তাহাদের শিখর হইতে যেন ভূমি নামিয়া যাইতেছে। গুঁড়ি দেখাইয়া বৃক্ষগণ পত্রশাখার ভিতর হইতে বাহির হইতেছে। ক্ষীণ-লুপ্ত ধারা প্রকাশ পাওয়ায় নদীরা যেন জোড় খাইতেছে। দেখ, কে যেন উপর পানে ছুঁড়িয়া পৃথিবীকে আমার কাছে তুলিয়া দিতেছে।।'

নামিবার সময় কিংপুরুষবর্ষের পর্বত হেমকূট রাজার নজরে পড়িল। মাতলি বলিল যে সেখানে প্রজাপতি মরীচি সস্ত্রীক তপশ্চর্যা করিতেছেন। রাজা বলিলেন তাঁহাকে প্রদক্ষিণ-বন্দনা করিয়া যাইবে। মাতলি রথ নামাইল। রাজাকে অশোকতরুর ছায়ায় বসাইয়া মাতলি মারীচের অবসর জানিতে গেল।

নেপথ্যে। না না চপলতা করিও না। যেখানে সেখানে নিজের স্বভাব জাহির করিতেছ।

রাজা। (কান দিয়া) এমন ঔদ্ধত্যের স্থান তো এ নয়। তবে কাহাকে এমনভাবে নিষেধ করা হইতেছে। (শব্দ অনুসরণে তাকাইয়া সবিস্ময়ে) আহা, এ তো (দেখি) শিশু। দুইজন তাপসী তাহাকে আটকাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহার সামর্থ্য তো কচি ছেলের মতো নয়।

> অর্ধপীতং স্তনং মাতুরামর্দক্লিষ্টকেসরম্।
> বিলম্বিতং সিংহশিশুং করেণাকৃষ্য কর্ষতি।।

১। পাঠান্তর "মেঘপ্রতিচ্ছন্দ"।

২। যবনী—প্রাচীনকালে রাজারা গ্রীক নারীকে অন্তঃপুরে বডিগার্ড রাখিতেন। তাহারা সেক্রেটারীর কাজও করিত।

৩। কালিদাস যদি আধুনিক কালের লোক হইতেন এবং যদি তাঁহার এরোপ্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা থাকিত তবে ইহার অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব বর্ণনা দিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

'মাতার স্তনপান শেষ হয় নাই তাই লাগিয়া আছে সিংহশিশু, তাহার কেশর চটকাইয়া তাহাকে হাত দিয়া টানিতেছে।।'

নিকটে আসিলে ছেলেটিকে দেখিয়া রাজার পুত্রস্নেহ লাগিল। তাহার হাতে বাজচক্রবর্তীর লক্ষণ চক্রচিহ্নও দেখা গেল। শিশুর প্রসারিত হাত রাজার বড় ভালো লাগিল।

প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্যপত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া নবোষসা ভিন্নমিবৈকপঙ্কজম্।।

'লোভদেখানো বস্তু পাইবাব জন্য প্রসারিত, জালের মতো গাঁথা আঙ্গুল, এমন শিশু-হাতখানি দেখাইতেছে যেন একটিমাত্র পদ্মফুল, যাহার পাপড়ি এখনও খুলে নাই, অভিব্যক্তদীপ্তি নব-উষা (যাহাকে) ফুটাইতে শুরু করিয়াছে।।"

শিশুর হাত হইতে সিংহশাবককে মুক্ত করিবার জন্য তাপসীরা কোন ঋষিকুমারকে না পাইয়া রাজাকে দেখিয়া তাহাকেই অনুরোধ করিল। রাজা সিংহশাবককে ছাড়াইয়া দিয়া শিশুর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বাজার ও শিশুর অবয়বে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া তাপসীরা বিস্ময় প্রকাশ করিল। রাজা আগেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে ছেলেটি ঋষিপুত্র নয়। এখন প্রশ্ন করিয়া জানা গেল যে ছেলেটি এক দারত্যাগী পুরুবংশীয়ের পুত্র। রাজার ইচ্ছা হইল, ছেলেটির মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করি। তাহার পর ভাবিয়া বুঝিলেন, পরনারীর বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ ভদ্ররীতি নহে ("অথ বা অনার্যঃ পরদারব্যবহারঃ")

তাপসী। (মাটির ময়ূর হাতে প্রবেশ করিয়া) "সব্বদমন পেক্‌খ সউন্দলাবণ্ণং" ('সর্বদমন, দেখ শকুন্ত-লাবণ্য'[1])।

বালক। (চোখ ঘুরাইয়া) কই সে আমার মা? (উভয়ে হাসিয়া উঠিল।)

প্রথমা। নামসাদৃশ্যেই মাতৃবৎসল উৎসুক হইয়াছে।

রাজা বুঝিলেন, বালকের মায়ের নাম শকুন্তলা।

হঠাৎ এক সময় তাপসীদের নজরে পড়িল যে বালকের মণিবন্ধে যে রক্ষাগ্রন্থি ("রক্‌খাগণ্ডও") বাঁধা ছিল, তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। রাজা তাহা কুড়াইতে গেলে তাপসীরা 'না, না' করিয়া নিষেধ করিল। রাজা তাহা না শুনিয়া তুলিয়া লইয়া বালকের হাতে পরাইয়া দিলেন। নিষেধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাপসীরা বলিল যে শিশুর জাতকর্মের সময়ে রক্ষাগ্রন্থিটি মারীচ নিজে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এটি খসিয়া মাটিতে পড়িলে শিশুর মাতাপিতা ছাড়া কাহাকেও ছুঁইতে নাই। যে ছুঁইবে সুতা সাপ হইয়া তাহাকেই কামড়াইবে। এখন রাজা নিশ্চিত প্রমাণ পাইলেন যে সর্বদমন তাঁহারই পুত্র। ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইলে সে বলিল, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি মায়ের কাছে যাই।'

রাজা। খোকা ("পুত্রক"), আমার সঙ্গেই মাতাকে খুশি করিবে।

বালক। দুষ্যন্ত আমার বাবা, তুমি নও।

রাজা। (মুখ হাসি হাসি করিয়া) এই বিবাদই আমাকে প্রত্যয় দিতেছে।

এমন সময় সেখানে শকুন্তলা আসিয়া পড়িল। শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজার মনে হর্ষবিষাদ জন্মিল।

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি।।

১। অর্থাৎ পাখিটির সৌন্দর্য।

'অত্যন্ত মলিন বসন পরিধানে। সংযমক্লেশে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। কেশ একটিমাত্র বেণিতে বাঁধা।[১] অতিনিষ্ঠুর আমি, শুদ্ধশীলা (শকুন্তলা) যেন আমার সঙ্গে দীর্ঘকালের বিরহকে ব্রতরূপে ধারণ করিতেছে।।"

রাজাকে দেখিয়া বিষাদক্লিষ্ট তপশ্চারিণী শকুন্তলা মনের ভাব সযত্নে দমন করিয়া শান্তমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, কে ও?' শকুন্তলা উত্তর দিল, 'বৎস, ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।' তাহার চোখে জল ঝরিতে লাগিল। রাজা শকুন্তলার পায়ে পড়িলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া সযত্নে উঠাইল। দুষ্যন্ত শকুন্তলার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া যেন নিজের পাপই ঘুচাইয়া দিলেন। তাহার পর সস্ত্রীক প্রজাপতি মারীচের আশীর্বাদের পুণ্যাভিষেক পাইয়া পতিপত্নী ধন্য হইল।

শাকুন্তলে দুইটি "ভরতবাক্য" শ্লোক আছে। একটি আসল নাটকের অর্থাৎ নাটকের প্রযুক্ত রূপের, অপরটি কালিদাসের নিজের অর্থাৎ নাটকের সাহিত্য রূপের। প্রথম শ্লোকটি প্রজাপতি মারীচের উক্তি, তাহাতে সকলের জন্য সুবৃষ্টির (অর্থাৎ সুভিক্ষের) ও রাজ্যসুশাসনের আশীর্বাদ আছে। দ্বিতীয় শ্লোকটি এই আলোচনার আরম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি।

নাটকটির নাম যে কালিদাশ 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' দিয়াছিলেন তাহা প্রস্তাবনা হইতে জানা যায়। নামটির ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ সমাসগঠন লইয়া পণ্ডিতদের মনে সংশয় আছে,—"অভিজ্ঞান ও শকুন্তলা", না "অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা"? "অভিজ্ঞান" শব্দ কালিদাসের রচনায় অপরিচিত নয়। মেঘদূতে অভিজ্ঞান বাচনিক। শাকুন্তলে অভিজ্ঞান রাজার নামের অক্ষরাঙ্কিত আংটি অর্থাৎ মুদ্রাঙ্গুরীয় (পুরানো বাংলায় মুদড়ী)। সামান্য এই স্মরণচিহ্নটুকু শকুন্তলার জীবনে বিপর্যয় আনিয়া দিয়াছিল এবং পরে তাহাকে সৌভাগ্যবতী করিয়াছিল। শকুন্তলার কাহিনী এই আংটির ছোঁয়াতেই অসামান্যতা পাইয়াছে। সেই অসামান্যতাটুকুর গুরুত্ব স্বীকার করিয়াই কালিদাস নাটকটির অমন নামকরণ করিয়াছিলেন। এই অসামান্যতাটুকু কালিদাসই যোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করি। আমার এই অনুমানের হেতু নিম্নের আলোচনায় উপলব্ধ হইবে।

উর্বশী-পুরূরবার আখ্যান যত পুরানো তত না হইলেও শকুন্তলা-দুষ্যন্তের কাহিনীর বীজ পুরানো বটে। এ কাহিনীর কোন উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই, আছে ব্রাহ্মণে। সেখানে পাই শুধু শকুন্তলা ও দুঃষ্যন্তের পুত্র দিগ্বিজয়ী ভরতের বহু অশ্বমেধযাজীরূপে প্রশংসা-গাথা। হয়ত এই গাথার মূল রূপে শকুন্তলার প্রেমকাহিনীও ছিল, হয়ত বা এই গাথার সূত্রেই শকুন্তলার প্রেমকাহিনী প্রথম রচিত হইয়াছিল। গাথা দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি।[২]

অষ্টাসপ্ততিং ভরতো দৌঃষন্তির্যমুনামনু।
গঙ্গায়াং বৃত্রঘ্নেঽবধ্নাৎ পঞ্চ পঞ্চ শতান্ হয়ান্।।
শকুন্তলা নাড়পিত্যপ্সরা ভরতং দধে।
পরঃসহস্রানিন্দ্রায় অশ্বান্ মেধ্যান্ য আহরৎ
বিজিত্য পৃথিবী সর্বাম্।।

১। সেকালে সধবা নারী পতি হইতে দূরে থাকিলে বিরহাবস্থার চিহ্নরূপে কেশপাশ একটিমাত্র বেণিতে বাঁধিয়া রাখিত, অবদ্ধ রাখিত না (বিধবার মতো) অথবা খোঁপাও বাঁধিত না (সধবার মতো)।

২। শতপথ-ব্রাহ্মণ (মাধ্যন্দিন) ১১, ৫, ৪, ১১, ১৩। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে বর্ধিত অনুষ্টুপ্ ছন্দ লক্ষণীয়।

'দুঃষ্যন্ত-পুত্র ভরত যমুনার ধারে ও গঙ্গাতীরে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আটাত্তর ও পাঁচ পাঁচ শ ঘোড়া বাঁধিয়াছিলেন।।'

'শকুন্তলা নাড়পিতী[১] অপ্‌সরা ভরতকে (গর্ভে) ধরিয়াছিলেন। যে ভরত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে হাজারের বেশি যজ্ঞীয় অশ্ব আহরণ করিয়াছিলেন—সর্ব পৃথিবী জয় করিয়া।।''

শকুন্তলার জন্ম ও কর্ম কাহিনী কালিদাসের নাটক ছাড়া পাওয়া যায় মহাভারতে (আদি-পর্বে) এবং ভাগবত ও পদ্ম ইত্যাদি কোন কোন পুরাণে। পুরাণগুলি কালিদাসের অনেক পরেকার রচনা। মহাভারতের সম্পূর্ণ রূপ যে রূপে আমরা ''মহাভারত'' গ্রন্থটিকে জানি—তাহা কালিদাসের আগে সম্পূর্ণ রচিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সকলে বলেন, কালিদাস মহাভারত হইতে তাঁহার নাটকের বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন।—এ অত্যন্ত অনুমান মাত্র। মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে কালিদাসের কাহিনীর অনেক বিষয়েই গরমিল আছে। সে হিসাবে বলিতে পারি, কালিদাসগৃহীত কাহিনী যে সেকালে মহাভারতেই নিবদ্ধ ছিল এমন নয়। শতপথ-ব্রাহ্মণের গাথা হইতে অনুমান করিতে পারি যে শকুন্তলার আখ্যান অবশ্যই কথাকোবিদদের মুখে মুখে গল্প রূপে ধারাবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। কালিদাস সে কথা শুনিয়া থাকিবেন, এবং সংস্কৃতে অথবা প্রাকৃতে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে পড়িয়া থাকিবেন। তাহার উপরেই কালিদাস তাঁহার নাটকের অপরূপ গাঁথনি তুলিয়াছিলেন।

অনুমান করি, কালিদাসের কাহিনীতে রূপকথার মিশ্রণ আছে। সে মিশ্রণ তিনি লোকগাথায় অথবা লোককথায় পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাই হোক, রূপকথার কারুকার্য কালিদাসের মৌলিকতাই প্রতিপন্ন করে। পুরানো একটি রূঢ় ও বর্বর প্রেমকাহিনীতে রূপকথার ময়ান দিয়া এবং নিজের প্রতিভাব ভিয়ানে চড়াইয়া কালিদাস ভারতীয় সাহিত্যে নূতন প্রাণরসের অন্নাদ্য যোগাইয়াছেন।

কালিদাসের কাহিনীর সঙ্গে মহাভারত-কাহিনীর সম্বন্ধ ও কালিদাসের নাট্যকাহিনীতে রূপকথার যোগাযোগ অন্যত্র একটি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।[২]

মৃচ্ছকটিক

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত নাটকের উৎকর্ষের শেষ সীমা প্রাপ্ত। সেই সঙ্গে আর একখানি—সম্ভবত সমসাময়িক কিংবা অল্প পরবর্তী—রচনার উল্লেখ কর্তব্য। সেখানির নাম 'মৃচ্ছকটিক'। শিশুর খেলনা একটি মাটির গাড়ি উপলক্ষ্য করিয়া নাট্যকাহিনী জমাট বাঁধিয়াছে, সেই জন্য এই নাম (''মৃৎশকটিকা'')। কাহিনী সবল নয়, জটিল এবং ঘোরালো। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্স-উপন্যাসের সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের তুলনা হয়। আধুনিক সাহিত্যের গল্পরস

১। পদটির মানে জানা নাই। *নড়পিৎ (অর্থাৎ নলপায়ী?) শব্দ হইতে জাত তদ্ধিতান্ত পদ (''অপত্যং স্ত্রী'') হইতে পারে। কণ্ব কি নবজাত শকুন্তলাকে নলে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া (—এখন যেমন ফীডিং বোতলে অথবা পলিতা করিয়া দুধ খাওয়ানো হয়—) বাঁচাইয়াছিলেন?

২। রূপকথা ও শকুন্তলা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৬ বর্ষ, ১৩৬৬ সাল, প্রথম সংখ্যা।)

এবং সদসৎ সাধারণ মানুষের অবস্থার মোটামুটি পরিচয় (মায় রাষ্ট্রবিপ্লব সমেত) এই নাটকে যেমন পাওয়া যায়, তেমন সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোথাও নয়। কালিদাসের তিন নাটকেরই নায়ক রাজা। মৃচ্ছকটিকের নায়ক-রাজা নয়, সম্ভ্রান্ত, তবে গরীব, ব্যক্তি।

রচয়িতার নাম দেওয়া হইয়াছে শূদ্রক। এটি নাম নয়, ছদ্মনাম।[১] প্রস্তাবনা হইতে মনে হয় যে বইটি কোন প্রাচীনতর রচনার সংস্করণ অথবা সংকলন। যিনি এই সংস্কার অথবা সংকলনের জন্য দায়ী তিনিই মূল লেখককে শূদ্রক নামে নির্দেশ করিয়াছেন। "আমুখ" (অর্থাৎ প্রস্তাবনা) হইতে কবিপরিচয় উদ্ধৃত করিতেছি। এ প্রস্তাবনা মূল লেখকের রচনা হইতে পারে না।

দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্বভূব প্রথিতঃ শূদ্রক ইত্যগাধসত্ত্বঃ।।

'গতিভঙ্গি যাঁহার গজশ্রেষ্ঠের মতো, চাহনি যাঁহার চকোরের মতো, মুখ যাঁহার পূর্ণচন্দ্রের মতো, দেহ যাঁহার সুঠাম, এবং বীর্য যাঁহার অগাধ, কবি ছিলেন তেমনই। তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং শূদ্রক নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।।'

ঋগ্‌বেদং সামবেদং গণিতমথ কলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং
জ্ঞাত্বা শর্বপ্রসাদাদ্ ব্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য।
রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা
লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ।।

'ঋগ্‌বেদ সামবেদ গণিত কামশাস্ত্র এবং হস্তিবিদ্যা অধিগত করিয়া, পুত্রকে রাজা দেখিয়া, যিনি অত্যন্ত সুকৃতকর্ম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই শূদ্রক শত বৎসরের অতিরিক্ত দশ দিন আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া অগ্নিতে প্রবিষ্ট[২] হইয়াছিলেন।।'

সমরব্যসনী প্রমাদশূন্যঃ ককুদং বেদবিদাং তপোধনশ্চ।
পরবারণবাহুযুদ্ধলুব্ধঃ ক্ষিতিপালঃ কিল শূদ্রকো বভূব।।

'সমরপ্রিয়, সংযত, বেদজ্ঞ ও তপস্বীদের অগ্রগণ্য, শত্রুশ্রেষ্ঠদের[৩] সঙ্গে বাহুযুদ্ধে অভিলাষী শূদ্রক মহীশাসক হইয়াছিলেন।।"

তাহার পরে দুই শ্লোকে নায়ক-নায়িকার নাম করিয়া এবং কাহিনীর মূল্য নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে সবটাই রাজা শূদ্রকের রচনা। ইহাতেই বোঝা যায় যে মৃচ্ছকটিকের সবটা, অন্তত প্রস্তাবনার অনেকটা, মূল নাটকের লেখকের রচনা নয়।

অবন্তিপুর্যাং দ্বিজসার্থবাহো যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।।
তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবাশ্রয়ং নয়প্রচারং ব্যবহারদুষ্টতাম্।
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা চকার সর্বং কিল শূদ্রকো নৃপঃ।।

'অবন্তীর রাজধানীতে বণিক্‌বৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণ যুবা চারুদত্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। বসন্তশোভার মতো (সৌন্দর্যশালিনী) গণিকা বসন্তসেনা তাঁহার গুণ শুনিয়া অনুরাগিণী হইয়াছিল।।

১। কবি ছিলেন খুব ভালো ব্রাহ্মণ ("দ্বিজমুখ্যতমঃ") অথচ নাম শূদ্রক। —অসঙ্গত বোধ হয়।
২। দুই রকম মানে হইতে পারে। এক অগ্নিসৎকার, আর আত্মাহুতি।
৩। "শত্রুর হাতির সঙ্গে"—এই মানে সহজ হইলেও সঙ্গত নয়। হাতির সঙ্গে মানুষের বাহুযুদ্ধ কল্পনায়ও আসে না।

'তাহাদের দুইজনের এই মনোহর প্রেমকাহিনী (আশ্রয় করিয়া) নীতির প্রচার, বিচার কার্যে দুর্নীতি, খলের প্রকৃতি এবং দৈবের অলঙ্ঘনীয়তা—এইসব (বস্তু) রাজা শূদ্রক (এই নাটকে) নিবদ্ধ করিয়াছেন।।'

মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা যিনিই হোন না কেন তিনি শিবভক্ত ছিলেন। আরম্ভশ্লোকে সমাধিমগ্ন শিবের বন্দনা। শিব যেন ধ্যানী বুদ্ধ। কালিদাসের কুমারসম্ভবে ধ্যানী শিবের ছবির সঙ্গে এ বর্ণনার মিল আছে।

দশ অঙ্কের বৃহৎ নাটকটির প্রথম অঙ্কের প্রথমে নায়ক চারুদত্তের সুহৃৎ ব্রাহ্মণ মৈত্রেয় (নাটকের বিদূষক) দেখা দিলেন। তাঁহার হাতে জাতিফুলের গন্ধবাসিত একটি উত্তরীয়। দেবতার আশীর্বাদী এই উত্তরীয়খানি জুণ্ণবুড্‌ঢ (জীর্ণবৃদ্ধ) প্রিয়বয়স্য চারুদত্তকে উপহার পাঠাইতেছেন। চারুদত্ত আসিয়া মৈত্রেয়কে দেখিয়া বলিল, 'এই যে আমার সব সময়ের বন্ধু, এস এস।'[১] মৈত্রেয় বলিল, 'ভাবিতেছ কী?' চারুদত্ত বলিল, 'আমার অর্থকষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভাবিতেছি না। আমি অর্থহীন এই মনে করিয়া যে অতিথি আমার গৃহে আর আসে না তাহাতেই আমার দুঃখ। তবে আরও কষ্ট হয় এই ভাবিয়া যে বন্ধু দরিদ্র হইয়াও পড়িলে তাহার প্রতি বন্ধুদের টানও আলগা হইয়া আসে।'[২]

তখন সন্ধ্যাকাল। চারুদত্ত গৃহদেবতাদের সন্ধ্যাপূজা দিয়া আসিয়াছে। সে মৈত্রেয়কে বলিল, 'যাও। চৌমাথায় মাতৃকাদের পূজাদ্রব্য রাখিয়া এস।'[৩] মৈত্রেয় বলিল, 'যাইব না।' চারুদত্ত বলিল, 'কেন?' মৈত্রেয় বলিল, 'এত পূজা দিয়াও তো দেবতারা প্রসন্ন হইতেছেন না, সুতরাং দেবতা পূজা করিয়া লাভ কী?' চারুদত্ত সে কথা মানিল না, পূজা দিতে যাইতে আবার বয়স্যকে অনুরোধ করিল।

এমন সময়ে নেপথ্যে গোলমাল শোনা গেল। রাজপথে বসন্তসেনার গলা পাইয়া তাহার প্রেমলুব্ধ, লম্পট ও দাম্ভিক মূর্খ রাজশ্যালক শকার[৪] তাহাকে তাড়া করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আছে বিট[৫] ও চাকর ("চেট")। শকার কামদেবমন্দিরের উদ্যানে বসন্তসেনাকে দেখিয়াছিল। তাহার পর হইতে সে বসন্তসেনাকে অন্তঃপুরে আনিতে সচেষ্ট। টাকাকড়ির লোভ দেখাইয়া পারে নাই। এখন বলপ্রয়োগের চেষ্টায় আছে। কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত ভীতু কাপুরুষ। এখন তাহার সাহস সঙ্গে বিট ও চেট আছে বলিয়াই।

বসন্তসেনাকে উদ্দেশ করিয়া হাবাগোবা শকার কবিত্ব করিয়া মূর্খত্ব বর্ষণ করিতে লাগিল।

মম মঅণমণঙ্গং বম্মহং বড্‌ঢঅন্তী
ণিশি অ শঅণকে মে নিদ্দঅং অসখিবন্তী।
পশলশি ভঅভীদা পক্খলন্তী খলন্তী
মম বশমণুজাদা লাবণশ্‌শেব কুন্তী।।

'আমার মদন অনঙ্গ মন্মথ বর্ধন করিয়া এবং নিশায় শয্যায় আমার নিদ্রা আকর্ষণ করিয়া (নিজে) ভয়ভীত হইয়া তুমি হোঁচট খাইতে খাইতে এবং স্খলিত হইতে হইতে ছুটিতেছ (কেন)? তুমি আমার বশে আসিয়া গিয়াছ, যেমন রাবণের কুন্তী।।'

১। "অয়ে সর্বকালমিত্রং মৈত্রেয়ঃ প্রাপ্তঃ। সখে স্বাগতং স্বাগতম্।"
২। "এতত্তু মাং দহতি নষ্টধনাশ্রয়স্য যৎ সৌহৃদাদপি জনাঃ শিথিলীভবন্তি"।
৩। "গচ্ছ। ত্বমপি চতুষ্পথে মাতৃভ্যো বলিমুপহর।"
৪। ঘৃণা বস্তুবাচক শব্দ, নামরূপে ব্যবহৃত।
৫। আসল অর্থ সম্ভবত বেশ্যালয়-অভিজ্ঞ।

বিটও বসন্তসেনাকে উদ্দেশ করিয়া শ্লোক পড়িতেছিল। সে শ্লোক সংস্কৃতে, শিক্ষিতের রচনা, তাহাতে শকারের মতো মূর্খতার পরিচয় একটুও নাই। বিট শকারের অর্থদাস কিন্তু মনিবের প্রতি তাহার সহানুভূতি ছিল না। বসন্তসেনার প্রতি তাহার নিজেরই একটু লোভ ছিল।

বসন্তসেনা মনে করিয়াছিল যে তাহার গায়ের গহনার জন্যই গুণ্ডারা তাহার পিছু ধরিয়াছে। বসন্তসেনা গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দিতে চাহিলে বিট বাধা দিয়া বলিল, "ন পুষ্পমোষমর্হত্যুদ্যানম্।"[১]

শকার বলিল, "হগে বরপুলিশমণুশ্শে বাশুদেবকে কাময়িদব্বে"।[২]

বসন্তসেনা অপমানিত বোধ করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, 'চুপ্ চুপ্। দূর হও। ইতরের মতো বকিতেছ।'[৩] শুনিয়া

শকারঃ। (সতালিকং বিহস্য) ভাবে ভাবে, পেক্খ দাব। মং অন্তলেন শুশিণিদ্ধা এশা গণিঅদালিআ ণং। ঝে মং ভণাদি—এহি। শন্তেশি। কিলিন্তেশি ত্তি। হগে ণ গামন্তলং ণগলন্তলং বা গডে। অজ্জুকে শবামি ভাবশশ্ শীশং অত্তণকেহিং পাদেহিং। তব জ্জেব পশ্চাণুপশ্চিআএ আহিণ্ডন্তে শন্তে কিলিন্তেম্হি সংবুত্তে।

'(হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিয়া) মহাশয় মহাশয়, দেখুন দেখি। আমার প্রতি সত্যই অত্যন্ত অনুরাগিণী এই গণিকা-কন্যা। তাই আমাকে বলিতেছে—এস। শ্রান্ত হইয়াছ। ক্লান্ত হইয়াছ। আমি তো অন্য গ্রামেও যাই নাই অন্য নগরেও নয়। মহাশয়া, আমি মহাশয়ের[৪] মাথা নিজের পা দিয়া ছুঁইয়া শপথ করিতেছি—তোমারই পিছু পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে আমি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

বিট বসন্তসেনাকে বলিল, আপনি বেশবাসবিরুদ্ধ[৫] কথা বলিতেছেন।

> তরুণজনসহায়শ্চিন্ত্যতাং বেশবাসো
> বিগণয় গণিকা ত্বং মার্গজাতা লতেব।
> বহসি হি ধনহার্যং পণ্যভূতং শরীরং
> সমমুপচর ভদ্রে সুপ্রিয়ং চাপ্রিয়ং চ।।

'তরুণজনের সহায় বেশ্যালয়ের কথা বিবেচনা কর। ভাবিয়া দেখ, তুমি গণিকা, পথের ধারে উৎপন্ন লতার মতো। তুমি যে দেহ বহন করিতেছ তাহা ধনে কেনা যায়। তাহা পণ্যের মতো। ওগো ভালো মেয়ে, তুমি সমানভাবে সেবা কর—(পুরুষ) ভালো (হোক) বা মন্দ (হোক)।'

বসন্তসেনা উত্তর দিল

> গুণো ক্খু অণুরাঅস্স কারণং ণ উণ বলক্কারো।
> 'গুণই অনুরাগের কারণ বলপ্রকাশ নয়।'

তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়াছে। লোক দেখা যায় না। বিটের মুখে সে অন্ধকারের বর্ণনা—

১। 'বাগানের ফুল ছেঁড়া উচিত নয়।'
২। আমি ভালো পুরুষমানুষ, কৃষ্ণ, প্রেম করিবার উপযুক্ত।'
৩। "শন্তং শন্তং। অবেহ। অণজ্জং মন্তেশি।"
৪। অর্থাৎ বিটের।
৫। "বেশ" মানে বেশ্যালয়, গণিকানিবাস।

লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টির্বিফলতাং গতা।।[১]

'অন্ধকার যেন গায়ে চিটিয়া যাইতেছে। আকাশ যেন কাজল বৃষ্টি করিতেছে। দৃষ্টি অসৎ পুরুষের সেবার মতো বিফল হইতেছে।।'

বিট ও শকারের হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় না দেখিয়া বসন্তসেনা, বাঁ দিকে চারুদত্তের ঘর, বিট ও শকারের সংলাপ হইতে জানিতে পারিয়া সেইখানে ঢুকিয়া পড়িল।

বসন্তসেনা সরিয়া পড়িলে বিট শকারকে বলিল, বসন্তসেনার কোন হদিস পাইতেছ কি ? শকার বলিল, কী রকম হদিস?

বিট বলিল, 'ভূষণের শব্দ, সুরভিময় মাল্যগন্ধ।' মূর্খ শকার উত্তরে যাহা বলিল তাহা এখনকার দিনের অভিনবকবিভারতীর অনুপযুক্ত নয়।

শুণামি মল্লগন্ধং অন্ধআলপুলিদাএ উণ ণাশিয়াএ ণ শুব্বত্তং
পেক্‌খামি ভূশণশদ্দং।

'শুনিতেছি মাল্যগন্ধ। কিন্তু নাসিকা অন্ধকারপূরিত হওয়ায় স্পষ্ট করিয়া ভূষণশব্দ দেখিতেছি না।'

বসন্তসেনাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চারুদত্ত তাহাকে দাসী রদনিকা বলিয়া ভুল করিল এবং তাহাকে জুন্নবুড়ঢের উপহার চাদরখানি দিয়া শিশুপুত্র রোহসেনের গায়ে জড়াইয়া তাহাকে ভিতরবাড়িতে লইয়া যাইতে বলিল। কেন না তখন ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল। চাদরখানির গন্ধ পাইয়া বসন্তসেনার মন সচকিত হইল। সে ভাবিল

অণুদাসীণং সে জোব্বণং পডিভাসেদি।

'ইঁহার যৌবন এখনও নিঃস্পৃহ হয় নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।'

বসন্তসেনা চাদরটি নিজের গায়ে জড়াইয়া লইল।

রোহসেনকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আবার বলিলেও বসন্তসেনা নড়িল না। সে মনে মনে বলিল

মন্দভাইণী ক্খু অহং তুহ্মে অব্‌ভন্তরস্‌স।

'তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার হতভাগিনী আমার নাই।'

ইহাতে রদনিকার ঔদ্ধত্য কল্পনা করিয়া চারুদত্ত দারিদ্র্যের দুঃখ আবার স্মরণ করিতে লাগিল। এমন সময় বিদূষক দূর হইতে রদনিকাকে আসিতে দেখিয়া বলিল, 'এই তো রদনিকা।' শুনিয়া চারুদত্ত বলিল, 'ইনি তবে কে ?'

অবিজ্ঞাতাবসক্তেন দূষিতা মম বাসসা।
ছাদিতা শরদভ্রেণ চন্দ্রলেখেব দৃশ্যতে।।

'না জানি কে ইনি আমার বস্ত্র গায়ে দিয়া দূষিত হইয়াছেন।
ইঁহাকে দেখাইতেছে যেন শরৎমেঘে আচ্ছাদিত চন্দ্রকলা।।'

পরস্ত্রীকে পর্যবেক্ষণ করা তো উচিত হইতেছে না।

মৈত্রেয় বলিল, 'পরস্ত্রীশঙ্কা করিও না। ইনি বসন্তসেনা, কামদেবায়তন-উদ্যানের পর হইতে তোমার প্রতি অনুরাগিণী।' ইনিই বসন্তসেনা, এই বলিয়া চারুদত্ত ভাবিল

যয়া মে জনিতঃ কামঃ ক্ষীণে বিভববিস্তরে।
ক্রোধঃ কুপুরুষস্যেব স্বগাত্রেষ্ববসীদতি

১। এই শ্লোকটি দণ্ডীর কাব্যাদর্শে উদ্ধৃত আছে।

"ইনি আমার অনুরাগ জন্মাইয়াছেন যখন আমার বৈভব ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে! এ যেন কাপুরুষের ক্রোধ যা নিজের মনেই লীন হয়।।"

বসন্তসেনার আগমনের বৃত্তান্ত বলিয়া মৈত্রেয় চারুদত্তের প্রতি শকারের দম্ভোক্তির পুনরুক্তি করিল।

যই মম হথে সঅং জেব পট্ঠাবিঅ এণং সমপ্পেসি
ততো অধিঅলণে ব্যবহালং বিণা লহুং নিজ্জাদমাণাহ
তব মএ অণুবন্ধা পীদী হুবিস্সদি। অণ্ণধা মলণন্তিকে
বেলে হুবিস্সদি।

'(বসন্তসেনাকে) যদি আমার হাতে নিজেই পাঠাইয়া সমর্পণ কর তবে বিচারালয়ে মামলা ছাড়াই, অল্প শাস্তি প্রাপ্ত তোমার সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইবে। অন্যথা মরণান্তিক বৈর হইবে।'

চারুদত্তঃ। (সাবজ্ঞম্) অজ্ঞোহসৌ। (স্বাগতম্) অয়ে কথং দেবতোপস্থানযোগ্য যুবতিরিয়ম্। তেন খলু তস্যাং বেলায়াং

প্রবিশ গৃহমিতি প্রতোদ্যমানা ন চলতি ভাগ্যকৃতাং দশামবেক্ষ্য।
পুরুষপরিচয়েন চ প্রগল্ভং ন বদতি যদ্যপি ভাষতে বহুনি।।

'(অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া) লোকটা বোকা। (মনে মনে) আহা দেবতাস্থানের উপযুক্ত[১] এই তরুণী। তাই তখন

"ঘরে যাও"—বারবার বলিলেও সে নড়ে নাই, আমার ভাগ্যহীন দশা দেখিয়া। পুরুষের সঙ্গে ব্যবহার থাকায়, যদিও সে মুখে কিছু কহিতেছে না তবুও যেন অনেক কথা কহিতেছে।।[২]

অপরিচয়ের জন্য তাহাকে দাসীভ্রম করিয়াছিল বলিয়া চারুদত্ত বসন্তসেনার কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চাহিল, "শিরসা ভবতীমনুনয়ামি।"[৩]

বসন্তসেনা উত্তর দিল, 'এদিণা অণুচিদভূমি-আরোহণেণ অবরদ্ধা অজ্জং সীসেণ পণমিঅ পসাদেমি।"[৪]

যাইবার আগে বসন্তসেনা তাহার অলঙ্কারগুলি রাখিয়া গেল। সে বলিল যে অলঙ্কারের লোভে গুণ্ডারা আবার নির্যাতন করিতে পারে। চারুদত্ত বলিল, "অযোগ্যমিদং ন্যাসস্য গৃহম্"। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তসেনা উত্তর দিল, "অজ্জ অলীঅং। পুরুসেসু ণাসা নিক্খিবিয়ন্তি ন উণ গেহেসু"।[৫] তখন চারুদত্ত বিদূষককে বলিল, "মৈত্রেয় গৃহ্যতাময়লংকারঃ"।

মৈত্রেয়ের সঙ্গে বসন্তসেনা নিজগৃহে চলিয়া গেল। এইখানে প্রথম অঙ্ক (নাম 'অলংকারন্যাস') শেষ।

ঘরে ফিরিয়া বসন্তসেনা সখী-পরিচারিকা মদনিকার সঙ্গে মনের কথা কহিতেছে। প্রথমেই মদনিকা বুঝিয়াছে যে বসন্তসেনা কাহাকে যেন চাহিতেছে। সে বলিল, বলো কাহার সেবা

১। অর্থাৎ দেবদাসী হইবার যোগ্য।
২। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ, "অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলি।"
৩। 'মাথা হেঁট করে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'
৪। 'যেখানে আমার প্রবেশের যোগ্যতা নাই এমন (এই) উচ্চস্থানে আসিয়া আমি অপরাধিনী। মাথা নত করিয়া আমি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।'
৫। 'মহাশয়, বাজে কথা। পুরুষ দেখিয়া ধন গচ্ছিত রাখা হয়, ঘর দেখিয়া নয়।'

করিতে চাও, রাজার না রাজবল্লভ কোন ভাগ্যবানের। বসন্তসেনা সংক্ষেপে যাহা বলিল তাহাতে তাহার চরিত্র উদ্‌ভাসিত।—"হঞ্জে রমিদুমিনুমি ণ সেবিদুং।"[১]

জেরা করিয়া মদনিকা বসন্তসেনার প্রেমাস্পদের নাম জানিয়া লইল। সে বলিল, কিন্তু শোনা যায় চারুদত্তের তো আর পয়সাকড়ি নাই।

বসন্তসেনা। অদো জ্জেব কামীঅদি। দলিদ্দপুরিসসংকন্তমণা কখু গণিআ লোএ অবঅণীআ ভোদি।

'সেই জন্যই তো চাই। গণিকা দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি অনুরাগিণী হইলে লোকের কিছু বলিবার থাকে না।'

মদনিকা। অজ্জএ কিং হীণকুসুমং সহআরপাদবং মহুঅরীও উণ সেবন্তি।

'আর্যকা, পুষ্পহীন আম্রবৃক্ষের কাছে কি আর মৌমাছিরা যায়?'

বসন্তসেনা। অদো জ্জেব তাও মহুঅরীও বুচ্চন্তি।

'সেই জন্যই তো তাহাদের মধুকরী বলা হয়।'

এমন সময়ে নেপথ্যে এক কাণ্ড ঘটিতেছে, এক জুয়াড়ির[২] জুয়ার দেনার দায়ে নির্যাতন। এই দৃশ্যটি মৃচ্ছকটিকের একটি বিশিষ্ট অংশ। ঋগ্‌বেদে যে জুয়াড়ির কবিতার[৩] কথা বলিয়াছি এই দৃশ্যে তাহাই কালোচিত রূপান্তরে দেখিতেছি।

(নেপথ্যে।) অলে ভট্টা দশসুবণ্ণাহ লুদ্ধু জুদকরু পপলীণু পপলীণু। তা গেহ্ন গেহ্ন। চিট্ঠ চিট্ঠ। দূলা পবিট্‌ঠো সি।

'ওগো মহাশয়, দশ স্বর্ণমুদ্রার[৪] দায়ে আটক জুয়াড়ি পলাইল পলাইল। তাই ধর ধর! দাঁড়াও দাঁড়াও। দূর থেকে নজরে পড়িয়াছ।'

(বস্ত্রাবৃত অবস্থায়[৫] রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া)

সংবাহক। ঝকমারি, জুয়াড়ির জীবন কষ্টের।

ণববন্ধণমুক্কাএ বিঅ গদ্দহীএ
হা তাড়িতোম্‌হি গদ্দহীএ।
অঙ্গলাঅমুক্কাএ বিঅ শত্তীএ।।
ঘডুক্কো বিঅ ঘাদিদোম্‌হি শত্তীএ।।

'হায়, নব বন্ধনমুক্ত গর্দভীর মতো আমি ঘাড়ধাক্কা[৬] খাইয়াছি। অঙ্গরাজ নিক্ষিপ্ত শক্তির দ্বারা ঘটোৎকচ যেমন তেমনি আমি সবলে প্রহৃত হইয়াছি।।"

১। 'ওলো, আমি প্রেম করিতে চাই। (দেহ দিয়া) সেবা করিতে চাই না।'

২। জুয়াড়ির নাম সংবাহক। এ তাহার আসল নাম নয়। মর্দনিয়ার কাজ করিত বলিয়া সে এই নামে পরিচিত ছিল।

৩। আগে পৃষ্ঠা ২৮-৩০ দ্রষ্টব্য।

৪। অথবা দশ তোলা সোনার।

৫। "অপটীক্ষেপেণ"। রঙ্গস্থলে পাত্রদের কেহ অপর পাত্রদের গোচরে না আসিয়া আড়ালে থাকিলে সে যে-কাপড় মুড়ি দিয়া সাজঘর হইতে আসিত তাহা খুলিয়া ফেলিত না। নতুবা সে-কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া তবে রঙ্গস্থলে পাত্র-পাত্রী আবির্ভূত হইত। 'নট নাট্য নাটক' দ্রষ্টব্য।

৬। দ্বিতীয় "গদ্দহীএ" পদটির মানে করা হয় "জুয়ার কড়ি"। এ অর্থ সঙ্গত নয়। বাংলা "ঘাড়" তুলনীয়।

লেহঅবাবডহিঅঅং শহিঅং দট্‌ঠুণ ঝত্তি পব্‌ভট্‌ঠে।
এণ্‌হিং মগ্‌গণিবদিদে কং ণু কখু শলণং পপজ্জে।।'
'(জুয়ার) আড্ডাধারীকে হিসাব লিখিতে ব্যস্ত দেখিয়া আমি ঝট করিয়া সরিয়া পড়িয়াছি। এখন রাস্তায় পড়িয়া কাহার শরণ লই!'
তা জাব এদে শহিঅজুদিঅলা অণ্ণদো মং অণ্ণেশন্তি তাব হক্কে বিপ্‌পডী-
বেহিং পাদেহিং এদং শুণ্ণদেউলং পবিশিঅ দেবীভবিশ্‌শং।
'অতএব যতক্ষণ আড্ডাধারী আর জুয়াড়ি অন্যদিকে আমাকে খুঁজিতে থাকিবে ততক্ষণে আমি পিছনে হাঁটিতে হাঁটিতে এই শূন্য দেবমন্দিরে ঢুকিয়া দেবতা সাজিয়া থাকি।'

আড্ডাধারী মাথুর ও তাহার সহকারী জুয়াড়ি সংবাহকের নাম করিয়া হাঁক পাড়িতে পাড়িতে সেইদিকেই আসিতেছে। তাহার অনুসরণ করিয়া আসিয়া দেখিল আর সম্মুখগমনের চিহ্ন নাই। মাথুর ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল যে সেখান হইতে পায়ের ছাপ উল্‌টা হইয়া দেবমন্দির পর্যন্ত গিয়াছে। উল্‌টা পা আর প্রতিমাশূন্য দেউল দেখিয়াই সে বুঝিল, "ধুত্তু জুদঅরু বিপ্‌পডীবেহিং পাদেহিং দেউলং পবিট্‌ঠো।"[1] মন্দিরে ঢুকিয়া তাহারা কিছু ঠিক করিতে পারিল না। তাহারা চালাকি খেলিল। জুয়াড়িকে তাহারা যেন প্রতিমা মনে করিয়া তর্ক তুলিল, প্রতিমা কাঠের না পাথরের। তর্ক দাঁড়াইল বাজিতে। সেইখানেই দুজনে বাজি খেলিতে লাগিয়া গেল। বাজিখেলার শব্দ শুনিয়া সংবাহকের প্রবৃত্তি চাগিয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না।

কত্তাশদ্দে ণিন্নাণঅশ্‌শ হলই হডক্কং মণুশ্‌শশ্‌শ।
ঢক্কাশদ্দে ব্ব ণড়াধিবশ্‌শ পব্‌ভট্‌ঠরজ্জশ্‌শ।।
জাণামি ণ কীলিশ্‌শং শুমেলুশিহল-পড়ণসন্নিহং জূ অং।
তহপি হু কোইলমহুলে কত্তাশদ্দে মণং হলদি।[2]
'পাশাঘুঁটি চালার শব্দে নিঃস্ব মানুষেরও হৃদয় চঞ্চল হয়,
যেমন ঢাকের শব্দে (হয়) রাজ্যচ্যুত রাজার।।
ভাবি কখনো জুয়া খেলিব না, যে খেলা সুমেরু শিখর থেকে পতনের মতো। (কিন্তু) কোকিলের মতো মধুর ঘুঁটি শব্দে মন টানে।।'

মাথুর ও জুয়াড়ি 'আমার পালা, আমার পালা' করিয়া চীৎকার তুলিলে সংবাহক আর থাকিতে পারিল না। ঝপ করিয়া তাহাদের সামনে আসিয়া বলিল, 'আমার পালা।' অমনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া মাথুর বলিল, "বেটা ধরা পড়িয়াছিস। দে আমার দশ স্বর্ণমুদ্রা।' সংবাহক বহু অনুনয় বিনয় করিল, পায়ে পড়িল, তবুও আড্ডাধারী ছাড়িল না। বলিল, 'যেমন করিয়া পারিস আমার টাকা শোধ দে।' শেষে স্থির হইল, সে নিজেকে বেচিয়া টাকা দিবে। কিন্তু তাহাকে কিনিবে কে ? কিছুক্ষণ পরে সেখানে এক ব্যক্তি, নাম দর্দুরক, আসিল। সে দুঃস্থ, তাহার কাজও সর্বদা ভালো নয়। তবে সে শিক্ষিত ও সদয়হৃদয়। সংবাহকের দুঃখ সে বুঝিল। মাথুরকে সে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বৃথা। মাথুর টাকা ছাড়িবে না। ধৈর্যহীন হইয়া মাথুর সংবাহককে টানিতে গেল। তখন দর্দুরক বলিল, 'অন্যস্থানে যা কর তা কর আমার সম্মুখে

১। ধূর্ত জুয়াড়ি পিছন হাঁটিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে।
২। তুলনীয় ঋগ্‌বেদ (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

ইহার গায়ে হাত দিতে পারিবে না।' এই কথার উত্তরে মাথুর সংবাহকের নাকে ঘুসি মারিল, তাহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। দর্দুরক ছাড়াইতে গিয়া মাথুরের মার খাইল। তবে সেও মাথুরকে দুই চারি ঘা লাগাইল। মাথুর তাহাকে গালি দিয়া শাসাইল, 'ফল পাইবি।' দর্দুরক বলিল, 'ওরে মূর্খ, তুই আমাকে রাস্তায় পাইয়া মারিলি। কাল যদি রাজকুলে[১] মারিতে চেষ্টা করিস তবে দেখিতে পাইবি।' মাথুর বলিল, 'এই দেখিব।'' দর্দুরক বলিল, 'কেমন করিয়া দেখিবি?' মাথুর আঙ্গুল দিয়া নিজের চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, 'এমনি করিয়া দেখিব।' অমনি মাথুরের চোখে এক মুঠা ধুলা ছুঁড়িয়া দর্দুরক সংবাহককে পলাইতে ইঙ্গিত করিল।' দর্দুরক ভাবিল।

প্রধানসভিকো মাথুরো ময়া বিরোধিতঃ। তন্নাত্র যুজ্যতে স্থাতুম্।
কথিতং চ মম প্রিয়বয়স্যেন শর্বিলকেন যথা কিল—আর্যকনামা গোপাল-
দারকঃ সিদ্ধাদেশেন সমাদিষ্টো রাজা ভবিষ্যতি ইতি। সর্বশ্চাস্মদ্‌বিধো
জনস্তমনুসরতি। তদহমপি তৎসমীপমেব গচ্ছামি।

'প্রধান সভিক[২] মাথুরকে আমি চটাইয়াছি। তাই আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। প্রিয়বয়স্য শর্বিলক আমাকে বলিয়াছিল বটে, "আর্যক নামধারী গোপালপুত্র[৩] সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যৎবাণী পাইয়াছে যে রাজা হইবে।" আমার মতো[৪] লোক সব তাহার অনুসরণ করিতেছে। সুতরাং আমিও তাহার কাছেই যাই।'

এই ভাবিয়া দর্দুরকও সরিয়া গেল।

খিড়কি দুয়ার খোলা দেখিয়া সংবাহক একটা বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। যে বাড়ি বসন্তসেনার। বসন্তসেনা তাহার পরিচয় লইল। সে ছিল পাটলীপুত্রবাসী গৃহস্থের ছেলে। এককালে সে শখ করিয়া মর্দনিয়ার শিল্প শিখিয়াছিল, অবস্থাগতিকে ইহা তাহার জীবিকা হইয়াছে। সে চারুদত্তের সেবক ছিল। অবস্থা খারাপ হওয়ায় চারুদত্ত তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছে। সে চারুদত্তের ভৃত্য ছিল জানিয়া বসন্তসেনা তাহাকে খুব খাতির করিল। তাহার পর তাহার জুয়ার দেনার কথা জানিয়া চেড়ীকে দিয়া জুয়ার আড্ডাধারী মাথুরের প্রাপ্য অর্থ পাঠাইয়া দিয়া সংবাহককে ঋণমুক্ত করিল। বসন্তসেনার ইচ্ছা সংবাহক আবার চারুদত্তের পরিচর্যা করুক গিয়া। কিন্তু সংবাহক বোঝে যে চারুদত্ত কিছুতেই বিনা বেতনে তাহার সেবা গ্রহণ করিবে না! সে মনে মনে ঠিক করিয়া বসন্তসেনাকে বলিল, 'জুয়া খেলিয়া এই অপমানের পর আমি সংসারে ও সমাজে থাকিতে চাহি না। আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু হইব ("শক্কশমণকে হবিশ্শং")। "জুয়াড়ি সংবাহক শাক্যশ্রমণ হইয়াছে",—এই কথাটি অনুগ্রহ করিয়া স্মরণে রাখিবেন।' উত্তরে বসন্তসেনা বলিল, 'মহাশয়, এমন সাহস করা উচিত নয়।' 'আর্যে, আমি স্থির নিশ্চয় করিয়াছি।'—এই বলিয়া সংবাহক একটি গাথাশ্লোক পড়িল।

জুদেণ তং কদং মে জং বীহথং সব্বশ্শ জণশ্শ।
এণহিঁ পাঅডশীশে নলিন্দমগ্গেণ বিহলিশ্শং।।

'সব লোক যা অত্যন্ত ঘৃণা করে তাহাই আমার ঘটিয়াছে জুয়াতে। এখন আমি ঢাকা মাথায় রাজপথে বিচরণ করিব।।'

১। অর্থাৎ রাজসভায় অথবা বিচারালয়ে।
২। সভিক মানে দ্যূতসভার (জুয়া-আড্ডার) অধ্যক্ষ।
৩। অর্থাৎ গোয়ালার ছেলে।
৪। অর্থাৎ ছন্নছাড়া।

এমন সময় রাজপথে কোলাহল উঠিল। বসন্তসেনার এক দুষ্ট হস্তী, নাম খোঁটাভাঙ্গা,[১] খেপিয়া গিয়া মাহুতকে মারিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। একটু পরে বসন্তসেনার পরিচারক কর্ণপূরক আসিয়া খবর দিল যে সে দুষ্ট হস্তীকে বশ করিয়াছে এবং এই কাজের জন্য উজ্জয়িনীর সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতেছে। আর্য চারুদত্তও তাহাকে জাতিকুসুম-সুবাসিত উত্তরীয় পুরস্কার দিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া বসন্তসেনা কর্ণপূরকের হাত হইতে চাদরখানি লইয়া নিজের গায়ে জড়াইল আর হাতের গয়না খুলিয়া কর্ণপূরককে দিল। চারুদত্ত এখন কোথায়, এই প্রশ্ন করিলে কর্ণপূরক বলিল, তিনি এই পথেই বাড়ির দিকে যাইতেছেন। অমনি তাঁহাকে দেখিতে বসন্তসেনা উপরের বারান্দায় উঠিল। এইখানে দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ। এ অঙ্কের নাম 'দ্যূতকর-সংবাহক'।

অনেক রাত হইয়াছে। চারুদত্ত গান শুনিতে গিয়াছে, মৈত্রেয় তাহার প্রতীক্ষায় জাগিয়া আছে। চারুদত্ত রেভিলের গান শুনিয়া মশগুল হইয়া ফিরিল। তাহার কাছে রেভিলের গানের প্রশংসা শুনিয়া মৈত্রেয় বলিল, গীতনাটের দুই ব্যাপারে আমার হাসি পায়, একালের মেয়েরা যখন সংস্কৃত বলে, আর পুরুষেরা যখন "কাঅলী"[২] গায়। মেয়েরা সংস্কৃত বলিবার সময়ে, যেন সদ্য-প্রসূত নাকফোঁড়া গাভীর মতো ফোঁস্ ফোঁস্ করে। আর পুরুষেরা যখন "কাঅলী" গায় তখন মনে হয় যেন শুকনো ফুলের মালাপরা বৃদ্ধ পুরোহিত মন্ত্র আওড়াইতেছে।

চারুদত্ত তখন শ্রদ্ধাস্পদ ("ভাব") রেভিলের গানের প্রশংসা করিয়া একটি শ্লোক বলিল। এ শ্লোকে ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য প্রকটিত।

> তং তস্য স্বরসংক্রমং মৃদুগিরঃ শ্লিষ্টং চ তন্ত্রীস্বনং
> বর্ণানামপি মূর্ছনান্তরগতং তারং বিরামে মৃদুম্।
> হেলাসংযমিতং পুনশ্চ ললিতং রাগদ্বিরুচ্চারিতং
> যৎসত্যং বিরতেঽপি গীতসময়ে গচ্ছামি শৃণ্বন্নিব।।

> 'তাহার সেই মৃদু কণ্ঠে সুরের খেলা, সেই তারের ঝঙ্কারের মিল, ধ্বনিপরম্পরায়
> মূর্চ্ছনার মাঝখানে কড়ি ও বিরামের কোমল,
> অনায়াসে শমে আসা এবং পুনরায় মধুরভাবে আবার রাগের আলাপ!—
> সত্যই মনে হয় যেন গান থামিয়া গেলেও কানে শুনিয়া চলিয়াছি।।'

দুইজনে বাড়ি ঢুকিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাই তাহাদের ঘুম না ভাঙাইয়া চারুদত্ত মৈত্রেয়ের সঙ্গে বাহির-বাড়িতেই শুইল এবং শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার পরে ঘরে চোর ঢুকিল। এ চোরের একটু ইতিহাস আছে।

চোরের নাম শর্বিলক। বামুনের ছেলে, প্রায় সর্ববিদ্যাবিশারদ। কিন্তু স্বভাব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যুবার মতো নয়। সে ভালোবাসে বসন্তসেনার পরিচারিকা-সখী মদনিকাকে। তাহার এখন টাকার ভারি প্রয়োজন হইয়াছে। সে বসন্তসেনাকে মূল্য দিয়া মদনিকাকে ছাড়াইয়া লইয়া পত্নীরূপে আপন অন্তঃপুরে স্থান দিতে চায়।

শর্বিলক চুরিবিদ্যাতেও পণ্ডিত। চারুদত্তের ঘরে সিঁধ কাটিবার উপলক্ষ্যে মৃচ্ছকটিকের লেখক চৌর্যশাস্ত্রের যে কিঞ্চিৎ তাত্ত্বিক ও আনুষ্ঠানিক পরিচয় দিয়াছেন তা আর কোথাও পাই

১। মূলে "খুণ্টমোডক"।
২। কাকলী, অর্থাৎ কলকণ্ঠের গান। কিংবা কাওয়ালী ঢঙের গান।

নাই। যে ঘরে চারুদত্ত ও মৈত্রেয় ঘুমাইতেছিল সেই ঘরে চোর ঢুকিল। মৈত্রেয় স্বপ্নের ঘোরে শর্বিলকের হাতে বসন্তসেনার অলঙ্কারভাণ্ডটি তুলিয়া দিল। ইতিমধ্যে দাসী রদনিকা জাগিয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোক বলিয়া শর্বিলক তাহাকে হত্যা করিল না। বেশি গোলমাল হইবার আগেই সে পলাইতে সমর্থ হইল।

বসন্তসেনার গচ্ছিত অলঙ্কারভাণ্ড চুরি গিয়াছে শুনিয়া চারুদত্ত যেন বসিয়া পড়িল। তাহার ভাবনা, লোকে বলিবে অভাবের তাড়নায় সে-ই আত্মসাৎ করিয়াছে। শুনিয়া তাহার পত্নী নিজের অবশিষ্ট অলঙ্কার রত্নমালাটি মৈত্রেয়কে দান করিল, ইচ্ছা সে যেন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বসন্তসেনাকে সেটি দিয়া আসে।[১] ইহাতে চারুদত্তের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে মৈত্রেয়কে বলিল

কথম্। ব্রাহ্মণী মামনুকম্পতে। কষ্টম্। ইদানীমস্মি দরিদ্রঃ।

'কি গৃহিণীও আমাকে অনুকম্পা করিতেছে! আহা, এখন আমি দরিদ্র হইয়াছি বটে।'

কিন্তু তখনই চারুদত্ত মনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'আমি দরিদ্রই বা কিসে? আমার

বিভবানুগতা ভার্যা সুখদুঃখসুহৃদ্ ভবান্।
সত্যাচ্চ ন পরিভ্রষ্টং যদ্দরিদ্রেষু দুর্লভম্।।

'পত্নী সংসারের অবস্থা মানিয়া চলেন। আপনি সুখদুঃখের মিত্র।
সত্য হইতেও পরিভ্রষ্ট নই,—যা আসল দরিদ্রের মধ্যে দুর্লভ।।'

চারুদত্ত মৈত্রেয়কে গায়ে হাত দিয়া শপথ করাইয়া বলিয়া দিল, তুমি বসন্তসেনাকে বল গিয়া যে তাঁহার গচ্ছিত অলঙ্কার চারুদত্ত নিজের মনে করিয়া জুয়াখেলায় হারিয়াছে। তাই তাহার বদলে এই রত্নাবলীটি পাঠাইয়াছে। এইখানে তৃতীয় অঙ্ক—নাম 'সন্ধিবিচ্ছেদ' (অর্থাৎ সিঁধকাটা)—শেষ।

চুরিকরা গয়না দিয়া শর্বিলক মদনিকাকে বসন্তসেনার দাসীত্ব হইতে ছাড়াইতে আসিয়াছে। মদনিকা গয়নাগুলি দেখিয়াই চিনিতে পারিল এবং কোথায় পাইয়াছে তাহা জেরা করিয়া জানিয়া লইল। শর্বিলক যে অলঙ্কারগুলি জোর করিয়া কাড়িয়া লয় নাই, মৈত্রেয় স্বপ্নের ঘোরে তাহার হাতে অলঙ্কারভাণ্ড সমর্পণ করিয়াছিল,—ইহা শুনিয়া মদনিকার বিবেক একটু শান্ত হইল। সে শর্বিলককে বলিল, 'এ অলঙ্কার বসন্তসেনার। তুমি উঁহাকে প্রত্যর্পণ কর।' নিজের দোষ ঢাকিবার উদ্দেশ্যে শর্বিলক গয়নাগুলি বসন্তসেনাকে দিয়া বলিল, 'এগুলি চারুদত্ত আপনাকে এই বলিয়া আমার হাতে পাঠাইয়াছেন,—বাড়ি জীর্ণ বলিয়া এই স্বর্ণভাণ্ড আমার রাখা উচিত নয়। অতএব ফেরৎ নিন।' বসন্তসেনা বলিল, 'ইহার জবাব আমি দিতেছি, আপনি শুনুন।'

শর্বিলক আশঙ্কা করিল, জবাব লইয়া চারুদত্তের কাছে যাইতে হইবে। সে মনে ভাবিল, সেখানে যাইবে কে? প্রকাশ্যে বলিল, 'কি প্রত্যুত্তর?'

বসন্তসেনা বলিল, 'আপনি মদনিকাকে গ্রহণ করুন।'

শর্বিলক বলিল, 'মহাশয়া, আমি তো বুঝিলাম না।'

বসন্তসেনা বলিল, আমি বুঝিতেছি।'

শর্বিলক বলিল, 'কি করিয়া?'

বসন্তসেনা বলিল, 'আর্য চারুদত্ত আমাকে বলিয়াছিলেন—যে ব্যক্তি এই অলঙ্কারগুলি তোমাকে সমর্পণ করিবে তাহাকে তুমি মদনিকাকে দান করিও।'

১। কেন না মৈত্রেয়ের হাত হইতেই চুরি গিয়াছে।

ভৃত্যকে গাড়ি জুড়িতে হুকুম দিয়া বসন্তসেনা বলিল, 'মদনিকা, আমাব দিকে ভালো করিয়া চাও। তোমাকে (কন্যা) দান করা হইল। গাড়িতে উঠ গিয়া! মাঝে মাঝে আমাকে মনে করিও।'

মদনিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমাকে আপনি পরিত্যাগ করিলেন।' এই বলিয়া সে পায়ে পড়িল।

বসন্তসেনা বলিল, 'এখন তুমিই (আমাদেব) পদধূলি দিবার যোগ্য হইলে। এখন এস। উঠ গাড়িতে। আমাকে মনে রাখিও।'

মদনিকা ও শর্বিলক গাড়িতে চড়িল। গাড়ি ছাড়িবার উদ্যোগ হইতেছে এমন সময়ে নেপথ্য হইতে ঘোষণা শোনা গেল,—'ওহে কে কোথা আছ এখানে রাজকর্মচারীরা, শোন তোমরা। রাজপুরুষ আদেশ দিতেছেন। এই সে গোপালপুত্র আর্যক[১] বাজা হইবে বলিয়া সিদ্ধ পুরুষের যে ভবিষ্যৎবাণী (প্রচারিত হইয়াছে) তাহাতে শঙ্কা বোধ করিয়া রাজা পালক[২] (তাহাকে) গোয়ালপাড়া হইতে আনিয়া কারাগাবে আটক করিয়াছেন। অতএব নিজের স্থানে অবহিত হইয়া থাকো।'

আর্যক শর্বিলকের প্রিয় সুহৃদ্। তাহার বন্দীদশা শুনিয়া শর্বিলক ভাবিল, 'বন্ধুর দুরবস্থার সময়ে আমি বিবাহ করিয়া বসিলাম!' সে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। মদনিকা তাহার মনের কথা বুঝিয়া বলিল, 'বেশ। আমাকে তুমি গুরুজনেব কাছে পাঠাইয়া দাও।' শর্বিলক বসন্তসেনার ভৃত্যকে সেইমতো আদেশ দিল। মদনিকার গাড়ি চালিয়া গেলে শর্বিলক ঠিক করিল যে এখন তাহার কাজ হইবে জ্ঞাতিদের বিটদের,যাহারা নিজের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহাদের এবং যেসব রাজকর্মচারী রাজার কাছে অপমানিত হইয়া অন্তরে ক্ষোভ পোষণ করিতেছে তাহাদের, সকলকে উত্তেজিত কবিবে—যাহাতে বন্ধুর কারামোচন হয়।[৩]

মদনিকা ও শর্বিলক চলিয়া গেলে পর মৈত্রেয় রত্নাবলী লইয়া বসন্তসেনার বাড়িতে আসিল। আটমহল সে বাড়ি আর রাজার বাড়ির ঐশ্বর্য, দেখিয়া তাহার তাক লাগিয়া গেল। চারুদত্তের সন্দেশ সহ রত্নাবলী বসন্তসেনাকে দিলে সে তাহা সাদরে গ্রহণ করিল। তাহাতে মৈত্রেয় মনে মনে ক্ষুব্ধ হইল। বসন্তসেনা তাহাকে বলিয়া দিল, 'আর্য, আমার এই কথা সেই জুয়াড়িকে বলুন গিয়া,—আমি সন্ধ্যায় মহাশয়কে দেখিতে যাইব।' মৈত্রেয় মনে মনে বলিল, 'গিয়া আর কী পাইবে? বিদূষক চলিয়া গেলে বসন্তসেনা চেড়ীর হাতে রত্নাবলীটি দিয়া বলিল, 'চারুদত্তের সঙ্গে স্ফূর্তি করিতে যাইব।'[৪]

এই অভিসারবাসনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘের ঘটা ঘনাইয়া আসিল। সেদিকে চেড়ী বসন্তসেনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বসন্তসেনা বলিল, 'মেঘই উঠুক, রাতই হোক, অবিরাম বৃষ্টিই পড়ুক—প্রিয়ের দিকে আমার হৃদয় তাকাইয়া আছে। আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না।'[৫] এইখানে চতুর্থ অঙ্ক—নাম 'মদনিকা-শর্বিলক'—সমাপ্ত।

১। নামটি সম্ভবত প্রাকৃত "অজ্জঅ" (ঋজুক, অর্থাৎ ভালো মানুষ, বোকা) হইতে সংস্কৃতায়িত। গোয়ালার ছেলের এ নাম সঙ্গত।

২। সম্ভবত ইহা নাম নয়, বিশেষণ—যিনি পালন করেন, গভর্নর।

৩। শ্লোক সংখ্যা ২৬

৪। "চারুদত্তং আহরামিদুং গচ্ছম্‌হ।"

৫। শ্লোকসংখ্যা ৩৩।

পঞ্চম অঙ্কের নাম 'দুর্দিন' (অর্থাৎ বাদল-দিন)। বিষয় চারুদত্তের গৃহে বসন্তসেনার অভিসার। এই অঙ্কটি একটি বর্ষাভিসার কাব্যের মতো।[১] এখানে এমন অনেকগুলি শ্লোক আছে যাহার মধ্যে যেন মেঘদূতের ভাব ও ভাবনা গুঞ্জরিত।

বৃষ্টি-পড়ার শব্দ নানারকম। তাহার বর্ণনা আছে শেষ শ্লোকে।

> তালীষু তারং বিটপেষু মন্দ্রং শিলাসু রুক্ষং সলিলেষু চণ্ডম্।
> সঙ্গীতবীণা ইব তাড্যমানাস্তালানুসারেণ পতন্তি ধারাঃ।।

'তালগাছে তীব্র (ঝন্‌ঝন্‌) শব্দে, ঝাঁকড়া গাছে নরম (ঝুপ্‌ঝুপ্‌) শব্দে, পাথরের উপর বিষম (চট্‌চট্‌) শব্দে, জলের উপর জোর (তড়্‌তড়্‌) শব্দে—জলধারা পড়িতেছে, যেন সঙ্গীতের বীণায় তালের গমক।।'

চারুদত্তের অন্তঃপুরে বসন্তসেনা রাত কাটাইল। তাহার ব্যবহারে দাসদাসী পর্যন্ত মুগ্ধ। চারুদত্তের পত্নী তাহার সম্মুখে আসে নাই। চলিয়া যাইবার আগে বসন্তসেনা এই বলিয়া রত্নাবলীটি চারুদত্ত-পত্নীকে ফেরৎ পাঠাইল, 'আমি চারুদত্তের গুণে বশীভূত দাসী, সেই সঙ্গে তোমারও।' চারুদত্ত-পত্নী এই বলিয়া হার ফেরত দিল, 'আর্যপুত্র আপনাকে এ উপহার দিয়াছেন, আমার নেওয়া চলে না। তা ছাড়া আপনি জানিয়া রাখুন যে আর্যপুত্রই আমার কণ্ঠহার।'

এমন সময় রদনিকা চারুদত্ত-পুত্র রোহসেনকে লইয়া প্রবেশ করিল। আগের দিন সে প্রতিবেশী-পুত্রের সোনার খেলাগাড়ি লইয়া খেলা করিয়াছে, আজ দাসীর দেওয়া মাটির খেলাগাড়ি তাহার মনে লাগিতেছে না। সে সোনার খেলাগাড়ির জন্য বায়না ধরিয়াছে। বসন্তসেনা তাহাকে দেখিয়া খুশি হইয়া কোলে তুলিয়া লইল। কোলে উঠিয়া বালক রদনিকাকে বলিল, 'এ কে?'

রদনিকা বলিল, 'বাছা, ইনি তোমার মা হন।' রোহসেন বলিল, 'ইনি যদি আমার মা হন তবে ইঁহার গায়ে গয়না কেন?' 'বাছা, ছেলে-মুখে কঠিন কথা বলিলে,'—এই বলিয়া বসন্তসেনা তাহার গয়না সব খুলিয়া মাটির খেলাগাড়ি ভর্তি করিয়া দিয়া বলিল, 'এই তো আমি তোমার মা হইলাম। এই গয়না নাও, সোনার খেলাগাড়ি গড়াও।' বসন্তসেনার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। রোহসেন বলিল, 'আর কাঁদিব না। তুমি সোনার খেলাগাড়ি গড়াও গিয়া।'[২]

রদনিকা বালককে লইয়া চলিয়া গেলে ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে চারুদত্তের কাছে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ি আসিয়াছে। বসন্তসেনা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

চালক গাড়ি লইয়া জীর্ণোদ্যানে যাইবার পথে চারুদত্তের বাড়ির দরজায় আসিয়া দেখিল যে গ্রাম হইতে আগত গাড়িতে রাস্তা বন্ধ। সে নিজের গাড়ি একটু তফাতে রাখিয়া আসন আনিতে গিয়াছে এমন সময় বসন্তসেনা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া অন্য গাড়িতে চাপিয়া বসিল। এ গাড়ির চালক স্থাবরক জানিল না। সে গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। এদিকে চারুদত্তের গাড়োয়ান বসিবার আসন আনিয়া দ্বারে বসন্তসেনার প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময়ে গোপাল-সন্তান

১। শ্লোক সংখ্যা ৫২।

২। এইখানে নাটকের নামের তাৎপর্য প্রকাশ পাইয়াছে। পরবর্তী একাধিক অঙ্কে দেখিব যে নাট্যকাহিনী শকট অবলম্বন করিয়াই পাক খাইতেছে।

রোহসেন-বসন্তসেনার মিলনদৃশ্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের শেষ অঙ্ক দুঃষ্মন্ত-সর্বদমনের মিলন স্মরণ করায়।

আর্যক, যাহাকে রাজা বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, শিকল ছিঁড়িয়া বন্দীঘর হইতে পলাইয়াছে। সে চারুদত্তের ঘরের দরজায় আসিয়া খালি গাড়ি দেখিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। মুড়িশুড়ি দেওয়া আর্যককে বসন্তসেনা মনে করিয়া গাড়োয়ান তখনই গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

আর্যক পলাইয়াছে বলিয়া চারদিকে রাজপুরুষেরা পাহারা বসাইয়াছে। একটু পরেই দুইজন পাহারাদার চারুদত্তের গাড়ি আটকাইল। একজন, নাম চন্দনক, চারুদত্তের গাড়ি ও মহিলা সওয়ারি শুনিয়া না দেখিয়াই ছাড়িয়া দিতে চায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি, নাম বীরক, সন্দিগ্ধপ্রকৃতির। সে গাড়ি তল্লাস করিতে চায়। দুইজনের মধ্যে কিছু রেষারেষিও ছিল। চন্দনক গাড়ি তল্লাস করিতে গিয়া আর্যককে দেখিল। আর্যক তাহার শরণাপন্ন হইল। আর্যক আবার চন্দনকের সুহৃদ্ শর্বিলকের মিত্র। তাহাকে অভয় দিয়া সে আসিয়া বীরককে বলিল, 'ঠিক আছে।' গাড়ি জীর্ণোদ্যান অভিমুখে চলিয়া গেলে চন্দনক ভাবিল, 'প্রধান দণ্ডধারক বীরক রাজার বিশ্বাসী কর্মচারী। তাহার সহিত বিরোধ করিলাম। সুতরাং আমিও পুত্রভ্রাতাদের লইয়া শর্বিলক-আর্যকের দলে যোগ দিই গিয়া।' এইখানে ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত। অঙ্কটির নাম গাড়ি-বদল ('প্রবহণ-পরিবর্তঃ')।

জীর্ণোদ্যানে চারুদত্ত বিদূষককে লইয়া বসন্তসেনার আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। গাড়ি আসিয়া পৌঁছিলে মৈত্রেয় বসন্তসেনাকে নামাইতে গিয়া আর্যককে দেখিয়া চারুদত্তকে বলিল, 'বসন্তসেনা কই, এ যে দেখি বসন্তসেন!' আর্যক নামিয়া চারুদত্তের কাছে নিজের পরিচয় দিল এবং তাহার শরণ লইল। আর্যকের পায়ে তখনও ভাঙ্গা বেড়ি ঝুলিতেছে। চারুদত্ত দাসকে দিয়া শিকল দূর করাইল। তাহার পর নিজের গাড়িতে করিয়াই আর্যককে তাহার গন্তব্যস্থানে গোপনে পাঠাইয়া দিল। 'আর্যক-অপহরণ' নামক সপ্তম অঙ্ক এইখানেই শেষ।

সংবাহক শাক্যভিক্ষু হইয়া কাষায় ধারণ করিয়াছে। সে কাপড় কাচিবার জন্য জীর্ণোদ্যানে প্রবেশ করিল। (জীর্ণোদ্যানের অধিকারী রাজশ্যালক।) আপন মনে এইরূপ ধর্মকথা বলিতে বলিতে সংবাহকের প্রবেশ।

> মূঢ় লোক, ধর্মাচরণ করো।
> সংযত কর নিজের পেট, ধ্যানের ঢাক বাজাইয়া সর্বদা জাগিয়া থাকো।
> বিষম ইন্দ্রিয়-চোরেরা চিরসঞ্চিত ধর্ম হরণ করে।।
> যে পাঁচ জনকে[১] হত্যা করিয়াছে, স্ত্রীকেও,[২] গ্রাম[৩] রাখিয়াছে, আর চণ্ডাল[৪] মারা হইলে, অবশ্যই সে ব্যক্তি স্বর্গে যায়।।[৫]
> মাথা মুড়াইয়াছে, গোঁপ দাড়ি মুড়াইয়াছে, চিত্ত মুড়ায় নাই।[৬]—তবে কি জন্য মুড়াইয়াছে? যাহার চিত্ত মুড়ানো হইয়াছে খুব ভালোভাবেই তাহার শির[৭] মুণ্ডিত হইয়াছে।

১। অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়। তুলনীয় চর্যাগীতি, "পঞ্চজণা ঘালিউ"।
২। অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া। তুলনীয় চর্যাগীতি, "মাঅ মারিঅ"।
৩। অর্থাৎ শরীর। তুলনীয় চর্যাগীতি, "দেহ-নঅরী"।
৪। অর্থাৎ অহংকার কিংবা কর্ম। তুলনীয় চর্যাগীতি, "কাম-চণ্ডালী"।
৫। "পঞ্চজণ জেণ মালিদা ইত্থি অ গাম লখ্খিদে।
অবলক চণ্ডাল মালিদে অবশ্শং বি শে নল শগ্গং গাহদি।।"
৬। অর্থাৎ চিত্ত বশীভূত হয় নাই।
৭। মূলে "শিল"। ইহা দ্ব্যর্থে 'শীল'ও হইতে পারে। তাহা হইলে "মুণ্ডিত" মানে হইবে 'মণ্ডিত শোভিত'।

ভিক্ষু চুপি চুপি কাজ সারিতে চায়, না জানি কখন রাজশ্যালক আসিয়া পড়ে। তাহার আশঙ্কা ফলিয়া গেল। শকার তাহাকে দেখিয়া মারধর করিতে ছুটিল। তাহার সঙ্গে ছিল বিট। সে ভিক্ষুর ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে সে সদ্য কাষায় গ্রহণ করিয়াছে।

অদ্যাপাস্য তথৈব কেশবিরহাদ্ গৌরী ললাটচ্ছবিঃ
কালস্যাল্পতয়া চ চীবরকৃতঃ স্কন্ধে ন জাতঃ কিণঃ।
নাভ্যস্তা চ কষায়বস্ত্ররচনা দূরং নিগূঢান্তরং
বস্ত্রান্তং ন পটোচ্ছ্রয়াৎ প্রশিথিলং স্কন্ধেন সংতিষ্ঠতে।।

'কেশ অপসারিত হওয়ায়, কপালের রঙ এখনও তেমনি গৌরবর্ণ। অল্পকাল বলিয়া কাঁধে চীবর ঘষার দাগ (এখনও) পড়ে নাই। কাষায়বস্ত্র পরা (এখনও) অনভ্যস্ত। অনেকটা গোঁজার জন্য আঁচল, কাপড়ের অবাধ্যতায়, আল্‌গা হইয়া কাঁধে রয় না।।''

বিটের মন্তব্য মানিয়া লইয়া সংবাহক বিনীতভাবে বলিল

উপাশকে এব্বং। অচিলপব্বজিদে হগে।
'হে উপাসক তাই বটে। আমি অল্পকাল প্রব্রজ্যা লইয়াছি।'

রাজশ্যালক শকার তাহার কথায় কান দেয় না, চড় ঘুষি মারে। তাহাতে ভিক্ষু শুধু বলে, 'ণমো বুদ্ধশ্‌শ, ণমো বুদ্ধশ্‌শ, শলণাগদম্‌হি।'' বিট অনেক কষ্টে শকারের হাত হইতে তাহাকে বাঁচায়।

ভিক্ষু পুকুরে কাপড় কাচিতে চলিয়া গেল। শকার বিটের কাছে আত্মশ্লাঘা ও নিজের মূর্খতার দম্ভ করিতে লাগিল। তাহার পর তাহার গাড়ি আসিয়া পৌঁছিলে দেখা গেল যে তাহার মধ্যে বসন্তসেনা রহিয়াছে। শকার বসন্তসেনার গায়ে হাত তুলিতে গেল। বিট বাধা দিল। তখন শকার ভাণ করিল যে বিট সরিয়া গেলেই সে বসন্তসেনার সম্মতি আদায় করিবে। তাহার কপটতায় বিট ভুলিয়া গেল। ''অয়ে কামী সংবৃত্তঃ। হন্ত নির্বৃতোঽস্মি'',—এই ভাবিয়া বিট নিশ্চিন্তমনে সরিয়া গেল। বিট চলিয়া গেলেই শকার নিজমূর্তি ধারণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। শকার যতই মারে বসন্তসেনা ততই বলে ''ণমো অজ্জ-চারুদত্তস্স।'' চারুদত্তের দোহাই শুনিয়া শকার জ্ঞানহারা হইয়া বসন্তসেনার গলা টিপিয়া ধরিল। বসন্তসেনা মরার মতো মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন শকারের ভয় হইল। সে ভাবিল, 'এখনই বিট[১] আসিয়া পড়িতে পারে। এখান হইতে সরিয়া পড়ি।'

বিট আসিয়া বসন্তসেনাকে না দেখিয়া ভাবনায় পড়িল। শকারকে জেরা করিলে সে নানারকম উত্তর দিতে থাকে। তাহাতে সন্দেহ বাড়ে। সে সত্য কথা জানিতে চাহিলে শকার নিজের বীরত্ব প্রকাশ করিবার জন্য বলিয়া ফেলে, 'আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি।' শুনিয়া বিটের মাথা ঘুরিয়া গেল। জ্ঞান পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

অন্যস্যামপি জাতৌ মা বেশ্যা ভূস্ত্বং হি সুন্দরি।
চারিত্র্যগুণসংপন্নে জায়েথা বিমলে কুলে।।

'হে সুন্দরী, পর জন্মে তুমি যেন বেশ্যা না হও।
চারিত্র্য-গুণসম্পন্ন বিশুদ্ধবংশে যেন তোমার জন্ম হয়।।'

বিট সে স্থান পরিত্যাগের উপক্রম করিলে শকার তাহার পথ রোধ করিয়া বলিল, 'আমার

১। শকার বিটের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মনে মনে ''বুড্‌ঢখোড়'' (অর্থাৎ 'খোঁড়া বুড়ো') বলিতেছে।

পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়া এখন পালাও কোথায়? এস। আমার ভগিনীপতির কাছে জবাবদিহি কর।'

'দাঁড়া তবে বেটা',—বলিয়া বিট খাপ হইতে তলোয়ার খুলিল। শকার ভয় পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। বলিল, 'কি ভয় পাইলে যে। তবে যাও।'

বিট স্থির করিল, 'ইহাদের সঙ্গে আর থাকা নয়। যেখানে আর্য শর্বিলক চন্দনক প্রভৃতি জুটিয়াছে সেইখানেই যাই।' বিট চলিয়া গেল। নাটকে এই তাহাকে শেষ দেখা।

বিট চলিয়া গেলে পর শকার শকটচালককে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া বসন্তসেনার মৃতবৎ দেহ শুখনো লতাপাতার মধ্যে লুকাইয়া রাখিল এবং সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পর কাপড় কাচিয়া ভিক্ষুর প্রবেশ। সে শুখাইবার জন্য কাপড় মেলিতে গিয়া শুষ্কপত্রপুঞ্জের মধ্যে বসন্তসেনাকে দেখিতে পাইল। তাহার জ্ঞান তখন ফিরিয়া আসিতেছে। বসন্তসেনার মুখে কাপড় নিংড়ানো জল বিন্দু বিন্দু করিয়া দিয়া বস্ত্রাঞ্চল নাড়িয়া ভিক্ষু বুদ্ধোপাসিকা বসন্তসেনাকে সুস্থ দেখিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল।

বসন্তসেনা। মহাশয়, কে আপনি?

ভিক্ষু। বুদ্ধোপাসিকা, আমাকে কি মনে পড়ে না, দশ (পল) সোনা দিয়া ছাড়াইয়াছিলেন?

বসন্তসেনা। মনে পড়িতেছে। কিন্তু মহাশয়, যাহা ভাবিতেছেন তা নয়। আমার মরিলেই ভালো ছিল।

ভিক্ষু। বুদ্ধোপাসিকা, এ কেমন (কথা)?

বসন্তসেনা। (হতাশকণ্ঠে) বেশ্যাভাবের যেমন উপযুক্ত।

ভিক্ষু। বুদ্ধোপাসিকা, উঠ উঠ—এই গাছের পাশে উদ্ভিন্ন লতা ধরিয়া। (এই বলিয়া লতা টানিয়া নামাইল। তাহা ধরিয়া বসন্তসেনা উঠিল।)

ভিক্ষু। ওই বিহারে আমার ধর্মভগিনী থাকে। সেখানে (গিয়া) মন ঠাণ্ডা হইলে পর, উপাসিকা, আপনি ঘরে ফিরিয়া যাইবেন। অতএব ধীরে ধীরে চলুন, বুদ্ধোপাসিকা।

(চলিতে লাগিল। তাকাইয়া) সরুন মহাশয়েরা, সরুন। ইনি তরুণী নারী, এই (আমি) ভিক্ষু। এই আমার শুদ্ধধর্ম,—'যে মানুষ যথাযথি হস্তসংযত, পদসংযত, ইন্দ্রিয়সংযত, কি করে তাহার রাজপাট? তাহার হাতে পরলোক বাঁধা।।"

এইখানে অষ্টম অঙ্ক শেষ। অঙ্কের নাম 'বসন্তসেনামোটন'।[১]

বসন্তসেনার হত্যার দায় এড়ানো আর সেই সঙ্গে চারুদত্তকে জব্দ করা—এই দুই পাখি এক ঢিলে মারিবার উদ্দেশ্যে শকার পরদিন সকালে আদালতে ("অধিকরণমণ্ডপে") গিয়া নালিশ করিল যে দরিদ্র চারুদত্ত গয়নার লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছে। বিচার করেন যাঁহারা ("অধিকরণ-ভোগিক") তাঁহাদের যিনি সভাপতি তিনিই বিচারক বা "কোর্ট" ("অধিকরণিক") আর দুইজন তাঁহার সহকারী বা এসেসর ("শ্রেষ্ঠিক" ও "কায়স্থ")। প্রথমেই শকারের নালিশ গ্রহণ করিতে বিচারকের প্রবৃত্তি হইল না। তিনি পেয়াদা শোধনককে বলিলেন, 'বল গিয়া—আজ তোমার নালিশের শুনানি হইবে না। কাল আসিও।' শুনিয়া

১। "আমোটন", প্রাকৃত "আমোড্ডন" মানে নিষ্ঠুর প্রহারে ভাঙিয়া ফেলা।

শকার। (সক্রোধে) আঃ, আমার নালিশ আজ বিচার হইবে না! যদি বিচার না হয় শুনুন। ভগিনীপতি রাজা পালককে জানাইয়া ভগিনী বড় বোনকে জানাইয়া এই বিচারককে দূরে সরাইয়া দিয়া এখানে অন্য বিচারককে বসাইব।[১]

(উঠিয়া যাইতে উদ্যত)

শোধনক। মহাশয়, রাজশ্যালক, একটু থাক। ততক্ষণ বিচারকদের জানাইয়া আসি। (বিচারকদের কাছে গিয়া) রাজার শালা চটিয়া গিয়া এই বলিতেছে। (তাহার উক্তি বলিল।)

বিচারক। মূর্খটার পক্ষে সবই সম্ভব। বাপু, বল গিয়া—এস, তোমার নালিশ বিচার হইবে।

শকার এই নালিশ করিল,—'কোন বদ লোক পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে বসন্তসেনাকে লইয়া গিয়া তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছে। আমার দ্বারা নয়।'

বিচারক। অহো, পুলিসদের গাফিলতি। ওগো শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ, "আমার দ্বারা নয়"—এইটুকু আরজিতে প্রথমে নোট করা হোক।

কায়স্থ। মহাশয় যা বলেন।

বিচারক শকারকে প্রশ্ন করিলেন, 'কিসে তুমি জানিলে যে গয়নার জন্যই বসন্তসেনাকে বধ করা হইয়াছে?' শকার উত্তর দিল, 'গায়ে গয়না নাই, গলায় হার নাই। তাই অনুমান করিতেছি।'

এ নালিশে বাদী-প্রতিবাদী নাই। তাই বিচারক শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থের পরামর্শ চাহিলেন। তাহারা পরামর্শ দিল বসন্তসেনার মাতাকে হাজির করা হোক। বসন্তসেনার মাতাকে ভদ্রভাবে ডাকাইয়া আনা হইল।

তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, 'তোমার মেয়ে কোথায়?' সে বলিল, 'মিত্রের ঘরে।' তখন প্রশ্ন হইল, 'মিত্রটি কে?' বৃদ্ধা বলিতে চাহিল না।

তখন বিচারক বলিলেন, 'লজ্জা করিয়ো না। আদালত তোমাকে এই প্রশ্ন করিতেছে।'[২] তখন সে চারুদত্তের নাম করিল।

চারুদত্তকে ডাকিয়া আনা হইল। অধিকরণমণ্ডপে তাহাকে সম্মানের আসন দেওয়াতে শকার—সে এতক্ষণ মাটিতে বসিয়াছিল—ক্রুদ্ধ হইল।

বিচারকের জেরায় চারুদত্ত স্বীকার করিল যে সে গণিকা বসন্তসেনার মিত্র। কিন্তু বসন্তসেনা এখন কোথায় আছে বলিতে পারিল না।

এমন সময় আদালতে চন্দনকের প্রতি অভিযোগ লইয়া বীরক আসিল। বিচারক তাহাকে বসন্তসেনার লাস তল্লাস করিতে জীর্ণোদ্যানে পাঠাইয়া দিলেন। বীরক আসিয়া বলিল, 'এক নারীদেহ শিয়াল কুকুরে খাইয়া ফেলিয়াছে, দেখিলাম।' শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসে বুঝিলে দেহটি নারীর?' সে বলিল 'হাত পা ও চুল পড়িয়া আছে, তাহা হইতে।'

বিচারক চারুদত্তকে অপরাধ স্বীকার করিতে বলিলেন। চারুদত্ত কিছু বলিল না। সে

১। "আঃ কিং ণ দীশদি মম ববহালে। জই ণ দীশদি তদো আবুত্তং লাআণং পালঅং বহিণীবদিং বহিণিং অত্তিকং চ বিণ্ণবিঅ এদং অধিকলণিঅং দূলে ফেলিঅ এত্থ অণ্ণং অধিঅলণিঅং ঠাবইশ্শং।"

২। "অলং লজ্জয়া। ব্যবহারস্ত্বং পৃচ্ছতি।"

বসন্তসেনার অলঙ্কার—যাহা সে রোহসেনকে সোনার খেলাগাড়ি গড়াইবার জন্য দিয়াছিল—বন্ধু মৈত্রেয়কে[১] দিয়া ফেরৎ পাঠাইয়াছে। মৈত্রেয়ের ফিরিতে দেরি দেখিয়া তাহার মনে ভাবনা হইতেছে।

বসন্তসেনার বাড়ির দিকে যাইতে যাইতে মৈত্রেয় শুনিল যে চারুদত্তকে আদালতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। সে বসন্তসেনার বাড়ি না গিয়া দ্রুতপদে অধিকরণমণ্ডপে চলিয়া আসিল। ব্যাপার শুনিয়াই মৈত্রেয় শকারকে আক্রমণ করিল। মৈত্রেয়ের কোমরে বাঁধা ছিল বসন্তসেনাব অলঙ্কার। দুইজনের হাতাহাতির সময়ে সেগুলি খুলিয়া পড়িয়া গেল। তাহাতে চারুদত্তের অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া বিচারকেরা দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা বসন্তসেনাব মাকে গয়নাগুলি সনাক্ত করিতে বলিলেন। বৃদ্ধার মায়া চারুদত্তের উপর। সে গয়না সনাক্ত কবিতে নারাজ হইল।

বসন্তসেনা মরিয়াছে ভাবিয়া ও বিচারের বিভ্রাট দেখিয়া চারুদত্ত হতাশ হইল। সে বলিতে চাহিল, নিজের দোষেই সে বসন্তসেনাকে হারাইয়াছে। সে শকারকে দেখাইয়া বলিল

মযা কিল নৃশংসেন লোকদ্বয়মজানতা।
স্ত্রীরত্নং চ বিশেষেণ শেষমেষোঽভিধাস্যতি।।

'নিষ্ঠুর আমিই, ইহলোক পরলোক না ভাবিয়া স্ত্রীরত্নটিকে—। বিশেষে বাকি কথা এ বলিবে।।'

বিচাবক ইহা চারুদত্তের অপরাধ-স্বীকার বলিয়া গণ্য করিলেন এবং রাজার কাছে দণ্ডেব হুকুম চাহিয়া পাঠাইলেন।

বৃদ্ধা বিচারককে অনুনয় করিয়া বলিল

'ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মহাশয়েরা। আমাব সে মেয়েকে যদি হত্যা করা হইয়া থাকে তো হত্যা করা হইয়াছে। এ বাঁচুক দীর্ঘায়ু হইয়া। আর একটা কথা। বাদী-প্রতিবাদী লইয়া নালিশ। আমি বাদী (অথবা, ফরিয়াদী) নই। ইহাকে ছাড়িয়া দাও।'

বৃদ্ধাকে সেখান হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। তখনই রাজার হুকুম আসিল,

'যে গয়নাগাঁটির নিমিত্ত বসন্তসেনাকে হত্যা করা হইয়াছে সেই গয়নাগুলি গলায় বাঁধিয়া দিয়া ঢেঁটরা পিটাইয়া চারুদত্তকে দক্ষিণ মশানে লইয়া গিয়া শূলে চাপাইয়া হত্যা কর।'

চারুদত্ত মৈত্রেয়কে বলিল, 'রোহসেনকে পালন করিও।' এইখানে নবম অঙ্ক শেষ। এ অঙ্কের নাম 'ব্যবহার'[২]।

দুই চণ্ডাল চারুদত্তকে লইযা রাজপথ দিয়া বধ্যস্থানের দিকে চলিয়াছে। চারুদত্তের অঙ্গে রক্তচন্দন মাখা, গলায় রক্তকরবীর মালা, হাতে শূল। লোকের ভিড ঠেলিয়া পথ করিতে করিতে চণ্ডালেরা বলিতেছে—'সরিয়া যাও, সরিয়া যাও, সরিয়া যাও। সৎ-পুরুষের মৃত্যুদণ্ড দেখিতে নাই।' চারুদত্তের শোকে নগরের লোকের চোখের জল ঝরিয়া পথ যেন ভিজিয়া গেল।

মাঝে মাঝে চণ্ডালেরা ঢেঁটরা পিটায় আর রাজাব দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করে।

দূর হইতে পুত্রের ও সখার বিলাপধ্বনি চারুদত্তের কানে আসিল। চারুদত্ত চণ্ডালদের বলিল, 'তোমাদের কাছে কিছু চাই।' তাহারা বলিল, 'আমাদের হাত হইতে তুমি কী লইবে?'

১। বিদূষকের নাম।
২। অর্থাৎ আদালতে বিচার।

চারুদত্ত বলিল, 'না না। পরলোকে যাইবার পাথেয়রূপে ছেলের মুখ একবার দেখিতে চাই।' তাহারা বলিল, 'বেশ।'

রোহসেনকে লইয়া বিদূষক প্রবেশ করিল। ছেলেকে দেখিয়া চারুদত্ত ভাবিতে লাগিল, 'কি দিই।' দিবার শুধু একটিমাত্র বস্তু তখনো তাহার ছিল, সে যজ্ঞোপবীত। চারুদত্ত পইতা খুলিয়া পুত্রকে দিল।

চণ্ডালেরা চারুদত্তকে বধ্যস্থানে লইয়া যাইবে, রোহসেন যাইতে দিবে না। চণ্ডালেরা আবার ডিণ্ডিম বাজাইয়া রাজঘোষণা পড়িল। এ ঘোষণা শকারের ভৃত্য স্থাবরকের কানে গেল। সে বসন্তসেনার ব্যাপার সবই জানে। পাছে সে বলিয়া দেয় সেইভয়ে শকার তাহাকে বাহির-বাড়ির দোতলায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। স্থাবরক প্রাণ বিপন্ন করিয়া জানালা ভাঙ্গিয়া লাফ দিয়া নীচে পড়িল এবং চণ্ডালের কাছে গিয়া বলিয়া দিল যে চারুদত্ত বসন্তসেনাকে হত্যা করে নাই। ইতিমধ্যে শকার আসিয়া পড়িল এবং তাহাকে ঘুষ দিয়া থামাইতে চেষ্টা করিল। স্থাবরক ঘুষ লইল না, কিন্তু শকারের চক্রান্ত কাটিয়া উঠিতেও পারিল না। চণ্ডালেরা স্থাবরকের কথায় বিশ্বাস করিল না।

কে বধকার্য করিবে এই লইয়া চণ্ডাল দুইজনের মধ্যে বিতর্ক হইল। এ বলে, তোমার পালা। ও বলে, তোমার পালা। শেষে হিসাব করিয়া যাহার পালা ঠিক হইল সে বলিল, 'একটু দেরি করা যাক।' অপর চণ্ডাল বলিল, 'কেন?'

প্রথম। ওরে, বাবা স্বর্গে যাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছেন,—বাছা বীরক, যখন তোমার বধ-পালা পড়িবে তখন তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ সারিবে না।

দ্বিতীয়। কি জন্য?

প্রথম। কখনো কোনও বণিক টাকা দিয়া বধ্য ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া নেয়। কখনো রাজার পুত্রলাভ হয়, তখন সেই উৎসব উপলক্ষ্যে সব বধ্যব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়। কখনো বা হাতি শিকল ছিঁড়ে, সেই গোলমালে বধ্য ব্যক্তি ছাড়া পায়। আবার কখনো রাজা বদল হয়, তখন সমস্ত বধদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি খালাস পায়।'

শকার তাহাদের আর দেরি করিতে দিল না। চারুদত্তকে লইয়া চণ্ডালেরা দক্ষিণ মশানের দিকে চলিল।

এদিকে ভিক্ষু বসন্তসেনাকে লইয়া চারুদত্তের বাড়ির দিকে রওনা হইয়াছে। পথে লোকের ভিড় দেখিয়া শুনিয়া ব্যাপার বুঝিল এবং তাহারা তখনি দক্ষিণ মশানের দিকে ছুটিল।

চারুদত্তের প্রতি অনুকম্পা করিয়া চণ্ডাল তাহার শিরচ্ছেদ করিতে গেল কিন্তু কাটিতে হাত উঠিল না। তখন চারুদত্তকে শূলে দিবার উদ্যোগ করা হইল। এমন সময় সেখানে ভিক্ষু ও বসন্তসেনা আসিয়া পড়িল।

'আর্য চারুদত্ত, এ কি।'—বলিয়া বসন্তসেনা তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

'আর্য চারুদত্ত, এ কি।' বলিয়া ভিক্ষু তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

একজন চণ্ডাল যজ্ঞবাটে রাজাকে খবর দিতে গেল। সমূহ বিপদ গণিয়া শকার পলাইল। চণ্ডাল আসিয়া বলিল, 'রাজার এই আদেশ—যে বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছে তাহাকে বধ করিতে হইবে।' চণ্ডালেরা শকারকে খুঁজিতে গেল।

এতক্ষণ পরে চারুদত্ত যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল। তাকাইয়া বসন্তসেনাকে চিনিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল, 'এ কি, বসন্তসেনা যে!'

কুতো বাষ্পাম্বুধারাভিঃ স্নপয়ন্তী পয়োধরৌ।
ময়ি মৃত্যুবশং প্রাপ্তে বিদ্যেব সমুপাগতা।

'কোথা হইতে (বসন্তসেনা) চোখের জলে স্তনদ্বয় সিক্ত করিতে করিতে মৃত্যুবশপ্রাপ্ত আমার (গোচরে) বিদ্যার মতো আসিয়া হাজির হইল।'[১]

ভিক্ষুকে দেখাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বসন্তসেনা বলিল, 'ইনিই আমাকে বাঁচাইয়াছেন।' চারুদত্ত বলিল, 'কে তুমি অকারণ বন্ধু?' তখন ভিক্ষু আত্মপরিচয় দিল, 'আমিই সেই তোমার পাদসংবাহনচিন্তক সংবাহক।' তাহার পর সব ঘটনা সে চারুদত্তকে বলিয়া দিল।

এমন সময়ে বহুলোকের চীৎকার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে শর্বিলক প্রবেশ করিল। যজ্ঞবাটস্থিত রাজা পালককে হত্যা করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে আর্যককে সিংহাসনে বসাইয়া, তাঁহারই আদেশে চারুদত্তকে মুক্ত করিতে সে আসিতেছে। দূর হইতে চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে জীবিত দেখিয়া তাহার দুশ্চিন্তা দূর হইল। কিন্তু চারুদত্তের সম্মুখে আসিতে তাহার লজ্জা ও ভয় হইল। শেষে স্থির করিল, "সর্বত্রার্জবং শোভতে।"[২] আসিয়া হাতযোড় করিয়া বলিল, 'আর্য চারুদত্ত!'

চারুদত্ত। কিন্তু কে আপনি?

শর্বিলক। যেন তে ভবনং ভিত্ত্বা ন্যাসাপহরণং কৃতম্।
সোঽহং কৃতমহাপাপস্ত্বামেব শরণং গতঃ।।

'যে তোমার ঘরে সিঁদ দিয়া গচ্ছিত ধন অপহরণ করিয়াছিল,
আমি সেই মহাপাপী। এখন তোমার শরণ লইলাম।।'

চারুদত্ত। বন্ধু, ও কথা বলিও না। এই তোমার সঙ্গে প্রণয় হইল।
(এই বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল।)

আর্যক রাজা হইয়াছে শুনিয়া চারুদত্ত প্রীত হইল। শর্বিলক বলিল যে আর্যক চারুদত্তকে উজ্জয়িনীর কাছে কুশাবতীতে রাজ্যখণ্ড দান করিয়াছেন। তাহার পর শকারকে আনিতে শর্বিলক হুকুম দিল। শকার আসিয়া চারুদত্তের পায়ে পড়িল, বলিল, 'আর্য চারুদত্ত, আমি তোমার শরণাগত, আমাকে বাঁচাও।' শর্বিলক শকারকে বধ করিতে চায়। চারিদিকে লোকে চীৎকার করিতেছে, 'উহাকে ছাড়িয়া দাও, আমরা মারিয়া ফেলি।' চারুদত্ত কিছুতেই শকারকে ছাড়িবে না। শর্বিলক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন ইহাকে শাস্তি দিতে চাও না?'

চারুদত্ত। "শত্রুঃ কৃতাপরাধঃ শরণমুপেত্য পাদয়োঃ পতিতঃ শস্ত্রেণ ন হন্তব্যঃ।"

শর্বিলক। বেশ, তাহা হইলে কুকুরের মুখে ফেলা হোক।'

চারুদত্ত। "নহি। উপকারস্তু কর্তব্যঃ।।"[৩]

শর্বিলক। কি আশ্চর্য! কি করি। বলুন আপনি।

চারুদত্ত। তাহা হইলে মুক্তি দিন।

শর্বিলক। মুক্ত হোক।

এমন সময় লোকমুখে শোনা গেল চারুদত্তের পত্নী অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত, কেবল পুত্র কাঁদিয়া আঁচলে ধরিয়া বাধা দিতেছে। চন্দনক আসিয়া বলিল, 'আমি বলিয়াছি আর্য চারুদত্ত জীবিত আছেন, কিন্তু গোলমালে কে কার কথা শোনে!'

১। এখানে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর ইঙ্গিত আছে, অনুমান করি। তবে "বিদ্যা" এখানে কোন নায়িকা নয়, বিদ্যাবিস্মৃত গুণীর সঙ্কটাবস্থায় অকস্মাৎ-স্মৃত বিদ্যা।

২। 'সোজা কথা সব স্থানেই ভালো।'

৩। চারুদত্তের উক্তি দুইটিতে একটি অর্ধ-শ্লোক পূর্ণ হইয়াছে। শ্লোকটির অর্থ, শত্রু অপরাধ করিলেও শরণ লইয়া পায়ে পড়িলে অস্ত্রে কাটিতে নাই। (তাহার) উপকারই করিতে হয়।'

শুনিয়াই চারুদত্ত মূর্ছা গেল। তাহার সংজ্ঞালাভ হইলে পর সকলে মিলিয়া তাহার বাড়ির দিকে ছুটিল। চারুদত্ত আসিয়া পড়াতে সেখানে সবদিক রক্ষা হইলে মৈত্রেয় বলিতে লাগিল, 'অহো, সতীর কি প্রভাব। যেহেতু অগ্নি প্রবেশ করিব এই সংকল্পের দ্বারাই প্রিয়ের সহিত মিলন ঘটিল।' চারুদত্ত বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিল।

দাসী আসিয়া, "অজ্জ বন্দামি"[১] বলিয়া পায়ে পড়িল। চারুদত্ত তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, 'ওঠ রদনিকা।' বলিয়া তাহাকে উঠাইল।

চারুদত্তপত্নী বসন্তসেনাকে দেখিয়া বলিল, 'এতক্ষণে আমার কুশল হইল।' দুইজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইল।

তখন শর্বিলক বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া ঘোষণা করিল, 'রাজা খুশি হইয়া আপনাকে বধূশব্দের দ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছেন।'[২] এই বলিয়া বসন্তসেনার মাথায় অবগুণ্ঠন পরাইয়া দিল।[৩]

ভিক্ষুর দিকে চাহিয়া শর্বিলক বলিল, 'ইহার কি করা যায়।' চারুদত্ত বলিল, 'ভিক্ষু, কি তোমার আকাঙ্ক্ষা?' ভিক্ষু বলিল, 'এইসব অনিত্যতা দেখিয়া প্রব্রজ্যায় আমার মন দ্বিগুণ বসিয়াছে।'

চারুদত্ত শর্বিলককে বলিল, 'বন্ধু, ইহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অতএব ইহাকে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের কুলপতি করা হোক।'

শর্বিলক বলিল, 'তাই হোক।' ভিক্ষু খুশি হইল। বসন্তসেনাও খুশি হইল।

তাহার পর শর্বিলক বলিল, 'স্থাবরকের[৪] কি করা যায়?'

চারুদত্ত বলিল, 'ইহার দাসত্বমোচন হোক। চণ্ডাল দুইজনকে চণ্ডালদের কর্তা করা হোক। চন্দনককে রাজ্যের দণ্ডপালক করা হোক। আর শকারকে তাহার পূর্বপদেই রাখা হোক।'

শর্বিলক সবেতেই রাজি কিন্তু শকারের বেলা নয়। তাহাকে সে বধদণ্ডই দিতে চায়। চারুদত্ত অনেক কষ্টে শর্বিলককে শান্ত করিল।

সবশেষে তিনটি ভরতবাক্য শ্লোক। তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টিতে সংসারের দুঃখ-সুখের বিচিত্র খেলার উল্লেখ আছে বলিয়া মূল্যবান্।

> কাংশ্চিৎ তুচ্ছয়তি প্রপূরয়তি বা কাংশ্চিন্ নয়ত্যুন্নতিং
> কাংশ্চিৎ পাতবিধৌ করোতি চ পুনঃ কাংশ্চিন্ নয়ত্যাকুলান্।
> অন্যোন্যং প্রতিপক্ষসংহতিমিমাং লোকস্থিতিং বোধয়ন্
> এষ ক্রীড়তি কূপযন্ত্রঘটিকান্যায়প্রসক্তো বিধিঃ।।

'কাহাকেও শূন্য করে, কাহাকে বা পূর্ণ করে, কাহাকে বা উন্নতি দেয়। কাহাকে বা পতনব্যাপারে ফেলে। আবার বিপন্ন কাহাকে বা উদ্ধার করে। পরস্পর বিরুদ্ধতার এই একত্র সমাবেশ জানাইয়া এই দৈব যেন। কুয়া থেকে জলতোলা ব্যাপারে যন্ত্র[৫] হইয়া ক্রীড়া করিতেছে।'

এইখানে 'সংহার[৬]' নামক দশম অঙ্ক শেষ। নাটকও সমাপ্ত।

১। 'ঠাকুর প্রণাম করি'
২। অর্থাৎ রাজা তোমাকে বেশ হইতে মুক্ত করিয়া কুলবধূর মর্যাদা দিয়াছেন।
৩। গণিকারা মাথায় কাপড় দিত না। মাথায় কাপড় কুলবধূর মর্যাদাজ্ঞাপক।
৪। শকারের ভৃত্য।
৫। এখানে Persian wheel (অরঘট্ট-ঘটিকা যন্ত্রের) উপমা।
৬। অর্থাৎ কাহিনী-গুটানো।

মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত সাহিত্যে অত্যন্ত একক এবং নাটকীয়তার গুণে ভারতীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।* এমন মনোহারী অথচ সম্ভাব্য কাহিনী দ্বিতীয় কোন সংস্কৃত বইয়ে নাই। কাহিনীটি আধুনিক এবং শুধু নাটক বলিয়াই নয়, গল্প-উপন্যাসের, এমন কি ডিটেক্‌টিভ কাহিনীরও কাছ ঘেঁষিয়া যায়। ভূমিকাসংখ্যা অনল্প নয়, এবং চরিত্রচিত্রণ সবই হৃদয়গ্রাহী ও যথাসম্ভব স্বাভাবিক এবং স্থানকালের গন্ধরঙমাখা। বসন্তসেনা ও চারুদত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রোহসেন ও বসন্তসেনার মা পর্যন্ত বড়-ছোট সব ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ছোট চরিত্রগুলি বোধকরি সবচেয়ে জীবন্ত। কিন্তু এগুলি সাধারণ পাঠকের চোখে পড়িবার নয়। যেমন সংবাহক, মৈত্রেয় ও বসন্তসেনার মাতা। সংবাহকের ভূমিকা সবচেয়ে বিশিষ্ট। পাটলীপুত্রবাসী গৃহস্থের ছেলে সে। দেশ দেখার কৌতূহলে উজ্জয়িনীতে আসিয়া দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। যা সে একদা শখ করিয়া শিখিয়াছিল সেই মর্দনিয়া-বৃত্তি তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিল। চারুদত্তের অবস্থা খারাপ হওয়ায় সে আবার দুর্বিপাকে পড়ে। জুয়াড়ি হয়, অশেষ দুর্দশা ভোগ করে, তাহার পর বসন্তসেনার দয়ায় উদ্ধার পায়। সে বরাবরই বুদ্ধোপাসক ছিল, এখন সে সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্যা লইল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরূপে তাহার যে মূর্তি জীর্ণোদ্যানে দেখিলাম তাহা বড় শান্ত স্নিগ্ধ। শকার তাহাকে মারিতেছে, সে মাথা নত করিয়া সহ্য করিতেছে আর মুখে বলিতেছে, "নমো বুদ্ধশ্‌শ"। বসন্তসেনার পরিচর্যা করিয়া তাহাকে রাজপথ দিয়া সন্তর্পণে লইয়া যাওয়াতেও তাহার প্রশান্ত করুণাময়তা উদ্‌ভাসিত। এ চরিত্র যিনি আঁকিয়াছেন হয় তিনি কোনো ভালো বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন নয় কোন প্রাচীন রচনা হইতে খাঁটি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মৃচ্ছকটিক নাটকের প্লটের জটিলতা এবং কোন কোন দৃশ্যের কবিতা-বাহুল্য আর মধ্যে মধ্যে ভাষার অর্বাচীনতা লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে মূল রচনার উপরে পরবর্তী কালের প্রলেপ কিছু কিছু হয়ত পড়িয়াছে। সে যাই হোক মূল নাটকখানি যে বেশ প্রাচীন তা যাঁহারা মন দিয়া পড়িবেন তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিবেন।

"ভাস"

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের আগে ভাস নামে এক প্রাচীন নাট্যকারের নামটুকু শুধু জানা ছিল। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের কোন কোন পুঁথিতে প্রস্তাবনায় প্রসিদ্ধ নাট্যকার বলিয়া ভাসের উল্লেখ আছে। বাণভট্ট (সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে) 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের উপক্রম অংশে যশস্বী নাট্যকার বলিয়া ভাসের নাম করিয়াছেন। রাজশেখর (দশম শতাব্দীর পরে) ভাসের রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্ত' নাটকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে রচনাটি বিদগ্ধ সমালোচকের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী কেরলে তেরখানি নূতন অজানা নাটকের পুঁথি পাইয়া ছাপাইয়াছিলেন (১৯১২)। এগুলির কোনটিতেই রচয়িতার নাম নাই। সবগুলির রচনা এক ছাঁচে ঢালা, যেন এক জনেরই লেখা। তাহার মধ্যে একখানির নাম 'স্বপ্নবাসবদত্ত'। রাজশেখর ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তের নাম করিয়াছেন, সুতরাং গণপতি শাস্ত্রী মনে করিলেন যে স্বপ্নবাসবদত্ত সমেত নাটকগুলি সবই ভাসের রচনা। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত অনেকেই মানিয়া

* মনে হয় কাহিনীটি কোন বিলুপ্ত বৌদ্ধ অবদান হইত গৃহীত।

লইলেন। কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন যে এগুলির কালিদাসের পূর্বগামী অথবা পরগামী কোন এক ব্যক্তির, ভাসের লেখা নয়। নাটকগুলি লইয়া যতই আলোচনা হইতে লাগিল সন্দেহ ততই বাড়িতে লাগিল। দেখা গেল যে কোন কোন গ্রন্থে ভাসের বলিয়া উদ্ধৃতি এই গ্রন্থাবলীতে মিলিতেছে না।[১] সব নাটকের ভরতবাক্য প্রায় একই রকম।[২] ইতিমধ্যে কেরল হইতে আরও দুই একটি নাটক আবিষ্কৃত হইল যাহার রচনা পূর্বাবিষ্কৃত "ভাস"-নাটকাবলীর মতোই, কিন্তু সেগুলির রচনাকাল অষ্টম শতাব্দী। তখন বোঝা গেল যে "ভাস"-নাটকগুলির মতো এই নাটকও কেরলের পেশাদার নাট্যসম্প্রদায় চক্কিয়ারদের সম্পত্তি। ইঁহারা পুরানো নাটক কাটাই-ছাঁটাই করিয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালিয়া অভিনয় করিতেন। অনেক সময় ইঁহাদের নাট্যবস্তু একটিমাত্র অঙ্কে বা দৃশ্যে নিবদ্ধ হইত। নাটকগুলি প্রাচীন কবি ভাসের কিনা এ বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। তবে এই পর্যন্ত নির্ভর করিয়া বলা যায় এ নাটকগুলি যেভাবে পাইয়াছি তাহা খুব প্রাচীন নয়, সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর (অথবা অবেও পরবর্তী কালের) সংস্করণ কেরলে সম্পাদিত। রচনাগুলির কোন কোনটির মূলে সম্ভবত প্রাচীনতর নাট্যবন্ধ ছিল। সে নাটক (অথবা নাটকগুলি) কালিদাসের পূর্ববর্তী কিনা বলা সম্ভব নয়।

গণপতি শাস্ত্রী যে ভাস-নাটকাবলী ছাপাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে পাঁচটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র রচনা, এক-অঙ্কের।[৩] একটি তিন-অঙ্কের,[৪] দুইটি চার-অঙ্কের।[৫] একটি পাঁচ-অঙ্কের,[৬] তিনটি ছয়-অঙ্কের,[৭] একটি সাত-অঙ্কের।[৮]

নাটকগুলির মধ্যে 'বালচরিত' সংস্কৃত ভাষায় প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন কৃষ্ণলীলাময় নাটক। কিছু পরিচয় দিই। বর্ণনা কংসবধ পর্যন্ত। নান্দীশ্লোকে চতুর্থাবতারবন্দনা, একটু অভিনব।

> পুরাকালের সত্যযুগে (যিনি) শাঁখ ও দুধের কান্তিময় এবং নারায়ণ নামে পরিচিত, ত্রেতায় যিনি তিন পদক্ষেপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, সুবর্ণকান্তি, বিষ্ণু, (যিনি) দ্বাপরযুগে রাবণবধার্থে দূর্বাদলশ্যাম, রাম। কলিযুগে তিনি কাজল কালো। তিনি দামোদর নিত্য তোমাদের রক্ষা করুন।।'

পরবর্তীকালের নেপাল দরবারের নাটকের মতো (এবং পুতুল-নাটবাজির মতো) আধিদৈবিক পাত্রপাত্রীরা—তাহার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রও আছে—রঙ্গমধ্যে আসিয়া আপন আপন পরিচয় দিয়াছে। বৃন্দাবনে 'হল্লীষক' অর্থাৎ রাসক্রীড়ার বর্ণনা আছে (তৃতীয় অঙ্ক), কালিয়-দমনের উল্লেখ আছে (চতুর্থ অঙ্ক)। কৃষ্ণ নামটি একবারও নাই।

১। যেমন ধ্বন্যালোকে, নাট্যদর্পণে ও নাটকলক্ষণরত্নকোশে স্বপ্নবাসবদত্ত হইতে উদ্ধৃত শ্লোক।

২। যেমন, 'ইমাং সাগরপর্যন্তাং হিমবদ্‌বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ।'

৩। 'মধ্যমব্যায়োগ', 'দূতবাক্য', 'দূতঘটোৎকচ', 'কর্ণভার' ও 'ঊরুভঙ্গ'। সব কয়টিরই বিষয় মহাভারত হইতে লওয়া।

৪। 'পঞ্চরাত্র'। বিষয় মহাভারতীয়।

৫। 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' ও 'চারুদত্ত'। প্রথমটির বিষয় প্রচলিত কাহিনী। দ্বিতীয়টির বিষয় মৃচ্ছকটিকের প্রথম অঙ্ক।

৬। 'বালচরিত'। বিষয় কৃষ্ণের বাল্যলীলা, বিষ্ণুপুরাণ হইতে লওয়া।

৭। 'স্বপ্নবাসবদত্ত', 'অবিমারক' ও 'অভিষেক'। প্রথম দুইটির কাহিনী প্রচলিত আখ্যায়িকা হইতে নেওয়া, তৃতীয়টির রামায়ণ হইতে।

৮। 'প্রতিমা'। বিষয় রামায়ণের।

ভবভূতি

সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যকার হিসাবে কালিদাসের পরেই ভবভূতির খ্যাতি। কালিদাসের মতো ইনিও তিনটি নাটক লিখিয়াছিলেন। দুইখানে নাটকের বিষয় রামচরিত্র— 'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তররামচরিত'। একখানি লৌকিক আখ্যান অবলম্বনে,—'মালতী-মাধব'।[১] ভবভূতির নামান্তর (অথবা উপাধি) ছিল শ্রীকণ্ঠ। পিতা নীলকণ্ঠ, মাতা জাতুকর্ণী। পিতামহ ভট্টগোপাল। নিবাস বিদর্ভদেশে পদ্মপুর (বা পদ্মাবতী) নগরে। ইঁহারা বেদজ্ঞ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।[২] ভবভূতির জীবৎকাল সপ্তম শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ।

মহাবীরচরিত সাত-অঙ্ক। ইহাতে রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন অবধি রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা নিখুঁতভাবে রামায়ণ অনুযায়ী নয়। নাটকটির পঞ্চম অঙ্কের খানিকটা পর্যন্ত ভবভূতির লেখা, বাকিটা অপরের লেখা,—এমন একটা জনশ্রুতি প্রাচীন টীকাকারেরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ কথা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে নাটকটি ভবভূতির শেষ রচনা এবং সমাপ্ত করিবার আগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা 'উত্তররামচরিত'। ইহাতে গর্ভবতী সীতার বনবাস হইতে শুরু করিয়া রামসীতার পুনর্মিলন পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। মিলনের ব্যাপারটি ভবভূতির নিজস্ব। সংস্কৃত নাটক বিয়োগান্ত করার রীতি ছিল না, শেষে নায়ক-নায়িকাকে মিলাইয়া দিতেই হইত। তাই সীতার আত্মবিসর্জন ঘটনাটি রামের সমক্ষে অভিনয় বলিয়া ভবভূতি উপস্থাপিত করিয়াছেন। রাম এ অভিনয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সীতার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। প্রজারাও খুব অনুতপ্ত হইল। তখন বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী সীতাকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। পতিপত্নীর মিলন ঘটিল। তখন বাল্মীকি কুশ ও লবকে আনিয়া মিলাইয়া দিলেন।

মালতীমাধব প্রেমকাহিনী-নাটক। মালতী ও মাধব—দুই বন্ধুর পুত্র ও কন্যা। জন্মের পূর্ব হইতেই বন্ধুদের মধ্যে কথা দেওয়া ছিল যে পরস্পরের পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া হইবে। বিবাহে বাধা উপস্থিত হইল। রাজার এক প্রিয়পাত্র মালতীকে বিবাহ করিতে চায়। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকীর বুদ্ধিকৌশলে, মাধবের পরাক্রমে এবং অদৃষ্টের অনুকূলতায় পরিশেষে মালতী ও মাধবের মিলন ঘটিয়াছিল। দশ-অঙ্কের এই "প্রকরণ"টিতে ভবভূতি নানা রসের পরিবেশন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে নূতন হইতেছে শ্মশানবর্ণনায় ও সেখানে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে বীভৎস-রসের অবতারণায়। মালতীমাধব ভবভূতির প্রথম রচনা। ইহাতে অপর দুইটি নাটকের মতো রচনায় প্রৌঢ়িমা ও গাঁথনিতে দৃঢ়তা ও সামঞ্জস্য নাই। প্রস্তাবনায় নিজের উপর কবির আস্থার প্রকাশও তাহাই নির্দেশ করে। এই শ্লোকটি ভবভূতির বোধ করি সবচেয়ে স্মরণীয় কবিতা।

> যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
> জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
> উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা।
> কালো হ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী।।

১। মৃচ্ছকটিকের মতো মালতীমাধবও প্রকরণ, অর্থাৎ লৌকিক বিষয়ে দশ-অঙ্ক নাটক।
২। এ পরিচয় মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় আছে।

'যাঁহারা হয়ত এখানে[১] আমাদের প্রতি অবজ্ঞা রটায়, তাহারা কতটুকু বোঝে। (আমার) এই প্রচেষ্টা তাহাদের জন্য নয়। আমার সমানধর্মা[২] কেহ হয়ত (পরে) জন্মাইবে, হয়ত (কেউ) আছেও। (কেননা) কালের অন্ত নাই, পৃথিবীও বিপুল।।'

সমসাময়িক নাট্য-অভিনয় রীতি ভবভূতির ভালো জানা ছিল।[৩] তাঁহার উত্তররামচরিতের অভিনয়—বিশেষ করিয়া কোন কোন অঙ্কের—ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল।[৪] আর কোন প্রাচীন নাটকের সম্বন্ধে এরকম খবব পাই নাই।

হৃদয়ের অনুভূতির বর্ণনায়, ভবভূতির অসাধারণ দক্ষতা এবং কবি হিসাবে তিনি খুবই বড়, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে খুব বড় নন। তবে যদি তাঁহার নাটককে কাব্য ও নাট্যবস্তুর মালা বলিয়া গ্রহণ করি তাহা হইলে তাঁহাকে ভালো নাট্যকার অবশ্যই বলিব। ভবভূতির নাটক-রচনার প্রধান দোষ সমাসকণ্টকিত দীর্ঘ গদ্য উক্তি এবং নাটকের অনুপযুক্ত কঠিন সংস্কৃত শ্লোকেব বাহুল্য। কালিদাসের পর হইতে যে পাণ্ডিত্যপ্রদর্শক পদ্য ও অবোধ্য গদ্য কাব্যরীতি প্রচলিত হইয়াছিল তাহাই যেন ভবভূতি তাঁহার নাটকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া দেখিলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কবি-নাট্যকার দুইজনের সমসাময়িক সাহিত্য-রুচির পার্থক্য ধরা পড়ে। একটি উদ্‌ভট কবিতায় এই সাহিত্যরুচি-বিরোধ কৌতুকচ্ছলে ব্যক্ত আছে। প্রথম ছত্রে ভবভূতির সমর্থকের অভিমত, দ্বিতীয় ছত্রে কালিদাসের।

কবয়ঃ কালিদাসাদ্যা ভবভূতির্মহাকবিঃ।
'কালিদাস প্রভৃতি কবিমাত্র, ভবভূতি মহাকবি।'
তরবঃ পারিজাতদ্যাঃ স্নুহীবৃক্ষো মহাতরুঃ।।
'পারিজাত প্রভৃতি গাছমাত্র, মনসাসিজ মহাবৃক্ষ।।'

অন্যান্য নাট্যকার

ভবভূতির প্রায় শতাব্দকাল পূর্ববর্তী এক নাট্যকার তাঁহার অপেক্ষা ভালো অর্থাৎ অধিকতর সরল ও অভিনয়যোগ্য নাটক লিখিয়াছিলেন। সম্ভবত এই কবির নাম হর্ষ। ইনিই সম্ভবত স্থাণ্বীশ্বরের রাজা বিখ্যাত হর্ষবর্ধন (রাজ্যকাল সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ)।[৫] হর্ষের তিনটি নাট্যরচনার মধ্যে দুইটি হইল চারিঅঙ্কের নাটিকা,—'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা'। দুইটিরই বিষয় উদয়ন-বাসবদত্তা-যৌগন্ধরায়ণের পুরানো কাহিনী শাখাভেদের মতো, কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের ছাঁচে ঢালা। তৃতীয়টি পঞ্চাঙ্ক নাটক, নাম 'নাগানন্দ'। বিষয় আত্মত্যাগী জীমূতবাহনের পুরানো গল্প। হর্ষবর্ধন ছিলেন ধর্মপরায়ণ ত্যাগশীল বৌদ্ধ। নাগানন্দের বিষয়নির্বাচনে তাঁহার অধ্যাত্ম-আদর্শ প্রকটিত।

১। এই লেখকের অর্থাৎ এই রচনায়।
২। অর্থাৎ আমার মতো কাজের কাজী।
৩। মদীয় 'নট-নাট্য-নাটক' (১৯৬৬) পৃষ্ঠা ৪৭-৮৮ দ্রষ্টব্য।
৪। ঐ পৃষ্ঠা ৪৯ দ্রষ্টব্য।
৫। রচনার কাজে রাজা তাঁহার সভাকবি-সভাপণ্ডিতদের সাহায্য লইয়া থাকিবেন।

মৃচ্ছকটিকের পরেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'।[১] সাত অঙ্কের নাটক। বিষয় পুরাপুরি পোলিটিক্যাল্। চাণক্য নন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে বসাইয়াছে। কিন্তু নন্দদের রাজমন্ত্রী রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে সরাইবার চেষ্টায় আছে। তাহাকে চন্দ্রগুপ্তের মহামন্ত্রী না করিলে মৌর্য রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবে না। তাই রাক্ষসের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া তাহাকে দলে ভিড়াইতে চাণক্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। রাক্ষসের চক্রান্তের ও চাণক্যের প্রতিচক্রান্তের ঘটনাবলি গাঁথিয়া মুদ্রারাক্ষসের সুপরিকল্পিত কাহিনী। স্ত্রীভূমিকা নাই বলিলেই হয়। সব ভূমিকাই সমঞ্জস এবং প্রত্যয়যোগ্য।

বিশাখদত্তের পিতা ছিলেন মহাসামন্ত ("মহারাজ") ভাস্করদত্ত, পিতামহ "সামন্ত" বটেশ্বরদত্ত। মুদ্রারাক্ষসের রচনাকাল লইয়া মতানৈক্য আছে। তবে তাহা যে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যের পুরানো প্রহসনগুলি[২] "ভাস"এর নাট্যরচনার মতো আধুনিককালে কেরলে আবিষ্কৃত। কাঞ্চীর রাজা মহেন্দ্রবিক্রমবর্মার 'মত্তবিলাস' এই ধরনের প্রাপ্ত রচনার মধ্যে বেশ পুরানো বলিয়া মনে হয়। মহেন্দ্রবিক্রমবর্মা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজ্য করিয়াছিলেন। মত্তবিলাসের সামান্য কাহিনীতে শৈব যোগী-যোগিনীর মদ্যপ্রিয়তা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর মদ্যলোলুপতা মোটা রঙে আঁকা আছে।

রুচি সব সময় ভদ্র না হইলেও 'চতুর্ভাণী' নামে প্রকাশিত (১৯২২) চারটি 'ভাণ' অভিধেয়[৩] সংস্কৃত প্রহসনের মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য। চতুর্ভাণীতে সঙ্কলিত ভান চারটি এই,—বররুচির 'উভয়াভিসারিকা', শূদ্রকের 'পদ্মপ্রাভৃতক', ঈশ্বরদত্তের 'ধূর্তবিটসংবাদ' এবং আর্য শ্যামিলকের 'পাদতাড়িতক'। চারটি ভাণেরই রচনারীতি কতকটা মত্তবিলাসেরই মতো। রচনাকাল সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর পরে নয়। 'উভয়াভিসারিকা' পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা হইতে পারে।

পরবর্তীকালের সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে রচনা-বাহুল্যে রাজশেখরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার চারটি নাট্যরচনা পাওয়া গিয়াছে,—'বালরামায়ণ', 'বালভারত', 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' ও 'কর্পূরমঞ্জরী'। রাজশেখর মহারাষ্ট্র ক্ষত্রিয় (ক্ষেত্রী?) ছিলেন, বিদ্বানের বংশ। পত্নী অবন্তীসুন্দরী ছিলেন চৌহান-বংশীয়া। তিনিও কম প্রতিভাবতী ছিলেন না। একাধিক রাজার সভায় থাকিয়া রাজশেখর তাঁহার নাটকগুলি লিখিয়াছিলেন। এই রাজারা নবম শতাব্দীর শেষ দশক হইতে দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুতরাং রাজশেখর নবম-দশম শতাব্দীর সন্ধি সময়ে জীবিত ছিলেন, বলিতে পারি।

'বালরামায়ণ' মহানাটক, সংস্কৃত সাহিত্যের বৃহত্তম নাট্যরচনা। বড় বড় দশ অঙ্কে লেখা, প্রস্তাবনাও একটি অঙ্কের মতোই দীর্ঘ। 'বালভারত' অসমাপ্ত রচনা। সমাপ্ত হইলে নিশ্চয়ই আকারে বালরামায়ণকে ছাড়াইয়া যাইত। 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' চার-অঙ্কের নাটিকা। বিষয় মালবিকাগ্নিমিত্র-রত্নাবলীর ধরনের। পুরুষবেশী মেয়ের ও মেয়েবেশী পুরুষের বিবাহ লইয়া

১। নামটিতে অভিজ্ঞানশকুন্তলের অনুকরণ আছে বলিয়া মনে করি।

২। আগেকার সংস্কৃত নাটকে প্রহসন অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকিত। কালিদাসের নাটকের ও মৃচ্ছকটিকের পরেই বোধ করি নাটকের আকারে স্বাধীন প্রহসন রচনা শুরু হয়।

৩। একোক্তি (monologue) নাট্যরচনার নাম "ভাণ"। শব্দটি 'ভণ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। অর্থ-একটানা বকিয়া যাওয়া।

গণ্ডগোল এবং অবশেষে নায়িকা দুইটির রাজার সঙ্গেই পরিণয় হওয়া। 'কর্পূরমঞ্জরী' রাজশেখরের সবচেয়ে পরিচিত নাট্যরচনা। এটিও চার-অঙ্কের নাটিকা, তবে আগাগোড়া প্রাকৃতে রচিত বলিয়া নাম 'সট্টক'[১]। এটির কাহিনী রত্নাবলীর আরও অনুরূপ।

অপর সংস্কৃত নাটকের মধ্যে একখানির কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এটি কৃষ্ণমিশ্রের রচনা, নাম 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'। সংস্কৃতে সবচেয়ে পুরানো রূপকনাটক। (অশ্বঘোষের নাটকের পুথির টুকরার মধ্যে একটি নাটকেরও সামান্য ভগ্নাংশ মিলিয়াছে। সেটির রচয়িতাও মনে হয় অশ্বঘোষ। এ নাটকের কথা বাদ দিলে তবেই প্রবোধচন্দ্রোদয়কে সংস্কৃতে প্রথম রূপক-নাটক বলা যায়।) কৃষ্ণমিশ্রের উৎসাহদাতা ছিলেন চন্দেল্ল-বংশীয় রাজা কীর্তিবর্মার সেনাপতি। সুতরাং রচনাকাল কীর্তিবর্মার সমসাময়িক, অতএব একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। কৃষ্ণমিশ্র পূর্বভারতের লোক ছিলেন, সম্ভবত বাংলাদেশের।[২] দক্ষিণরাঢ়ের ব্রাহ্মণদের কুলগর্বের ও আত্মম্ভরিতার প্রত্যয়যোগ্য প্রকাশ এই নাটকেই প্রথম পাওয়া গেল।

সংস্কৃত কাব্য

কালিদাসের পর সংস্কৃত কাব্য ভিন্ন পথে চলিয়াছিল। সংস্কৃতের মর্যাদা চড়িতে লাগিল, ব্যাকরণবন্ধন দৃঢ়তর হইতে লাগিল, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে জানপদী ভাষার দূরত্ব বাড়িয়াই চলিল। তাহার ফলে সংস্কৃত-বিদ্যা পাণ্ডিত্যের দুর্গে বন্দিনী হইল এবং জানপদী ভাষায়, অর্থাৎ প্রাকৃতে, সাহিত্য—যাহা পূর্ব হইতেই সংস্কৃতের দ্বারা প্রচুর প্রভাবিত ছিল—তাহাও সংস্কৃতের অনুগমন করিল। অর্থাৎ সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুই সাহিত্যেরই বিচরণ হইল পাণ্ডিত্যমার্গে। সেইজন্য এই সময়ের সাহিত্যে কাব্যরসের চেয়ে বিদ্যারসেরই যোগান বেশি। কালিদাসের পরবর্তী সংস্কৃত কাব্যে বিষয়বস্তুর নবীনতা কিছুমাত্র নাই, মহাভারত ও রামায়ণের বাহিরে কবিরা যান নাই। পাণ্ডিত্যপ্রকাশ শুধু অলঙ্কারে বা শব্দপ্রয়োগ-চাতুর্যে নিবদ্ধ নয়—দুর্ঘট ব্যাকরণসূত্রের উদাহরণে, স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের জ্ঞানোচ্ছ্বাসে এবং সহজ কথাকে যতদূর সম্ভব কঠিন করিয়া প্রকাশে প্রকটিত। বাহাদুরি প্রকাশের চরম চেষ্টা দেখি একাক্ষর শ্লোক রচনায়। যেমন

> ন নোননুন্নো নুন্নোনো ন না নানাননা ননু।
> নুন্নোঽনুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ।।[৩]
>
> (= ন না উননুন্নঃ নুন্ন উনঃ ন না, নানাননাঃ ননু।
> নুন্নঃ অনুন্নঃ ন-নুন্নেনঃ ন-অনেনাঃ নুন্ননুন্ননুৎ।।)

'হীন আহত (ব্যক্তি) পুরুষ নয়। হে নানামুখেরা, হীনঘাতীও পুরুষ নয়। আহত অনাহত(ই), (যদি তাহার) প্রভু আহত না হয়। বারবার আহতঘাতী নিষ্পাপ নয়।।'

১। শব্দটি ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। নট্টের সাদৃশ্যে 'সট্ট' এবং নাটকের সাদৃশ্যে, 'নট্টক' অনুসারে, 'সট্টক' উৎপন্ন।—এই অনুমান করিতে পারি।

২। বাঙালী বলিব না এই কারণে যে তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মধ্যে ভাষায় ও লোকযাত্রায় বিভেদের পাকা গাঁথুনি ছিল না।

৩। ভারবির কিরাতার্জুনীয় হইতে।

অলঙ্কার শাস্ত্রের নিদর্শন অনুসরণ করিয়া যাঁহারা "মহাকাব্য" লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য ভারবি। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এক শিলালিপিতে কালিদাসের সঙ্গে ইঁহারও কবিকীর্তির উল্লেখ আছে। সুতরাং ভারবি এই সময়ের আগে কাব্য লিখিয়াছিলেন। কত আগে বলা যায় না। তবে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারবির জীবৎকাল ধরিলে দোষ হয় না।

ভারবির একমাত্র রচনা 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্য আঠারো সর্গে গাঁথা। বিষয় মহাভারতের বনপর্বে কথিত অর্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ ব্যাপার। কাহিনীটুকু যৎসামান্য। কবি সে কাহিনীতে স্বকল্পিত ঘটনাসংযোগ করিয়াছেন। ভারবির রচনার প্রধান গুণ গাঢ়তা ও ওজস্বিতা। টীকাকার মল্লিনাথ ভারবির কবিত্ব রসকে যে ছোবড়ার ও খোলার পুটবদ্ধ নারিকেল শস্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন তা অযথার্থ নয়।

ভট্টির 'রাবণবধ' কবির নাম অনুসারে 'ভট্টিকাব্য' নামেই প্রসিদ্ধ। গুজরাটের বলভী নগরীতে কাব্যটি লেখা হইয়াছিল। কবি বলভীর রাজা শ্রীধরসেনের নাম করিয়াছেন। শ্রীধরসেন নামে তিন চারজন রাজা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে অর্বাচীন যিনি তাঁহার মৃত্যু হয় ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ ভট্টিকাব্য-রচনার সম্ভাব্য অধস্তন সীমা। কবি সম্বন্ধে খাঁটি কথা কিছু জানা নাই।

ভট্টিকাব্যের বিষয় রামচরিত। রচনার উদ্দেশ্য রামের কথা নব-কাব্যাকারে এমনভাবে উপস্থাপন যাহাতে ব্যাকরণের, শব্দপ্রয়োগের ও অলঙ্কারের শিক্ষা অনায়াসে পাওয়া যায়। কাব্যটি বাইশ সর্গে গাঁথা। শেষে নিজের রচনা সম্বন্ধে কবি এই কথা বলিয়াছেন

দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেদ্ ব্যাকরণাদৃতে।।

'আমার এই রচনা দীপের মতো, ব্যাকরণজ্ঞদের কাছে। অন্ধদের হাত ধরার মতো, ব্যাকরণ বিনাও (ব্যাকরণশিক্ষক) হইতে পারে।।'

ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া।।

'এই কাব্য (সাধারণ পাঠক) ব্যাখ্যার সাহায্যেই বুঝিবে, তবে সুধী ব্যক্তির পক্ষে এ যেন প্রচুর ভোজ; নির্বোধেরা এই (কাব্যে) নিবারিত। বিদ্বানের প্রিয়তা হেতু আমি (এমনি করিয়াছি)।।'

ভট্টিকাব্যের কবি শক্তিমান্ ছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎকট উদাহরণের মধ্য দিয়া এবং বিশেষ করিয়া মাঝে মাঝে ব্যাকরণের কথা ভুলিয়া গিয়া কবি যে কাব্যরস প্রবাহিত করিয়াছেন তাহা তাহার অপর "মহাকাব্য"গুলিতে সুলভ নয়।

মাঘের 'শিশুপালবধ' ভারবির পরে লেখা। রচনাকাল আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। কাব্যটিতে সতেরো সর্গ। বিষয় মহাভারত হইতে গৃহীত কাহিনী। শিশুপালবধ কিরাতার্জুনীয়ের মতো সুসংহিত ও প্রগাঢ় রচনা নয়। তবে বেশি সুখপাঠ্য। ভারবি ব্যাকরণ-বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই, মাঘ তাহা করিয়াছেন। সম্ভবত ভট্টিকাব্য তাঁহার পড়া ছিল।

টোলের পণ্ডিতদের অভিমত অন্যরকম ছিল। তাঁহাদের মতে

তাবদ্ ভা ভারবের্ভাতি যাবন্ মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।।

'ততকালই ভারবির কবিগৌরব ছিল, যতদিন মাঘের উদয় হয় নাই। নৈষধ কাব্য উদিত হইলে (এখন) কোথায় মাঘ কোথায় বা ভারবি!'

তবুও শ্রীহর্ষের 'নৈষধীয়চরিত' কাব্যকে ভারবির ও মাঘের রচনার তুল্য মর্যাদা দেওয়া যায় না। কাব্যটির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ বলিয়া অনুমিত[১] হয়। বিষয় মহাভারত হইতে গৃহীত নলোপাখ্যান। সর্গসংখ্যা বাইশ। শ্রীহর্ষ একটি নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছিলেন। তা হইল সর্গান্ত শ্লোকে আত্মপরিচয়দান ও সর্গের নাম ও সংখ্যা জ্ঞাপন। কাব্যের শেষ শ্লোকে কবি গর্ব করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি ইহ ও পর দুই লোকে সমুন্নতিলাভ করিয়াছেন।

তাম্বুলদ্বয়ম্ আসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাদ্।
যঃ সাক্ষাৎ কুরুতে সমাধিষু পরং ব্রহ্ম প্রমোদার্ণবম্।

শ্রীহর্ষের পূর্ববর্তী একটি রচনার উল্লেখ করিতে হয়। ইহা হইল 'রামচরিত'। ইহাতে দ্ব্যর্থের সাহায্যে এক সঙ্গে রামের সীতা-উদ্ধার কাহিনী এবং রাজা রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্র-ভূমি পুনর্জয়ের ইতিহাস বর্ণিত হইযাছে। রচয়িতার নাম সন্ধ্যাকর নন্দী। রামচরিত ভারতীয় সাহিত্যে বোধ করি প্রথম সমসাময়িক (contemporary) ঐতিহাসিক পদ্য কাব্য। কাব্যটিতে চার পরিচ্ছেদ। শেষে অতিরিক্ত কয়েকটি শ্লোকে কবি নিজের ও রচনার পরিচয় দিয়াছেন। আগাগোড়া আর্যা ছন্দ ব্যবহৃত। কবি নিজেই কাব্যটির টীকা খানিকটা লিখিয়াছিলেন।

আত্মপরিচয় অংশ হইতে জানা যায় যে সন্ধ্যাকরের কুলস্থান ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন নগরের সংলগ্ন বৃহদ্‌বটু (এখানকার ভাযায় হইবে "বড়বড়ু") গ্রামে। জাতি করণ (অর্থাৎ উত্তররাঢ়ীয় কাযস্থ)। পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালের সান্ধিবিগ্রাহিক[২] মন্ত্রী ছিলেন।

নিজের কাব্য সম্বন্ধে সন্ধ্যাকর নন্দী এই অভিমত দিয়াছেন

অবদানং রঘুপরিবৃঢ়-গৌড়াধিপ-রামদেবয়োরেতৎ।
কলিযুগ-রামায়ণমিহ কবিরপি কলিকাল-বাল্মীকিঃ।।

'এই (কাব্য) রাঘব রামদেবের এবং গৌড়রাজ রামদেবের কীর্তিগাথা। এই (তো) কলিযুগের রামায়ণ। কবিও কলিকালের বাল্মীকি।।'

লক্ষ্মণসেনের সভাকবি গোবর্ধন আচার্য একটি প্রকীর্ণ কবিতাময় কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, নাম 'আর্যাসপ্তশতী'। তাঁহার আদর্শ ছিল প্রাকৃত ভাষায় লেখা "কোষকাব্য" (অর্থাৎ কবিতাসংগ্রহ) 'গাথাসপ্তশতী' (প্রাকৃতে 'গাথাসত্তসঈ')। গাথাসপ্তশতীর অনুকরণে গোবর্ধন আচার্য আগাগোড়া আর্যা ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কয়েকটি কবিতা বেশ ভালো।

গদ্যে কাব্য ও কাহিনী

সংস্কৃত সাহিত্যের গদ্যরচনারীতি অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যের গদ্যরীতির ক্রমপরিণতি নয়। সে পরিণতি পতঞ্জলির মহাভাষ্যের মতো ব্যবহারিক গদ্যরচনায় আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল। সে কথা আগে বলিযাছি। সংস্কৃত সাহিত্যের গদ্যরীতি রাজাদের প্রশস্তি হইতে আগত। সুতরাং জন্মসূত্র হইতেই এ রীতি অলঙ্কার-ভারাক্রান্ত এবং অকেজো।

১। প্রত্যেক কাব্যের শেষের শ্লোকে কবি পিতা-মাতার নাম করিয়াছেন। পিতার নাম--শ্রীহরি ও মাতার নাম মামল্ল দেবী।

২। অর্থাৎ যাঁহাকে যুদ্ধ লাগাইবার এবং সন্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া আছে।

শাকপার্থিব রুদ্রদামনের জুনাগড় লিপিতে এই গদ্যরীতির (এবং রাজপ্রশস্তিতে সংস্কৃত ভাষার) ব্যবহার প্রথম পাইতেছি। সুদর্শন হ্রদের সংস্কার করিয়া দিয়া কোন রাজকর্মচারী প্রভুর এই প্রশস্তিটি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। রুদ্রদামনের রাজ্যকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীয়। রচনার একটু নমুনা দিই।

> ... স্বয়মভিগতজনপদপ্রণিপতিতায়ুষশরণদেন দস্যুব্যালমৃগরোগাদিভিরনুপসৃষ্ট-পূর্বনগরনিগমজনপদানাং স্ববীর্যার্জিতানামনুরক্তসর্ব্বপ্রকৃতীনাং . . . . সর্ব্বক্ষত্রাবিষ্কৃতবীরশব্দজাতোৎসেকাবিধেয়ানাং যৌধেয়ানাং প্রসহ্যোৎসাদকেন . . . . ভ্রষ্টরাজ্যপ্রতিষ্ঠাপকেন যথার্থহস্তোচ্ছ্রয়ার্জিতোর্জিতধর্মানুরাগেণ শব্দার্থগান্ধর্বন্যায়াদ্যানাং বিদ্যানাং মহতীনাং পারণধারণবিজ্ঞানপ্রয়োগাবাপ্তবিপুলকীর্ত্তিনা . অহরহর্দানমানানবমানশীলেন স্থূললক্ষেণ যথাবৎপ্রাপ্তৈর্বলিশুল্কভাগৈঃ কানকরজতবজ্র বৈদূর্যরত্নোপচযবিষ্যন্দমানকোশেন স্ফুটলঘুমধুরচিত্রকান্তশব্দসময়োদারালংকৃতগদ্যপদ্য [কাব্যবিধানপ্রবাণে]ন প্রমাণমানোন্মানস্বরগতিবর্ণসারসত্ত্বাদিভিঃ পরমলক্ষণব্যঞ্জনৈরুপেতকান্তমূর্ত্তিনা স্বয়মধিগতমহাক্ষত্রপনাম্না নরেন্দ্রকন্যাস্বয়ংবরানেকমাল্যপ্রাপ্তদাম্না মহাক্ষত্রপেন রুদ্রদাম্না. . . .

প্রথম দিকের কোন সংস্কৃত গদ্যকাব্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। গদ্যকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সেই "ভট্ট" বাণ তাঁহার হর্ষচরিত কাব্যের উপক্রমে[১] এক পূর্বগামী কবি "ভট্টার" হরিচন্দ্রের গদ্য রচনাকে খুব প্রশংসা করিয়াছেন।[২] ভট্টার হরিচন্দ্র সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন কি প্রাকৃতে লিখিয়াছিলেন তাহা জানা নাই। (প্রাকৃতে গদ্যরচনা আগে হইতেই ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।) ইনি সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তির রচয়িতা হরিষেণ হইতে পারেন। এ প্রশস্তির গদ্য-অংশও বেশ ভালো রচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে তিনজন গদ্যকাব্য রচয়িতার নাম প্রসিদ্ধ,—দণ্ডী, সুবন্ধু আর বাণ (বাণ "ভট্ট")। সুবন্ধু বাণের পূর্বগামী। হর্ষচরিতে বাণ সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' আখ্যায়িকার রচনাচাতুর্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

> কবীনামগলদ্ দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।
> শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্।।

> 'কবিদের সত্যসত্যই দর্প গলিয়া গিয়াছিল বাসবদত্তা শোনার পর,[৩] যেমন ইন্দ্রের দেওয়া পাণ্ডুপুত্রদের অস্ত্র কর্ণের কাছে।।'

সুবন্ধু বাণের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

বাসবদত্তার কাহিনী সংক্ষেপে বলি। এক রাজার ছেলে কন্দর্পকেতু স্বপ্নে এক মেয়ের মুখ দেখিয়া প্রেমে পড়িয়াছে। আর এক রাজার মেয়ে বাসবদত্তাও স্বপ্নে এক ছেলের মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। পরস্পর স্বপ্নে-দেখা মুখ এই দুজনেরই। কন্দর্পকেতু বন্ধু মকরন্দকে সঙ্গে লইয়া স্বপ্নে-দেখা মেয়ের খোঁজে বাহির হইয়াছে। বাসবদত্তাও সখী তমালিকাকে পাঠাইয়াছে স্বপ্নে-দেখা ছেলের খোঁজে। পাটলীপুত্রে আসিয়া দুই পার্টির দেখা হইল। বাসবদত্তার পিতা তাহাকে

১। বাণকে এক হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস-লেখক বলিতে পারি। ইঁহার কাব্যের ভূমিকায় পূর্বগামী কবিদের নামের তালিকা আছে। সেরকমটি অমন বিস্তৃতভাবে আগে পাওয়া যায় নাই।

২। "ভট্টার-হরিচন্দ্রস্য গদ্যবন্ধো নৃপায়তে।"

৩। শ্লোকটিতে শ্লেষ আছে দুইটি পদে—"বাসবদত্তয়া" আর "কর্ণগোচরম্"।

অনতিবিলম্বে বিদ্যাধর পুষ্পকেতুর সহিত বিবাহ দিতে স্থির করিয়াছে জানিয়া কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে লইয়া বিন্ধ্যপর্বতে পলাইয়া গেল। সেখানে গিয়া কন্দর্পকেতু ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল পাশে বাসবদত্তা নাই। বাসবদত্তার বিরহে কন্দর্পকেতু আত্মহত্যা করিতে গেল। কিন্তু দৈববাণীর নিষেধ শুনিয়া প্রাণ ধরিল। তাহার পর অনেক পর্যটনের পর সে এক প্রতিমা দেখিল। তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে জীবন্ত বাসবদত্তা হইয়া গেল। নায়ক নায়িকার স্থায়ী মিলন ঘটিল।

বাসবদত্তায় কিছু কিছু শ্লোকও আছে। সেগুলির রচনা ভালো।

সংস্কৃত গদ্য কবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বাণ হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন (সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। বাণের রচনা দুইখানি পাইয়াছি,—'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকা ও 'কাদম্বরী' কথা।[১] দুইটি বইই অসম্পূর্ণ। বাণের পুত্র ভূষণ পিতার অবর্ণিত অংশটুকু লিখিয়া দিয়া কাদম্বরীকে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

'হর্ষচরিত' সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র সমসাময়িক জীবনী গ্রন্থ।[২] রচনাটি আট উচ্ছ্বাসে বিভক্ত।[৩] প্রথম উচ্ছ্বাসে বাণ নিজের বংশবর্ণনা করিয়া আপনার প্রথম জীবনের কথা বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে রাজসাক্ষাৎকার পর্যন্ত আত্মকথার অনুবৃত্তি। তৃতীয় উচ্ছ্বাসের মাঝামাঝি হইতে হর্ষবর্ধনের বংশবর্ণনা দিয়া রাজচরিত শুরু হইয়াছে।

হর্ষচরিতের গোড়াতেই কয়েকটি শ্লোকে ব্যাসের এবং সমসাময়িক পূর্বগামী সাতজন কবির রচনার প্রশংসা। সে কবিদের মধ্যে সংস্কৃতে যাঁহারা লিখিতেন তাঁহারাও আছেন, প্রাকৃতে যাঁহারা লিখিতেন তাঁহারাও আছেন। সংস্কৃত লেখকদের মধ্যে প্রথমেই আছেন, সুবন্ধু (বাণের প্রায়-সমসাময়িক), তাহার পর ভট্টার-হরিচন্দ্র[৪], ভাস (নাট্যকার), কালিদাস। প্রাকৃত লেখকদের মধ্যে আছেন সাতবাহন ('গাথাসপ্তশতী'র সঙ্কলয়িতা), প্রবরসেন ('সেতুবন্ধ' কাব্যের কবি) আর 'বৃহৎকথা'-রচয়িতা।

প্রথমেই যে শিববন্দনা শ্লোক আছে সেটি সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের অনেক রাজশাসনে উৎকীর্ণ দেখা যায়।

নমস্তুঙ্গশিরশ্চুম্বিচন্দ্রচামরচারবে।
ত্রৈলোক্যনগরারম্ভমূলস্তম্ভায় শম্ভবে।।

'নমস্কার, যাঁহার তুঙ্গশীর্ষ চন্দ্রচামরের[৫] দ্বারা চুম্বিত,
যিনি ত্রিভুবনরূপ নগর পরিধির মূলস্তম্ভ, সেই শম্ভুকে।।'

১। "কথা" ও "আখ্যায়িকা" এই দুই শ্রেণীর রচনার লক্ষণ লইয়া প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে মোটামুটি বলা যায় যে আখ্যায়িকার বিষয় কবিকল্পিত নয়, কথার বিষয় কবিকল্পিত। আখ্যায়িকার ভাষা সংস্কৃত, কথার ভাষা সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত দুইই হইতে পারে। আখ্যায়িকার কবিতা অল্পস্বল্প থাকিতে পারে। কথায় কবিতার পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়।

২। বইটি প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর (১৮৮৩)।

৩। কাব্যাদর্শে দণ্ডী উচ্ছ্বাসবিভাগ আখ্যায়িকার অন্যতম লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্যন্ত প্রত্যেক উচ্ছ্বাসের গোড়ায় বাণ দুইটি করিয়া আর্যা শ্লোক দিয়াছেন। প্রথম উচ্ছ্বাসের গোড়ায় বিশটি অনুষ্টুপ শ্লোকের পর একটি আর্যা শ্লোক আছে।

৪। ইনি সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন কি প্রাকৃতে লিখিয়াছিলেন তাহা জানা নাই।

৫। "চন্দ্রচামর" এখানে চন্দ্রকিরণ অথবা চন্দ্রকরোজ্জ্বল জটাজাল কিংবা চন্দ্রকরোদ্ভাসিত-জাহ্নবীধারা বুঝাইতেছে। উৎপ্রেক্ষাটি কালিদাসের কাছেই পাওয়া,—'যা বিহস্যেব ফেনৈঃ শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদ্ ইন্দুলগ্নোর্মিহস্তা।"

তাহার পর হরকণ্ঠলগ্ন উমার বন্দনা।

হরকণ্ঠগ্রহানন্দমীলিতাক্ষীং নমাম্যুমাম্।
কালকূটবিষস্পর্শজাতমূর্চ্ছাগমামিব।।

'আমি উমাকে নমস্কার করি। হরকণ্ঠগ্রহণের আনন্দে তাহার চক্ষু মুদ্রিত, যেন (হরকণ্ঠস্থিত) কালকুট বিষের স্পর্শে মূর্চ্ছাবিষ্ট।।'

তাহার পর ব্যাসের প্রশংসা।

নমঃ সর্ববিদে তস্মৈ ব্যাসায় কবিবেধসে।
চক্রে পুণ্যং সরস্বত্যা যো বর্ষমিব ভারতম্।।

'নমস্কার সেই সর্বজ্ঞ পুণ্যবান্ কবি-ব্রহ্মা ব্যাসকে,
যিনি সরস্বতীর পুণ্য বর্ষের মতো (মহা) ভারত রচনা করিয়াছেন।।'

(ব্যাসের বন্দনার তাৎপর্য বুঝি, কেননা মহাভারত আখ্যায়িকার মহাসমুদ্র। কিন্তু বাল্মীকির অনুল্লেখ বোঝা গেল না।)

কবিপ্রশস্তির পর বাণ হর্ষচরিত-রচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে ভয়ে ভয়েই তিনি রাজপ্রশস্তিকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন।

আঢ্যরাজকৃতোৎসাহৈর্হৃদয়স্থৈঃ স্মৃতৈরপি।
জিহ্বান্তঃ কৃষ্যমাণেব ন কবিত্বে প্রবর্ততে।।

'আঢ্যরাজের[1] উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও, আমার হৃদয়ে প্রচুর উৎসাহ থাকিলেও, এবং (সব কথা) স্মরণে রাখিলেও, জিহ্বা (অর্থাৎ আমার লেখনী) যেন ভিতর দিকে টান পাইয়া কবিকর্মে প্রবৃত্তি পাইতেছে না।।'

তথাপি নৃপতের্ভক্ত্যা ভীতো নির্বহণাকুলঃ।
করোম্যাখ্যায়িকাম্ভোধৌ জিহ্বাপ্লবনচাপলম্।।

'তবুও নৃপতির প্রতি ভক্তিহেতু, সিদ্ধিলাভে ব্যাকুল হইয়া আমি আখ্যায়িকা-সমুদ্রে[2] জিহ্বা-তরণী ভাসাইবার চাপল্য করিতেছি।।'

পরের শ্লোকে আখ্যায়িকার প্রশংসা। তাহার পর হর্ষের প্রশস্তি শ্লোক। তাহার পর গদ্যবন্ধ আরম্ভ। ব্রহ্মার সভার ঋষিদের আলোচনা-চক্র উপলক্ষ্য করিয়া বাণ নিজবংশের উৎপত্তিকথা কহিয়াছেন।[3]

হর্ষচরিতের প্রথমে বাণ আপনার কথা কিছু বলিয়াছেন। (ইহার আগে কোন সংস্কৃত কবির আত্মকথা বলিয়া কিছু পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ শ্লোকে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় অর্থাৎ নিজের অথবা বাবা মায়ের নামটুকু করিয়াছেন।) এ অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি।

অলভত সচিত্রভানুস্তেষাং মধ্যে রাজদেব্যাভিধানায়াং ব্রাহ্মণ্যাং বাণম্ আত্মজম্। স বাল এব বিধের্বলবতো বশাদ্ উপসম্পন্নয়া ব্যযুজ্যত জনন্যা। জাতস্নেহস্তু নিতরাং পিতৈবাস্য মাতৃতাম্ অকরোৎ। অবর্ধ্যত চ তেনাধিকতরমেধীযধৃতির্ধাম্নি নিজে।

কৃতোপনয়নাদিক্রিয়াকলাপস্য সমাবৃত্তস্য চতুর্দশবর্ষদেশীয়স্য পিতাপি

১। "আঢ্যরাজ" কথাটির মানে স্পষ্ট নয়। কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা হর্ষকে বোঝাইতেছে। কোন ব্যক্তির (—হর্ষের ভ্রাতা কৃষ্ণের?) নামস্থানীয় উপাধি অথবা পদবী হওয়া বেশি সম্ভব। আক্ষরিক অর্থ 'ধনী রাজা'।

২। বাণ এখানে হর্ষচরিতকে আখ্যায়িকা শ্রেণীতে ফেলিতেছেন।

৩। বর্ণনায় বাণ উত্তমপুরুষ ব্যবহার না করিয়া প্রথম পুরুষ ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রুতিস্মৃতিবিহিতংকৃত্বা দ্বিজজনোচিতং নিখিলং পুণ্যজাতং কালোনানশমীস্থ এবাস্তমগাৎ। সংস্থিতে চ পিতরি মহতা শোকেনাভীলমনুপ্রাপ্তো দিবানিশং দহ্যমানহৃদয়ঃ কথং কথমপি কতিপয়ান্ দিবসান্ আত্মগৃহ এবানৈষীৎ। তে চ বিরলতাং শনৈঃ শনৈর্ অবিনয়নিদানতয়া স্বাতন্ত্র্যস্য কুতূহলবহুলতয়া চ বালভাবস্য ধৈর্যপ্রতিপক্ষতয়া চ যৌবনারম্ভস্য শৈশবোচিতান্যনেকানি চাপলান্যাচরন্নিত্বরো বভূব।

'তাহাদের (অর্থাৎ বাণের পিতামহের এগারো পুত্রের) মধ্যে চিত্রভানু ব্রাহ্মণকন্যা রাজদেবীর গর্ভে বাণকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন। সে যখন শিশু তখনই বলবান্ বিধিব বশে জননীর মৃত্যুবিয়োগ হইল। অত্যন্ত স্নেহশীল হইয়া তাহার পিতাই মাতার কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তাহার পর তাহার বুদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজ গৃহে বাড়িতে লাগিল।

'উপনয়ন প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ করা হইলে এবং গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন কবিলে পর তাহার চৌদ্দ বছর বয়সে পিতাও বেদ ও সদাচারবিহিত ব্রাহ্মণোচিত পুণ্যকর্ম সব করিয়া আয়ুঃ পূর্ণ হইবার আগেই অস্ত গমন করিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে শোকে কষ্ট পাইয়া দিবারাত্রি তপ্তহৃদয় হইয়া কোনও রকমে কিছুদিন নিজের বাড়িতেই কাটাইল। ধীরে ধীরে শোক কমিয়া আসিলে, স্বাধীনতা অশিক্ষার হেতু বলিয়া বাল্যাবস্থায় কুতূহল প্রবল বলিয়া, যৌবনারম্ভকাল ধৈর্য মানে না বলিয়া, (বাণ) শৈশবোচিত অনেক চপল কাজে বিচরণশীল হইল।'

তাহার পর বাণ তাঁহার বর্ষীয়ান্ এবং বাল্য ও কৈশোর সঙ্গী ও সঙ্গিনীদেব নাম করিয়াছেন।[১] এই তালিকা দেখিলে মনে হয় যে মাতৃহীন পুত্রকে চিত্রভানু শাসনে রাখিতে পারেন নাই, বাণের কৌতূহল লেখাপড়ার তুলনায় বাহিরের জীবনের দিকে কম ছিল না। তাই তাঁহার বাল্য ও যৌবন বন্ধুদের মধ্যে সাপুড়ে হইতে নাট্যাচার্য, সৈরন্ধ্রী হইতে নর্তকী, তাম্বুলদায়ক হইতে সংবাহিকা (মেয়ে মর্দনিয়া), ক্ষপণক হইতে মন্ত্রসাধক পর্যন্ত—এমন অনেকেই আছে যা সপ্তম শতাব্দীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাড়ির ছেলের পক্ষে অত্যন্ত অভাবিত।

'এই রকম আরও অনেকের সঙ্গে থাকিয়া অল্পবয়সীর উপযুক্ত মোহে মজিয়া, দেশান্তর দেখিবার কৌতূহলে আক্ষিপ্তহৃদয় (হইয়া), পিতৃপিতামহের সঞ্চিত ব্রাহ্মণপরিবারের উপযুক্ত ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও এবং বিদ্যাচর্চায় বিরত না হইয়াও গৃহ হইতে বাহির হইল। নিয়ন্ত্রণহীন (সে) নবযৌবন ও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তিরূপ গ্রহপীড়িত হইয়া ভালো লোকের উপহাসপাত্র হইল।'

তাহার পর নানা দেশের রাজধানী দেখিয়া, নানা বিদ্যায় উদ্ভাসিত গুরুকুল সেবা করিয়া অনেক জ্ঞানী-গুণীব গোষ্ঠীতে যোগ দিয়া[২] বাণ আবার নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। জ্ঞাতিরা তাঁহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিল।[৩] কিছুকাল পরে মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর

১। যেমন পিতার অব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভজাত দুই ভাই চন্দ্রসেন ও মাতৃষেণ, "ভাষা-কবি" ঈশান, "বর্ণ-কবি" বেণীভারত, "প্রাকৃতকৃৎ" কুলপুত্র বায়ুবিকার (এ নামটি নিশ্চয়ই পরিহাসজাত), "কাত্যায়নিকা" চক্রবাকিকা, "জাঙ্গলিক" (সাপুড়ে) ময়ূরক, বীরবর্মা, মৃদঙ্গকুশল জীমূত, গায়ক সোমিল ও গ্রহাদিত্য, "সৈরন্ধ্রী" কুরঙ্গিকা, বংশীবাদক মধুকর ও পারাবত, নাট্যাচার্য দর্দুরক, নর্তকী হরিণিকা, নটযুবা শিখণ্ডক, "ঐন্দ্রজালিক" চকোরাক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

২। মহার্হালাপগম্ভীরগুণবদ্গোষ্ঠীশ্চোপতিষ্ঠমানঃ স্বভাবগম্ভীরধীধনানি বিদগ্ধমণ্ডলানি চ গাহমানঃ"।

৩। এইখানে প্রথম উচ্ছ্বাস শেষ।

শ্রীহর্ষদেবের ভ্রাতা কৃষ্ণ বাণকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে রাজা তাঁহাকে দেখিতে চান। সে আহ্বান মান্য করিয়া বাণ রাজসভায় চলিলেন। বাণের রাজধানী প্রবেশ হইতে হর্ষচরিতের মূল বিষয়ের আরম্ভ।

হর্ষচরিত ঐতিহাসিক কাব্য। ঘটনাক্রমের দিক দিয়া হয়ত পণ্ডিতের চোখে হর্ষচরিতে ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিন্তু সেকালের রাজসভার ও রাজসংসারের সে চিত্রগুলির বাস্তব মুল্য অপরিমেয়। কৌতূহলী পাঠককে হর্ষের পিতার মরণান্তিক রোগভোগের বর্ণনাটুকু পড়িতে অনুরোধ করি। এমন চিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোথাও নাই।

কাদম্বরীর বিষয়বস্তু বৃহৎকথা থেকে নেওয়া। তবে তাহাতে বাণের নিজস্বতাও বেশ কিছু আছে। রচনার দিক দিয়া এক হিসাবে কাদম্বরীকে উৎকৃষ্টতর বলিতে পারি। বাণের বিশিষ্ট যে শ্লেষবিদ্ধ শব্দচিত্রাঙ্কণরীতি তাহা কাদম্বরীতে আদ্যন্ত প্রকাশিত। আবার অন্যদিকে কাদম্বরীর তুলনায় হর্ষচরিতের শ্রেষ্ঠতা। সে হইল রচনারীতির অপেক্ষাকৃত লঘুতা, এবং চিত্রপরম্পরার বাহুল্য না থাকায় বর্ণনার ক্ষিপ্রগতি।

সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে বাণের প্রগাঢ় অধিকার ছিল। তাহার চিত্রাবলীতে সে ক্ষমতার অকুণ্ঠিত পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে[১] সেদিকে আমাদের চোখ ফুটাইয়া গিয়াছেন।

দণ্ডীর 'দশকুমচারচরিত' লৌকিক গল্পের সংগ্রহের মতো। বইটির 'পূর্বপীঠিকা' ও নিতান্ত ক্ষুদ্র 'উত্তরপীঠিকা' পরবর্তীকালের সংযোজন। মূল গ্রন্থ আদ্যন্ত খণ্ডিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়ায় এই দুই অংশ মূল কাহিনীকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য বেশ কিছু কাল পরে রচিত হইয়া থাকিবে। গল্পগুলি অধিকাংশই পূর্বভারতের বলিয়া বোধ হয়। দণ্ডীর রচনারীতি বাণের তুলনায় অনেক সরল। বাণ দণ্ডীর উল্লেখ করেন নাই এবং বাণের রচনারীতি আরও জটিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে দণ্ডী বাণের পূর্বগামী ছিলেন। এ অনুমান হয়ত অসঙ্গত নয়।

দশকুমারচরিতে এক রাজপুত্র ও তাঁহার সহচরগণের এড্‌ভেঞ্চার-কাহিনী বর্ণিত আছে। এই কাহিনীগুলির কোন কোনটি বেশ পুরানো গল্পের অথবা জনশ্রুতির আধারে গঠিত এবং ইহাতে স্থানীয় অভিজ্ঞতার প্রতিফলন বিদ্যমান। উদাহরণরূপে মিত্রগুপ্তের "চরিত" (adventure) হইতে আরম্ভ অংশ অনুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি। মিত্রগুপ্ত ফিরিয়া আসিয়া বন্ধু রাজবাহনের কাছে নিজের গল্প বলিতেছে।

> আমিও অন্য বন্ধুদের মতো ভ্রমণেচ্ছু হইয়া সুহ্মদেশে[২] দামলিপ্ত[৩] নামক নগরের বাহির-উদ্যানে বিরাট উৎসব-সমাজের[৪] আয়োজন দেখিলাম। সেখানে এক মাধবীলতামণ্ডপে দেখিলাম যে এক উৎকণ্ঠিত যুবাপুরুষ বীণা বাজাইয়া আপনার মন ভুলাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভদ্র, কী এ উৎসব? কি করা হইতেছে? কি নিমিত্তই বা উৎসবের পাশ কাটাইয়া আপনি যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া বীণাটিকে লইয়া নির্জনে রহিয়াছেন?'
>
> সে বলিল, 'সৌম্য, দেবী বিন্ধ্যবাসিনী, যিনি বিন্ধ্যবাসের সুখ বিস্মৃত হইয়া এই দেবালয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহার পাদমূলে সন্তানহীন সুহ্মপতি তুঙ্গধন্বা দুইটি সন্তান

১। 'কাদম্বরী-চিত্র', প্রাচীন-সাহিত্যে সঙ্কলিত।

২। অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলে।

৩। অর্থাৎ তাম্রলিপ্তিতে।

৪। উৎসব-সমাজ—মেলা, যেখানে সব লোকে আসে এবং নৃত্যগীত ও খাওয়া দাওয়া করে।

প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ধরনা-দেওয়া ইঁহাকে[১] তিনি[২] স্বপ্নে সমাদেশ দিয়াছিলেন, "উৎপন্ন হইবে তোমার একটি পুত্র, জন্মিবে তোমার একটি দুহিতা। সে[৩] কিন্তু উহার[৪] পাণিগ্রাহকের[৫] অধীনে বাস করিবে। তবে সে (কন্যা) সাড়ে সাত বছর হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ না হওয়া অবধি প্রতিমাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে কন্দুকনৃত্যের[৬] দ্বারা যেন আমার আরাধনা করে, গুণবান্ ভর্তা লাভের জন্য। যাহাকে সে অভিলাষ করিবে তাহার হাতেই উহাকে দিতে হইবে। সে উৎসবের নাম কন্দুক-উৎসব হোক।[৭] তাহার পর অল্পকাল পরে রাজার প্রিয় মহিষী, নাম মেদিনী, এক পুত্র প্রসব কবিল। একটি কন্যাও হইল। সেই কন্যা, কন্দুকাবতী নাম, (আজ) সোমাপীড়া[৮] দেবীকে কন্দুকক্রীড়ার দ্বারা আরাধনা করিতে আগমন করিবে। তাহার সখী, চন্দ্রসেনা নাম, ধাত্রীকন্যা, আমার প্রিয়া ছিল। সে এই কিছুদিন রাজপুত্র ভীমধন্বা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছে।[৯] তাই আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া .... মনকে কোন রকমে আশ্বাস দিয়া নির্জনে বসিয়া আছি।'

চিত্রগুপ্ত-চরিতের অন্তর্গত গোমিনীর গল্প সংক্ষিপ্ত করিয়া অনুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি। মধ্য বাংলা সাহিত্যের মনসামঙ্গলে চাঁদোর পুত্রবধূ-সন্ধানের সঙ্গে কিছু মিল লক্ষ্য হয়।

দ্রাবিড়দেশে কাঞ্চী নামে নগর আছে। সেখানে অনেক কোটি অর্থবান্ শ্রেষ্ঠিপুত্র ছিল, নাম শক্তিকুমার। আঠারো বছর বয়স হইলে পর সে ভাবিল, যাহারা বিবাহ করে নাই এবং যাহাদের পত্নী মনের মতো নয় তাহাদের সুখ নাই। অতএব কিসে গুণবান্ পত্নী লাভ করি।'

এই ভাবিয়া সে ঘটক সাজিয়া গামছায় সেরখানেক ধান বাঁধিয়া লইয়া উপযুক্ত কন্যার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। সুলক্ষণযুক্ত স্বজাতীয় কন্যা দেখিলে সে বলে, 'এই এক সের ধানে আমাকে যথোচিত ভোজন করাইতে পারিবে কী?' শুনিয়া সকলেই উপহাস করিয়া তাহাকে বিদায় দেয়।

একদা শিবিদেশে কাবেরীর তীরে এক পত্তনে পিতা মাতা ও গৃহ মাত্র আছে এমন বিগতধন, বিরলভূষণ এক কুমারী কন্যাকে পাত্রী আনিয়া তাহাকে দেখানো হইল। সমস্ত সুলক্ষণ দেখিযা তাহাকে শক্তিকুমার এক সের ধান দেখাইয়া সেই প্রশ্ন করিল। কুমারী রাজি হইল। সে সেই এক সের ধান ভানিয়া খুদ কুঁড়া ইত্যাদি দিয়া হাঁড়ি কুঁড়ি কাঠ কিনিল, চালের অর্ধেক দিয়া আনাজ মশলা ইত্যাদি কিনিল, শক্তিকুমারকে পুরা ভোজ খাওয়াইল। শক্তিকুমার পরমানন্দে কন্যাটির পাণিগ্রহণ করিল।

১। অর্থাৎ রাজাকে।
২। অর্থাৎ দেবী।
৩। অর্থাৎ পুত্র।
৪। অর্থাৎ দুহিতার।
৫। অর্থাৎ ভগিনীপতির।
৬। অর্থাৎ গোলা লুফিতে লুফিতে নাচ।
৭। ইহাই কি 'কেঁন্দুলী' কথাটির মূল?
৮। অর্থাৎ যাহার মুকুটে চন্দ্র আছে, চন্দ্রশেখরা।
৯। অর্থাৎ রাজপুত্র তাহাকে পাইবার জন্য জবরদস্তি করিয়াছে, তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

নীতি-গল্প

বৌদ্ধ সাহিত্যে পশুপক্ষীর ও ভূতমানুষের নীতি-কথা ও উদাত্ত কাহিনীর বিষয়ে বলিযাছি। সেসব কাহিনীর নায়ক—অর্থাৎ মহৎচরিত্র—বুদ্ধের জন্মজন্মান্তর বলিয়া ব্যাখ্যাত, তাই পালি সাহিত্যে সে কাহিনীর নাম 'জাতক।'

জৈন সাহিত্যেও উদাত্ত কাহিনী আছে সেখানে পশুপক্ষীর ভূমিকা নাই, সবই মানুষেব, কিছু কিছু দেবতার। পশুপক্ষী লইয়া নীতি কথা ও বিবিধ গল্প সংস্কৃত সাহিত্যেও গদ্যে ও পদ্যে প্রচলিত ছিল। শুধু পদ্যে এমন কিছু কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত আকারে মহাভারতে সন্নিবিষ্ট আছে। পরম্পরাগত এমন গল্প শ্লোক মহাভারতে "অনুবংশ"[১] বলা হইয়াছে। যেমন নিম্নে উদ্ধৃত ভূতের গল্পটি।[২]

একদা যুধিষ্ঠির ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কুরুক্ষেত্রের দ্বারদেশে "প্লক্ষ" নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে ছিল লোমশ ঋষি। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, একরাত্রির বেশি এখানে থাকা উচিত হইবে না। লোমশের উক্তিতেই কাহিনীর আভাসটুকু পাওয়া যায়।

অত্রানুবংশং পঠতঃ শৃণু মে কুরুনন্দন।
উলূখলৈরাভরণৈঃ পিশাচী যদভাষত।।
যুগন্ধরে দধি[৩] প্রাশ্য উষিত্বা চাচ্যুতস্থলে।
তদ্বদ্‌ভূতলয়ে[৪] স্নাত্বা সপুত্রা বস্তুমর্হসি।
একরাত্রমুষিত্বেহ দ্বিতীয়ং যদি বৎস্যসি।
এতদ্‌বৈ তে দিবা বৃত্তং রাত্রৌ বৃত্তমতোঽন্যথা।।
অদ্য চাত্র নিবৎস্যামঃ ক্ষপাং ভরতসত্তম।
দ্বারমেতং তু কৌন্তেয় কুরুক্ষেত্রস্য ভারত।।

'হে কুরুপুত্র, আমি শোনা কথা বলিতেছি, শোন। তা উদূখল-আভরণ-ধারিণী পিশাচী (এক ব্রাহ্মণকে) বলিয়াছিল।।

'যুগন্ধরে দধি খাইয়া অচ্যুতস্থলে বাস করিয়া সেইরূপ ভূতলয়ে স্নান করিয়া পুত্রকে লইয়া (তুমি অল্পকাল) বাস করিতে পার।।

"একরাত্রি বাস করিয়া যদি দ্বিতীয় (রাত্রি) বাস করিতে চাও, (তবে) এই যে তোমার দিনের কাণ্ড হইল, রাত্রিতে ইহা হইতে অন্যরকম হইবে।।"

'হে ভারতশ্রেষ্ঠ, আমরা আজ রাত্রি এখানেই থাকিব। হে কুন্তীপুত্র ভরতবংশীয়, এই স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বারদেশ।।'

খ্রীষ্টপর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে মানুষ ও জন্তু ঘটিত কতকগুলি কাহিনী লইয়া একটি শিক্ষাপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই মূল গ্রন্থ এখন লুপ্ত। তবে ইহার একাধিক সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। সংস্করণগুলি 'তন্ত্রাখ্যান', 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' অথবা 'পঞ্চতন্ত্র' নামে খ্যাত।

১। অর্থাৎ traditional verse
২। বনপর্ব ১২৯, ৮-১১।
৩। টীকাকারের মতে যুগন্ধরের লোকেরা উটের দুধের দই খাইত।
৪। পাঠান্তরে "ভূতিলয়ে"। সম্ভবত কুৎসিত বাহীকদেশের অঞ্চল ও নদী। ভূতলয় নদীতে তাহারা মৃতদেহ জলসংকার করিত।

পঞ্চতন্ত্রের আসল নাম ছিল 'পঞ্চতন্ত্রাখ্যায়িকা' (অর্থাৎ তাঁতে-বোনার মতো ওতপ্রোত গল্পময় পাঁচটি আখ্যায়িকা)। 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'হিতোপদেশ' আমাদের সুপরিচিত।[১] পঞ্চতন্ত্রে বড় গল্পের মধ্যে একটু ছোট গল্প তাহার মধ্যে আরো একটু ছোট গল্প—এইভাবে পর পর গল্পের তাঁত-বোনার বা কৌটা সাজানোর যে কৌশল আছে তাহা পরবর্তীকালে অন্যত্র অনুকৃত হইয়াছে। আরব্য-উপন্যাসে গল্প-গাঁথার কৌশলও এই রকম।

তন্ত্রাখ্যানের গল্পগুলি ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম বস্তু যাহা সর্বাগ্রে বিশ্বসাহিত্যে পরিগৃহীত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্রের এক "সংস্করণ" মধ্য-পারসীক পহ্লবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। পঞ্চতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট গল্পের দুই ধূর্ত শৃগাল-নায়কের নামে এই পহ্লবী অনুবাদ নাম পাইয়াছিল—কবটক ও দমনক ('কলিলা ব দিম্‌না')। অবিলম্বে পহ্লবী অনুবাদ হইতে সীরীয় ভাষায় অনুবাদ হয় এবং তাহা হইতে আরবীতে অনুবাদ হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেই আরবী অনুবাদ অবলম্বনে প্রাচীন স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল। ইয়োরোপীয় ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের ইহাই প্রথম অনুবাদ।

প্রশস্তি-নিবন্ধ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সংস্কৃতে সাহিত্যিক গদ্য রচনার প্রচলন রাজ-অনুশাসন হইতে। রাজ-অনুশাসনের গোড়ার দিকে রাজার নাম ও অল্প কথায় পরিচয় থাকিত। ক্রমশ সেই পরিচয়-ভাগ বাড়িতে থাকে এবং গুপ্ত রাজাদের সময়ে রাজ-অনুশাসনে শ্লোক-অংশ সাহিত্যগুণান্বিত হইতে থাকে।

গদ্যে পদ্যে লেখা রাজ-প্রশস্তি কাব্য যাহা পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে প্রথম এবং উৎকৃষ্ট হইল এলাহাবাদ দুর্গ মধ্যে অশোক-স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের (চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ) প্রশস্তি। প্রশস্তির রচয়িতা কবি হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের মহামন্ত্রী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। প্রশস্তিটির গদ্য ও পদ্য দুই অংশই ভালো। পদ্যের একটু নমুনা দিই।

রাজা চন্দ্রগুপ্তের একাধিক পুত্র ছিল। তাহার মধ্যে গুণাধিক বলিয়া তিনি সমুদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রশস্তির এই শ্লোকে বর্ণিত

আর্যো হীত্যুপগুহ্য ভাবপিশুনৈরুৎকর্ণিতৈ রোমভিঃ
সভ্যেযুচ্ছ্বসিতেষু তুল্যকুলজগ্লানাননোদ্‌বীক্ষিতঃ।
স্নেহব্যালুলিতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বেক্ষণা চক্ষুষা
যঃ পিত্রাভিহিতো নিরীক্ষ্য নিখিলাং [পাহ্যেবমুর্বীম্‌] ইতি।।

'পিতা স্নেহব্যাকুল জলভরা মর্মখোঁজা চোখে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবভরে পুলকিত অঙ্গে, যাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, "নিখিলভূমিকে এমনি পালন কর।" সভাসদেরা উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল. তুল্যবংশীয়েরা মুখ চুন করিয়া (তাহার দিকে চাহিয়া ছিল)।।'

১। পঞ্চতন্ত্রে পাঁচটি গল্পমালা আছে। প্রত্যেক মালার একটি করিয়া নাম আছে,—ভেদ, সন্ধি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক। হিতোপদেশে শেষ মালাটি ("অপরীক্ষিতকারক") বাদ গিয়াছে।

প্রশস্তির আকারে গদ্যবর্জিত প্রায় বিশুদ্ধ কাব্যও লেখা হইয়াছিল। এমন রচনার মধ্যে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রাদেশিক মালব-রাজ বন্ধুবর্মার শাসনকালে দশপুরে একটি সূর্যমন্দির নির্মাণের ও সংস্কারের বিবরণ বিজড়িত উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপিটি বিশিষ্ট। রচয়িতা বৎসভট্টি। কালিদাসের কবিতা ইঁহার ভালো করিয়া পড়া ছিল। দশপুরের বর্ণনায় কালিদাসের অনুসরণ সুস্পষ্ট। অন্যত্রও রচনার ছাঁদে কালিদাসের প্রভাব আছে। প্রশস্তি-কাব্যটিতে সর্বসমেত ৪৪ শ্লোক, নানা ছন্দে লেখা। সে সব ছন্দের মধ্যে দণ্ডকও আছে। যেমন

স্মরবশগতরুণজনবল্লভাঙ্গনাবিপুলকান্তপীনোরুস্তন-
জঘনঘনালিঙ্গননির্ভৎসিততুহিনহিমপাতে।।

প্রথম তিন শ্লোকে মন্দিরের দেবতা সূর্যের বন্দনা। তাহার পর দশ শ্লোকে দশপুর-প্রশংসা।

তটোত্থবৃক্ষচ্যুতনৈকপুষ্পবিচিত্রতীরান্তজলানি ভান্তি।
প্রফুল্লপদ্মাভরণানি যত্র সরাংসি কারণ্ডবসংকুলানি।।

'সেখানে সরোবরসমুহের কী শোভা। তটস্থবৃক্ষ হইতে অনেক ফুল জলের কিনারা বিচিত্রিত করে। (জলের মধ্যে) পদ্ম ফুটিয়া আছে, কলহংস প্রচুর।।'

মন্দিরের নির্মাণে ও সংস্কারে অর্থ এবং সামর্থ্য যোগাইয়াছিল বিভিন্ন "শ্রেণী" অর্থাৎ শিল্পসংঘ। একটি শ্লোকে (১৯) তাহাদের প্রশংসা। শ্রেণীর মধ্যে মুখ্য ছিল রেশম-শিল্পীরা। পরবর্তী দুই তিনটি শ্লোকে তাহাদের শিল্পকর্মের প্রশংসা, যেন আধুনিক কালের বিজ্ঞাপন।

তারুণ্যকান্ত্যুপচিতো-পি সুবর্ণহার-
তাম্বুলপুষ্পবিধিনা সমলঙ্কৃতো-পি।
নারীজনঃ প্রিয়মুপৈতি ন তাবদগ্র্যাং
যাবন্ন পট্টময়বস্ত্রযুগানি ধত্তে।।

'(দশপুরের) মেয়েরা তারুণ্যে ও লাবণ্যে মণ্ডিত, তাহারা সোনার হার পরে আর ফুলে ও পানে বিলাসসজ্জা করে। তবুও তাহারা নির্জনে প্রিয়তমের কাছে যায় না, যতক্ষণ না পাটের শাড়ি ও ওড়না পরে।।'

একটি শ্লোকে (২৩) অধিরাজ কুমারগুপ্তের প্রশংসা।

চতুস্সমুদ্রান্তবিলোলমেখলাং
সুমেরুকৈলাসবৃহৎপয়োধরাম্।
বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীং
কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি।।

'চারদিকে সমুদ্র যাহার বিলোল মেখলা, সুমেরু ও কৈলাস যাহার বৃহৎ পয়োধর, বনান্তে বায়ুভরে ফুলে যাহার হাসি ফুটিয়া উঠে সেই পৃথিবীকে যখন কুমারগুপ্ত শাসন করিতেছিলেন।"

তারপর দুই শ্লোকে বন্ধুবর্মার পিতা, কুমারগুপ্তের প্রাদেশিক, মালব-রাজ বিশ্ববর্মার প্রশংসা। তারপর তিন শ্লোকে বন্ধুবর্মার প্রশংসা। সেই বন্ধুবর্মার রাজ্যকালে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা (৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) এবং সংস্কার (৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) হইয়াছিল।

তস্মিন্নেব ক্ষিতিপতিবৃষে বন্ধুবর্মণ্যুদারে
সম্যক্ স্ফীতং দশপুরমিদং পালয়ত্যুন্নতাংসে।
শিল্পাবাপ্তৈর্ধনসমুদয়ৈঃ পট্টবায়ৈরুদারং
শ্রেণী — — — ভবনমতুলং কারিতং দীপ্তরশ্মেঃ।।

"সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ উদার বৃষস্কন্ধ বন্ধুবর্মা যখন এই পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ দশপুর পালন করিতেছিলেন তখন পট্টবায়েরা[১] শিল্পকার্যে উপার্জিত সমুদয় ধনের ধারা ... সূর্যের এই উদার অতুল ভবন করাইলেন।।"

তারপর এক শ্লোকে (৩০) মন্দির-বর্ণনা এবং পাঁচ শ্লোকে ঋতু-বর্ণনা পূর্বক মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ উল্লেখ। পরবর্তী শ্লোকে (৩১) মন্দিরের এক অংশ ভগ্ন হওয়ার কথা। তারপর ছয় শ্লোকে মন্দির সংস্কারের তারিখ নির্দেশ এবং ঋতুবর্ণনা। সংস্কার সমাধা হইয়াছিল বসন্তকালে। সে কালের বর্ণনা (৪০-৪১)

স্পষ্টৈরশোকতরুকেতকসিন্ধুবার-
লোলাতিমুক্তকলতামদয়ন্তিকানাং।
পুষ্পোদ্গমৈরভিনবৈরধিগম্য ন্যূনং
ঐক্যং বিজৃম্ভিতশরে হরপূতদেহে।।
মধুপানমুদিতমধুকরকুলোপগীতনগনৈকপৃথুশাখে।
কালে নবকুসুমোদ্গমদন্তুরকান্তপ্রচুরলোধ্রে।।

'অশোকতরু, কেতকী, সিন্ধুবার, লোল মাধবী, মল্লিকা (প্রভৃতি) ফুলের সুস্পষ্ট আবির্ভাবে সত্য সত্যই যেন পবিত্র হরদেহে আক্রমণোদ্যত পঞ্চবাণ একত্রিত হইয়াছে (যে কালে)।।
মধুপানে আনন্দিত মৌমাছিদের গুঞ্জনে মুখর অসংখ্য পরিপুষ্ট তরুশাখা, আর নবকুসুমোদ্গমে কণ্টকিত মনোহর লোধ্র প্রচুর (ফুটিয়াছে) যে কালে।।'

তারপর এক শ্লোকে (৪২) মন্দিরের স্থায়িত্ব কামনা।

অমলিনশশিলেখাদন্তুরং পিঙ্গলানাং
পরিবহিত সমূহং যাবদীশো জটানাং।
বিকচকমলমালামংসসক্তাং চ শার্ঙ্গী
ভবনমিদমুদারং শাশ্বতং তাবদস্তু।।

'যতদিন শিব অমলিন চন্দ্রকরবিচিত্রিত পিঙ্গল জটাভার এবং বিষ্ণু স্কন্ধলগ্ন প্রস্ফুট পদ্মমালা বহন করিবেন ততদিন এই উদার ভবন চিরস্থায়ী হোক।।'

শেষ শ্লোক

শ্রেণ্যাদেশেন ভক্ত্যা চ কারিতং ভবনং রবেঃ।
পূর্ব চেয়ং প্রযত্নেন রচিতা বৎসভট্টিনা।।
স্বস্তি কর্তৃলেখকবাচকশ্রোতৃভ্যঃ।। সিদ্ধিরস্তু।।

'শ্রেণীর আদেশে ও ভক্তিবশে রবির (এই) ভবন নির্মিত হইল। পূর্ববর্তী এবং এই (প্রশস্তি) সযত্নে বৎসভট্টির দ্বারা রচিত হইল। (মন্দির-) নির্মাণকারক (প্রশস্তি-) লেখক (প্রশস্তি-) পাঠক ও (প্রশস্তি-) শ্রোতাদের মঙ্গল হোক। সিদ্ধি হোক।।"

বাংলা দেশে পাল রাজাদের সময় থেকে সেন রাজাদের সময় পর্যন্ত (নবম-দ্বাদশ শতাব্দী) যে সব প্রত্নলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশেই রাজশাসনের লক্ষণের অপেক্ষা প্রশস্তি-কাব্যের লক্ষণই প্রকটতর। দুই চারিটি তো সম্পূর্ণই প্রশস্তি-কাব্য। যেমন "ভট্ট" গুরব-মিশ্রের গরুড়-স্তম্ভ (দশম শতাব্দী) প্রশস্তি এবং কবি বাচস্পতি বিরচিত "ভট্ট" ভবদেব (একাদশ শতাব্দী) প্রশস্তি।

[১] পট্টবায় যাঁহারা পট্ট-বস্ত্র বয়ন করেন। "তন্তুবায়" তুলনীয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রশস্তি-রচয়িতা কবিদের মধ্যে উমাপতিধরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি সেন-রাজাদের তিন পুরুষের একটানা মহামন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। সেন-বংশের উত্থান ও পতন ইঁহার চোখের সামনেই যেন ঘটিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের কবিদের মধ্যে উমাপতিধরের নাম আরও এক কারণে স্মরণীয়। ইনি বহু বিষয়ে বহুবিধ প্রকীর্ণ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি 'সদুক্তিকর্ণামৃত' বইটিতে উদ্ধৃত আছে।[১] দেওপাড়ায় প্রাপ্ত বল্লালসেনের প্রশস্তি-কাব্যটি উমাপতিধরের একমাত্র বড় রচনা যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই প্রশস্তি হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

মুক্তাং কার্পাসবীজৈর্মরকতশকলং শাকপত্রৈর্ অলাবু-
পুষ্পৈ রূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাম্।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকশিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাদ্ বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়ানাম্।।

'কার্পাস বীজের সঙ্গে মুক্তা, শাকপাতার সঙ্গে মরকতখণ্ড, লাউফুলের সঙ্গে রূপা, পাকিয়া ফাটিয়া-পড়া ডালিমের সঙ্গে রত্ন,[২] কুমড়া ফুলের সঙ্গে সোনা,—(এই উপমায়) যাঁহার প্রসাদে বহুধনপ্রাপ্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মেয়েরা নগরবাসিনী-কর্তৃক (গয়নার ব্যাপারে) শিক্ষিত হয়।।'

কামরূপের ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনের গদ্য-অংশের গোড়ার দিকটা বাণের মতো পাকা লেখকের রচনা বলিয়া মনে হয়।[৩] বাণের পোষ্টা হর্ষবর্ধন ভাস্করবর্মার মিত্র ছিলেন। তিনি মিত্রের পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করিতে বাংলা দেশে আসিয়া কিছুকাল ছিলেন। সুতরাং ভাস্করবর্মার প্রশস্তিতে বাণের মুসাবিদা থাকা বিস্ময়ের বিষয় নয়।

কামরূপের বলবর্মার (দশম শতাব্দী) নওগাঁয় প্রাপ্ত অনুশাসনের রচনায় কালিদাসের অনুসরণ সুস্পষ্ট। যেমন

তাম্বুলবল্লীপবিণদ্ধপূগং
কৃষ্ণাগুরুস্কন্ধনিবেশি তৈলম্।
স কামরূপে জিতকামরূপো
প্রাগ্জ্যোতিষাখ্যং পুরমধ্যুবাস।।

'পানের লতা যেখানে সুপারি গাছে জড়াইয়া উঠে,
এলালতা যেখানে কৃষ্ণ-অগরু বৃক্ষের স্কন্ধ অবলম্বন করে,
(এমন) কামরূপে, রূপে যিনি কামদেবকে জয় করিয়াছেন
তিনি,[৪] সেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরে নিবাস করিয়াছিলেন।।'

প্রশস্তি-কবিতায় অতিশয়োক্তির সীমাপরিসীমা ছিল না, বিশেষ করিয়া পরবর্তীকালে। একটি উদাহরণ দিতেছি।

রাঢ়াবরেন্দ্রযবনীনয়নাঞ্জনাশ্রু-
পূরেণ দূরবিনিবেশিতকালিমশ্রীঃ।
তদ্বিপ্রলম্ভকরণাদ্ভুতনিস্তরঙ্গা
গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ।।

১। সদুক্তিকর্ণামৃতের প্রসঙ্গ পরে দ্রষ্টব্য।
২। অর্থাৎ পদ্মরাগ।
৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ (চতুর্থ সংস্করণ) পৃঃ ২৪-২৫ দ্রষ্টব্য।
৪। অর্থাৎ নরক-অসুর।

'রাঢ়-বরেন্দ্রের যবনীদের চোখের জলে (ধোওয়া)
কাজলের স্রোত বহুদূর অবধি কালিমার শোভা ছড়াইয়াছিল।
তাঁহার দ্বারা তাহাদের (পতি-) বিয়োগকরণের ফলে অদ্ভুতভাবে নিস্তরঙ্গ হইয়া
গঙ্গাও যে এখন যমুনা হইয়া গেল।।'[১]

কবির বক্তব্য হইতেছে যে তাঁহার রাজা দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্রচোল পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালায় মুসলমানদের যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে বহু শত্রুসৈন্য নিহত হইয়াছিল।

প্রকীর্ণ কবিতা

কালিদাসের পরে সংস্কৃত সাহিত্যের স্বাভাবিক ঝোঁক পড়িয়াছিল প্রকীর্ণ কবিতার দিকে। প্রকীর্ণ কবিতা বলিতে এক অথবা দুই তিনটি শ্লোকে আধৃত সম্পূর্ণ একটি রচনা। পণ্ডিতেরা গদ্যে যেমন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর সমাসের দিকে প্রয়াসী ছিলেন, পদ্যে তেমনি ''মহা''-কাব্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। যে ভাষা দিন দিন অবোধ্যতর হইতেছে এমন নিতান্ত কঠিন ভাষায় মহাকাব্যের মতো দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর রচনা ঠেলিয়া লইয়া যাইতে অতি বড় কবিরও লেখনী ভোঁতা হইয়া যায়। সুতরাং সাধারণ অর্থাৎ পাণ্ডিত্য-অপ্রয়াসী কবি জানপদ ভাষার রচনার অনুকরণেই ছোট ছোট কবিতা লিখিতে লাগিলেন। এমন কবিতা মোটামুটি ভালো রচনা। কবিতার বিষয় প্রধানত প্রেমকথা হইলেও অন্য বিষয় একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই। প্রেমের পরেই জনপ্রিয় বিষয় ছিল নীতি। তাহার পর ধর্ম—বৈরাগ্য ও ভক্তি। ইহার পরিণতি পরবর্তীকালে অজস্র স্তব, স্তোত্র, বন্দনা।

প্রকীর্ণ প্রেমের কবিতার প্রাচীনতম সংকলনটি 'অমরুশতক' নামে প্রসিদ্ধ। অমরু কে অথবা কী তাহা জানা নাই। কোন কবিতার ভণিতায় এ নাম নাই। কবিতাগুলি যে একলোকের লেখা তাহাও বলা যায় না। অমরুর নামে প্রচলিত কবিতাগুলি অষ্টম শতাব্দীতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নীতি-কবিতার সংকলনের মধ্যে প্রাচীন ও সবচেয়ে বিশিষ্ট হইতেছে ভর্তৃহরির 'নীতিশতক' ও 'বৈরাগ্যশতক'।

অমরুশতকের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। মানিনীর প্রতি সখীর ভর্ৎসনা।

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদস্
ত্বয়া কান্তে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাশ্লিষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্‌ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাংস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ।।

'প্রেমের পরিণতির আলোচনা না করিয়া, সখীদের কথা ঠেলিয়া, বোকা তুমি, কেন প্রিয়তমের প্রতি মান ধরিলে? বিরহদহনে জ্বলন্তশিখা এই অঙ্গাররাশি (তুমি তো) স্বহস্তে আলিঙ্গন করিয়াছ। অতএব বৃথা এখন অরণ্যে-রোদন।।'

প্রকীর্ণ কবিতাগুলি কয়েকটি সংকলন-গ্রন্থে সংগৃহীত আছে। তাহার মধ্যে প্রাচীনতার ও সাহিত্যমূল্যের দিক দিয়া দুইটি সর্বোত্তম,—'সুভাষিতরত্নকোশ' (প্রথমে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'

১। এখানেও কালিদাসের অনুসরণ।

নামে প্রকাশিত) ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। দুইটিই বাংলা দেশে সংকলিত এবং বাংলা দেশের ও পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কবিদের রচনাই এ দুইটি গ্রন্থে বেশি আছে। সুভাষিতরত্নকোশ ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সংকলিত। সংকলয়িতার নাম বিদ্যাকর। ইনি বৌদ্ধ ছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃত ইহার ঠিক একশ বছর পরে সংকলিত হয়। সদুক্তিকর্ণামৃতের সংকলয়িতা শ্রীধরদাস লক্ষ্মণসেনের এক মহামন্ত্রীর পুত্র ছিলেন।

সংকলনগ্রন্থগুলিতে কবিতা-শ্লোকগুলি নির্দিষ্ট রীতিতে সাজানো। সে রীতি হইল—দেবদেবীর বন্দনা, সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি দেবস্থানীয় জ্যোতিষ্কের বন্দনা, সমুদ্র পর্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক মহৎ দৃশ্যের বর্ণনা, ঋতু বর্ণনা, শীতল বায়ুর বর্ণনা, কবি ও কাব্য প্রশস্তি, রাজ-প্রশস্তি, নায়িকার বিবিধ রূপের ও অবস্থার বর্ণনা (—বয়ঃসন্ধিস্থা, যৌবনারূঢ়া, অভিসারিকা, মানিনী, বিরহিণী ইত্যাদি—), প্রেমসুখের বর্ণনা, বিরহদশার বর্ণনা, সতী ও অসতী নারীর বর্ণনা, বৈরাগ্য বর্ণনা, রৌদ্রহাস্য ইত্যাদি রসের বর্ণনা, ইত্যাদি। বাঁধাধরা বিষয়ে সংস্কৃত কবিতায় গতানুগতিকতা প্রত্যাশিত, এবং সে গতানুগতিকতা প্রায়ই বিরক্তিকর। কিন্তু প্রীতিকর নূতনত্বও আছে। সে হইল নির্দিষ্ট দেশকালের দিগন্তে ক্ষণিক উদ্‌ভাসিত ছোটখাট চিত্রগুলি। এ বস্তু ইতিপূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে শুধু কালিদাসের রচনাতেই আভাসিত, অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। জীবন-আদর্শের নয়, সমাজসংসার-প্রবাহের এই খণ্ডচিত্রগুলি ভারতীয় সভা-সাহিত্যে নূতন কাব্যবস্তুর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মূল্যবোধের আবির্ভাব সূচনা করিতেছে।

আনুমানিক ৭০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত প্রকীর্ণ কবিতার বৈচিত্র্যের পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে বোঝা যাইবে।

বর্ষাকাল। ধানের ক্ষেত জলে থইথই করিতেছে। আলের ধারে ছোট ছোট ছেলেরা মাছ ধরিতেছে। অজ্ঞাত কবির রচনা।

> কেদারে নববারিপূর্ণজঠরে কিংচিৎক্বণদ্দর্দুরে
> শম্বুকাণ্ডকপিণ্ডপাণ্ডুরতটপ্রান্তস্থলীবীরণে।
> ডিম্বা দণ্ডকপাণয়ঃ প্রতিদিশং পঙ্কচ্ছটাচর্চিতাশ্‌
> চুভ্রাশ্চুভ্রারিতি[১] ভ্রমন্তি রভসাদুদ্‌যায়িমৎস্যোৎসুকাঃ।।

> 'আলবাঁধা ক্ষেত নূতন জলে পরিপূর্ণ। মন্দস্বরে ব্যাঙ ডাকিতেছে।
> শামুকের ডিমের ছড়াছড়িতে মাঠ-প্রান্তের বেনা-ঝাড়গুলি শাদা।
> ছেলেরা সর্বত্র ছড়ি হাতে করিয়া কাদার ছিটায় লিপ্ত হইয়া উজানগামী
> মাছের লোভে চবর্‌চবর্‌[১] শব্দ করিয়া ঘুরিতেছে।।'

এই বর্ণনার সঙ্গে একটু মিলিতেছে অন্তত পাঁচ-ছয় শ বছরের পরবর্তীকালের এক বাংলা কবির উক্তি।

> তথায় ছাওয়াল পাঁচে খোলা দিয়া জল সেঁচে
> মৎস্য ধরে পঙ্কেতে ভূষিত।[২]

ঐহিক ও পারমার্থিক—জীবনের দুই চরম সুখের আদর্শ সমতুল করিয়া দেখাইয়াছেন কবি উৎপলরাজ একটি কবিতায়।

১। এঁটেল মাটিতে জল হইলে যে কাদা হয় তাহাতে পা ফেলিয়া চলিতে গেলে এইরূপ "চবর্‌ চবর্‌" শব্দ হয়।

২। (মনসামঙ্গল কবি) ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের আত্মপরিচয়।

অগ্রে গীতং সরসকবয়ঃ পার্শ্বতো দাক্ষিণাত্যাঃ
পৃষ্ঠে লীলাবলয়রণিতঃ চামরগ্রাহিণীনাম্।
যদ্যেতৎ স্যাৎ কুরু ভবরসাস্বাদনে লম্পটত্বং
নো চেচ্চেতঃ প্রবিশ সহসা নির্বিকল্পে সমাধৌ[১]।।

'সম্মুখে গানের আসর। দুই পাশে দাক্ষিণাত্যের সরস কবি। পিছনে চামরধারিণীদের লীলাচ্ছলে বলয় শিঞ্জন। যদি এমন হয় তবে সংসারের রস-আস্বাদনে লম্পটগিরি কর। নহিলে, হে (মোর) চিত্ত, কঠিন হইয়া নির্বিকল্প (অর্থাৎ ব্রহ্ম) সমাধিতে প্রবেশ কর।।'

জীবনের ব্যর্থতা ও অদৃষ্টের বঞ্চনা কবি মহাব্রতের একটি শ্লোকে বর্ণিত আছে।

মজ্জন্মাপি হি নিষ্ফলং শ্রুতমপি ব্যর্থং গুণাঃ কিং কৃতে
হা ধিক্ কষ্টমনর্থকং গতমিদং নিঃশেষমস্মদ্বয়ঃ।
মার্গঃ কোঽপি নিরত্যয়ং ন বহতি ব্যাঘাতবদ্ধগ্রহো
ধর্মার্থাদিচতুষ্পথে নিবসতি ক্রূরো বিধির্গৌল্মিকঃ।।

'আমার জন্মই নিষ্ফল। পড়াশোনাও বৃথা। কিসের গুণাবলী। হা ধিক্!
কষ্টের কথা, আমার এই বয়স শুধু শুধুই কাটিয়া গেল!
নিরাপদ কোন পথই নাই, গ্রহব্যাঘাত লাগিয়াই আছে।
ধর্ম অর্থ প্রভৃতির[২] চৌমাথায় নিষ্ঠুর দৈব পেয়াদা (রূপে খাড়া।।')

ধর্মের (অর্থাৎ বৃষোৎসর্গের) ষাঁড়কে সেকালে মুসলমানেরা ভারবহন কাজে লাগাইত। সেই দুঃখে কবি সাজোক এই শ্লোকটি লিখিয়াছিলেন

পূতঃ শ্রৌতপরিক্রিয়াভিরবহীভাবায় যো দীক্ষিতঃ
শ্লাঘ্যা যস্য গয়াশিরঃসহচরী তুল্যোঽশ্বমেধেন যঃ।
নাসাবেধনতশ্চিরেণ কলিতশ্চক্রত্রিশূলাঙ্কিতো
ধিক্ কর্মাণি তুরস্কবেশ্মনি সুরাকাণ্ডালবাহী বৃষঃ।।

'বেদবিধিমতে যে পবিত্র, ভারবহন কার্য না করিবার জন্য যে দীক্ষিত,
গয়াপর্বতে যাহার সহচরী গৌরবান্বিত,[৩] যে অশ্বমেধের তুল্য,
নাকবেঁধানোর পর যে চক্র ও ত্রিশূল চিহ্নে অঙ্কিত,
সেই বৃষ, হায় কর্মফল, তুরুকের পাড়ায় মদের পিপা বহিতেছে!'

বিনয়ী রাজকবির উৎসর্গ-বাণীর ভালো নমুনা বীর্যমিত্রের এই কবিতাটি

প্রভুরসি বয়ং মালাকারব্রতব্যবসায়িনো
বচনকুসুমং তেনাস্মাভিস্তবাদরঢৌকিতম্।
যদি তদগুণং কণ্ঠে মা ধাস্তথোরসি মা কৃথা
নর্মমিতি কিয়ৎ কর্ণে ধেহি ক্ষণং ফলতু শ্রমঃ।

'তুমি তো প্রভু। মালাকার কর্ম আমাদের ব্যবসায়।
তাই বচনকুসুম (গাঁথিয়া) তোমাকে সাদর উপহার দিলাম!

১। পাঠান্তরে "প্রবিশ পরমব্রহ্মণি প্রার্থনৈষা"।
২। অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুষ্পথের মোড়ের মাথায়।
৩। গয়া অঞ্চলে গোরু বিখ্যাত ছিল।

সে গুণ[1] যদি কণ্ঠে না ধর অথবা বুকেও না রাখ,[2] তবে
নূতন বলিয়াও একবার কানে দাও[3]। শ্রম সফল হোক।।'

সহৃদয় শ্রোতা-পাঠকের অভাব কবিদের চিরকালের খেদ। বল্লণ একটি কবিতায় তাহা সুন্দরভাবে ব্যক্তি করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভির্দ্রবিণব্যয়ব্যতিকরক্লেশাদবজ্ঞায়সে
দ্বেষান্তঃপরিপূর্ণকর্ণকুহরৈর্নাকর্ণ্যাসে সুবিভিঃ।
ইত্থং ব্যর্থিতবাঞ্ছিতেষু হি মুধেবাস্মাসু কিং খিদ্যসে
মাতঃ কাব্যসুধে কথং ক্ব ভবতীমুন্মুদ্রয়ামো বয়ম্।।

ধনীরা অর্থ ব্যয় করিতে হইবে ভাবিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করে। বিদ্বেষের বিষে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ, তাই পণ্ডিতেরা (তোমাকে) শোনে না। এইভাবে ব্যর্থ বাসনায় বঞ্চিত হইয়া বৃথা আমাদের (অন্তরে) দুঃখ পাও। ওগো মাতা কাব্যসুধা, কেমনে কোথায় আমরা তোমার মোহর[4] ঘুচাই!'

মহৎ লেখকের প্রশংসা উপলক্ষ্যে সাধারণ লেখক— যাহারা মহৎ কবির রচনা আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদের যশ অপহরণ করে—তাহাদের কবি জলচন্দ্র ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

ধন্যাস্তে ভুবনে পুনন্তি কবয়ো যেষামজস্রং গবাম্
উদ্দামধ্বনিপল্লবেন পরিতঃ পূতা দিশাং ভিত্তয়ঃ।
ধিক্ তান্ নিঃস্ববিলাসিনঃ কবিখলাল্লোকদ্বয়দ্রোহিণো
নিত্যাকম্পিতচেতসঃ পরগবীদোহেন জীবন্তি যে।।

'ভুবনে সেই কবিরাই ধন্য যাঁহাদের অজস্র বাণীর[5]
উদ্দাম ধ্বনির প্রস্তাবে সবদিক দিগন্তের মূল অবধি পবিত্র।
ধিক্ সেই পরস্ববিলাসী কবি-চোরদের, উভয়লোকদ্রোহী
যাহারা, ভীতচিত্ত, সর্বদা পরের গোরু[6] দুহিয়া বাঁচিয়া থাকে।।'

কবি কর্তৃক সমসাময়িক কবির প্রশংসা সব দেশেই দুর্লভ। বিশেষ করিয়া প্রাচীনকালে তা অজ্ঞাতই ছিল। কবি অভিনন্দের একটি শ্লোকে তাহার ব্যতিক্রম।

সৌজন্যাঙ্কুরকন্দ সুন্দরকথাসর্বস্ব সীমান্তিনী-
চিত্তাকর্ষণমন্ত্র মন্মথসুহৃৎকল্লোল বাগ্‌বল্লভঃ
সৌভাগ্যৈকনিবেশ পেশলগিরামাধার ধৈর্যাম্বুধে
ধর্মাদ্রিদ্রুম রাজশেখরকবে দৃষ্টোহসি যামো বয়ম্।।

'সৌজন্য অঙ্কুরের কন্দ বিচক্ষণ কথাকোবিদ,
নারী-চিত্তাকর্ষণের মন্ত্র, কামদেবের সখা, বাণী-তরঙ্গিণীর বল্লভ,
সৌভাগ্যের একমাত্র নিধান, রুচির রচনার আধার, ধৈর্যে সমুদ্রতুল্য,
ধর্মপর্বত চূড়া, হে কবি রাজশেখর, দেখা হইল। আমরা যাই।।'

১। শ্লিষ্ট অর্থ — (১) মালা, (২) কাব্যমূল্য
২। মালা দুই রকমের — ছোট অর্থাৎ কণ্ঠী, বড় অর্থাৎ ঝোলানো।
৩। খুব ছোট মালা সেকালে কানে পরিত। অর্থাৎ, একটিবার শোন।
৪। সুধাকলস, কবির বাণী, যেন তাঁহার অন্তরে শীলমোহর দিয়া আঁটা।
৫। এখানে ''বাণী'' অর্থ ধ্বনিত। প্রথম চরণ দ্রষ্টব্য।
৬। মূলে 'গো' শব্দ আছে যাহার প্রধান অর্থ ''গাভী'' এখানে ধ্বনিত। চতুর্থ চরণ দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের মধ্যে ধোয়ীর খ্যাতি সবচেয়ে বেশি ছিল। ইঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কবি-রাজচক্রবর্তীরূপে অভিষেক করা হইয়াছিল। সে অভিষেকের একটু বর্ণনা ধোয়ী তাঁহার 'পবনদূত' কাব্যে দিয়াছেন। সে শ্লোকটি সদুক্তিকর্ণামৃতেও উদ্ধৃত আছে। এখনকার রাষ্ট্রীয় সাহিত্যপুরস্কারের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য উদ্ধৃত করিতেছি

দন্তিব্যূহং কনককলিতং চামরে হেমদণ্ডে
যো গৌড়েন্দ্রদরভ কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্তী।
খ্যাতো যশ্চ শ্রুতিধরতয়া বিক্রমাদিত্যগোষ্ঠী-
বিদ্যাভর্তুঃ খলু বররুচেরাসসাদ প্রতিষ্ঠাম্।।

'সোনার সাজপরা হস্তিসমূহ ও সোনার দণ্ডযুক্ত দুই চামর, কবিরাজাদের সম্রাট যিনি, গৌড়েশ্বরের কাছে পাইয়াছিলেন, যিনি শ্রুতিধর বলিয়া খ্যাত, (যিনি) বিক্রমাদিত্যের সভায় বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ বররুচি হইতে (অধিক) প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন।।'

ধোয়ী নিজের জীবনে যা কিছু কীর্তিলাভ করিয়াছেন তাহার মূল্য স্বীকার করিয়া শেষ জীবনে তপোবনের প্রশান্তি চাহিয়াছিলেন। পবনদূতের উপসংহারের সে শ্লোকটিও সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত আছে।

কীর্তির্লব্ধা সদসি বিদুষাং শীলিতাঃ ক্ষৌণীপালা
বাক্সন্দর্ভাঃ কতিচিদমৃতস্যন্দিনো নির্মিতাশ্চ।
তীরে সংপ্রত্যমরসরিতঃ ক্বাপি শৈলোপকণ্ঠে
ব্রহ্মাভ্যাসপ্রবণমনসা নেতুমীহে দিনানি।।

'বিদ্বান-সভায় কীর্তিলাভ করিয়াছি। রাজাদের সঙ্গলাভ করিয়াছি।
অমৃতনির্ঝর রচনাও কয়েকটি নির্মাণ করিয়াছি।
এখন সুরনদীর তীরে কোন পর্বতের সানুদেশে
ব্রহ্মধ্যানপ্রবণ চিত্ত লইয়া (বাকি) দিনগুলি কাটাইয়া দিতে চাই।'

নারী-কবির লেখা সংস্কৃত কবিতা সংকলনগ্রন্থগুলিতেই পাওয়া যাইতেছে। এ ধরণের অধিকাংশ কবিতা একটু বেশিমাত্রায় আদিরসাল। হয়ত সেটা স্বাভাবিক। তবে ব্যতিক্রমও আছে। আমাদের পরিচিত ''রজকিনী রামী''র মতো সেকালেও এক রজকসরস্বতী ছিলেন। নিম্নে উদ্ধৃত তাঁহার কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। বিষয় চক্রবাকের বিরহাতঙ্ক।

ভংক্ত্বা ভীতো ন ভুংক্তে কুটিলবিসলতাকোটিমিন্দোর্বিতর্কাৎ
তারাকারাস্তৃষার্তো ন পিবতি পয়সাং বিপ্রুষঃ পত্রসংস্থাঃ।
ছায়ামম্ভোরুহাণামলিকুলশবলাং বেত্তি সন্ধ্যামসন্ধ্যাং
কান্তাবিচ্ছেদভীরুর্দিনমপি রজনীং মন্যতে চক্রবাকঃ।।

'ভাঙিয়াও, চন্দ্রভ্রম করিয়া ভয়ে বাঁকা মৃণালের অগ্র খায় না।
তৃষ্ণার্ত হইয়াও তারা আশঙ্কায় পাতায় বারিবিন্দু পান করে না।
অলিকুল সমাকীর্ণ গাছের ছায়ায় সন্ধ্যা না হইলেও, সন্ধ্যা ভ্রম করে।
কান্তাবিচ্ছেদভীরু চক্রবাক দিনকেও রাত্রি বলিয়া আতঙ্কিত হয়।।''

প্রকীর্ণ কবিতা রচনার ধারা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে একাল অবধি চলিয়া আসিয়াছে। সদুক্তিকর্ণামৃতের পরের সংকলনগুলিতেও (যেমন 'সুভাষিতাবলী' ও 'শার্ঙ্গদেবপদ্ধতি') অনেক ভালো শ্লোক সংকলিত আছে। বাংলাদেশে এমন কবিতা ''উদ্ভট শ্লোক'' নামে প্রসিদ্ধ। (''উদ্ভট'' মানে উজ্জ্বল, বিচিত্র। পতঞ্জলির ''ভ্রাজাঃ'' স্মরণীয়।) আধুনিক কালে কয়েকটি উদ্ভট-শ্লোকের সংগ্রহ অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। দুইটি ভিন্নরসের ''উদ্ভট'' অর্থাৎ অর্বাচীন প্রকীর্ণ কবিতার উদাহরণ দিতেছি।

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ নিবর্তয় সখীন্ বন্দস্ব বন্ধুস্ত্রিয়ঃ
কাবেরীতটসন্নিবিষ্টনয়নে মুগ্ধে কিমুত্তাম্যসি।
আস্তে পুত্রি সমীপ এব ভবনাদ্ এলালতালিঙ্গন-
ন্যঞ্চদ্‌বালতমালদন্তুরদরী তত্রাপি গোদাবরী।।

'গুরুজনদের সেবা সমবয়সীদের প্রীতি জ্ঞাতিস্ত্রীদের সম্মান করিও।
বোকা মেয়ে, কেন তুমি কাবেরীর তীরের দিকে তাকাইয়া কাঁদিতেছ!
বাছা, সেখানে বাড়ির খুব কাছেই আছে এলালতার আলিঙ্গনে
ঝুঁকিয়া পড়া তমাল গাছের সারিবাঁধা গোদাবরী-তীরগুহা।।'

কোন এক রাজসভায় এক কবি-পণ্ডিত অর্থসাহায্য প্রত্যাশায় দীর্ঘকাল কাটাইয়া শেষে হতাশ হইয়া ব্যাজস্তুতি করিয়া রাজার কাছে বিদায় মাগিতেছে

শূলী জাতঃ কদশনবশাদ্ ভৈক্ষ্যযোগাৎ কপালী
বস্ত্রাভাবাদ্ গগনবসনস্তৈলনাশাজ্ জটাবান্।
ইত্থং রাজন্ তব পরিচয়াদীশ্বরত্বং ময়াপ্তম্।
অদ্যাপ্যেবং মম নরপতে নার্ধচন্দ্রং দদাসি।।

'কুখাদ্য খাইয়া শূল[১] জন্মিয়াছে। ভিক্ষার জন্য খাপরা[২] ধরিয়াছি।
বস্ত্রাভাবে দিগম্বরত্ব পাইয়াছি। তৈলাভাবে মাথায় জটা বাঁধিয়াছে।
হে রাজা, তোমার পরিচয়সূত্রে এইভাবে আমি শিবত্ব[৩] পাইলাম।
কেবল তুমি, হে নরপতি, এখনও আমাকে অর্ধচন্দ্র[৪] দিতেছ না!'

গীতগোবিন্দ

সংস্কৃত শ্লোক আবশ্যক মতো গাওয়া হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এখন গীতিকবিতা বা গান বলিতে যে ধরণের রচনাছাঁদ বুঝি তা প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকেই আগত। সংস্কৃত সাহিত্যে সে বস্তু দ্বাদশ শতাব্দীর কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের আগে এক আধ ছত্রের ধুয়া ছাড়া বিশেষ কিছু পাই না। 'গীতগোবিন্দ' এখন বারো সর্গের কাব্য আকারে আমাদের পরিচিত। আসলে কিন্তু গানগুলি ছাড়া বাকি অংশ—অধিকাংশ শ্লোক—অপ্রয়োজনীয় রচনা।

গীতগোবিন্দকে নাট্যপ্রবন্ধ বলিতে পারি, এখনকার পরিভাষায় গীতিনাট্য বলিলেও চলে।[৫] নাট্যপ্রবন্ধটি চব্বিশটি গানের (বা পদাবলীর) সমষ্টি। গানগুলিতে সংস্কৃত ভাষা অভিনবভাবে পরিশীলিত এবং অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের ছন্দ মধুর ও নমনীয়ভাবে প্রকটিত। জয়দেবের হাতে, এই গানগুলিতে, সংস্কৃত ভাষায় শেষবারের মতো নূতন শক্তি জাগানো হইল এবং সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বিকাশ ঘটিল। অতঃপর সংস্কৃতে আর সত্যকার নূতন বলিয়া কিছু সৃষ্ট হয় নাই।

১। মূলে "শূলী"= শিবপক্ষে শূলধারী, কবিপক্ষে শূলরোগী।
২। মূলে "কপালী"= শিবপক্ষে নরকপালধারী, কবিপক্ষে ভিক্ষাপাত্রধারী।
৩। মূলে "ঈশ্বরত্বং"।
৪। শিবপক্ষে শিরোভূষণ, কবিপক্ষে গলাধাক্কা।
৫। এই লেখকের 'মঙ্গলযাত্রা নাটগীত ও পাঁচালি কীর্তন' প্রবন্ধ পঠনীয়।

জয়দেব ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে আমাদের অবগতি আছে, সুতরাং বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু বলিতে হইবে যে গীতগোবিন্দ যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ কাব্য এবং ইহার গানগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম গান, তেমনি ইহা বাংলায় তথা অপর সব আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সভা-সাহিত্যের প্রভাতীও। বাংলা ও গুজরাটি প্রভৃতি কোন কোন আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষায় সাহিত্যের আলোচনা জয়দেবের গীতগোবিন্দ লইয়াই শুরু করিতে হয়।

গীতগোবিন্দের গানের একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি। গীত-কবিতাটি একছত্রের, সুতরাং ছন্দের দিক দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে অ-দ্বিতীয়। গানটি নাটপালার "নান্দ্যান্তে" উপক্রমণিকা-প্রস্তাবনার মতো।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল।।
জয় জয় দেব হরে ।। ধ্রু ।।
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ।।
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান।।
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান।।
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ।।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর।।
তব চরণে প্রণতা বয় মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি।।

'কমলার দেহ আলিঙ্গন করিয়া আছ, কুণ্ডল পরিয়া আছ, ললিত বনমালা ধরিয়া আছ।। হে দেব হরি, জয় জয়।।
সূর্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত (তুমি), মুক্তিদাতা। মুনিমানসের হংস (তুমি)।।
কালিয় সর্প দমন করিয়াছ। লোকের আনন্দদাতা (তুমি), যদুবংশ-পদ্মবনের সূর্য।
মধু-মুর-নরক অসুর বিনাশ করিয়াছ। গরুড় (তোমার) আসন। (তুমি) দেবলোকের সুখের হেতু।।
অমল কমল (পদ্ম) দলের মতো তোমার লোচন, (তুমি) ভবভয় মোচন কর। (তুমি) ত্রিভুবন-ভবনের মূলস্তম্ভ।।
জনকদুহিতাকে তুমি ভূষণ[১] করিয়াছিলে, দূষণকে জয় করিয়াছিলে, সমরে দশাননকে বধ করিয়াছিলে।।
নূতন জলধরের মতো সুন্দরকান্তি (তুমি) মন্দর ধরিয়াছিলে[২]। (তুমি) লক্ষ্মীর মুখচন্দ্রের চকোর।।
তোমার চরণে আমরা প্রণাম করিতেছি, এই কথা স্মরণ কর। প্রণত (আমাদের) কুশল কর।।
শ্রীজয়দেবের এই উজ্জ্বলগীতিময় মঙ্গল (নিবন্ধ) আনন্দ বিস্তার করুন।।'

ভারতবর্ষে একদা সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে কালিদাসের পরেই জয়দেবের খ্যাতি কেন যে হইয়াছিল তাহা গীতগোবিন্দের গান শুনিলে বোঝা দুরূহ হইবে না।

১। অর্থাৎ সমাদরে ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলে।
২। সমুদ্রমন্থনকালে।
৩। অর্থাৎ সুধাপিয়াসী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাকৃত

জানপদী ভাষার প্রথম অবস্থার রচনা-বন্ধের পরিচয় অশোকের ও অপর প্রাচীন অনুশাসনে এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে পাইয়াছিলাম। তাহার পর সংস্কৃত নাটকে জানপদী ভাষার দ্বিতীয় অবস্থার সাহিত্যিক মূর্তি পাইয়াছি বিভিন্ন "প্রাকৃত" উক্তিগুলিতে। এই "প্রাকৃত" শব্দটির উৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। তবে মোটামুটি আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে "প্রাকৃত" নামটি "সংস্কৃত" নামের পরে এবং উহার অনুকরণে গড়া। বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার যে নাম পাই তাহার অনেকগুলি অঞ্চল অথবা প্রদেশ বিশেষেরও নাম।[১] যেমন, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী। কোন কোনটি তা নয়। যেমন পৈশাচী। নাম যাহাই হোক না কেন, "প্রাকৃত" ভাষাগুলি যে উত্তরাপথের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের অথবা বিশেষ বিশেষ প্রদেশের কথ্য ভাষা কিংবা কথ্য ভাষার সাহিত্যমূর্তি কখনো ছিল এমন অনুমান সমর্থন করা যায় না। এই পর্যন্ত বলা যায় যে কোন বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর অথবা সেই জনগোষ্ঠীর অধ্যুষিত স্থানের নাম কোনও কারণে (—যেমন বিশিষ্ট কবির উদ্ভব অথবা বড় রাজার কিংবা বড় পণ্ডিতের পোষকতা ইত্যাদি হেতু—) বিশেষ একটি সাহিত্যভাষার সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছিল।

প্রাকৃতের সহিত অপভ্রংশের জন্মভেদ নাই, জাতিভেদ আছে। অপভ্রংশ প্রাকৃতের সরলতর এবং কথ্যভাষার নিকটতর সাহিত্যভাষা। আর্যভাষার কাল হইতে কালান্তরে প্রবাহে "প্রাকৃত" ভাষা সরলপথবাহী নয় বক্রপথবাহী, এবং সে বক্রপথের প্রবাহ মূলধারার দিকে আর ফিরিয়া আসে নাই। অপভ্রংশ কিন্তু যথাসম্ভব সরলপথবাহী, এবং কিছু বক্রপন্থা গ্রহণ করিলেও অপভ্রংশের প্রবাহ কথ্যভাষার প্রবাহে আসিয়া মিলিয়াছিল। অপভ্রংশের সঙ্গে তুলনা করিলে প্রাকৃত ভাষাগুলিকে অনেকটাই কৃত্রিম বলিতে হয়। সংস্কৃতভাষার প্রভাবও পাকে প্রকারে নানাভাবে প্রাকৃতের উপর পড়িয়াছিল। এমন কি অনেক সময় প্রাকৃত সাহিত্যের গদ্য সংস্কৃত হইতে ভাঙা বলিয়া মনে হয়। তাহার কারণ, যখন প্রাকৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা হইতেছিল তখন কথ্যভাষা মধ্য অবস্থায় অনেকটাই আগাইয়া গিয়াছে, অপভ্রংশ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। সুতরাং সংস্কৃতপাঠীদের কাছে বোধগম্য করিবার জন্যই প্রাকৃতকে সংস্কৃত মূলের যথাসম্ভব অবিদূরে রাখিতে হইয়াছিল।

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত হইল সাহিত্যের আদর্শ (standard) প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষার প্রথম ব্যাকরণ 'প্রাকৃতপ্রকাশ' গ্রন্থে প্রাকৃত বলিতে মাহারাষ্ট্রীই বোঝায়। প্রাকৃত কবিতা ও কাব্য প্রায় সবই মাহারাষ্ট্রীতে লেখা। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে প্রাকৃতে যে কবিতা বা গান আছে সেগুলির ভাসা এই প্রাকৃত।[২] শৌরসেনী সংস্কৃত নাটকে নারীর এবং সাধারণ, অশিক্ষিত পুরুষের ভাষা।

১। আসলে এগুলি বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর নাম। পরে জনগোষ্ঠীর নাম অনুসারে প্রদেশের ও অঞ্চলের নাম হইয়াছিল।

২। তবে মাঝে মাঝে অন্য প্রাকৃতে লেখা শ্লোকও দুই একটি পাওয়া যায়।

আগাগোড়া শৌরসেনীতে লেখা কোন বই নবম শতাব্দীর আগে পাই না। নবম শতাব্দীতে ও তাহার পরে লেখা এমন বইও খুবই কম পাওয়া গিয়াছে। মাগধী প্রাকৃতে কোন বই লেখা হয় নাই, এবং সংস্কৃত নাটকেও কয়েকটি খুব অশিক্ষিত ও বোকা লোকের মুখে ছাড়া, মাগধীর ব্যবহার নাই। এসব নাটকে মাগধীতে লেখা যে অল্পস্বল্প অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা শুধু হাস্যরস যোগানের জন্যই। পৈশাচী[1] ভাষায় একদা এক বৃহৎ গল্পগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বইটির নাম 'বৃহৎকথা' (প্রাকৃতে 'বড্ডকহা'), সংকলনকারীর নাম গুণাঢ্য। বইটি এখন বিলুপ্ত, তবে গল্পগুলি দুই তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থে রক্ষিত আছে। সেগুলির মধ্যে ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' (দ্বাদশ শতাব্দী) সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

অর্ধমাগধী জৈন শাস্ত্রের ও শাস্ত্রেতর সাহিত্যের ভাষা।[2] পরে সে আলোচনা করিতেছি। জৈন গ্রন্থকারেরা মাহারাষ্ট্রীতে ও শৌরসেনীতেও লিখিয়াছেন। তবে তাঁহাদের সে লেখায় অর্ধমাগধীর প্রভাব খুব বেশিমাত্রায় দেখা যায়। সেইজন্য জৈনদের লেখা গ্রন্থের মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী যথাক্রমে "জৈন-মাহারাষ্ট্রী" ও "জৈন-শৌরসেনী" বলিয়া নির্দিষ্ট হয়।

জৈন শাস্ত্র-সাহিত্য

জৈন[3] ধর্মের প্রথম ঋষি ও প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বুদ্ধের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার মাতৃভূমি ছিল উত্তর বিহারে। বুদ্ধের মতো মহাবীরেরও অন্যতম প্রধান কর্মভূমি ছিল দক্ষিণ বিহার। জৈন শাস্ত্রে বুদ্ধের এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রে মহাবীরের নাম আছে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ধর্ম ও সাধনার প্রধান গুরুরূপে। বৌদ্ধশাস্ত্রে মহাবীর নিগণ্ঠ নাতপুত্ত (অর্থাৎ—"নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র") নামে উল্লিখিত।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্যে মূলগত ঐক্য কিছু আছে। দুই ধর্মই ব্রাহ্মণ্য বেদবিধানের বিরুদ্ধবাদী এবং দুই ধর্মই নিরীশ্বর এবং সংসারজীবনের বিরোধী। কর্মের মূলোচ্ছেদ এবং জন্মজন্মান্তরাগত ও জন্মজন্মান্তরপ্রবাহী কর্মসন্তানের বিধ্বংস না হইলে জীবসত্ত্বের মোক্ষ বা নির্বাণ নাই। তবে দুই ধর্মের মধ্যে ভেদও আছে। বৈরাগ্য ও অহিংসার উপর জৈন ধর্মের ঝোঁক অত্যন্ত বেশি। বৌদ্ধধর্মে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ কিন্তু কেহ আমিষ অন্ন ভিক্ষা দিলে তাহা গ্রহণে ভিক্ষুর দোষ নাই। জৈন সাধু কোন রকমেই আমিষ ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। জৈন ধর্মে অহিংসার মূল্য এত উঁচুতে ধরা হইয়াছে যে তাহা কখনো কখনো যুক্তিযুক্ততা ছাড়াইয়া গিয়াছে। যেমন, জৈন সাধুদের পথে চলিবার সময় সম্মার্জনীর দ্বারা আগে আগে ঝাঁটাইয়া যাওয়া, যাহাতে পদক্ষেপে পিঁপড়ের মতো নিতান্ত ক্ষুদ্র কীটও না মারা পড়ে। আরও যেমন, খাটিয়ায় ছারপোকা নষ্ট না করা এবং তাহারা যাহাতে অনাহারে মারা না যায় (অথবা শয়নকারীকে তীব্র দংশন না করে) সেইজন্য লোক ভাড়া করিযা ছারপোকা-দংশন করানো। বৌদ্ধ ধর্মও সন্ন্যাসীর (ভিক্ষুর) ধর্ম বটে কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তিদেরও সে ধর্মে স্থান আছে। জৈন

১। পৈশাচী প্রাকৃত অনেকটা পালির মতো ছিল।

২। সেইজন্য জৈন লেখকেরা কখনো কখনো এই ভাষাকে 'আর্য' অথবা 'আর্য প্রাকৃত' বলিয়াছেন।

৩। "জৈন" শব্দ "জিন" হইতে উৎপন্ন। জিন শব্দ "বুদ্ধ" শব্দের প্রায় সমার্থক। জিন = যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, বুদ্ধ = যিনি চরমজ্ঞান ("বোধি") লাভ করিয়াছেন (এই দুইটি শব্দ হইতে দুইটি ধর্মের ঝোঁক কোথায় তাহা বোঝা যায়। জৈনধর্মের ঝোঁক তপস্যায়, বৌদ্ধধর্মে ঝোঁক জ্ঞানে।) বৌদ্ধশাস্ত্রে গৌতম যেমন শেষ বুদ্ধ জৈনশাস্ত্রে মহাবীর তেমনি শেষ জিন।

ধর্মে গৃহস্থ ব্যক্তিদের ("শ্রাবক") স্থান আগে ছিল না, পরে হইয়াছে। কিন্তু জৈন শাস্ত্রে গৃহী ব্যক্তি গ্রাহ্য নয়। জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের মতো নিরীশ্বর ও বেদবাহ্য হইলেও বর্ণভেদ একেবারে অস্বীকৃত নয়। বৌদ্ধধর্মে বর্ণভেদের কিছুমাত্র স্বীকৃতি নাই। এইজন্য, অর্থাৎ বর্ণভেদ না থাকায় আর সংসারী মানুষ পরিবর্জিত না হওয়ায় (এবং আরও নানা কারণে) বৌদ্ধধর্ম একদা ভারতবর্ষের সীমান্ত ছাড়াইয়া দূরপ্রসারিত হইয়া সর্বজাতিক ও সর্বমানবিক (international ও universal) ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। আর বর্ণভেদ একেবারে অগ্রাহ্য না করিয়া অহিংসার উপর অত্যন্ত জোর দেওয়ায়, সংসারী মানুষকে ধর্মের বেষ্টনী হইতে দূরে রাখায় এবং শুষ্ক বৈরাগ্যের বাড়াবাড়ি করায়[১] (এবং আরও নানা কারণে) জৈনধর্ম ভারতবর্ষের চৌকাঠ ডিঙাইতে পারে নাই, ভারতবর্ষেই রহিয়া গিয়াছে—একটি জাতীয় (national) ধর্মরূপে।

জৈন ধর্ম বেদ-বিধান অস্বীকার করিলেও পৌরাণিক ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে নাই। যেমন কৃষ্ণ ও যদুবীরদের কাহিনী এবং রামচরিত। অবশ্য জৈন সাহিত্যে কৃষ্ণ-কথা ও রাম-কথা কিছু নূতনভাবে উপস্থাপিত। মনে হয় জৈন ধর্মের বীজ মহাবীরের অনেককাল আগেই উপ্ত হইয়াছিল এবং যদুবংশ ও রঘুবংশ গোড়ায় ঠিক ব্রাহ্মণ্য-মতাশ্রিত ছিল না।

বুদ্ধের মতো মহাবীরও নিজের মাতৃভাষায়, অর্ধমাগধীর মতো কোন প্রাকৃতে (অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায়) শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। সেই ভাষাতেই তাঁহার উপদেশবাণী ও জৈন ধর্মের আদি শিক্ষাপদসমূহ প্রথম সংগৃহীত হইয়াছিল। তবে সেগুলি বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয় নাই, বেশ কিছুকাল বেদের মতো মুখবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। লিপিবদ্ধ কবে হইয়াছিল তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে সবচেয়ে পুরানো জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার ভাষা বিবেচনা করিলে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে নেওয়া চলে না। এই বইটির নাম 'আয়রঙ্গসুত্ত' (সংস্কৃত করিলে "আচারাঙ্গ-সূত্র" অথবা "আচারাঙ্গ-সূক্ত")।

প্রাচীন জৈন শাস্ত্র ("আগম") সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই। যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা এক বড় সাহিত্যের খণ্ডিত অংশ মাত্র। এ অংশের ভাষা প্রাকৃত, এবং ভাব বিশুষ্ক অর্থাৎ সাহিত্যরসহীন। পরবর্তীকালে জৈন লেখকেরা সবাই অর্ধমাগধী প্রাকৃতে লিখেন নাই। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় অষ্টম শতাব্দী হইতে এবং দিগম্বর সম্প্রদায় তাহারও পূর্ব হইতে শৌরসেনী প্রাকৃত ব্যবহার করিতেন। দশম শতাব্দীর আগে হইতে অপভ্রংশও বেশ ব্যবহৃত ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে জৈনধর্মের দুইটি প্রধান সম্প্রদায় দাঁড়াইয়া যায়। একটি সম্প্রদায়ের নাম শ্বেতাম্বর, অপরটির নাম দিগম্বর। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে সিদ্ধান্তশাস্ত্র, "আগম", এই কয় ভাগে বিভক্ত।

১. "অঙ্গ"। সংখ্যায় এগারো[২]। 'আয়রঙ্গসুত্ত' ও 'সূয়কড়ঙ্গসুত্ত' (= সূতকৃতাঙ্গসূত্র) ইহার অন্তর্গত।

২. "উপাঙ্গ"। এগুলি সংখ্যায় বারো।

৩. "প্রকীর্ণ" (প্রাকৃতে 'পইন্ন'), অর্থাৎ বিবিধ। সংখ্যায় ছয়।

৪. "ছেদসূত্র" (প্রাকৃতে 'ছেয়-সুত্ত')। সংখ্যায় ছয়।

৫. অঙ্গ উপাঙ্গ প্রকীর্ণ অথবা ছেদসূত্র নয় এমন গ্রন্থ। সংখ্যায় দুই।

৬. "মূলসূত্র"। সংখ্যায় চার। 'উত্তরজ্ঝয়ণসুত্ত' (= উত্তরাধ্যয়নসূত্র) ইহার অন্তর্গত।

১। যেমন "দিগম্বর" জৈন সাধুদের আচরণে (ইঁহারা সর্বদা উলঙ্গ থাকিতেন) এবং দিগম্বর-শ্বেতাম্বর নির্বিশেষে সব সাধুদের সর্বাঙ্গের লোম-উৎপাটনে।

২। মতান্তরে বারো।

এই আগম-গ্রন্থাবলীর ভাষা অর্ধমাগধী। এগুলি ছাড়া যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ লেখা হইয়াছিল তাহার ভাষা "জৈন মাহারাষ্ট্রী" (অর্থাৎ অর্ধমাগধী-মিশ্রিত মাহারাষ্ট্রী)।

জৈন আগমগ্রন্থের প্রাচীনতম বই তিনটির[১] মধ্যে প্রথম দুইটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের পক্ষে তা খুব মূল্যবান্ নয়। তবে তৃতীয় গ্রন্থখানির, উত্তরজ্ঝয়ণ-সুত্তের, ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাসের দিক দিয়া বেশ কিছু মূল্য আছে। পালি সুত্তনিপাতে যেমন এ গ্রন্থেও তেমনি পুরানো ঐতিহ্য ও কাহিনী-গাথা কিছু কিছু সঙ্কলিত আছে। সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি।[২]

নবম অধ্যয়নে নমী-রাজার প্রব্যজ্যাকাহিনী সংলাপময় গাথা-রীতিতে (—যেমন পালি সুত্তনিপাতে ধনিয়সুত্তে দেখিয়াছি—) বর্ণিত। নমী দেবলোকে হাজার হাজার বছর সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্যলোকে মিথিলায় রাজা হইয়া জন্মিযাছেন। যথাকালে তাঁহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হইল এবং সংসার-সুখভোগে বিরাগ জন্মিল।

জাইং সরিত্তু ভয়বং সংসংবুদ্ধো অনুত্তরে ধম্মে।
পুত্তং ঠবেত্তু বজ্জে অভিনিক্খমঈ নমী রায়া।।

'জন্ম হেতু স্মরণ করিয়া ভগবান্ (নমী) সঙ্গে সঙ্গে অনুত্তর[৩] ধর্মে
সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিলেন।
পুত্রকে রাজ্যে বসাইযা রাজা নমী অভিনিষ্ক্রমণ করিলেন।।'

স্বর্গের মতো ভোগ ও সমৃদ্ধ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ নমী রাজা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন- এই সংবাদে অনুরক্ত প্রজাদের মধ্যে করুণ ক্রন্দনকোলাহল উঠিল। শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া নমীর প্রব্রজ্যাস্থানে আবির্ভূত হইলেন। তাহার পর দেবেন্দ্রের সহিত নমীর উত্তরপ্রত্যুত্তর চলিল।

দেবেন্দ্র — কিন্নু ভো অজ্জ মিথিলা কোলাহলগসংকুলা।
সুব্বন্তি দারুণা সদ্দা পাসাএসু গিহেসু য়।।
'ওগো, কেন আজ মিথিলায় এত গোলমাল?
দারুণ[৪] শব্দ শোনা যাইতেছে—প্রাসাদে এবং গৃহস্থঘরেও।।'

নমী — মিহিলাএ চেইএ বচ্ছে সীয়চ্ছাএ মনোরমে।
পত্তপুপ্ফফলোবেএ বহূণং বহুগুণে সযা।।
বাএণ হীবমাণংমি চেইয়ংমি মণোরমে।
দুহিয়া অসরণা অত্তা এএ কন্দন্তি গো খগা।।
'ওগো, মিথিলায় শীতলছায় মনোরম পত্রপুষ্পফলবান্ বহু শত চৈত্যবৃক্ষ (আছে)। মনোরম চৈত্যবৃক্ষ ঝড়ে পড়িয়া যাওয়ায় সেখানকার সেইসব পাখি দুঃখিত অশরণ ও আর্ত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে।।'

দেবেন্দ্র — এস অগ্গীয় বাউয এয়ং ডজ্ঝই মন্দিরং।
ভয়ং অন্তেউরং তেণং কীস নং নাবপেক্খহ।।
'এ তো অগ্নি আর বায়ু, যা ঘরবাড়ি দগ্ধ করিতেছে।

১। 'আয়রঙ্গসুত্ত', 'সূয়কড়ঙ্গসুত্ত' ও 'উত্তরজ্ঝয়ণসুত্ত'।
২। জাতক-কাহিনীর রূপান্তরও কিছু কিছু আছে।
৩। অর্থাৎ যাহার উপরে আর কোন ধর্ম নাই।
৪। অর্থাৎ করুণ।

হে ভগবন্,[১] তাহাদের অন্তঃপুর কেন রক্ষা করিতেছ না?'

নমী সুহং বসামো জীবামো জেসি মো নত্থি কিংচণ।
মিথিলাএ ডজ্‌ঝমানীএ ন মে ডজ্‌ঝই কিংচণ।।
চত্তপুত্তকলত্তস্‌স নিব্বাবাবস্‌স ভিক্‌খুণো।
পিয়ং ন বিজ্জঈ কিংচি অপ্পিয়ং পি ন বিজ্জঈ।।

'সুখে থাকি ও বাঁচি—যেখানে আমার কিছুই নাই।
মিথিলা দগ্ধ হইলে আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।।
স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগী সংসারকর্মহীন ভিক্ষুর প্রিয় কিছু নাই, অপ্রিয়ও কিছু নাই।।'

দেবেন্দ্র পাগারং কারইত্তাণং গোপুরট্টালগাণি চ।
উস্‌সুলগসয়গ্‌ঘীউ তউ গচ্ছসি খত্তিয়া।।

'প্রাকার[২] করাইয়া, গোপুর[৩] ও অট্টালিকা[৪] সকল (করাইয়া তাহাতে),
শূল ও শতঘ্নী[৫] (বসাইয়া), হে ক্ষত্রিয়, সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছ!'

নমী সদ্ধং চ নগরং কিচ্চা তপসংবরমগ্‌গলং।
খন্তিং নিউণপাগারং তিগুত্তং দুপ্পধংসযং।।
ধনুং পরক্কমং কিচ্চা জীবং চ হরিয়ং ময়া।
ধিইং চ কেয়ণং কিচ্চা সচ্চেন পলিমন্থএ।।
তবনারাচজুত্তেন ভিত্তূণং কম্মকঞ্চুয়ং।
মুনী বিগয়সংগামো ভবাউ পরিমুচ্চএ।।

'শ্রদ্ধাকে নগর করিয়া, তপস্যা ও সংযম অর্গল করিয়া, ক্ষান্তিকে নিপুণ[৬] প্রাকার করিয়া, (নগরকে) তিনগুণ সুরক্ষিত ও দুর্ধর্ষ করিয়া পরাক্রমকে ধনু করিয়া, প্রাণকে কুটা[৭] করিয়া, ধ্যানকে কেতন[৮] করিয়া আমি সবদিকে সুরক্ষিত। তপস্যারূপ নারাচের[৯] দ্বারা ভিক্ষু কর্মরূপ (শত্রুর) বর্ম ছেদ করিয়া সংগ্রামে বিরত হইয়া ভব[১০] হইতে পরিমুক্ত হয়।।'

দেবেন্দ্র আমোসে লোমহারে যে গণ্ঠীভেএ য় তক্করে।
নগরস্‌স খেমং কাউণং তউ গচ্ছসি খত্তিয়া।।

'যাহারা ধরিয়া কাড়িয়া লয়,[১০] যাহারা মারিয়া কাড়িয়া লয়,[১১] যাহারা গাঁঠ কাটে, যাহারা চুরি করে[১২] (তাহাদের শাস্তি দিয়া) নগরের মঙ্গল করিয়া, তবেই হে ক্ষত্রিয়, যাইও।।"

নমী অসইং তু মনুস্‌সেহিং মিচ্ছা দণ্ডো পজুংঈ।
অকারিণোত্থ বজ্‌ঝান্তি মুচ্চঈ কারউ জনো।।

১। অর্থাৎ মহারাজ।
২। দুর্গবেষ্টনী প্রাচীর অথবা খাল
৩। নগরদ্বার।
৪। ইঁটের গাঁথা দুর্গ।
৫। দুর্জয় অস্ত্রবিশেষ।
৬। অর্থাৎ শত্রু-আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত। তুলনীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, "প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ম্"।
৭। পতাকা।
৮। লোহার বাণ।
৯। পুনর্জন্ম।
১০। মূলে "আমোসে"।
১১। মূলে "লোমহারে"।
১২। মূলে "তক্করে"।

'প্রায়ই মনুষ্যদের মধ্যে অন্যায় শাস্তি দেওয়া হয়।।
এখানে[১] অনপরাধীরা[২] দণ্ড পায়, অপরাধী[৩] লোক ছাড়া পায়।।'

দেবেন্দ্র যে কেঈ পত্থিবা তুজ্ঝং নাণমন্তি নরাহিবা।
বসে তো ঠাবইত্তাণং তউ গচ্ছসি খত্তিয়া।।

'যদি কোন দেশের রাজা তোমার অধীনতা না স্বীকার করে, (তবে) তাহাকে বশে আনিয়া, হে ক্ষত্রিয়, তবে যাইও।।'

নমী জো সহস্সং সহস্সাণং সংগামে দুজ্জয়ে জিণে।
এগং জিণেজ্জ্ অপ্পাণং এস সে পরমো জউ।।

'সহস্রের সহিত দুর্জয় সংগ্রামে যে কেহ সহস্রকে জয় করে, (কিন্তু যে একমাত্র নিজেকে[৪] যদি জয় করিতে পারে সে জয় শ্রেষ্ঠ।।'

(এই শ্লোকটি সামান্য পাঠান্তরসহ ধম্মপদে পাওয়া গিয়াছে। পালি শ্লোকটি এই,
যো সহস্সং সহস্সেন সংগামে মানুসে জিনে।
একং চ জয্যমত্তানং স বে সংগামজুত্তমো।।

'যে যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ জয় করিতে পারে, (তাহার, তুলনায়)
একমাত্র নিজের উপর জয়ী হয় যে সে-ই শ্রেষ্ঠ রণজয়ী।।'

এইভাবে আরও একটু তর্কাতর্কির পর ইন্দ্র ক্ষান্ত দিলেন এবং নমীকে স্তব করিয়া ও তাহার পাদবন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন।

কাব্য ও কবিতা

প্রাকৃত কবিতার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। যখন থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় গদ্যরচনা পাওয়া যাইতেছে তখন হইতে প্রাকৃত অর্থাৎ (মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় লেখা) কবিতাও মিলিতেছে।[৫] (পালির কথা এখানে বিবেচনা করিতেছি না।) এখন যে প্রাকৃত-সাহিত্যের আলোচনা করিতেছি সে সাহিত্যের, পুরাতন মধ্যভারতীয় আর্য সাহিত্যের, সঙ্গে ধারাবাহিকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। সে ধারাবাহিকতা অনুমানগম্য।

প্রাকৃত কাব্য কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতির ধারাবাহী নহে। সংস্কৃত কাব্য (—সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র-অনুযায়ী "সর্গবন্ধ মহাকাব্য"—) রচনার অভ্যাস হইতেই প্রাকৃত কাব্যরচনার প্রবৃত্তি আসিয়াছিল। বাণ হর্ষচরিতের উপক্রমে কয়েকজন প্রাকৃত-কবির কথা বলিয়াছেন। যেমন গুণাঢ্য সাতবাহন ও প্রবরসেন। যতদূর সন্ধান পাওয়া যায় তাহাতে এই তিনজনই সবচেয়ে পুরানো প্রাচীন কাব্যকর্তা। (এখানে সংস্কৃত নাটকের অন্তর্গত প্রাকৃত কবিতার কথা ধরিতেছি না। অশ্বঘোষ ও কালিদাস প্রমুখ প্রাচীন নাট্যকারের রচনামধ্যে যে অল্পস্বল্প প্রাকৃত কবিতা ও

১। অর্থাৎ সংসারে।
২। মূলে "অকারিণো", অর্থাৎ যাহারা (অপরাধ) করে নাই।
৩। মূলে "কারড", অর্থাৎ যে (অপরাধ) করিয়াছে।
৪। মূলে "আপ্পানং"।
৫। একটিমাত্র আছে। প্রাকৃতের ঢঙে ও বিশিষ্ট "আর্যা" ছন্দে লেখা একটিমাত্র কবিতা পাওয়া গিয়াছে তাহা "সুতনুকা" কবিতায় সমকালে লেখা। আগে পৃঃ ৯১ দ্রষ্টব্য।

গান আছে সেগুলিতে প্রাকৃত কবিতার ধারাবাহিকতা নাই, তাহার ছিন্নসূত্রের টুকরা ছড়াইয়া আছে।)

গুণাঢ্যের কাব্য বৃহৎকথার উল্লেখ করিয়াছি।[১] এ কাব্যটির মূল প্রাকৃত ("পৈশাচী") রূপ এখন অবলুপ্ত। তবে দুই তিনখানি সংস্কৃত অনুবাদে—আর্য ক্ষেমীশ্বরের 'বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ', ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' আর সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'—কাব্যটির কথ্যবস্তু সংক্ষেপে অথবা বিস্তারে ধরা আছে। অনেক সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তুতে গুণাঢ্যের সংগৃহীত গল্প প্রতিফলিত।[২] পরবর্তীকালের জৈন লেখকের সংগৃহীত কোন কোন গল্পেও গুণাঢ্যের সংকলিত কাহিনীর ভাষান্তর পাইয়াছি।[৩] বৃহৎকথার কোন কোন গল্প ভাষা ও দেশ কাল বদল করিয়া আরব্য-উপন্যাসে স্থান লাভ করিয়াছে।

প্রবরসেনের কাব্যের নাম 'সেতুবন্ধ' (নামান্তরে 'রাবণবহো' অর্থাৎ রাবণবধ)। সর্গ[৪]-সংখ্যা পনেরো। বিষয় সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও সীতার উদ্ধার। কাব্যটিব রচনারীতির একটু পরিচয় দিবার জন্য একাদশ সর্গ হইতে সীতা কর্তৃক রামের মায়ামুণ্ড-দর্শন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ছিন্নমুণ্ডের ক্ষত ইত্যাদি সামান্য ব্যাপারের নিখুঁত বর্ণনা আধুনিক কালের ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের অনুপযুক্ত নয়।

পেচ্ছই অ সরহসোহরিঅমগুলগ্ গাহিঘাঅবিসমচ্ছিন্নং।
দূরধণুসংঘিঅঞ্চিঅসরপুঙ্ খালিদ্ধসামলিআবঙ্গং।।
নিব্বুঢ়রুহিরপণ্ডুরমউলন্তচ্ছেঅমাসপেল্লিঅবিবরং।
ভজ্জন্তপডিঅপহরণকণ্ঠচ্ছেঅদরলগ্গধারাচুন্নং।।
নিদ্দঅসংদট্‌ঠাহরমূলুকখিত্তদর-দাঠাহীরং।
সংখাঅ-সোণিঅপঙ্কপডলপূরেন্তকসণকণ্ঠচ্ছেঅং।।
নিসিঅরকঅগ্গহাণিঅনিলাডঅডনট্‌ঠভিউডিভুমআভঙ্গং।
গলি অরুহিবন্ধলহুঅং অণহিঅউম্মিল্লতারঅং রামসিরং।।

'(সীতা) রামের (ছিন্ন-) মুণ্ড দেখিলেন। (সে মুণ্ড) বাঁকা তলোয়ারের প্রবল আঘাতে অসমানভাবে কাটা, (সে মুণ্ডে) চোখের প্রান্তভাগ অনেকটা টানা ধনুকের জোড়া তীরের পুচ্ছভাগের ঘর্ষণে কালো।।

'রক্ত বাহির হইয়া যাওয়ায় পাণ্ডুবর্ণ ক্ষতমাংস সঙ্কুচিত হইয়া (ধমনীর) ফাঁক বুজাইয়া দিয়াছে। আঘাতের অস্ত্র ভাঙিয়া পড়িয়া যাওয়ায় ছিন্নকণ্ঠের ধারে অল্প অল্প শাণের চুন[৫] লাগিয়া ছিল।

সজোরে কামড়ানো অধরমূল হইতে বহির্গত বজ্রদংষ্ট্রা ঈষৎ দেখা যাইতেছিল। জমিয়া যাওয়া রক্তের পাঁকে পূর্ণ হওয়ায় কণ্ঠচ্ছেদ-ক্ষত কালো দেখাইতেছিল।

রাক্ষস চুলের মুঠি ধরিয়া আনিয়াছে তাই ললাটতলের ভ্রূকুটি-ভ্রূভঙ্গ মিলাইয়া

১। বইটি এখনকার দিনের আরব্য-উপন্যাসের মতো গল্পকথার সংগ্রহ ছিল।

২। যেমন উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী, চারুদত্ত-বসন্তসেনার গল্প ইত্যাদি।

৩। যেমন উদয়ন-কথা, মূলদেব-কাহিনী ইত্যাদি।

৪। এখানে সর্গের বদলে 'আশ্বাসক' ("অচ্ছাসঅ") শব্দ ব্যবহৃত। (তুলনীয় হর্ষচরিতের "উচ্ছ্বাস"।) অর্থাৎ দম, একটানা যতখানি বলা যায়।

৫। শাণিত তলোয়ারের ধার যাহাতে মরিচা পড়িয়া নষ্ট না হয় এইজন্য খড়ির গুঁড়া লাগানো থাকিত।

গিয়াছে। (সে রাম-শির) নীরক্ত হওয়ায় অর্ধ-ভার হইয়াছে, আর চোখের তারা উন্মুক্ত কিন্তু তাহার (পিছনে) হৃদয় নাই[১]।।'

সেতুবন্ধের পর উল্লেখযোগ্য প্রাকৃত কাব্য হইল 'গউড়বহো' (সংস্কৃত করিলে 'গৌড়বধঃ')। কবির নাম (অথবা উপাধি) বাক্‌পতি (অথবা বাক্‌পতিরাজ)। শ্লোকসংখ্যা কিছু বেশি বারো শ। ছন্দ আগাগোড়া আর্যা, বিষয় কবির পোষ্টা যশোবর্মা কর্তৃক এক গৌড়রাজকে[২] পরাজয় ও নিধন। কাব্যটির রচনাকাল অষ্টম শতাব্দীর আগে যাইবে না। গ্রন্থারম্ভে বিস্তারিত নমস্ক্রিয়া প্রাচীনত্বের চিহ্ন নহে।

মঙ্গলাচরণের পর কবিপ্রশংসা। তাহার মধ্যে একটি শ্লোকে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের যে তুলনামূল্য ধরা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সমসাময়িক প্রাকৃত-কবিরা প্রায়ই সংস্কৃত ভাঙিয়া প্রাকৃতপদ নিষ্পন্ন করিতেন।

উম্মিল্লই লায়ণ্ণং পয়য়চ্ছায়াএ সক্কয়বয়াণং।
সক্কয়সক্কারুক্করিসণেণ পয়য়স্‌স বি পহাবো।।

'প্রাকৃতের ছায়ায় সংস্কৃত পদের লাবণ্য ফোটে।
সংস্কৃতের সংস্কার-উৎকর্ষের দ্বারা প্রাকৃতের প্রভাবও (ফোটে)।।'

প্রকীর্ণ প্রাকৃত কবিতার চেয়ে পুরানো সংগ্রহ হইল 'গাথাসপ্তশতী' (প্রাকৃত 'গাহাসত্তসঈ')। সংগ্রহকর্তার নাম হাল। তিনি সাতবাহন-বংশীয় রাজা ছিলেন এই বিশ্বাসে সাতবাহন নামেও উল্লিখিত। বাণ হর্ষচরিতে বইটি সাতবাহনের রচনা (অথবা সংকলন) বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সাতবাহন রাজাদের যে কাল ইতিহাসে স্বীকৃত (খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী) তাহার সঙ্গে কবিতাগুলির ভাষার সঙ্গতি করা যায় না। সুতরাং সংকলয়িতা যিনিই হোন তিনি সাতবাহন-বংশীয় হইতে পারেন কিন্তু কোন সাতবাহন (বা শালিবাহন) রাজা নহেন।

গাথাসপ্তশতী নাম অনুসারে সংকলনটিতে সাত শত গাথা (অর্থাৎ আর্যা ছন্দে লেখা প্রাকৃত শ্লোক) থাকিবার কথা কিন্তু পুথিতে শ্লোকসংখ্যায় বহু বিভিন্নতা দেখা যায়। কোন কোন পুথিতে অধিকাংশ কবিতার রচয়িতার নাম দেওয়া আছে। তাহার মধ্যে কয়েকজন নারী।[৩] পূর্ণতমরূপে যে সংকলনটি আমরা পাইতেছি তা এককালে ঘটে নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দীতে যোগের পর যোগ হইয়া তবেই পরিবর্ধিত কায় হইয়াছে। বাণের পূর্বেই মূল সংকলন হইয়াছিল কিন্তু তাহা সপ্তশতী ছিল কিনা জানি না।[৪] মোটামুটিভাবে বলা যায় যে গাথাসপ্তশতীর শ্লোকসংগ্রহ ৪০০ হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

গাথাসপ্তশতীর কবিতাগুলি সবই পণ্ডিত-কবির রচনা নয়। এবং অধিকাংশ কবিতার ভাবও উচ্চ অথবা নীতিগর্ভ নয়, বরং বিপরীত। অধিকাংশই আদিরসের—এমন কি স্থূল আদিরসের, মেয়েলিয়ানার কবিতা।[৫] আদিরস থাক বা না থাক কতকগুলি কবিতার ভাষা স্পষ্ট মেয়েলি ধাঁচের। মনে হয় এইধরণের গাথাগুলি মেয়েলি, লৌকিক, কবিতার মার্জিত সংস্করণ। কবিরা সবাই এক অঞ্চলের লোক ছিলেন না। তবে অনেকগুলি কবিতায়, বিশেষ

১। অর্থাৎ চাহনি জীবনহীনের।
২। হয়ত কোন গোন্দ অথবা গৌড়বংশীয় রাজা।
৩। যেমন রেবা, পহঈ, রোহা, অণুলচ্ছী, মাহবী।
৪। বাণ প্রভৃতি প্রাচীন কবি সংকলনটিকে সপ্তশতী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।
৫। এমন গাথা নারীর রচনা হওয়াই সম্ভব।

করিয়া যেগুলিতে গোলা নদীব (গোদাবরীর) উল্লেখ আছে, সেগুলি দাক্ষিণাত্যে উদ্ভূত বলিয়া অনুমান করিতে হয়।

গাথাসপ্তশতীর মিতভাষিণী কবিতার পরিচয় দিতেছি। ইহার কোন কোনটিতে নব্যভারতীয় আর্য ভাষার কবিতাব যে বীজ আছে তাহা লক্ষ্য করিবার মতো। গ্রাম দৃশ্যের ছোট ছোট ছবিগুলি উপভোগ্য।

আরম্ভন্তস্স ধুঅং লচ্ছী মবণং বা হোই পুরিসস্স।
তং মরণং অনারম্ভে বি হোই লচ্ছী উণ ন হোই।।[১]

'(বীর-) কাজে যে পুরুষ নামে অবশ্যই তাহার লক্ষ্মী[২] লাভ হয়।
সে কাজে না নামিলেও মরণ হয় তবে লক্ষ্মীও হয় না।।'

কইঅবরহিঅং পেম্মং ণত্থি ব্বিঅ মামি মানুসে লোএ।
অহ হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জিঅই।।[৩]

'বিশুদ্ধ প্রেম, সখি,[৪] মনুষ্য লোকে নাই-ই।
যদি হয়, তবে বিরহ কোথায়[৫]? বিরহ হইলে কে বাঁচে?'

রূঅং অচ্ছীসু ঠিঅং ফরিসো অঙ্গেসু জম্পিঅং কন্নে।
হিঅঅং হিঅএ নিহিঅং বিওইঅং কিং ইহ দেব্বেণ।।[৬]

'রূপ আঁখিতে লগ্ন, স্পর্শ (আমাব) অঙ্গে অঙ্গে, বচন[৭] কানে।
হৃদয় হৃদয়ে নিহিত। এখানে দৈব কি বিয়োগ ঘটাইল?'

সুপ্পউ তইও বি গও জামো ত্তি সহিও কীস মং ভণহ।
সেহালিআণং গন্ধো ণ দেই সোত্তুং সুঅহ তুম্হে।[৮]

ঘুমাও। (রাত্রি) তৃতীয় প্রহরও কাটিয়া গেল।''—হে সখীরা, কেন আমাকে বারবার বলিতেছ! শিউলি ফুলের গন্ধে আমাব ঘুম আসিতেছে না। ঘুমাও তোমরা।।''

জং জং পলোএমি দিসং পুরও লিহিঅ ব্ব দীসসে তত্তো।
তুহ পতিমা-পড়িবাড়িং বহই ব্ব সঅলং দিসাঅক্কং।।

'যে যে দিকে চোখ ফেরাই সামনে দেখি এমি আঁকা।
সমগ্র দিক্‌চক্রবাল তোমার প্রতিমাপরম্পরাই বহন করিতেছে।।'

(তুলনা করুন
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি
যাহাঁ যাহাঁ দৃষ্টি পড়ে তাহাঁ ইষ্টস্ফূর্তি।[৯])

পঙ্কমইল্লেণ ছীরেক্কপাইণা দিন্নজাণুবডণেণ।
আনন্দিজ্জই হলিঅ পুত্তেণ ব্ব সালিচ্ছেত্তেণ।।

'কাদালাগা,[১০] শুধু ক্ষীর[১১] মাত্র ভোজী, হামাগুড়ি-দেওয়া,[১২]
পুত্রের দ্বারা আর ধানক্ষেতে চাষী আনন্দিত হয়।।'

১। কবির নাম বল্লহ (= বল্লভ)।
২। অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ।
৩। কবির নাম রাম।
৪। মূলে "মামি"। মাতুলানী এখানে সখী।
৫। মূলে "কস্স" (= কিসে)।
৬। কবির নাম ব্রহ্মগতি।
৭। অর্থাৎ গলার স্বর।
৮। কবির নাম সিরিসত্তি (= শ্রীশক্তি)।
৯। চৈতন্যচরিতামৃত।
১০। শিশুর পক্ষে ধূলামাটি লাগা।
১১। ক্ষীর = (১) শিশুব পক্ষে দুধ, (২) ধানক্ষেতের পক্ষে জল।
১২। ধানক্ষেতের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়া রোয়া আর নিড়েন করা।

গিজ্জন্তে মঙ্গলগাইআহিং বরগোত্তদিন্নঅন্নাএ।
সোউং ব নিগ্‌গও উঅহ হোন্তবহূআএ রোমঞ্চো।।

'মঙ্গলগায়িকারা গান করিতেছে। বরের নাম কান পাতিয়া শুনিবামাত্র, দেখ, বিয়ের কনের বধূর গায়ে কাঁটা দিয়াছে।।'

ফুট্টন্তেণ বি হিঅএণ মামি কহ ণিব্বারিজ্জএ তম্মি।
আদংসে পডিবিম্বং ব্ব জম্মি দুঃখং ন সংকমই।।[১]

'হৃদয় ফাটিয়া গেলেও, সখী, কি করিয়া তাহাকে নিবারণ করি? আরশিতে যেমন প্রতিবিম্ব, তেমনি তাহার মনে দুঃখ লাগিয়া থাকে না।।'

বেবিরসিন্নকরঙ্গুলিপরিগ্‌গহক্‌খসিঅলেহণীমগ্‌গে।
সোত্থি ব্বিঅ ণ সমপ্পই পিঅসহি লেহম্মি কিং লিহিমো।।[২]

'কাঁপনলাগা শীর্ণ হাতের আঙ্গুল থেকে খসিয়া পড়া কলমের গতি "স্বস্তি"[৩] টুকুই শেষ করিতেছে না। প্রিয়সখী, চিঠি কি লিখিব।।'

দুই চারিটি শ্লোকে কৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ আছে। যেমন

জই ভমসি ভমসু এমেঅ কণহ সোহগ্‌গগব্বিরো গোট্‌ঠে।
মহিলাণং দোসগুণে বিআরইউং জই খমো সি।।

'চাই কি গোষ্ঠে বেড়াইতে চাও তো এমনিই বেড়াইতে পার, কৃষ্ণ, সোহাগ-গরবে গর্বিত (হইয়া)। (অবশ্য) যদি মেয়েদের দোষগুণ বিচারে যোগ্যতা থাকে!'

গাথাসপ্তশতীর পরে আরও দুই একটি প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার সংকলন হইয়াছিল (যেমন 'বজ্জালগ্‌গ')[৪]। এই সব সংকলনের কবিতা প্রায়ই গতানুগতিক রচনা হইলেও দুটি চারটি বেশ ভালো।

নাটক

সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃতের ব্যবহার আছে, আর তাহাতেই "প্রাকৃত" ভাষাগুলির সাহিত্য-ব্যবহারের প্রাচীন ও প্রধান নিদর্শন রহিয়াছে,—একথা আগে বলিয়াছি। আগাগোড়া প্রাকৃতে লেখা নাটক ("সট্টক") দুই তিনটি অত্যন্ত পরবর্তীকালে লেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে যেটি সবচেয়ে পুরানো সে হইল রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'[৫] (নবম শতাব্দীর শেষভাগে)।

কর্পূরমঞ্জরী রাজশেখরের প্রথম নাট্যরচনা বলিয়া অনুমান করা হয়। কবির পত্নী অবন্তীসুন্দরী, যিনি চৌহানবংশীয়া বলিয়া রাজশেখর গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার অনুরোধে কর্পূরমঞ্জরী বিরচিত হইয়াছিল। চার অঙ্কের নাটিকা। বিষয় অত্যন্ত মামুলি, রত্নাবলীর মতোই।

১। কবির নাম রাঅবগ্‌গ (= রাজবর্গ)।
২। কবির নাম (অথবা ছদ্মনাম) অন্ধ (= অন্ধ, না আন্ধ্র অর্থাৎ অন্ধ্রদেশীয়?)।
৩। যে পদটি দিয়া চিঠি আরম্ভ করিতে হয়।
৪। সংস্কৃত করিলে হইবে "ব্রজ্যালগ্ন", 'অর্থাৎ ব্রজ্যায় গুচ্ছবদ্ধ। সংস্কৃত কবিতাসমুচ্চয় গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে যেটি প্রাচীন (অর্থাৎ 'সুভাষিতরত্নকোশ') তাহাতে কবিতাগুলি "ব্রজ্যা" শীর্ষক গুচ্ছে সাজানো। "ব্রজ্যা" মানে বেড়া, বেড়াঘেরা, গুচ্ছ।
৫। রাজশেখরের অপর নাট্যরচনার উল্লেখ আগে করিয়াছি।

প্রস্তাবনায় নাটকটিতে আগাগোড়া প্রাকৃত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে কবি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সূত্রধর জিজ্ঞাসা করিল,

তা কিং উণ সক্কঅং পরিহরিঅ পাউঅবন্ধে পঅট্টো কঈ।

'তবে কেন সংস্কৃত পরিহার করিয়া প্রাকৃত-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন কবি?'

পারিপার্শ্বিক উত্তর দিল,

সব্বভাসা-চউরেণ তেন ভণিদং জেব্ব জধা

অত্থণি এসা তে চ্চিঅ সদ্দা তে চ্চিঅ পরিণমাইং।
উত্তিবিসেসো কব্বো ভাসা জা হোই সা হোদু।।
পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরুসমহিলাণং জেত্তিঅং ইহন্তরং তেত্তিঅং ইমাণ।।

'সর্বভাষায় দক্ষ তিনি বলিয়াছেন এই কথা

সেই[1] শব্দগুলির একই অর্থসম্ভার, একই পরিণাম।
চমৎকারজনক উক্তিই কাব্য। ভাষা যা হয় তা হোক।
'সংস্কৃত রচনা পরুষ, প্রাকৃত রচনা সুকোমল।
পুরুষ-মেয়েদের মধ্যে যে তফাৎ সে তফাৎ এই দুইয়ের মধ্যে।।'

গদ্য

জৈন গ্রন্থকারদের একটি প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সে হইল প্রচলিত নীতি-গল্প ও লৌকিক কাহিনী সংগ্রহ করিয়া প্রাকৃতে ও প্রাকৃতমিশ্র অপভ্রংশে ধর্মের কাজে লিপিবদ্ধ করা। বৌদ্ধ ধর্মে গল্পকথা প্রথম হইতেই সমাদৃত হইয়াছিল, জৈন ধর্মে প্রায় শেষকালে। তবে একটু তফাৎ আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত অথবা সংগৃহীত গল্পগুলি অধিকাংশই প্রাচীন ও নীতিগর্ভ, এবং সে গল্পের আসরে পশুপক্ষী মানুষের তুল্যমূল্য। জৈন গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলি প্রধানত রোমান্টিক আর তার অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। জৈনদের সংকলিত (অথবা বিরচিত) গল্পে পশুপক্ষীর বিশেষ স্থান নাই। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রচলিত কোন কোন রূপকথার প্রাচীন অথবা মূল রূপটি জৈনদের সংকলিত প্রাকৃত গল্পে পাওয়া যায়। তবে সর্বদা গল্পের পরিণামে ধর্মাশ্রয় নির্দেশিত।

প্রাকৃত অপভ্রংশ মিশ্র ভাষায় লেখা 'বসুদেবহিণ্ডী' বইখানি জৈনদের সংকলিত গল্পগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে একটি গল্প যথাযথ অনুবাদে উদ্ধৃত করিতেছি। গল্পের নাম 'বসুদত্তা-কথা' দেওয়া যাইতে পারে।

উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে। সেখানে বসুমিত্র নামে গৃহস্থব্যক্তি বাস করে। তাহার পত্নীর নাম ধনশ্রী, পুত্রের নাম ধনবসু, দুহিতার নাম বসুদত্তা। বাণিজ্য প্রসঙ্গে আগত

১। অর্থাৎ সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের।

কৌশাম্বী-নিবাসী সার্থবাহ[১] ধনদেবের সঙ্গে সে বসুমিত্র সার্থবাহ তাহার দুহিতা বাসুদত্তার বিবাহ দিলও। সেও[২] ভালোয় ভালোয় তাহাকে[৩] লইয়া কৌশাম্বীতে আসিল ও বাপমায়ের সঙ্গে সুখে থাকিল।

কালক্রমে বসুদত্তাব গর্ভে ধনদেবের দুইটি পুত্র জন্মিল। তৃতীয় গর্ভের প্রসবও আসন্ন হইল। তাহার ভর্তা (তখন) বিদেশে। সে শুনিল, বণিকদল উজ্জয়িনী যাইতেছে। বাপ মা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া (উজ্জয়িনী) যাইতে মন কবিয়া শাশুড়ী শ্বশুরের কাছে বিদায় লইল, "উজ্জয়িনী যাইতেছি", এইটুকু (বলিল)।

তখন তাঁহারা বলিলেন, "বাছা একেলা কোথায় যাইবে। তোমার ভর্তা বিদেশে। তাহাব প্রত্যাগমন (পর্যন্ত) অপেক্ষা কর। তাহাব পর যাইও।"

সে বলিল, "আমি যাই। ভর্তা আমাব কি কবিবে।"

তাঁহারা আবার বারণ কবিলেও সে শুনিতে চাহিল না। নিজের ইচ্ছামতো. গুরুজনের কথা না মানিযা ছেলে দুইটিকে লইয়া চলিয়া গেল। তাঁহারাও, সহায় সম্পত্তিহীন (বলিযা), "আমাদের কথা রাখিবে না" (বুঝিয়া) চুপ কবিয়া রহিলেন।

সেই দুর্ভাগিনী যখন গেল তখন বণিকদল দূর চলিয়া গিয়াছে। বণিকদলেব সঙ্গ না পাইয়া সে অন্য পথে চলিল। তাহার ভর্তা সেই দিনই ফিরিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বসুদত্তা কোথায় গিয়াছে?" তিনি বলিলেন, "পুত্র, আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও উজ্জযিনী (-গামী) বণিকদের সঙ্গে গিয়াছে।"। তখন "আহা অকার্য করিযাছে", এই বলিয়া পুত্রপত্নীব স্নেহাবদ্ধ সে পথের রসদ লইয়া পথে খুঁজিতে খুঁজিতে চলিল। সন্ধানক্রমে সে দেখিল যে সে ঘুবিতে ঘুরিতে বনের পথে চলিয়াছে।। সে[৪] অনুনয় করিয়া তাহাব মন ফিবাইতে চেষ্টা করিল। সে[৫] চলিতে লাগিল এবং ঘন অরণ্যে প্রবেশ করিল। সূর্য অস্ত গেলে বাত্রি কাটাইবার স্থান লইল।[৬]

সেই সময় বসুদত্তার পেটে বেদনা উঠিল। তখন ধনদেব সার্থবাহ গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া তাহার জন্য মণ্ডপ কবিয়া দিল। সেখানে বসুদত্তা গর্ভমোচন করিল, পুত্র প্রসব করিল। (তাহার পর) সেখানে রাত্রির অন্ধকারে রক্তের গন্ধ পাইয়া মৃগ-মাংসাহাবী বনের শ্বাপদ-ক্ষয়কারী অতিশয় ভীষণ বাঘ আসিল। বিশ্রামরত ধনদেবকে সে ঘাড়ে ধরিয়া লইয়া গেল। পতিবিয়োগজনিত দুঃখভরে করুণ শোক সন্তপ্তহৃদয় হইয়া সেও কাঁদিতে কাঁদিতে "তুই জন্ম-অলক্ষণ", এই (কথা) বলিতে বলিতে মূর্ছা গেল। সেই করুণ অসহায় শিশু দুইটিও ভয়ে সর্বাঙ্গে কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছা গেল। সেই দিনে জন্মিয়াছে যে শিশু সেও স্তন্য না পাইয়া মরিল।

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে সকাল হইলে, বিলাপ করিতে করিতে ছেলে দুইটিকে লইয়া (সে স্থান ছাড়িয়া) চলিল। অকালবর্ষায় গিরিনদী পূর্ণ। তাহা দেখিয়া সে এক পুত্রকে পারে রাখিয়া আসিয়া অপর পুত্রকে পার করিবার সময়ে উঁচুনীচু পাথরে পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। ছেলেটিও তাহার হাত হইতে খসিয়া গেল। অপর যে ছেলেটি জলের ধারে ছিল সে (এই দেখিয়া) জলে ঝাঁপ দিল।

১। সার্থবাহ মানে যে বাণিজ্যকারী দলকে এক দেশ হইতে অপর দেশে লইয়া যায় এবং নিজেও এইভাবে বাণিজ্য করে।

২। ধনদেব। ৩। বসুদত্তা।

৪। ধনদেব। ৫। বসুদত্তা।

৬। "আবাসিও" (অর্থাৎ, আড্ডা গাড়িল।

সে বেচারী[১] খরস্রোতপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল এবং নদীকূলে নামিয়া-পড়া গাছের ডালে লাগিয়া মুহূর্তের অবকাশ পাইয়া আশ্বস্ত হইল ও ধীরে ধীরে (তীরে) উঠিল। সে নদীতটে থাকিতে থাকিতে বনভ্রমণকারী তস্কর-পুরুষদের হাতে পড়িল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহারা তাহাকে সিংহগুহা নামক গ্রামে চোর-সেনাপতি কালদণ্ডের কাছে আনিয়া দিল। তাহাকে রূপসী দেখিয়া সে[২] ভার্যা করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল। সে[৩] সকল তস্কর-মহিষীদের পাটরানী হইল।

তাহার পর সেই তস্কর-মহিলারা পতিসুখভোগ না পাইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল, "কিসে ইহাকে পরিত্যাগ করিবে"— এই (ভাবনা)। কালক্রমে তাহার[৪] ঔরসে তাহার[৫] গর্ভে পুত্র জন্মিল। সে তাহার মায়ের মতো (দেখিতে) তখন তাহারা[৬] তাহাকে নিবেদন করিল, "স্বামী, অত্যন্ত ভালোবাস বলিয়া উহার চরিত্র জানো না। ও পরপুরুষাসক্তহৃদয়। এই তোমার পুত্র তাহারই জন্মিত। যদি তোমার অবিশ্বাস (হয়) তবে নিজেকে আর উহাকে নিরীক্ষণ কর।"

সে কলুষহৃদয়ে অসি নিষ্কাশন করিয়া (সেই অসির ফলকে) নিজেকে দেখিতে চাহিল। সে (নিজের) মুখ দেখিল। গণ্ডস্থলে বড় কাটা দাগ, বীভৎস, বাঁকা বড় বড় চোখ, চেপটা বড় ব্যাঙের মতো নাক, বিস্ফারিত স্থূল লম্বৌষ্ঠ—(এমন) নিজের মুখ দেখিয়া আর সেই শিশুকে (দেখিয়া) বলিল, "ঠিক বটে।" তখন অপরীক্ষিতবুদ্ধি সেই পাপী সেই খড়্গে শিশুকে হত্যা করিল। তাহাকে[৭] চাবুক ও বেত কসাইয়া মাথা মুড়াইয়া, তস্করদের আদেশ করিল, "যাও, ইহাকে গাছে বাঁধ।" তাহার পর তস্কর-পুরুষেরা তাহাকে লইয়া দূরে গেল। সেখানে পথের ধারে এক শাল গাছের গোড়ায় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাঁটাভরা ডালপালা দিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়া ফিরিয়া আসিল। সে হতভাগিনী পূর্বকর্মবিপাকজনিত দুঃখ ভোগ করিয়া মনে মনে বহু চিন্তা করিয়া অনাথ অশরণ হইয়া রহিল।

তাহার অদৃষ্টবশে উজ্জয়িনী-গমনকারী বণিকদল সেই দিনই পানীয়সুলভ সেই অঞ্চলে আড্ডা গাড়িয়াছিল। সেই দলের কয়েক জন তৃণ কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহ করিতে একটু দূরে গিয়াছিল। তাহারা তাহাকে একেলা সেই গাছের গোড়ায় দড়ি-বাঁধা ও কাঁটাডালের বেড়ায় ঘেরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সে সকরুণ কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের অনুভূত দুঃখপরম্পরা বিবৃত করিল। তখন দয়াপরবশ হইয়া তাহারা তাহাকে মুক্ত করিল এবং সঙ্গে করিয়া দলের কাছে আনিল। দলের কর্তাকে যাহা ঘটিয়াছিল সকল কথা বলা হইল। তাহার পর সার্থবাহ তাহাকে আশ্বাস ও অন্নবস্ত্র দিয়া বলিল, "বাছা, নির্ভয়ে দলের সঙ্গে চল। ভয় করিও না।" তখন সে আশ্বাস পাইয়া ভয় ছাড়িয়া সেই বণিকদলের সঙ্গে উজ্জয়িনী চলিল।

সেই বণিকদলের সঙ্গে সুব্রতা নামে গণিনী[৮] (যিনি) জিনবাক্য সার করিয়া পরমার্থ

১। বসুদত্তা। ২। কালদণ্ড।
৩। বসুদত্তা। ৪। কালদণ্ড।
৫। বসুদত্তা। ৬। চোরসেনাপতির অপর পত্নীরা।
৭। জৈন সন্ন্যাসিনী যাঁহার অনেক শিষ্যা আছে।

প্রাপ্ত হইয়াছেন, (তিনি) বহু শিষ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া জীবন্ত স্বামীকে বন্দনা করিবার জন্য উজ্জয়িনী যাইতেছিলেন। তাঁহার পাদমূলে সে[১] ধর্ম (কথা) শ্রবণ করিয়া সার্থবাহের অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা লইল। তাহার নাম (হইল) কণ্টিকার্যকা[২]।

তাহার পর সে উজ্জয়িনী পৌঁছিয়া বাপ মা ও প্রধান প্রধান আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলিত হইল। নিজের দুঃখ কথা কহিয়া সে দ্বিগুণ উদ্বেগ অনুভব করিল এবং সম্যক্ ধ্যানে ও তপস্যায় উদ্‌যুক্ত হইয়া ধর্ম (উপার্জন) করিতে লাগিল।

জৈন অপভ্রংশ

অপভ্রংশ ভাষাকে অনেকটা হালকা করিয়া (অর্থাৎ প্রাকৃতের সঙ্গে অবহট্‌ঠ মিশাইয়া) দাক্ষিণাত্যের ও গুজরাট-রাজস্থানের জৈন-লেখকেরা পুরাণপ্রমাণ আখ্যায়িকা-কাব্য রচনায় এবং ছোটখাট কাব্য নাটক ও পদ্য আখ্যান রচনায় দীর্ঘকাল ধরিয়া (নবম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী) পর্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পুরাণ-জাতীয় বৃহৎকায় রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল 'মহাপুরাণ' (নবম শতাব্দী)। ইহাতে ত্রিষষ্টি সংখ্যক মহাপুরুষের চরিতকথা আছে, সেইজন্য বইটির নামান্তর 'ত্রিষষ্ঠিশলাকাপুরুষ-চরিত্র'। সে তেষট্টি মহাপুরুষ হইলেন—চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্কর, তাঁহাদের সমকালীন বারো জন চক্রবর্তী রাজা, এবং সাতাশ জন বীর (নয়জন বলদেব, নয়জন বাসুদেব ও নয়জন প্রতিবাসুদেব)। প্রথম অংশের নাম 'আদিপুরাণ', দ্বিতীয় অংশের নাম 'উত্তরপুরাণ'। আদিপুরাণের প্রায় সবটাই জিনসেনের রচনা। বাকি অল্প অংশ এবং সমগ্র উত্তরপুরাণ জিনসেনের শিষ্য গুণভদ্রের রচনা। ইঁহারা কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহাদের মাতৃভাষা ছিল কানাড়ী।

স্বয়ম্ভুর 'পউমচরিউ' রামকথা। আদিপুরাণ যদি জৈন অপভ্রংশের মহাভারত হয় তো পউমচরিউ জৈন অপভ্রংশের রামায়ণ। স্বয়ম্ভুর কাব্য পাঁচ কাণ্ডে বিভক্ত—বিদ্যাধর ("বিজ্জাহর"), অযোধ্যা ("অউজ্‌ঝা"), সুন্দর, যুদ্ধ ("জুজ্‌ঝা") ও উত্তর। এখানে রাম-মাতার নাম অপরাজিতা, শত্রুঘ্ন-মাতার নাম সুপ্রভা। কাহিনীতে ছোটখাট নূতনত্ব আরও আছে।

আখ্যায়িকা কাব্যের ("ধর্মকথা") মধ্যে হরিভদ্রের 'সমরাইচ্চ-কহা'—গদ্যে পদ্যে লেখা—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কাব্যের ভাষা অপভ্রংশপ্রভাবহীন। তবে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাব্য—ধনপালের (বা ধনপতির) 'ভবিস্‌সয়ত্তকহা'—পুরাপুরি অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ। এই গ্রন্থের গল্প কোন কোন অংশ আরব্য-উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয়। পরবর্তীকালের নব্যভারতীয় সাহিত্যের কিছু কিছু পূর্বাভাসও ইহাতে আছে।

১। বসুদত্তা।
২। "কণ্টিয়জ্জয়া" অর্থাৎ কাঁটিয়া-মাতা।

জৈন অপভ্রংশ বৃহৎকাব্যগুলি কয়েকটি করিয়া "সন্ধি" নামক অংশে বিভক্ত। সন্ধির শেষে কবির ভণিতা থাকে। যেমন ভবিস্‌সয়ত্তকহার ষষ্ঠ সন্ধির শেষে

ন পয়াসিউ গুজ্‌ঝু দূরবিষপ্পমহামইণ।
ইত্তিয়ং কহেবি সংধি সমাণিয় ধণবইণ।।

'দুরদর্শিবুদ্ধি তিনি গুহ্যকথা প্রকাশ করিলেন না। এইমাত্র কহিয়া ধনপতি (এই ষষ্ঠ) সন্ধি সমাপ্ত করিলেন।।'

প্রত্যেক সন্ধি আবার কয়েকটি "কড়্‌বক" নামক ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত। কাব্যে যেমন সন্ধির সংখ্যা ঠিক নাই, কড়্‌বকের সংখ্যাও তেমনি নির্দিষ্ট নয়,—বিশ বা ততোধিক হইতে পারে, আট বা বেশিও হইতে পারে। কড়্‌বকের শেষ পদ (couplet) অপর পদ হইতে ভিন্ন ছন্দের হইবে। যেমন সংস্কৃত কাব্যে সর্গের শেষে হয়। এ পদের নাম "ঘত্তা" (অর্থাৎ ধর্‌তা, ধুয়া)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অবহট্ঠ

খ্রীষ্টীয় নবম-দশম হইতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ পর্যন্ত (এবং তাহার পরেও) যে অপভ্রংশ-ভাঙা সাধু ভাষা অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের গানে-গাথায় কবিতায়-ছড়ায় ব্যবহৃত হইত তাহাকে সমসাময়িক লেখকেরা 'অবহট্ঠ' (সংস্কৃত 'অপভ্রষ্ট') বলিয়াছেন। অঞ্চলভেদে অল্পস্বল্প রূপান্তর ও শব্দভিন্নতা ছাড়া অবহট্ঠের কোন সুস্পষ্ট প্রাদেশিক উপভাষা ছিল না। সাহিত্যে এই ভাষা প্রায় একইরূপে উত্তরাপথের পশ্চিম প্রান্ত গুজরাট হইতে পূর্ব প্রান্ত আসাম পর্যন্ত চলিত। যে সময়ে এইভাষায় সাহিত্য-ব্যবহারের নিদর্শন পাইতেছি সে সময়ে ভারতবর্ষীয় আর্যভাষা নব্যস্তরে অবতীর্ণ হইতেছিল। সেই উদ্‌ভিদ্যমান নব্য ভারতীয় আর্যভাষার শব্দ পদ ও ইডিয়ম অবহট্ঠ রচনার মধ্যে অসুলভ নয়। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার বিকাশের ও তাহাতে সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হইবার বেশ কিছুকাল পরে পর্যন্তও অবহট্ঠে ছড়া-গান ও দীর্ঘতর রচনা প্রস্তুত হইয়াছিল। এবং এগুলির ভাষায় আধুনিক ভাষার প্রভাব অত্যন্ত বেশি।

অবহট্ঠ সাহিত্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির সাহিত্যের পূর্বরূপ বহন করিতেছে। নব্য ভারতীয় আর্য সাহিত্য গোড়ার দিকে অবহট্ঠ সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পদাঙ্কানুসারী। অধিকাংশ অবহট্ঠ লেখক তাঁহার মাতৃভাষায় (নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায়) গান অথবা ছড়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে অবহট্ঠ তেমনি ছিল যেমন এখন আমাদের কাছে বিদ্যাসাগরের কিংবা মাইকেলের ভাষা।

দোহা

যোগী অধ্যাত্ম-সাধকেরা অবহট্ঠ ভাষায় নীতি-উপদেশবাণী ও প্রাচীন কবিতা রচনা করিতেন। এমন রচনার মধ্য দিয়াই আমরা অবহট্ঠের পুরানো এবং বহুল নিদর্শনগুলি পাইয়াছি। তাহার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো হইল সরহপাদের ও কাহ্নপাদেব দোহাকোষ দুটি।[১] ইঁহাদের জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী। সরহের কবিতায় ভাষা বেশ সরল। কাহ্নের কবিতায় ভাষা একটু কঠিন ও প্রাকৃতঘেঁষা। কিছু কিছু উদাহরণ দিই।

সরহ বলিতেছেন, নানা ধর্মে নানারকম ধ্যান-ধারণা-উপাসনার বিধি। সে সব বিধি অনুসরণ করিলে চরম অধ্যাত্মজ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ হয় না।

১। মানে দোহাসংগ্রহ। দোহা আসলে ছন্দের নাম, তাহা হইতে এই ধরনের প্রকীর্ণ কবিতারও নাম হইয়াছিল "দোহা"। অধিকাংশ দোহার ছন্দ কিন্তু দোহা নয়, "চউপঈ" (চতুষ্পদ)।

মন্তহ মন্তে সন্তি ণ হোই
পড়িল ভিত্তি কি উট্‌ঠিঅ হোই।
তরুফলদরিসণে ণউ অগ্‌ঘাই
বেজ্জ দেক্‌খি কি রোগ পলাই।।

'মন্ত্রের মন্ত্রণে (অর্থাৎ জপে) শান্তি হয় না।
পড়া ভিত (অর্থাৎ দেওয়াল) কি (আপনি) উত্থিত হয়?
গাছে ফল দর্শনে আস্বাদ (পাওয়া যায়) না।
বৈদ্য দেখা দিলেই কি (রোগীর) রোগ পলায়?'

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ ণেবিজ্জেঁ
কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সিজ্‌ঝ।
কিন্তহ তিত্থ তপোবণ জাই।
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণী ন্হাই।।

'কি (হয়) তায় দীপে? কি (হয়) তায় নৈবেদ্যে?
কি তায় করা যায় মন্ত্রের সিদ্ধিতে?
কি (হয়) তার তীর্থ-তপোবনে গিয়া?
মোক্ষ কি লাভ হয় জলে স্নান করিয়া?'

তাহা হইলে উপায় কি? সরহ বলিতেছেন, উপায় গুরুপদাশ্রয়।

জই গুরু-বুত্তউ হিঅই পইসই
ণিচ্চিঅ হত্থে ঠবিঅউ দীসই।
সরহ ভণই[১] জগ বাহিঅ আলেঁ
ণিঅসহাব ণউ লক্‌খিউ বালেঁ।।

'যদি গুরু-বাক্য হৃদয়ে প্রবেশ করে, (তবে পরমার্থ)
নিশ্চয় হস্তে-স্থাপিত (অর্থাৎ হস্তামলকবৎ) দেখা যায়।
সরহ বলে, জগৎ বৃথাই ঘুরিয়া মরে।
নিজ-স্বভাব লক্ষ্য করে না মূর্খ।।'

অবহট্‌ঠ দোহার স্টাইল যে মেয়েলি ছড়ার আদর্শে গড়া, সরহের কোন কোন দোহা থেকেই তার প্রমাণ দেওয়া যায়। যেমন

ঘরেঁ অচ্ছই বাহিরে পিচ্ছই
পই দেক্‌খই পড়িবেসী পুচ্ছই।
সরহ ভণই বঢ় জাণউ অপ্পা
ণউ সো ধেয় ণ ধারণ জপ্পা।।

'ঘরে (যে) আছে, বাইরে (তাহার) খোঁজ করে।
পতিকে দেখে, (তবুও) প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করে।
সরহ বলে, মূর্খ, আত্মাকে জানা হোক।
সে তো ধ্যানের ধারণীর ও জপের (নাগালে) নয়।।'

---

[১] ছড়ার গানে কবিতায় ভণিতার প্রচলন এইভাবেই শুরু হইয়াছিল।

সিদ্ধিরত্থু মই পঢ়মে পড়িঅউ
মণ্ডপিবন্তেঁ বিসরঅ এমইউ।
অক্‌খরমেক্ক এত্থ মই জাণিউ
তাহর ণাম ন জাণমি এ সইউ।।

"সিদ্ধিরস্তু"—আমি প্রথমে পড়িয়াছিলাম।[১]
মাড় গিলিতে গিলিতে (তা) এমনিই ভুলিয়া গিয়াছি[২]।
'এখন একটিমাত্র অক্ষর আমি জানিয়াছি।
কিন্তু তাহার নাম (তো) জানিনা, হে সখী।।'

সরহের দোহাকোষের সব দোহাই গভীর অধ্যাত্মবিষয়ক নয়। সাধারণ নীতিগর্ভ কবিতাও দুই একটি আছে। যেমন

পরউআর ণউ কিঅউ
অত্থি ন দীঅউ দাণ।
এহু সংসার কবণ ফলু
বরু ছড্ডহু অপ্‌পাণ।।[৩]

'পর-উপকার করা হইল না, অর্থীকে দানও দেওয়া হইল না। এ সংসারে (তবে) ফল কী? ববং ছাড় আত্মাকে।।'[৪]

কাহ্নের দোহা অর্থাৎ অবহট্‌ঠ শ্লোক-কবিতা বা ছড়া যাহা শুধু দোহা ছন্দেই নয়, চউপঈ ও গাহা ছন্দেও লেখা,[৫] সংখ্যায় সরহের তুলনায় অনেক কম এবং ভাষায় ও ভাবে একটু বেশি গুরু। কাহ্নেরও কোন কোন দোহায়[৬] ভণিতা আছে। কাহ্নের অধ্যাত্ম-কবিতার পরিচয় দিতেছি। প্রথম কবিতার ছন্দ দোহা দ্বিতীয়টির ছন্দ চউপঈ।

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই
হউঁ পরমত্থে পবীণ।
কোড়িহ মজ্‌ঝে এক্কু জই
হোই নিরঞ্জণলীণ।।

'লোকে বড়াই করে, "আমি পরমার্থে প্রবীণ।"
কোটির মধ্যে গোটিক যদি নিরঞ্জন-ভাবুক হয়!'

অহ ণ গমই উহ ণ জাই।
বেণি-রহিঅ তসু ণিচ্চল ঠাই।।

১। সেকালে "সিদ্ধিরস্তু" বলিয়া হাতেখড়ির আরম্ভ হইত। এখনও হয়।
২। অথবা, জানি না "নিজেই"।
৩। এই দোহার ছন্দ "দোহা"।
৪। অর্থাৎ, প্রাণ পরিত্যাগ ভালো।
৫। দোহায় দুই চরণ, চরণগুলির মাত্রাসংখ্যা চব্বিশ (১৩ + ১১ অথবা ১৪ + ১০) করিয়া। চউপঈতে চার চরণ, প্রত্যেক চরণে মাত্রাসংখ্যা ১৬(৮ + ৮) করিয়া। দোহায় ও চউপঈতে মিল (অন্ত্যানুপ্রাস) আছে। গাহাতে মিল নাই। এখানে দুই চরণ ও চরণসংখ্যা অসমান (সাধারণত ২৯, ২৪)। অবহট্‌ঠ দোহায় গাহার ব্যবহার খুব কম। গাহা সরাসরি আর্যা (গাথা) ছন্দ হইতে আগত।
৬। সরহের এবং কাহ্নের রচিত দোহা-কবিতার মধ্যে ভনিতা বেশির ভাগ চউপঈ ছন্দে পাওয়া যায়, দৈবাৎ দোহায়।

ভণই কাণ্‌হ মণ কহবি ণ ফুট্টই।
নিচ্চল পবণ-ঘরিণি-ঘরে বট্টই।

'অধোদেশে গমন করে না ঊর্ধ্বেও যায় না।
দ্বৈতবিহীন তাহার ঠাঁই নিশ্চল।
ভনে কাহ্ন, মন একটুও ফুটে না (অর্থাৎ নড়ে না),
নিশ্চল (হইয়া) পবনরূপ গৃহিণীর গৃহে থাকে।।'

জই মণ পবণ-দুয়ারে
দিঢ় তালবি দিজ্জই।
জই তসু ঘোর অন্ধারেঁ
মণি-দীব হো কিজ্জই।।
জিণ রঅণ উঅঁরে জই সো
বর অম্বর ছুপ্পই।
ভণই কাণ্‌হ ভব ভুঞ্জন্তে
ণিব্বাণো বি সিজ্‌ঝই।।

'যদি পবনদ্বারে মনকে দৃঢ় তালা দিয়া (রাখা) হয়,
যদি তাহার ঘোর আঁধারে মণিদীপ জ্বালা হয়,
যদি জিন-রত্নের[১] উপরে সে ভালো ছাউনি দেওয়া হয়,
(তবে) কাহ্নু ভনে, সংসার ভোগ করিলেও নির্বাণও সিদ্ধ হয়।।'

অল্প কয়েকটি দোহা তীল-পাদের নামে পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে দুএকটি আবার সরহের দোহাকোষেও মিলে। তাহার মধ্যে একটিতে এক পাঠে তীলপাদের অপর পাঠে সরহপাদের ভণিতা আছে। সেটি এই

সঅসংবেঅণ তত্তফলু
তীলপাঅ/সরহপাঅ ভণন্তি।
জো মণগোঅর পাঠিঅই
সো পরমত্থ ণ হোন্তি।।

'স্ব-সংবেদন হইল তত্ত্বফল, তীলপাদ/সরহপাদ বলেন।
যাহা মনোগোচর বলা হয় তাহা পরমার্থ হইতে পারে না।।'

নামে সম্ভ্রমসূচক "পাদ" এবং সেই সঙ্গে সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াপদ থাকায় বলা যায় যে কবিতাটি যিনি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার গুরু ছিলেন তীল/সরহ। সম্ভবত তীল/সরহ একই ব্যক্তি। তাহা হইলে সরহ জাতিবৃত্তিতে তৈলিক ছিলেন, এমন অনুমান করিতে বাধা নাই।

পরবর্তীকালেও দুই একটি দোহাসংগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে রামসীহ অর্থাৎ রামসিংহের 'পাহুডদোহা' ("প্রাভৃতদোহা", অর্থাৎ দোহা-উপহার) উল্লেখযোগ্য।[২] এ দোহাগুলি জৈন, নাথ-পন্থী ও শৈব যোগীর রচনা। কয়েকটি পুরানো দোহাও অবিকৃত অথবা পরিবর্তিত ভাবে ইহাতে আছে।

১। অর্থাৎ জিন-প্রতিমা। এখানে জৈন দেবসেবা উল্লিখিত।
২। তীল সরহ ও কাহ্নের দোহাকোষ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত 'দোহাকোষ' গ্রন্থে (১৯৩৯) পাওয়া যাইবে। পাহুডদোহা হীরালাল জৈন সম্পাদিত।

শৈব যোগীদের দোহার উদাহরণ

সিবু বিনু সত্তি ণ বাবরই
সিউ পুণু সত্তি-বিহীণু।
দোহিঁ জাণহি সয়লু জগু
বুজ্‌ঝই মোহ-বিলীণু।।

'শিব বিনা শক্তি অকর্মণ্য, শক্তিবিহীন শিবও।
দুজনেই জানেন সকল জগৎ। মোহ-বিলীন (হইলে) বোঝা যায়।।'

ভাষা-সম

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, অবশ্য বেদের অনেক পরে এবং মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি অঙ্কুরিত হইবার পরে, এ ব্যাপার সর্বদা লক্ষ্য করা যায় যে প্রাচীন ও নবীন দুই তিন স্তরের ভাষা সাহিত্যে একই কালে চলিতেছে, কিন্তু, বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া, কোথাও দুই স্তরের ভাষা যুগপৎ ব্যবহৃত হয় নাই। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃতের ব্যবহার আছে, বিবিধ প্রাকৃতের ব্যবহার। কিন্তু সেখানে প্রত্যেক ভাষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র নির্দিষ্ট। সংস্কৃতের মধ্যে প্রাকৃত বাক্য বা পদ নাই এবং প্রাকৃতের মধ্যেও সংস্কৃত বাক্য বা পদ নাই। কাব্য রচনায় সংস্কৃত-প্রাকৃতের জুড়ি ঘোড়া হাঁকানোর প্রথম প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন ভট্টিকাব্যের কবি। তবে তিনি সংস্কৃত-প্রাকৃতের মিশ্রণ ঘটান নাই। তিনি অভিন্ন সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দ বাছিয়া তাঁহার কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গটি গাঁথিয়াছিলেন। সর্গটির নাম 'ভাষাসমাবেশ'। সর্বসমেত পঞ্চাশ শ্লোক, তাহার মধ্যে চারটি (২১, ২৬-২৮) ছাড়া সবই সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত বলিয়া নেওয়া যায়। ছন্দ আর্যা, সংস্কৃতেও চলে, প্রাকৃতেও তো চলেই।[১] প্রথম শ্লোক এই

চারুসমীরণরমণে হরিণকলঙ্ক-
কিরণাবলীসবিলাসা।
আবদ্ধরামমোহা বেলামূলে
বিভাবরী পরিহীণা।।

'সুন্দর-বাতাস-দেওয়া সমুদ্রকূলে রাত্রি প্রভাত হইল। উজ্জ্বল চাঁদিনী রাত্রি বলিয়া রাম বিরহমূর্ছাগত হইয়াছিলেন।।'

পরবর্তীকালের আলঙ্কারিকেরা ভাষাসমত্ব যমক-অলংকারের মধ্যেই ধরিয়াছেন। প্রহেলিকায় ভাষা-সংমিশ্রণও অলঙ্কারের পর্যায়েই পড়ে।

১। মল্লিনাথ সর্গারম্ভে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য।
"অথাস্মিন্ সর্গে ভাষাসংকরস্যাপি চমৎকারিতয়া কাব্যেহলংকারত্বেন তন্ নিবধ্নন্ অপভ্রংশাদীনাং তথা প্রাকৃতভেদেষু চ দেশিতদ্ভবয়োশ্চ সংস্কৃতে সমাবেশাসম্ভবাৎ তৎসমাধাভেদাশ্রয়ণেন ভাষাসমাখ্যং শব্দচিত্রম্ আর্যগীতাখ্যেন মাত্রাবৃত্তেনাহ চার্বিত্যাদি।"

অবহট্‌ঠ কবিতার বিচিত্র নাম

অবহট্‌ঠ কবিতার মধ্যে মেয়েলি কবিতার বা ছড়ার ছাপ যে পড়িয়াছে আগে সে বিষয়ে সরহের দোহার প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। পরবর্তীকালে জৈন ভক্ত কবিদের রচনায় মেয়েলি নাচ-গানের আদর্শ অত্যন্ত বাহ্যত, সাধারণত রচনার নামেই—আরও স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক জৈন কবির ছোটখাট অবহট্‌ঠ কবিতায় ছন্দ-স্তবক নামে "ছপ্‌পয়" ("ষট্‌পদ"), "চউপঈ" ("চতুষ্পদিকা"), "দূহা" ("দোহা, দোধক") ছাড়া নারী-নৃত্যগীত নাম "রাসু" ("রাসউ", "রাসু"), "ফাগু" ও "চর্চরিকা" ("চাচরি") পাওয়া যায়। "রাসু" (> রসাক) হইল শোভন বেশে মণ্ডলীবন্ধনে নাচ। "ফাগু" (> ফল্গুক) হইল বসন্ত উৎসবে ফাগ মাখিয়া মাখাইয়া নৃত্য। "চর্চরিকা"ও বসন্তকালের নাচ, তবে প্রথম বসন্তের, হয়ত অগ্নি-কুণ্ডের চারধারে অথবা মসাল হাতে নাচ।

"রাসু" ("রাসউ" বা "রাস") কাব্যের মধ্যে আমরা বীররসের রচনা পৃথ্বীরাজের চরিত পাই, অবহট্‌ঠে লেখা, চন্দ-বলিদ্দের ও জল্‌হুর। সবচেয়ে পুরাতন জৈন "রাস" হইল অজ্ঞাতনামার "উপদেশরসায়নরাস"। সরহ-কাহ্নের দোহার সঙ্গে এখানে কিছু মিল দেখা যায়। কাব্যটি ছোট, সবশুদ্ধ ৩২০ ছত্র। ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে জিনপাল ইহার টীকা লিখিয়াছিলেন।

"ফাগু" ("ফাগু", "ফল্গু") রচনার মধ্যে খুব ছোট (৫৪ ছত্রের) হইলেও জিনপদ্মসূরির রচিত "সিরিথূলিভদ্দফাগু" উল্লেখযোগ্য। শেষ ছত্রে অনুরোধ আছে, এই ফাগু কবিতাটি চৈত্র মাসে গাওয়া নাচা হইতে পারে।[১]

প্রাচীনতম "চর্চরী" কবিতাটি ৯৫ ছত্রাত্মক। রচয়িতার নাম জানা নাই। জিনপাল ইহার টীকা লিখিয়াছিলেন ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।

জিনদত্তের (১০৭৫-১১৫৪) "কালস্বরূপকুলকম্' এ ধরণের রচনার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন এবং ভালো। কবির গুরু ছিলেন চাহিল। গুরুর কথা কবি এইটুকু বলিয়াছেন,

> তুম্‌হ ইহ পহু চাহিলি দংসিউ।
> হিয়ই বহুত্তু খরউ বীমংসিউ।।
> ইত্থু করেজ্জহু তুম্‌হি সরায়রু।
> লীলই জিবঁ তরেস্‌হ ভবসায়রু।।

'প্রভু চাহিল, তোমাকে এই দেখিলে
হৃদয়ে বহুত প্রবল জ্ঞানলাভ হয়।
দয়াবান্ তুমি এই কর,
যেন আমরা হেলায় ভবসাগর তরিয়া যাই।।'

এই চতুষ্পদীটিতে সরহের প্রতিধ্বনি শোনা যায়,

> বহুয় লোয় লুঞ্চিয়সির দীসহিঁ
> পর রাগদোসিহিঁ সহুঁ বিলসহিঁ।।
> পঢ়ই গুণহি সত্থই বক্‌খাণহি
> পরি পরমত্থ তিত্থু সু ণ জাণহি।।

১। "খরতরগচ্ছিয়া জিণপউমসূরিকিয় ফাগু রমেবউ।
খেলা নাচইং চৈত্রমাসি রংগিহি গাবেবউ।

'বহুলোক নেড়ামাথা দেখা যায়,
কিন্তু (তাহারা) বাসনাদোষ লিপ্ত হইয়া সংসারে বিলাস করে।
(তাহারা) পড়ে, ধ্যান করে, শাস্ত্র ব্যাখ্যান করে।
কিন্তু পরমার্থ আসলে কিছুই জানে না।"

লৌকিক কবিতা ও কাব্য

জৈন মহাপণ্ডিত হেমচন্দ্রের ব্যাকরণের শেষ অংশে বিবিধ সূত্রের উদাহরণ হিসাবে অনেক অবহট্‌ঠ কবিতা উদ্ধৃত আছে। এগুলি সত্যকার লৌকিক কবিতা, এবং বিষয়ও বিচিত্র। উদাহরণ দিতেছি।

দিঅহা জন্তি ঝড়প্ পড়হিঁ
পড়হিঁ মণোরথ পচ্ছি।
অং অচ্ছই তং মাণি অই
হোসই কর তু ম অচ্ছি।

'দিনগুলি ঝট্‌পট্ করিয়া চলিয়া যায়,
মনোরথ পিছনে পড়িয়া থাকে।
যাহা আছে তাহাই (যথেষ্ট) মানো।
হইবে করিয়া তুমি (আশায়) থাকিও না।।'

জই কেঁব পাবীসু পিউ
অকিআ কুড্ড করীসু।
পাণিউঁ নরই সরাবি জিবঁ
সব্বঙ্গে পইসীসু।

'যদি কোনরকমে প্রিয়কে পাই,
(তবে) অদ্ভুত কাণ্ড করিব।
জল যেমন নূতন শরায়, তেমনি
তাহার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিব।।'

কৃষ্ণলীলা অবহট্‌ঠ লৌকিক কবিতার একটি বিশিষ্ট বিষয় ছিল। অবহট্‌ঠের সরণী ধরিয়াই জয়দেবের গান এবং তাহার পরে বৈষ্ণব-পদাবলী চলিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণের ব্রজপ্রেমলীলা ঘটিত একটি পুরানো অবহট্‌ঠ কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

রাহী দোহড়ি পঢ়ণ সুণি
হসিউ কণ্‌হ গোআল।
বৃন্দাবণ-ঘণ-কুঞ্জঘর
চলিউ কমণ রসাল।।

'রাধিকার দোহাটি[1] পড়া শুনিয়া কৃষ্ণ গোপাল হাসিল,
(আর) বৃন্দাবনের নিবিড় কুঞ্জগৃহে কেবল রসাল (গতিতে) চলিয়া গেল।'

পরবর্তীকালের, অর্থাৎ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা—অবহট্‌ঠ কবিতার নিদর্শন 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' বইটিতে বিবিধ ছন্দের উদাহরণরূপে সংকলিত আছে। অন্যত্র আলোচনা ও উদাহরণ দ্রষ্টব্য।[2]

অবহট্‌ঠে লেখা গাথা কাব্যের নাম ও কিছু কিছু উদ্ধৃত শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল 'পৃথ্বীরাজরাসক'। একাধিক কবি এই নামে গাথা লিখিয়াছিলেন। দুইজনের নাম শুধু পাওয়া গিয়াছে—জল্‌হ ও চন্দ-বলিদ্দ। কাব্যটি পরবর্তীকালে পশ্চিমা হিন্দীতে রূপান্তরিত ও ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বার বার নবকলেবর ধারণ করিয়া কবি চন্দ বর্দাইয়ের নামে চলিয়া গিয়াছে। মূল ছিল অবহট্‌ঠে লেখা। তাহার কয়েকটিমাত্র কবিতা একটি জৈনগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়া রক্ষা পাইয়াছে।

যে অল্প কয়টি সম্পূর্ণ অবহট্‌ঠ কাব্য পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অনেক দিক দিয়া মুসলমান কবি অব্‌দর রহমানের ("অদ্দহমাণ") 'সংণেহয়রাসউ' (সংস্কৃতে 'সংস্নেহকরাসক') উল্লেখযোগ্য।[3] কাব্যটি মেঘদূতের মতো, তবে নায়কের উক্তিময় নয়, নায়িকার উক্তিময়। কবি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় বেশ বুৎপন্ন ছিলেন। অবহট্‌ঠের তুলনায় অপভ্রংশের ভাগ বেশি বলিয়া রচনা কঠিন ও গুরুভার। একটু উদাহরণ দিই।

অব্‌দর রহমান নিজের লেখনীধারণের কৈফিয়ৎ রূপে এইকথা বলিতেছেন,

জই অখি ণই গঙ্গা তিয়লোএ ণিচ্চ-পয়ডিয-পহাবা।
বচ্চই সায়রসম্মুহ তো সেসসরী মা বচ্চন্তু।।[4]

'যদি (বল) গঙ্গানদী, ত্রিলোক প্রভাব নিত্য প্রকটিত (করিয়া) সাগরের দিকে ধাবমান (রহিয়াছে), তবে কি অপর নদী প্রবাহিত হইবে না!'

জই সরোবরম্মি বিমলে সূরে উইয়ম্মি বিঅসিআ ণলিণী।
তা কিং বাড়িবিলগ্‌গা মা বিঅসউ তুম্বিণী কহ বি।।

'যদি (বল) সূর্য উঠিলে বিমল সরোবরে নলিনী বিকশিত হয়, তবে কি বেড়ায় বিলগ্ন লাউ-লতার কি কিছুতেই ফুল ধরা উচিত নয়?'

জা জস্‌স কব্বসত্তি সা তেণ অলজ্জিরেণ ভণিয়ব্বা।
জই চউম্মুহেণ ভণিয়ং তা সেসকঈ মা ভণিজ্জন্তু।।

'যাহার যেমন কাব্যশক্তি তা সে অলজ্জিত হইয়া প্রকাশ করুক।
যদি ব্রহ্মা (দেব) বলিয়াছিলেন[5] তবে কি বাকি কবিরা চুপ থাকিবে?'

"বিজ্জাবই" (বিদ্যাপতি) বিরচিত 'কীর্তিলতা' অবহট্‌ঠে রচিত শেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য। রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। ভাষায় প্রচুর আধুনিক ("দেশী") শব্দ ও পদ মেশানো আছে। সে সম্বন্ধে কবি গোড়াতেই পাঠককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

১। একটি দোহা পড়িয়া রাধা কৃষ্ণকে সঙ্কেতস্থানে যাইতে ইঙ্গিত করিয়াছিল। সে দোহাটি উদ্ধৃত থাকিলে অবহট্‌ঠ সংলাপময় কবিতার একটি সম্পূর্ণ উদাহরণ পাইতাম।
২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
৩। রচনাকাল আনুমানিক ১৩০০-১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।
৪। ছন্দ 'গাহা' (অর্থাৎ গাথা), সংস্কৃতের আর্যা-জাতীয়।
৫। ব্রহ্মা আদিকবি। তাঁহার কাব্য বেদ। সব বিদ্যা ও কাব্যশক্তি তাহাতে পরিনিষ্ঠিত।

সক্কয় বাণী বুহঅণ ভাবই
পাউঅরস কো মম্ম ণ পাবই।
দেসিল বয়ণা সব জন মিট্‌ঠা
তেঁ তৈসণ জম্পওঁ অবহট্‌ঠা।।

'সংস্কৃত বাণী পণ্ডিতব্যক্তিরা ব্যবহার করেন।
প্রাকৃত (কাব্য-) রসের মর্ম কেউই পায় না।
দেশিল (অর্থাৎ দেশোয়ালি) বচন সব লোকের মিষ্ট।
তাই আমি (সেইভাবে)[১] অবহট্‌ঠ বলিতেছি।।'

কাব্যে কবি স্বীয় পোষ্টা মিথিলার রাজা কীর্তিসিংহের পিতৃবৈর নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। অবহট্‌ঠে প্রচলিত বীরগাথারই এক পরিণাম কীর্তিলতায় দেখি। কাহিনীর আরম্ভ রূপকথার রীতিতে, তবে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর মুখে নয়—ভৃঙ্গ-ভৃঙ্গীর প্রশ্নোত্তর। মাঝে মাঝে ছড়ার মতো গদ্যের টুকরা (rhyming prose) আছে।

কীর্তিলতায় চারটি ভাষা ব্যবহৃত। প্রথমত সংস্কৃত। কাব্যের আরম্ভে পাঁচটি আর কাব্যের চারটি "পল্লব" বিভাগের প্রত্যেকটির আরম্ভে একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আছে। দ্বিতীয় অপভ্রংশ। এ ভাষা দৈবাৎ ব্যবহৃত এবং যে কয়টি উদাহরণ পাই তাহাতে বিকৃতি অর্থাৎ অবহট্‌ঠের পদ প্রক্ষিপ্ত আছে। যেমন,

পুরিসত্তণেন পুরিসও
নহি পুরিসও জন্মমত্তেন।
জলদানেন হু জলও
ণ হু জলও পুঞ্জিও ধুমো।।

'পুরুষত্ব দেখাইলেই পুরুষ (বলি),
(পুরুষ হইয়া) জন্মিলেই পুরুষ নয়।
জলদান করিলেই জলদ (বলি),
নহিলে জলদ পুঞ্জীভূত ধূম (মাত্র)।।'

তৃতীয় অবহট্‌ঠ। কীর্তিলতার বারো আনারও বেশি ইহাতে রচিত। চতুর্থত "লৌকিক" অর্থাৎ সমসাময়িক মৈথিল ভাষার সাধু (বা "ব্রজবুলি") রূপ। কিছু কিছু পদ্য অংশে এবং বেশির ভাগ গদ্য অংশে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। লৌকিক পদ্যের উদাহরণ।

তসু নন্দন ভোগীসররাঅবর ভোগপুরন্দর।
হুঅহুআসন-তেজি কান্ত কুসুমাউহ-সুন্দর।।
যাচকসিদ্ধি-কেদার দান পঞ্চম বলি জানল।
পিঅসখ ভণি পিঅরোজ সাহ সুরতান সমানল।।

'তাঁহার নন্দন ভোগীশ্বর রাজশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রের মতো ঐশ্বর্য।
হুতহুতাশনের তেজের মতো কান্তি, কুসুমায়ুধের মতো সুন্দর।।
যাচকদের সিদ্ধি-কেদার দানে পঞ্চম শ্রেষ্ঠ বলিয়া লোকে জানিয়াছিল।
(তাহাকে) প্রিয়সখা বলিয়া ফিরোজশাহ্ সুলতান সম্মান করিয়াছিলেন।।'

গদ্যের উদাহরণ, জৌনপুর শহরের বর্ণনা।

১। অর্থাৎ দেশোয়ালি-ভাষা মিশ্র।

তাহি নগরহিকরোপরি ঠবঠবন্তে সতসংখা হাট বাট ভমন্তে শাখানগর শৃঙ্গাটক আক্রীড়ন্তে গোপুর বকহঠী বলভী বীথি অটারী ওবারী রহট ঘাট কৌসীস প্রকার পুরবিন্যাস কথা কহন্তো কা ভনি দোসরী অমরাবতীক অবতার ভা।

'সেই নগরের উপরে (ঘোড়ায় চড়িয়া) ঠবঠব্ করিতে করিতে, শতসংখ্যক হাট বাট ভ্রমণ করিতে করিতে শাখানগরে পথের মোড়ে আমোদ অনুভব করিতে করিতে (রাজপুত্রদ্বয় চলিলেন)। গোপুর[1] বকহঠী বলভী বীথি অট্টালিকা উয়ারি[3] কূয়া ঘাট ইত্যাদি অশেষ প্রকার নগরবিন্যাসের কথা কহিব কি, যেন দ্বিতীয় স্বর্গপুরী অবতীর্ণ হইয়াছে।

কীর্তিলতার বিবিধ বর্ণনাচিত্রগুলিতে অবহট্‌ঠ-লৌকিক মিশ্র রচনার ভালো উদাহরণ মিলিবে। যেমন অশ্বারোহী সেনানীর যাত্রা বর্ণনা।

জোঅন্না ধাবহিঁ তুরয় ণচাবহি
বেলহিঁ গাঢ়িমা বেলা।
লোহিত পিত সামর লহঅউ চামর
সবণহি কুণ্ডল ডোলা।।
আবত্তবিবত্তে শখ পরিবত্তে
জুগ পরিবত্তণ ভানা।
ঘন তবলনিসানে সুনিঅ ন কানে
সাণে বুজ্‌ঝাবই আণা।।

'জোয়ানেরা ধাবিত হইয়াছে, ঘোড়া নাচাইয়া।
(তাহারা) গম্ভীর স্বরে কথা কহিতেছে।
লোহিত পীত শ্যামল চামর লাগানো হইয়াছে।
(তাহাদের) কানে কুণ্ডল দুলিতেছে।
এদিকে ওদিকে চালানোয়, পথ পরিবর্তনে, যুগ পরিবর্তন[4] ভ্রম হয়।
ঘন তবলের শব্দে কানে শোনা যায় না, ইশারায় আজ্ঞা বুঝায়।।'

অবহট্‌ঠের বল্কল ছাড়িয়া পূর্বাঞ্চলের আর্যভাষা তার নব্য বাংলা রূপ ধারণ করিতে লাগিল দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে অপভ্রংশের খোলস ছাড়িয়া বাংলাভাষা পূর্ণরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে লেখা কিছু গান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন নেপাল রাজদরবারে সংগ্রহের মধ্যে একটি পুঁথিতে। পুঁথিটির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। পুঁথিটি লেখা হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। তবে গানগুলির রচনাকাল একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর পরে নহে বলিয়া শব্দবিদ্যাবিদেরা নির্ণয় করিয়াছেন এবং এই রচনাগুলির ভাষা পুরাতন বাংলা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের শেষোক্ত ধারণা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ প্রধানত দুইটি। প্রথমত, ভাষায় অবহট্‌ঠের প্রভাব বেশি পরিস্ফুট, দ্বিতীয় ছন্দ প্রায় পুরোপুরি অবহট্‌ঠের। অর্থাৎ অক্ষররীতি তখনও মাত্রাবৃত্ততা পরিত্যাগ করে নাই। অতএব 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুঁথিতে প্রাপ্ত গানগুলির (যাহার মধ্যে কতকগুলি দোহার অর্থাৎ ছড়ার সমষ্টি) ভাষা ঠিকমতো বলিতে গেলে প্রত্নবাংলা বলিতে হয়।

১। নগরমধ্যে উচ্চ তোরণদ্বার।
২। অট্টালিকার উচ্চ চূড়াগৃহ।
৩। প্রাচীরঘেরা নিভৃত অট্টালিকা।
৪। অর্থাৎ প্রলয় কাণ্ড।

এখন অবহট্‌ঠের শেষ পর্যায়ের (এবং প্রত্নবাংলা পর্যায়ের) পদ্য রচনারীতি ও ছন্দপংক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। (এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে বাংলা-ভাষায় গদ্যরীতি চালু হইতে তখনো বেশ কয়েক শতাব্দী বিলম্ব ছিল।)

বৈদিক ভাষাশিল্পের কাল হইতেই পদ্যের কলি ("পদ") হিসেবে চার রকমের ছিল।[১] এক কলির পদ ("একপদী") দুই—দুইকলি ("দ্বিপদী") ("দোহা") তিন—("ত্রিপদী") এবং চার কলির পদ চতুষ্পদী ("চৌপা")। এই চার রকম কলি বা পদ ভেদ বেদেও পাওয়া যায়।[২] বেদে একপদী ছন্দের স্বতন্ত্র নিদর্শন নেই। এগুলি সবই ত্রিপদী কিংবা চতুষ্পদী শ্লোকের শেষ পদ ধুয়া হইয়া গিয়াছে। যেমন

ইন্দ্রায়েন্দো-পরিশ্রবঃ।।
মহদ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্।।
শ্রদঅস্মৈধত্তস জনাস ইন্দ্রঃ।। ইত্যাদি।

সংস্কৃতে একপদী শ্লোকের একমাত্র উদাহরণ পাইতেছি জয়দেবের গীতগোবিন্দে প্রথম মঙ্গলাচরণ গানটিতে।

১। ঋগ্‌বেদ আগে দ্রষ্টব্য।
২। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

নির্ঘণ্ট